KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"x8.5"
Vol. & Number : 19/3 19/4 20/2 20/4	Year of Publication : Feb - 1998 May - 1998 Oct - 1998 June - 1999 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

বিভাব

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

১৪০৫

With Best Compliments From

ADDLIFE INDIA PVT LTD.

28/1/A, Suren Sarkar Road
Calcutta - 700 010
Phone : 351-2563

With Best Compliments From

M/S. PRINCE BAKERY

(Bakers and Confectioners)
68, Dilkhusa Street
Calcutta - 700 017
Phone : 247 0919

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

বিভাব বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা প্রকাশিত হলো। একই সঙ্গে শুরু হলো অপ্রতিহত প্রকাশনার তেইশতম বছর। সময়ের ব্যাপক পরিসরে আমরা নানা বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি। একমাত্র পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সদা-প্রস্তুত সহযোগিতার সঙ্গে লেখকদের অকৃপণ প্রশ্রয় আমাদের সঞ্জীবিত রেখেছে।

জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণসংখ্যাটি পাঠক ও গবেষক মহলে যে বিপুল সমাদর লাভ করেছে তাতে আমরা অভিভূত। এই অবশ্য-সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যাটির কিছু সংখ্যা এখনো পাওয়া যাচ্ছে পাতিরাম, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের দ্বিতলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'বইঘর' ও অন্যান্য স্টলে।

বর্তমান সংখ্যাটিতে নানা আকর্ষণীয় রচনা রয়েছে। উৎপল দত্তের অপ্রকাশিত ডাইরি (উৎপল দত্তের অপ্রকাশিত ছবি ও ডাইরির জন্য আমরা শোভা সেনের কাছে কৃতজ্ঞ) ও সমরেশ বসুর অপ্রকাশিত রচনা ছাড়াও এই সংখ্যায় আমরা কাজী নজরুল ইসলাম ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে স্মরণ করেছি। উভয়বাংলার নামী লেখকরা তাদের যোগ্য রচনাসম্ভার দিয়ে আমাদের ঋণী করেছেন।

ছোট কাগজগুলিই সাহিত্যের প্রকৃত নির্ণায়ক। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমানের সাহিত্যের পত্রিকা রয়েছে একাধিক। অথচ আজ অবধি এমন কোনো মাধ্যম তৈরী হলোনা যাতে এদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা হয়। যারা ছোট কাগজ নিয়ে ব্যবসা করেন তাদের সাহিত্যের প্রতি তিলমাত্র দরদ নেই। তাই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংগঠকদের অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে কিছু ভূক্ষেপহীন বিক্রেতাদের কাছে। এতে সাহিত্যের অনেক সৎ প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। বছরের পর বছর প্রতিবাদহীন এই ব্যাপার চলে আসছে। অনেক কাগজই এখন ভাল বিক্রী হয়। বড় বাজার-চলতি কাগজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেক সাহিত্যপ্রাণ মানুষ ধীরে ধীরে আবার যোগ্যমানের সাহিত্যের ছোট কাগজগুলির দিকে ফিরে আসছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বাংলা আকাদেমী নানাভাবে ছোট কাগজগুলির দিকে সহৃদয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন! এ জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাতেই হয়। নিতান্তই অসম্ভব না হয় তবে বইপাড়ায় তারা যদি কোনো বিকল্প বন্টনব্যবস্থার আয়োজন করতে পারেন তবে আমরা চিরঋণী থাকবো। না হলে যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই! বড় ব্যবসায়িক কাজগুলির ছায়া দীর্ঘতর হয়ে গ্রাস করবে লিটিল ম্যগাজিগুলির সৎ সৃজন প্রয়াস।

বিনীত নমস্কারান্তে
সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

CAMBRIDGE BOOKS

Of The Hour And For Ever

কেমব্রিজের অসাধারণ বাংলা বই :-

১। রং তুলির রবীন্দ্রনাথ (বিতর্কমূলক)
ডঃ দিলীপ মালাকার

২। অ্যাগনেস থেকে মাদার টেরেসা
ডঃ নিত্যানন্দ ও তপতী দাশগুপ্ত

৩। পাবলো পিকাসো
ডঃ দিলীপ মালাকার

৪। নেপোলিয়ানের দেশে
ডঃ দিলীপ মালাকার

৫। রহস্যময়ী প্যারিস
ডঃ দিলীপ মালাকার

৬। পরিবেশ কথা
তরুণ বসু

৭। জঙ্গলের গল্প - মুন্সী প্রেমচন্দ
ডঃ নীলাঞ্জনা দাস

৮। সিনেমা সপ্তম শিল্পকলা
বরুণ দাস

৯। পাগলা কৃত্তা ও কূটনীতিক
সুনীতি চরণ ভট্টাচার্য্য

১০। চল যাই দূর দেশে
ডঃ দিলীপ মালাকার

১১। টপ সিক্রেট
সুনীতি চরণ ভট্টাচার্য্য

১২। গল্প নিয়ে অল্প কথা
শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

Cambridge India's blazing titles :

1. **Awakening** by A. Rama Rao, a chain of wonderful short stories.
2. **Between you and me** by Chenulu from U.S.A. Some highly interesting cerebrations.
3. **Rain At Dawn** by Asis Sanyal translated by Leela Roy, reminds us of the pathos of partition in a pithy novel.
4. **Aryanman** by Gautam Shankar Banerjee is a novel *Indo-Angliana*, piercing yet sublimating.
5. **'Munni's Mother Teresa** by Srinwanii Dasgupta presents Mother Teresa as a heroine of a modern fiction with a gripping plotline, internal and external conflicts.
6. **Whatever I write and have written is you** by Samarenda Sengupta is an exquisite poetry that communicates before it is understood. (Rabindra prize winner 1998)
7. **'Biraj Mohan and other poems'** by Sarat Kumar Mukhopadhyay and Mcnamara is a true to the original translation.
8. **Maxim Gorky's Mother**, simplified and abridged by Dr. Bratati Dasgupra Sen is a superb exposure to the school and junior college students.
9. **Pride and Prejudice** by Suniti Charan Bhattacharya is Jane Austin, simplified and abridged.
10. **Kamayani** - an epic per se by Monohar Banerjee.
11. **The Tumpet Major** by Dr. Bratati Dasgupta Sen.
12. **Swiss Family Robinson** - (Whis) Dr. Rolla Guha Niyogi.
13. **Activity Books** - Mary Ann Dasgupta.
14. **Glympses of Indian Sculpture** - Samarendu Sengupta.
15. **Sonata of Incessant Waves** Debabrata Bandyopadhyoy.
16. **Tales of our Time** Dr. M. Q. Khan and P. M. Nayak.

Publishers of many other quality books including Text Books

CAMBRIDGE INDIA

F 46 Dakshinapan, 2 Gariahat Road (South)
Calcutta 700 068 ✆ (033) 473 1246

Showroom and Sales Counter : 66 College Street (1st Floor), Calcutta 700 073 ✆ (033) 241 3356

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা ১৪০৫/১৯৯৮

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

সভ্যতার ভবিষ্যৎ ১ শিবনারায়ণ রায়
নিজের কথা (অপ্রকাশিত রচনা) ৬ সমরেশ বসু
তারাশঙ্করের উপন্যাস ৯ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

ক্রোড়পত্র-১: নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম ৩৩ বুদ্ধদেব বসু
আমার সুন্দর ৩৯ নজরুল ইসলাম
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ ৪৪ নজরুল ইসলাম
প্রতিভাষণ ৫০ নজরুল ইসলাম
নজরুল - প্রমীলা ও একটি পত্র ৫৩ বাঁধন সেনগুপ্ত

ক্রোড়পত্র-২ : উৎপল দত্ত

ল্যাঙ্কাস্টার আন্তর্জাতিক নাট্যসম্মেলনে ৫৯ শোভা সেন
উৎপল দত্তের অপ্রকাশিত দিনলিপি ৬৪
দিনলিপিতে উল্লিখিত চরিত্র-পরিচিতি ৭০
তাঁর অন্যতম শেষ ইচ্ছা ছিল
রাহুলকে নিয়ে নাটক লেখার ৭৩ সৌভিক রায়চৌধুরী

ক্রোড়পত্র-৩ : গল্প

প্রেত কাহিনী ৮১ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
জোয়ার জলের কাব্য ৮৯ ইমদাদুল হক মিলন
টোটেম ১০৩ মানব চক্রবর্তী
শঙ্খুয়া ১১৯ এষা দে
মৃত্যু-বাক্স ১৩১ বিজনকুমার ঘোষ
পিপলিপাড়া পোলিংস্টেশন থেকে ১৪০ সুনীল দাশ
সুখবাসী ১৫৪ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
বুধন ম্যান্ডেলা ১৬৫ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নক্ষত্র ১৬৯ রামকুমার মুখোপাধ্যায়
ক্রীতকন্যা ১৭৩ গোপালকৃষ্ণ রায়
হুইশিল ১৮১ মৃত্যুঞ্জয় সেন
বাযট্টি নম্বর কেবিন ১৯২ বন্দনা স্যান্যাল
রূপকথার শেষ রাজ্য ১৯৯ সুব্রত সেনগুপ্ত

ক্রোড়পত্র-৪: উপন্যাস

দীপেশ্বরীর অপেক্ষা ২০৭ সেলিনা হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী :
পবিত্র সরকার।
ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল। প্রদীপ দাশগুপ্ত।

শান্তিনিকেতন
অরুণ মুখোপাধ্যায়। অনাথনাথ দাশ

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল)। কলকাতা - ৬৮

শান্তিনিকেতনে যোগাযোগ কেন্দ্র
অরুণ মুখোপাধ্যায়
এ্যানড্রুজপল্লী (পশ্চিম) পো: শান্তিনিকেতন। পিন:৭৩১২৩৫

প্রচ্ছদ : রনেনআয়ন দত্ত

অলংকরণ : শ্যামল সেন

মূল্য : তিরিশ টাকা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৭০০ ০৬৮ থেকে প্রকাশিত। বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০ ০৩২ ফোন : ৪১২ ১১৩৩ হইতে অক্ষরবিন্যস্ত এবং চিত্রিত ও দি শিল্প মুদ্রণ, নিউ বালিগঞ্জ, কলিকাতা-৭০০ ০৩৯ হইতে মুদ্রিত।

সভ্যতার ভবিষ্যৎ

শিবনারায়ণ রায়

ইতালীর রেনেসাঁসের অন্যতম প্রবীন ভাবুক পিকো দেলা মিরান্দোলা তাঁর বীজগ্রন্থ "মানুষের মহত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায়" একটি কাহিনী বিবৃত করেন। সূর্য, নক্ষত্রমন্ডলী, আকাশ, গাছপালা, পর্বত, সমুদ্র, নদ,নদী, জীবজন্তু, সব কিছু সৃষ্টি করবার পর ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করে বললেন, দেখ, জগতে আমি প্রত্যেকটি সৃষ্টির জন্য নিয়ম বেঁধে দিয়েছি, এই নিয়ম তারা কোনো মতেই ভাঙতে পারে না, কিন্তু তোমার জন্য আমি কোনো নিয়ম বেঁধে দিলাম না, তোমার নিয়ম তুমি নিজেই রচনা করবে। তার দায়দায়িত্ব সবটাই তোমার। ভুল করলে তার দাম তুমিই দেবে, সুবিবেচনা করে যদি নিয়ম উদ্ভাবনা কর তার সুফল তুমিই ভোগ করবে। বিশ্বসংসারে তুমিই আমার একমাত্র সৃষ্টি যে স্বাধীন।

আমি নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু পিকোর এই কাহিনীটির ভিতরে আমি আধুনিক সভ্যতার মূল সূত্র দেখতে পাই। অবশ্যই প্রকৃতির কিছু নিয়ম আছে যা মানুষকেও মানতে হয়। শুধু খিদে, ঘুম, কায়িক সামর্থ্যের সীমা, বংশবৃদ্ধি এসব ব্যাপারেই নয়, যে সব নিয়ম অনুসারে প্রকৃতি চলে মানুষও তাদের অধীন। তবু তার দেহের গঠন, বিশেষ করে তার গুরুমস্তিষ্ক তাকে এমন এক বিশেষ সামর্থ্যের অধিকারী করেছে যার ফলে প্রায় প্রতি অবস্থাতেই সে বিকল্পের ভিতরে বাছতে পারে — পারে শুধু নয়, বেছে থাকে। এই সামর্থ্যের অনুশীলন থেকেই সভ্যতার জন্ম এবং বিকাশ ঘটে; এবং এই সামর্থ্যকে অবহেলা করলে সভ্যতার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বাছবার এই সামর্থ্যই মানুষের নৈতিকতার মূল উৎস।

মানুষ যে তার স্বাধীনতার সীমা বাড়াতে পেরেছে তার মুখ্য কারণ মানুষের জিজ্ঞাসা, কল্পনা, জ্ঞানার্জনের এবং সেই জ্ঞান সফলভাবে প্রয়োগের সামর্থ্য। তার বিশিষ্ট গুরুমস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে ভাষা এবং অক্ষর উদ্ভাবন করেছে, গড়েছে চাকা, নৌকো, লাঙ্গল, কায়িক শ্রমের ফলোৎপাদিকা শক্তি সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাধীনতার সম্প্রসারণ ঘটেছে, বিভিন্ন সম্ভাবনার ভিতরে বাছবার সুযোগ বেড়েছে, মানুষ প্রকৃতির দাস না হয়ে তার প্রায় প্রভু হয়ে উঠেছে।

সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষের ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য নানা কারণে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সূচনাকালে। আমার বিভিন্ন বইতে আমি এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি (যথা, রেনেসাঁস, গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়, স্রোতের বিরুদ্ধে, In Mans own Image, A New Renaissance ইত্যাদি)। সুতরাং এখানে আর এ বিষয়ে নতুন করে আলোচনা করব না। এখানে আমার মূল বক্তব্য হল, রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে যে আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব, যে সভ্যতা আজ শুধু পশ্চিমে নয়, কমবেশি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে গেছে, সেই সভ্যতা এখন পতনের মুখে, এবং তার বিকল্প রূপে নতুন একটি সভ্যতা যদি না গড়ে ওঠে তাহলে মনুষ্য-প্রজাতির ভবিষ্যৎ একেবারেই তমসাচ্ছন্ন।

ইতিহাসে আধুনিক সভ্যতার অবদানকে আমি কিছুমাত্র খাটো করে দেখি না, বা দেখাতে চাই না। আধুনিক সভ্যতার উদ্ভবের আগে জগৎ সম্বন্ধে আমাদের নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ছিল

খুবই সীমাবদ্ধ। কোপার্নিকান বিপ্লবের ফলে সৌরজগৎ এবং তার সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের ধারণা আমূল বদলে যায়। তারপর বর্তমান শতকে আমাদের জ্ঞান আর সৌরজগতে আবদ্ধ নেই; আমরা জানি সৌরমন্ডলের বাইরেও অসংখ্য মন্ডল বিদ্যমান (এক সময়ে এই কথা লেখার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্যোর্দানো ব্রুনোকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।) মানুষের দেহের অভ্যন্তর এবং তার ক্রিয়াকলাপ বিষয়েও আমাদের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান। অর্থাৎ আধুনিক যুগ নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগের ফলে একদিকে যেমন শ্রমের উৎপাদনশক্তি এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র অভূতপূর্বভাবে বর্ধমান, অন্যদিকে তেমনি ভৌগলিক দূরত্বের বাধা অতিক্রম করে দূরদেশবাসী মানুষদের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। একদিকে নানা কঠিন ব্যাধিকে জয় করবার সামর্থ্য যেমন বেড়েছে, অন্যদিকে সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মনে আপন আপন মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার অভীপ্সাও প্রবলতর হয়েছে।

এ সবই আধুনিক সভ্যতার সুফল। কিন্তু তারি সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা যে আপনাকে বস্তুত মানব প্রজাতিকে ধ্বংসের প্রত্যন্ত সীমায় নিয়ে এসেছে আজ আর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতি সংক্ষেপে সেই সর্বনাশা দিকগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করি। পরমাণুর ভিতরে যে প্রায় অপরিমেয় শক্তি নিহিত ছিল তার রহস্যভেদের অন্যতম ফল পরমাণু বোমা, এবং তার প্রয়োগ যে কী বীভৎস হতে পারে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে তা আমরা দেখেছি। আজ পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিমান রাষ্ট্রের কাছে যে পরিমাণ পরমাণু বোমা সঞ্চিত আছে তার বিস্ফোরণ ঘটলে মনুষ্য প্রজাতিই হয়তো বিলুপ্ত হতে পারে। পৃথিবীর গোপন গর্ভে যে পেট্রল সঞ্চিত ছিল তা আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়ে সব বড় নগর শহরের বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে, আকাশে যে ওজোনের আচ্ছাদন পৃথিবীতে জীবনধারণ সম্ভবপর করেছে তা দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসছে। মানুষের সীমাহীন লোভ এবং ভোগবাসনা প্রকৃতিপরিবেশকে বাসের প্রায় অযোগ্য করে তুলেছে। অপর পক্ষে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে। অধিকাংশ হিসাব অনুসারে পৃথিবীর শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ লোক উৎপন্ন সম্পদের শতকরা আশিভাগ সম্ভোগ করে, আর শতকরা আশিভাগ লোক বাকি কুড়িভাগ সম্বল করে কোনো রকমে টিকে আছে। যান্ত্রিক উদ্‌ভাবন এবং প্রয়োগের ফলে মানবীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হতে বসেছে, অধিকাংশ মানুষের রুচি ও ধারণা একই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। মানুষের মধ্যে ধ্বংসের প্রবৃত্তি যেমন প্রবলতর হচ্ছে, ধ্বংসের শক্তিও তেমনি ক্রমবর্ধমান। অধিকাংশ মানুষের মনে একদিকে শুভনাস্তিক্য (Cynicism) ও নির্নৈতিকতা (amoralism), নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা বোধ যেমন ছড়িয়ে গেছে, অন্যদিকে ফ্রয়েড যাকে বলেছেন মৃত্যুবৃত্তি (thanatos) তা প্রবলতর হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের শেষ লগ্নে পৌঁছে আধুনিক সভ্যতা শুধু নয়, সমগ্রভাবে সভ্যতার আত্মহত্যা বিষয়ে আশঙ্কার কারণ দেখা যাচ্ছে।

এই অবস্থায় আমরা কী করতে পারি। ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবী বলে কিছু নেই। মানুষ স্বাধীন জীব, তার সামনে তাই সর্বদাই বিকল্প বিদ্যমান। আধুনিক সভ্যতার মর্তুকাম রূপটি দেখে আমাদের ভাবতে হবে কোথায় গলদ ছিল, কী ভাবে একুশ শতকে নতুন সভ্যতার বনিয়াদ রচনা করা যেতে পারে। আমার ধারণা যে কোপার্নিকান বিপ্লব যেমন কেন্দ্র থেকে পৃথিবীকে সরিয়ে সূর্যকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিল, রেনেসাঁস তেমনি তার বিশ্ববীক্ষা কেন্দ্রে মানুষকে

প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই স্বাধীন মানুষের মূল্য অভীষ্ট হয়ে ওঠে সব কিছুর ওপরে তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। প্রথমে জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন মেটাবার উপায়মাত্র ভেবে আধুনিক মানুষ ক্রমেই ভুলতে শুরু করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার প্রাণের অচ্ছেদ্য যোগের কথা। আমরা নিত্যই প্রকৃতিপরিবেশ থেকে গ্রহণ করি, কিন্তু পরিবর্তে প্রকৃতিকে কতটুকু ফিরিয়ে দিই? আসলে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের একটা গভীর মিলনের সম্পর্ক আছে। এবং আধুনিক মানুষ ক্রমেই সেই সম্পর্ককে ক্ষীণতর করে এনেছে। বাঁধ বেঁধে নদীর স্বাভাবিক স্রোতকে রুদ্ধ করেছে, নানা প্রয়োজনে বনের পর বন উচ্ছেদ করেছে, জলকে করেছে বিষাক্ত, বায়ুকে করেছে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অযোগ্য। ঋতুরঙ্গের যে রস মানুষের মনকে ঋদ্ধ করে, সৃজনশীল করে, যন্ত্রবিপ্লব নাগরিক সভ্যতা তার ছন্দকে ক্রমাগতই ব্যাহত করে চলেছে। আমাদের যদি নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে হয় তাহলে প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে যথার্থ সংযুতি ফিরিয়ে আনতে হবে। যাঁরা পরিবেশদূষণ বন্ধ করবার জন্য আজ উদ্যোগী আগামী দিনের সুস্থ সভ্যতার এই দিকটিই তাঁদের লক্ষ্য।

ক্ষমতার সাধনায় মানুষ শুধু প্রকৃতিকেই তার প্রয়োজন সাধনের উপায়মাত্র ভাবে নি, অন্য মানুষদেরও আরো নির্মমভাবে নিজেদের নিমিত্তমাত্র ভেবে ব্যবহার করেছে। আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার স্থানীয় অধিবাসীকে জাহাজে পুরে আমেরিকায় চালান দেওয়া এর একটি নাটকীয় উদাহরণ মাত্র। ক্ষমতার সাধনায় পশ্চিমের দেশগুলি ক্রমে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকে তাদের অধীন করেছে, উপনিবেশের নামে তারা সেই সব দেশ নিরঙ্কুশভাবে শোষণ করেছে, বর্ণের ভিত্তিতে অসাম্যকে বৈশ্বিক ভিত্তি দিয়েছে। যদি সুস্থ কোনো সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে এই অসাম্য দ্রুত নিরাকরণ করবার জন্য ফলপ্রসূ ব্যবস্থা জরুরি। এ সমস্যা শুধু শ্বেতকায় এবং অশ্বেতকায়ের নয়, প্রত্যেকটি দেশেই এই অসাম্য কমবেশি বিদ্যমান। আমরা তৃতীয় জগতের কথা বলি, কিন্তু বস্তুত আধুনিক সভ্যতায় 'চতুর্থ জগৎ' আরো ভয়ানক প্রকট। এই চতুর্থ জগতের স্ত্রী পুরুষ দিনরাত খেটেও দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, এরা নিরক্ষর এবং এদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে, এদের বাসস্থান বস্তিতে অথবা পথেঘাটে, এদের ব্যাধিতে সুচিকিৎসার কোনো সুযোগ সামর্থ্য নেই, সারা পৃথিবীর অধিবাসীদের এরা এক তৃতীয়াংশের বেশি। এদের মধ্যে অনেকে অসংগঠিত-শ্রমজীবি, অনেকে ভূমিহীন খেত-মজুর, অনেকে বেকার। কোনো সুস্থ সভ্যতাই আজ কল্পনীয় নয় যদি না পৃথিবীর অন্য অধিবাসীদের সঙ্গে এদেরও মানবীয় মৌল অধিকার সমানভাবে প্রতিষ্ঠা পায়।

আর এই অসাম্য প্রসঙ্গে যাদের কথা সব চাইতে উল্লেখ্য তারা মনুষ্য প্রজাতির অর্ধাংশ। বিগত অন্তত আড়াই হাজার বছর ধরে মেয়েদের করে রাখা হয়েছে পুরুষদের সেবাদাসী। তারা সন্তান ধারণ করে, নানাভাবে পুরুষদের সেবা করে, কিন্তু না তারা পেয়েছে সমাজের ও রাষ্ট্রের সামূহিক সিদ্ধান্ত নির্ধারণে কোনো সক্রিয় অংশ, না তাদের ভিতরে বেশির ভাগ পেয়েছে ন্যূনতম শিক্ষা। এই অসম ব্যবস্থার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে পরিবার প্রতিষ্ঠান। একটি সুস্থ সভ্যতায় নারীকে নরের সঙ্গে পূর্ণ মানবিক অধিকার দিতে হবে। জীবনের সব ক্ষেত্রে তাদের সমান নাগরিক রূপে আচরণ করতে হবে। তার ফলে পরিবার ব্যবস্থা টিকবে কিনা, অথবা তার কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, পুরুষদের নতুন করে শিখতে হবে কী ভাবে যথার্থ সমতার ভিত্তিতে পরিবারের সুস্থিতি বজায় রাখা যায়, অথবা পরিবারের বিকল্প হিসেবে প্রকৃষ্টতর প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন করতে হবে — এসব নিয়ে আজ গভীর ভাবে চিন্তা করা

দরকার।

আধুনিক সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বৈপ্লবিক বিকাশ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু আমরা আজ জানি যে এই বৃদ্ধিকে সংযত করতে না পারলে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সুষম সম্পর্ক বজায় রাখা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। সুতরাং নতুন সভ্যতাকে বিশেষ করে জোর দিতে হবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমানোর ওপরে — তারজন্য একদিকে চাই বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য হয়, অন্যদিকে ব্যাপক জনশিক্ষা যাতে বিবাহিত এবং অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণকেযৌনসম্পর্কের একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে।

তবে সব কিছুর গোড়াতে আছে শিক্ষার প্রশ্ন। এখন যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হয় তার একদিকে দেখি ছাত্র ছাত্রীদের ওপরে তথ্যের বোঝা বৃদ্ধি, অন্যদিকে তাদের ওপরে দিনরাত চাপ তারা যেন যে উপায়েই হোক কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিত্ত এবং প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারে। ক্ষমতাকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রায় ভুলে গেছে বলেই মনে হয়। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। যে সব গুণ শিক্ষার ফলে শিশুমনে সঞ্চারিত হলে তার ভিতরে ক্রমে যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটা সম্ভব — সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, ভয়হীনতা, করুণা, নিজের বিশ্বাস এবং আচরণের মধ্যে ঐক্য, প্রকাশের আগ্রহ এবং সৃজনের দক্ষতা, প্রকৃতি ও সমাজের প্রতি দায়িত্বের চেতনা, অজানা বিষয়ে কৌতূহল, বন্ধুতা ও সহযোগ, নিজের কায়িক পরিশ্রমে রচিত সৃষ্টিতে আনন্দ, দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা, নিষ্ঠুরতা ও মিথ্যাচরণের প্রতি ঘৃণা — তালিকা দীর্ঘতর করা যায়, তার প্রয়োজন দেখি না — আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এই গুণগুলির অনুশীলন ক্বচিৎ চোখে পড়ে। শিক্ষার মধ্যে এই অভাব দেশব্যাপী দুর্নীতির প্রধান উৎস।

আমি আগেই বলেছি, আমি ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবী-তত্ত্বে আস্থাহীন। শতাব্দীর শেষ দশকে চারপাশে ঘোর অন্ধকার দেখতে পাই বটে, কিন্তু মানুষ যে ইতিহাসের রচয়িতা এই ধারণা আমার মনে দৃঢ়মূল। শুধু যে ভূপ্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য আমাকে প্রেরণা যোগায় তাই নয়, মানুষের ইতিহাসে আমি দেখতে পাই সৃষ্টিশীল মানুষ কত অফুরন্ত সম্পদ রক্ষা করে গেছে আমার দীর্ঘ জীবনেও যার অতি সামান্য অংশই আমি সম্ভোগ করতে পেরেছি। আর মানুষের এই সৃষ্টির প্রকৃতি এমনতর যে বহুজন বহুযুগ ধরে উপভোগ করলেও তা খন্ডিত হয় না। কবে সেই নাটক লিখেছেন সফক্লেস, কাব্য লিখেছেন কালিদাস, দান্তে, দর্শন কল্পনা করেছেন উপনিষদের ঋষি, প্লেটো, কান্ট, সঙ্গীত রচনা করে গেছেন বাখ্ মোৎসার্ট, ছবি এঁকেছেন মোঘল-রাজপুত শিল্পী, বতিচেল্লী, টিনিয়ান, — আজো তারি সান্নিধ্যে এসে আমরা নতুন করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠি। এই সব বই, নাটক, গান, কবিতা, ছবি লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখেছে, দেখবে — তাদের ভিতর দিয়েই মানুষ মৃত্যুকে জয় করেছে। এরি কথা আমি লিখেছি আমার সম্প্রতি প্রকাশিত বই "স্বদেশ, স্বকাল, স্বজন"-এ। যে সভ্যতার কথা আমি ভাবছি এ সবই তার উপাদান, কিন্তু সেই সভ্যতাকে সর্বোদয়ী হতে হবে, যাতে এই অফুরন্ত সম্পদের সন্ধান সকলেই পেতে পারে। তাছাড়া আছে দেশে দেশে ছড়ানো লোকসংস্কৃতি। এত সম্পদ নিয়ে মনুষ্যপ্রজাতি কি দেউলিয়া বা আত্মঘাতী হতে পারে?

হয়তো একুশ শতক দেখবার সৌভাগ্য আমার হবে না। কিন্তু এই লেখা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা অনেকেই বয়সে নিশ্চয় তরুণ, তাঁদের ওপরে স্বাধীনতার সেই দায়িত্ব এসে পড়েছে যা

পালন করলে একুশ শতকে প্রকৃষ্টতর নতুন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে। কে জানে, হয়তো তার সূচনা হবে এই ভারতবর্ষে, এমন কি এই খন্ডিত পশ্চিমবঙ্গে। যেমন একদিন আধুনিক সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ইয়োরোপের দক্ষিণপ্রান্তে ইতালিতে — ফুলের শহর ফ্লরেন্সে। আজকের অবস্থা যাই হোক, স্মরণ করা দরকার উনিশ শতকে ভারতীয় নবজাগরণ সুরু হয় এই কলকাতা শহরে। আমার যুবকালে তার সূর্যাস্ত বৈভব আমি দেখেছি।

২৫শে অগাস্ট, ১৯৯৮।

নিজের কথা

সমরেশ বসু

সাহিত্যের থেকে জীবন বড় । জীবন অর্থাৎ মানুষই যে সাহিত্যের প্রধান উপাদান, এ কথাটা যথার্থ বোধের দ্বারা উপলব্ধি করতে নিশ্চয়ই আমার কৈশোর অতিক্রম করেছিল। এই উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা একান্তই নিজস্ব অভিজ্ঞতা। কেন না, জীবনকে দেখার ছাঁচ আমাদের সকলের একরকম হতে পারে না । বিভিন্নতা থাকতে বাধ্য । আমাদের সকলের দেখা, ভাবনা, চিন্তা কখনোই একটা ছকে বাঁধা হতে পারে না। হলে আমাদের কারোরই কোনো বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য থাকতো না। সে হিসাবে মনুষ্যজন্মের জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি।

কিন্তু জীবন যে সাহিত্যের থেকে বড়। আমার সাহিত্য চিন্তার উন্মেষকালে অর্থাৎ শৈশবেই আমার অবচেতনে গচ্ছিত করে দিয়েছিলেন আমার মা। ছেলেবেলায় তাঁর মুখে শুনেছি নানা ব্রতকথা। নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই মূলতঃ এসব ব্রতকথার উৎস। এই রকম ব্রত পালন এবং তার বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন রূপে। রূপকথার মতোই তা কখনো লৌকিক এবং অলৌকিক। কিন্তু সেই সব ব্রতকথার মধ্যে থাকতো অত্যাশ্চর্য গল্প। সংহার, দমন, নানা ষড়যন্ত্র, দেবতার অভিশাপ, অভিশাপ মোচনের দুর্জয় চেষ্টা, পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়, শোক, দুঃখ, প্রেম, মিলন, বিরহ বিচিত্র সব ঘটনার মধ্যে শেষ পর্যন্ত ন্যায়ের জয় আমাকে অভিভূত করতো। সেই সব গল্প শুনে কখনো আমার বালক মন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো। কখনো দুঃখীর দুঃখে কান্না পেতো, আবার ন্যায়ের জয়ে খুশিতে হেসে উঠতাম। সেই সব ব্রতকথার ঘটনা ও চরিত্রদের আমি যেন আমার চারপাশে আর এক রূপে দেখতে পেতাম। মন জিজ্ঞাসু হয়ে উঠতো। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা যুক্ত হয়ে, মনে মনে গল্প তৈরি করতাম। অতএব সাহিত্য চর্চা আমার কাছে জীবন চর্চারই সামিল হয়ে উঠেছিল। তারই প্রথম সূচনা, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে আমার প্রথম মুদ্রিত গল্প 'আদাব'। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, আমার ছেলেবেলায় দেখা, পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) দাঙ্গার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। 'আদাব' ঢাকা শহরের রায়টের গল্প, বিদেশী শাসকের ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার, অসহায় দেশবাসীর পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণা, যার পরিণতি, বিদেশী শাসকের গুলিতে নিহত দেশবাসী, এই ছিল গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই শুরু থেকে আমি নিরন্তর লিখে চলেছিলাম গল্প আর উপন্যাস। কিন্তু আমার দেখার, ভাবনায় ও বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সীমিত। সমগ্র ভারতবর্ষকে দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছিলাম। আমার মতো একজন দরিদ্র সাহিত্যিকের পক্ষে সারা ভারত ঘুরে দেখা সম্ভব ছিল না। সেই জন্য ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আমি এলাহাবাদের প্রয়াগে, কুম্ভমেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মিলন ক্ষেত্র। সেখানে আমি দেখলাম সারা ভারতকে — আমার কাছে সেই দেখা এক বিরাট আবিষ্কার। ধর্মের উন্মাদনা নয়, সারা ভারতের মানুষ এসেছে সেখানে আলোকের সন্ধানে, তার অন্তরের সকল অন্ধকারের গ্লানিকে মুক্তিস্নানে ধৌত করার গভীর আকাঙ্খায়। সেখানে আমি দেখলাম, উত্তর প্রদেশের পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ

হতদরিদ্র কৃষক, তার নব্বুই বছরের বৃদ্ধা মাকে কাঁধে বহন করে নিয়ে আসছে দূরের গ্রাম থেকে, পায়ে হেঁটে। যৌবনে তার মাকে কথা দিয়েছিল, তোমাকে আমি প্রয়াগ দর্শনে নিয়ে যাবো। পঁচাত্তর বছর বয়সে সেই কথা রাখবার সময় সে পেয়েছিল। এ দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় কী না, আমি জানি না। সেই কৃষকের রক্তাক্ত পায়ে চলা পথের ধূলা কুড়িয়ে নিয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। কুম্ভমেলা থেকে ফিরে, সেই প্রথম আমি কালকূট ছদ্মনামে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' লিখেছিলাম।

জীবন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। অতএব সাহিত্য চর্চাও এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আমার মনে এক নতুন জিজ্ঞাসা জাগ্রত করে দিয়েছিলেন এক মহিলা। তিনি বলেছিলেন, কেবল মানুষের জীবনকে জানবার জন্যই কি তোমার লেখা? নিজেকে জানবার জন্যও কি তোমার লেখা উচিত নয়? সাহিত্য চর্চা যে জীবন চর্চারই একটি ক্ষেত্র, আমি আবার তা নতুন করে অনুভব করেছিলাম। শুরু হয়েছিল, আত্মদর্শনের পালা, যার প্রথম ফলশ্রুতি, ষাটের দশকের গোড়ায় লেখা আমার গল্প 'স্বীকারোক্তি'। প্রায় সমস্ত ষাটের দশক জুড়েই এই আত্মদর্শনের লেখা লিখতে গিয়ে, প্রবল বিতর্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। মামলা রুজু করা হয়েছিল এবং এখনও একটি উপন্যাস অশ্লীলতার দায়ে সুপ্রিম কোর্টে বিচারের প্রতীক্ষায় রয়েছে। আত্মদর্শনকে বলা যায়, ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত মানসিকতার ও চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। আমার ও চারপাশের জীবনধারণ, ভাবনা চিন্তা ও সমাজের চিত্রকে তুলে ধরা। জীবনের নানান অন্ধকার ও বিকৃতির মধ্যে আমি সত্যকেই সন্ধান করেছি। কিন্তু সে সত্য সহজে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। এমন কি লেখনীর ভাষার এক আমূল পরিবর্তনের চেষ্টাকেও অনেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। প্রশংসা ও নিন্দার ঝড় শুরু হয়েছিল।

কেউ কেউ সেইসব রচনার মধ্যে অস্তিত্ববাদের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো 'বাদ' বা 'ইজম্' নয়, বিপন্ন ব্যক্তি মানুষই আমার পরীক্ষার বিষয়। সমাজ কোনো দায়িত্ব লেখকের কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারে না। আমি নিজে একজন সামাজিক জীব, আমি আমার দায়িত্ববোধের দ্বারা চালিত হয়েই লিখি। সমাজের এই বিপন্ন ব্যক্তি মানুষের জীবনের যন্ত্রণাকে আমি উপলব্ধি করছি। যে সুখে আবিষ্ট থাকতে পারছেনা, দুঃখের মধ্য দিয়েই সে নিরন্তর মুক্তির সন্ধান করছে, তার বেঁচে থাকার উপায় ও সার্থকতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'শাম্ব' উপন্যাসটি লেখবার আগে মহাভারত আমার অবশ্যই পড়া ছিল। তারপরে ভারতীয় পুরাণ পাঠ করতে গিয়ে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের লেখা পড়ে, আমার বিশ্বাস হলো, ভারতীয় পুরাণ আর গ্রীক মাইথোলজি এক নয়। ভারতীয় পুরাণ ভারতেরই প্রাচীন ইতিবৃত্ত। 'শাম্ব' চরিত্রটি আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব, পিতার অভিশাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল নিজের আরোগ্যের চেষ্টা করেন নি, দেশব্যাপী ঘুরে দেশের আশাহত সমস্ত কুষ্ঠরোগীদের মনে তিনি আশার সঞ্চার করেছিলেন। ভারতের বাইরে গিয়ে, সূর্যপূজারী কুষ্ঠরোগের চিকিৎসকদের কয়েকটি পরিবারকে এনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। নিজের মঙ্গলের সঙ্গে অপরের মঙ্গলবোধই তাঁকে আমার কাছে মহৎ করে তুলেছিল। আমরা আজও একজন শাম্বকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

জীবনের শুরু থেকে বিবিধ চিন্তা ভাবনার ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে, একটি বিশ্বাসই আমার মনে

স্থায়ী হয়ে আছে। যাঁরা নিজেরা বিশ্বাস করেন, শুভ ও মঙ্গলবোধের দ্বারা তাঁরা চালিত, তাঁরা মহৎ। কিন্তু যে মানুষের মনে পাপবোধ আছে, পাপবোধের দংশনে যে বিচলিত এবং সেই পাপ থেকে উত্তরণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত তিনি আমার কাছে মহত্তম মানুষ।

তারাশঙ্করের উপন্যাস

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

তারাশঙ্কর তাঁর চতুর্থ উপন্যাস 'রাইকমল'-এর ভূমিকায় বলেছিলেন "চালচিত্র না হইলে প্রতিমা মানায় না, স্থান ও কালের পটভূমি উপযোগী না হইলে পাত্র-পাত্রীর পূর্ণ অভি-ব্যক্তি হয় না। পাঠকের ও বুঝিতে কষ্ট হয়।" তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস—বিশেষ করে উপন্যাস সম্পর্কে নিজের এই মন্তব্যটি তারাশঙ্করের বিশিষ্টতাকে অনেকটাই চিনিয়ে দেয়। অবশ্যই তারাশঙ্করের যে উপন্যাসগুলি বাংলার গ্রামকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যে ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে দক্ষতা ও সাফল্য, সেই সব উপন্যাসের ক্ষেত্রেই এই মন্তব্যটি যথার্থ বলে মনে হয়।

প্রায় পঁয়ষট্টিটি উপন্যাসের লেখক তারাশঙ্করকে বহুপ্রসবী ঔপন্যাসিকই বলব। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সে সবগুলির বিস্তৃত আলোচনাও এখানে সম্ভব নয়। কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই তারাশঙ্করকে বুঝবার চেষ্টা করবো।

ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নাগিনীকন্যার কাহিনী আরোগ্য নিকেতন, বিচারক, সপ্তপদী, রাধা, মঞ্জরী অপেরা এবং শেষ জীবনে লেখা কীর্তিহাটের কড়চা — এই গুলিই তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অবশ্য এনির্বাচনে মতভেদ হতেই পারে। তবে, বোধহয় এই উপন্যাসগুলির আলোচনার ভেতর থেকেই তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভার মূল স্বরূপটি যথেষ্ট পরিমাণেই ধরা পড়বে বলে মনে হয়। এছাড়া আরও দু-একটি উপন্যাসের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। যেগুলিতে তারাশঙ্করের প্রতিভা যতটা না প্রকাশিত তার চেয়ে বিষয়গত বৈচিত্র্য-কে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণে ধরবার চেষ্টা — ব্যর্থ হলেও তাৎপর্যময় চেষ্টা। আলোচনা সুত্রেই তা এসে পড়বে।

একথা মানতেই হবে, ধাত্রীদেবতা (আশ্বিন ১৩৪৬) উপন্যাসেই প্রথম তারাশঙ্কর তাঁর নিজের ঔপন্যাসিক স্বরূপটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। পরবর্তী সাফল্যের সূচনা এই উপন্যাসেই। সমকালীন প্রবণতার টানে ট্রেডইউনিয়নিজম্ -এর আদর্শে তিনি ঝুঁকেছিলেন 'চৈতালী ঘূর্ণী' -তে। নাগরিক মানবিকতার দিকে ঝুঁকেছিলেন 'পাষাণপুরী'-তে । কিন্তু প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রসকলি'ই তাঁর স্বধর্ম পালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তবে 'চৈতালী ঘূর্ণী'-র রাজনৈতিক চেতনাই যে 'ধাত্রীদেবতা'-তে সমৃদ্ধতর হয়েছে, কিংবা 'পাষাণপুরী'-র কারাজীবনের সত্যাগ্রহীরাই যে ধাত্রীদেবতার রাজনৈতিক কর্মীদের মানসিকতাকে গড়ে তুলেছে সেকথা অস্বীকার করা যাবে না।

কিন্তু 'রসকলি' গল্পের আঞ্চলিক চেতনা এবং তার আড়ালে তারাশঙ্করের রাঢ় অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মানুষ- নিসর্গ-সংস্কৃতি ও আবহমান ঐতিহ্যধারার প্রতি গভীর মমতা অবশ্যই 'চৈতালী ঘূর্ণী' বা 'পাষাণপুরী'-তে নেই। তারাশঙ্করের এই আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা তিনটি ধারায় ছড়িয়ে গেছে। প্রথম ধারায় রাঢ় অঞ্চলের তান্ত্রিক সাধনার ধারা। তার ঐশ্বর্য ও অবক্ষয় ফুটেছে জমিদারি ব্যবস্থার মধ্যে। 'ধাত্রীদেবতা'য় তার সূচনা। দ্বিতীয় ধারাটি বৈষ্ণব ধর্ম চেতনার ধারা। 'রসকলি' গল্পে তার শুরু, 'রাইকমল' উপন্যাসে তার বিস্তার এবং 'রাধা'তে তার পরিণতি। তৃতীয় ধারাটি হল সমাজের অন্তেবাসী আদিম মানুষের ব্রাত্যধারা। রাঢ়ের

কাহার-বাগদি ডোম-বাউড়িদের জীবন-বিন্যাস। 'কবি' ও 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'-র মধ্যে তারই অন্বেষণ, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় তার পরিণতি। ঐতিহাসিক আধারে 'অরণ্যবহ্নি'-র মধ্যেও এই ব্রাত্যধারাকেই ধরবার চেষ্টা।

এই তিনটি ধারাই কিন্তু দুটি ভিত্তি-সূত্রে বিশিষ্ট, প্রথমটি সমাজ বিবর্তনে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভূমিকা। দ্বিতীয়টি হল যে একটি প্রজন্ম - চেতনা - কেন্দ্রিক কালচেতনা। এই প্রজন্মচেতনায় দুটি বিপরীতমুখী প্রবণতার ambivalence। একটি অতীত মুখী, অপরটি বর্তমান-ভবিষ্যতের মিশ্র চেতনা। তারাশঙ্করের এই কালচেতনা তাঁর অনেক উপন্যাসের নামেও আছে : দুইপুরুষ, বিংশ শতাব্দী, ১৩৫০, মন্বন্তর, শতাব্দীর মৃত্যু, কলকাতা' ৭১ ইত্যাদি। অবশ্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই যে কালচেতনা বা সময়ান্তর চেতনাকে নিয়ে আসে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কালান্তরে যে পালাবদল আসে তাতে মানুষ হয়ে পড়ে ঘাত-প্রতিঘাতের মানুষ। অর্থনীতিই জমিদার থেকে কৃষক, কৃষক থেকে শ্রমিককে টেনে আনে। কৃষকের মধ্যে নিছক চাষী কৃষক আছে, চাষবাস নির্ভর মধ্যবিত্ত সমাজের কৃষক আছে। এরা বুদ্ধিজীবী চাকরিজীবী নয়, সামান্য লেখাপড়া-জানা সুদখোর মহাজন, তেজারতি কারবার করে হঠাৎ-বড়লোক এই মধ্যবিত্ত চাষী জমিদার প্রভুকে গ্রাহ্য করে না। গণদেবতা-র শ্রীহরি পাল, রসকলি-র মোহান্ত তার উদাহরণ।

'ধাত্রীদেবতার' মধ্যে এই সব-কটি স্তরবিবর্তন ধরা পড়েছে। দর্পিত শৈলজা সামন্ত সভ্যতার প্রতীক। এই জমিদারের ঘরেই স্ববিরোধ। প্রপার্টি ইজ থেফ্‌ট — একথা বুঝতে পেরে জমিদারি প্রথার শেষ-প্রতিনিধি শিবনাথ স্বত্ব ছেড়ে চলে আসে ময়ূরাক্ষীর তীরে চাষবাস করতে। অর্থাৎ সে তখন চাষী শিবনাথ। অর্থাভাবে সে ধান বিক্রি করে। এই প্রথম চাষী-স্তরটি থেকে দ্বিতীয় স্তরে এসে শিবনাথ হয়েছে শ্রমিক বা মজুর। ' চৈতালী ঘূর্ণী'-তেও শ্রমিক আন্দোলনের কথা আছে। সেখানেও তারাশঙ্কর কৃষক থেকে শ্রমিক হবার ধাপটি দেখিয়েছেন। ধাত্রীদেবতা-য় সেই পরিবর্তনটি আরও স্পষ্ট। কয়লার ব্যবসায়ী রামকিঙ্কর আর কমলেশ অর্থনৈতিক বিবর্তনের আরেকটি স্তর। জমিদার থেকে কৃষক, কৃষক থেকে ব্যবসায়ী হওয়ার স্তরটি এখানেই স্পষ্ট। কালের বা প্রজন্মের ব্যবধানে শৈলজার কাল আর শিবনাথের কাল আলাদা। শিবনাথের কালচেতনার সঙ্গে রামকিঙ্কর - কমলেশের কালচেতনা মেলে না। এই তিন কাল-প্রতিনিধির পরস্পরের মধ্যেই বিরোধ। আবার এই বিরোধের মধ্যে তারাশঙ্কর এক প্রবৃত্তি-নির্ভর আদিম মানবশক্তিকে দেখেছেন। আবার আর একদিকে সেই শক্তিই বড় আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চায়। মানবশক্তির এই দুটি চাহিদার মধ্যেও বিরোধ। তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যিক চরিত্র এই বিরোধের ভিত্তিতেই স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যিক প্রতিভা থেকে এখানেই তাঁর স্বতন্ত্র মহিমা। এই বিশেষ মহিমাই তাঁকে সমকালীন আর এক প্রতিভা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে।

শিবনাথের জন্য যেমন একদিকে সমাজ-অর্থনীতি বিবর্তনের স্তরগুলি দেখানো হয়েছে, তেমনি তার স্বদেশ চিন্তা, রাজনীতিচর্চা আদর্শবাদও তাকে চেনার আর একটি দিক। এই দু-দিকের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, দুয়ে মিলেই পরিপূর্ণতা। গোরা যেমন তার সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান বজায় রেখেই এক পূর্ণ মানববোধে পৌঁছেছে, এখানে সেই পূর্ণতা এসেছে শিবনাথের সামাজিক স্তর-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে। কাজেই তার দেশপ্রেম আর দেশসেবার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দেশমাতৃকার অতীত-বর্তমান - ভবিষ্যৎ তার কাছে এক সূত্রে

বাঁধা। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বর্তমান যদি শ্রীহীন হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে তাকে অতীতের গৌরবেই পৌঁছে দিতে হবে। তারাশঙ্করের অতীতপ্রিয়তার রহস্য এইখানেই।

পিসিমা শৈলজা সেই অতীতের ব্যক্তিস্বরূপ। তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর পিসিমা একাধারে দেশ ও মানুষের 'বাস্তু'র মূর্তিমতী দেবতা হিসেবে দেখা দিয়েছেন। গোটা পূর্বপুরুষের প্রতীক হয়েই, ধন-ধান্যভরা দেশমাতৃকার অতীত ঐশ্বর্য হয়েই এসেছেন। শিবনাথ জমিদারি প্রথা ছেড়েছে, কিন্তু দেশপ্রেমিক শিবনাথের মনে দেশমাতৃকাই ওই প্রাচীন গৌরবের সঙ্গে মিশে আছে।

শিবনাথ যে কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছেছে তাতে তার তত্ত্বচিন্তা ও কর্মযোগের ভূমিকা দুই-ই সমান। তার পড়াশোনা থেকেই তার কর্তব্যপরায়ণতা জেগেছে। তাছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীজি তার তাত্ত্বিক ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে। আনন্দমঠ-এর মাতৃরূপের তিনটি স্তর শিবনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ও ভবিষ্যৎ কল্পনায় গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান নি, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আত্মসমৃদ্ধির হিংসাহীন পথ দেখিয়েছেন, 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথও অনেকটা সেইভাবে সরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের নির্বিশেষ মানুষের তীর্থ — ভারততীর্থ শিবনাথেরও তীর্থ। কিন্তু শিবনাথ যখন অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছে তখন ওই পদ্ধতিই তার কাছে সামনে এসে পড়া কার্যক্রম বলেই মনে হয়েছে।

সুশীল ও পূর্ণের প্রসঙ্গ এইখানেই জরুরি হয়ে উঠেছে। সুশীলের মধ্যে যে হঠাৎ মানব-সেবার আদর্শচেতনা থেকে কেন সন্ত্রাসবাদী মনোভাব জেগে উঠল (তারাশঙ্করের ব্যক্তিজীবনে বিপ্লবী দলগড়ার চেষ্টা দেখি। আত্মকথা পৃ: ৫৯-৬০) তার কারণ স্পষ্ট নয়। তবু তার এই পরিবর্তন শিবনাথের জীবনে একটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তার নিজের অহিংসার পথ ঠিক করতে সাহায্য করেছে। মহামারী, নারীঘটিত কলঙ্ক (পঞ্চগ্রামের দেবুঘোষের জীবনেও এই কলঙ্ক এসেছে) মা-র আকস্মিক মৃত্যু, বিপ্লবীর আশ্রমে যাওয়া ও তাঁর মৃত্যু দেখা, সুশীলের সঙ্গে গভীর রাতে ময়ূরাক্ষীর ধারে শেষ দেখা ইত্যাদি নানা ঘটনা শিবনাথকে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ ও পরিণত করেছে। এছাড়াও গৃহশিক্ষক রামরতন এবং সন্ন্যাসী গোঁসাইবাবার ভূমিকাও গৌণ নয়। মা আর গৃহশিক্ষক আদর্শে একই, তেমনি পিসিমা ও গোঁসাইবাবাও ভিন্ন আদর্শে এক। এঁরা সবাই মিলে শিবনাথের 'ধাত্রীদেবতা' হয়ে উঠেছেন।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা শিবনাথের জন্মেছে। অন্ত্যজ মানুষের নিজেদের মহত্ত্বেই তারা এই শ্রদ্ধা পেয়েছে। এই হল শিবনাথের গণ-চেতনার একটা বড় দিক। সাঁওতাল পরগণার মহানায়ক পূর্ণকে বলেছিল, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে অনার্য ও শূদ্রেরা শতশত বছর ধরে অশিক্ষিত ও অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। এদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন উন্মত্ততা ছাড়া কিছু নয়। নিছক মানুষের প্রতি এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা শিবনাথের জীবনে একটি বড় অর্জন। 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসের বীজ এখানেই। আর অব্রাহ্মণ শূদ্র রামরতন মাস্টার শিবনাথের আদর্শ। উচ্চবর্ণের গর্বে যে শিবনাথ তাঁর পা ছোঁয়নি, এই বিশেষ দিনে সে-ই তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে। অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও এই মুহূর্তে গোরার সঙ্গে শিবনাথের পার্থক্য ঘুচে যায় না কি?

এছাড়াও কিশোর শ্যামুর সেবা-পরায়ণতা, গাঁজাখোর লোকটির মৃতদেহ-সৎকার-প্রবণতা, ভোলা মুচির দাম্পত্য-প্রেম, ডোম-বউ-এর কৃতজ্ঞতাবোধ, সাঁওতাল মাঝির অতিথি সৎকার,

খোনা মেয়েটির স্বামীর প্রতি ভালবাসা — এই সমস্তই শিবনাথের জীবনের মহৎ অর্জন। এই সবই শিবনাথের ঐ 'ধাত্রীদেবতার' অন্তর্ভুক্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারাশঙ্করের আত্মস্মৃতি পড়লে মনে হয়, তাঁর ব্যক্তিজীবন আর এই সৃষ্টিকর্মের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। তারাশঙ্করের আত্মবিকাশ প্রায় শিবনাথেরই আত্মবিকাশ। বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্য যতটুকু থাকে, ততটুকুই আছে।

আবার এই শিবনাথের মধ্যেই এমন একটা আদিম প্রাণশক্তি, সারল্য, বন্যতা আছে যা তার জন্মগত আভিজাত্যকে বাদ দিয়ে নয়। আদর্শবাদী চরিত্র, কিন্তু দেহ বাসনার ঊর্ধ্বে সে ওঠে না। আদর্শবাদ যখন তার কাছে সমস্যা হয়ে আসে ঠিক তখনই সে তার অবদমিত প্রাণশক্তিকে বের করে দিতে চায় পুকুরের ঘাটে অক্লান্তভাবে সাঁতার কেটে, উদ্দামভাবে ঘোড়ায় চেপে কিংবা স্ত্রী গৌরীর সঙ্গে একশয্যায় শয়নের কল্পনায়। উত্তাপে উত্তেজিত তার শরীরের শোণিত কণিকাগুলির 'কুঙ্কুমের মতো' ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনায়। এই আভিজাত্য, আদর্শবাদ ও দেহ চেতনার মিশ্রণের দৃষ্টান্ত তারাশঙ্কর-পূর্বেকার উপন্যাস-সাহিত্যে পাই নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে-উপন্যাসে অবদমিত যৌনতার ছবি আছে। সমাজবিরোধী মানুষের অবদমিত যৌনতার হিংস্র প্রকাশও আছে, কিন্তু আদর্শবাদী উঁচু-বর্ণের কর্মী মানুষের সমস্যাদীর্ণ মনের ভেতরকার যৌনতার এমন সরল প্রকাশ দেখা যায় নি। মনে রাখতে হবে, নিছক কাহার বাগদি ডোম বাউরিদের প্রাণবন্যাতেই তারাশঙ্করের নজর নেই, তাঁর স্বপ্ন-কল্পনাপ্রবণ, শিক্ষিত আদর্শবাদী চরিত্র মানসিক সঙ্কটেও শারীরিক ক্রিয়াতেই উত্তেজনার উপশম চেয়েছে। শিবনাথকে লেখক শুধু জমিদারি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী চাষীই করেন নি, তার মধ্যে রাঢ়ের আদিম প্রাকৃতিক প্রাণশক্তির সঞ্চার করে দিয়েছেন। উপন্যাসেব মধ্যে শিবনাথ ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রের চেহারা, চরিত্র-কামনা-বাসনার তুলনা দিতে গিয়ে অনেক সময়েই যে জীবজন্তু ও প্রাকৃতিক কোনো দৃশ্যকে এনেছেন তাতেও তারাশঙ্করের জীবনদৃষ্টিতে আদিম সরল প্রাণশক্তির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁকটিই প্রকাশিত হয়েছে। মাটির কাছে শিবনাথের এই প্রত্যাবর্তন-ভাবনাকে তারাশঙ্কর প্রকাশ করেছেন এই ভাষায় : 'জীবিকা? এত বড় বিস্তীর্ণ দেশ — মা ধরিত্রীর প্রসারিত বক্ষ, তাহারই মধ্যে তারা স্বামী স্ত্রীতে স্তন্যপায়ী শিশুর মত মায়ের বুক হইতে রস সংগ্রহ করিত।' শিবনাথের ধাত্রীদেবতারা এইভাবেই শিবনাথের মধ্যে ধরিত্রী-চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছে।

একটু বিস্তৃত হলেও 'ধাত্রীদেবতা'র এই আলোচনা থেকে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের মূল চরিত্র-স্বভাবটি পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না। পরবর্তী অনেক উপন্যাসে তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও এই চরিত্রটির প্রাধান্য বরাবরই ছিল।

'কালিন্দী' উপন্যাস হিসেবে 'ধাত্রীদেবতা'র সঙ্গে তুলনীয় নয়। যদিও কালিন্দীর চর তার পরিবর্তনশীল রূপ নিয়ে তার নিষ্ঠুর শক্তির যে লীলা দেখিয়েছে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে সে লীলার যোগ খুব গভীর নয়। সে যোগ সাময়িক তো বটেই, মাঝে মাঝে আকস্মিকও বটে। শিবনাথের মধ্যে যেমন নানা আইডিয়া অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, অহীন্দ্রের চরিত্রে আইডিয়া একটা বদ্ধমূল ধারণার মতো। তাই অহীন্দ্রকে চরিত্র হিসেবে Flat-ই বলব।

কিন্তু 'ধাত্রীদেবতা'র তারাশঙ্কর আর একটু প্রসারিত হয়েছেন 'গণদেবতা' - 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে। গ্রামীণ জমিদারি ব্যবস্থা ও অর্থনীতি-সমাজরীতি-নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ব্রাত্যধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও আদিম প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা অর্থাৎ গণচেতনা

— স্বদেশ ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমগ্র জীবনরীতিকেদেখার চেষ্টা — সমস্তই গণদেবতা-পঞ্চগ্রামের চালচিত্রে ধরা আছে। কালান্তরের প্রসঙ্গ যে গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম-এ স্পষ্ট হয়েছে তাও তো ধাত্রীদেবতা-তে ছিল। শিবনাথ তো সেই চেতনা নিয়েই তার সামাজিক অবস্থান বদল করেছে এবং মাটির কাছাকাছি এসেছে।

গ্রামসমাজের ভেতর থেকে উঠে-আসা এক আদর্শবাদী চরিত্রের গ্রামীণ যৌথ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হতে চাওয়াই যদি 'ধাত্রীদেবতা'র নায়কের বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে গণদেবতা-পঞ্চগ্রামের তেমন কোনো প্রধান চরিত্রই নেই যে গ্রামীণ জীবনযাত্রার পুনর্গঠনের আদর্শে নিজের সামাজিক অবস্থানকে বদল করতে করতে জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতে মিলতে চায়। অধিকাংশ চরিত্রই সমান অবস্থার চাষী গৃহস্থ। সমাজনেতা হওয়ার মতো অভিজাত বংশীয় কোনো চরিত্র নেই। চারজন মানুষ এই সম-অবস্থান সম্পন্ন মানুষগুলোর ওপরে উঠেছে। প্রথম জন, দ্বারিক চৌধুরী। তিনি জমিদারি থেকে বিচ্যুত হয়ে চাষীর অবস্থানে এসেছেন। কিন্তু অর্থগৌরব হারিয়ে আত্মমর্যাদা হারান নি। দ্বিতীয় জন ছিরু বা শ্রীহরি পাল। সে চাষী থেকে উন্নীত হয়েছে জমিদারে! ভালো মন্দ সব রকম প্রবৃত্তির সে অদ্ভুত মিশ্রণ। বনেদী ঘরে প্রতিষ্ঠা পাওয়াই তাঁর লক্ষ্য। সেই লোভেই সে সমাজকল্যাণে ব্রতী। তৃতীয় জন হল, দেবু পণ্ডিত। সে এমন এক আদর্শবাদী জগতে থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষকে দেখে যে দেখার সঙ্গে গ্রামীণ মানুষ নিজেদের মেলাতে পারে না। ঘেঁটু গানে তার প্রশস্তি রচনা করে গ্রামের মানুষ তাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে এক 'পৌরাণিক মহিমা' দিয়েছে। এ মহিমার কোনো কার্যকারিতা নেই। চতুর্থ জন, শিবশেখর ন্যায়রত্ন তাঁর ব্রাহ্মণ্য মহিমা নিয়ে স্বার্থসর্বস্ব জনগোষ্ঠীর কাছে দৈব আদর্শের মতো। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ-বন্ধন যখন শিথিল হয়ে ভেঙে চুরে যাচ্ছে তখন সেই মহিমার দাম রইল না। দেবু পণ্ডিতের বিনম্র নতমস্তকে ন্যায়রত্নের আশীর্বাদ-বর্ষণ উপন্যাসে একটি উজ্জ্বল মুহূর্ত ঠিকই, কিন্তু সামগ্রিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সে মুহূর্ত বড়ই নিঃসঙ্গ ও করুণ। সব মিলিয়ে যেন বিধ্বস্ত রণভূমিতে এই চারটি চরিত্র দীর্ঘ চূড়ার মতো থেকে চারপাশের ধরাশায়ী অসংখ্য মুমূর্ষুদের অনিবার্য মৃত্যুকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

'গণদেবতা'র প্রাণশক্তি কেবল গ্রামের দলাদলিতে প্রকাশিত হয়েছে। কামার, নাপিত, ছুতোর ইত্যাদি শিল্পী ও কর্মীদের পারিশ্রমিক-ভিত্তিক প্রাচীন ব্যবস্থা না মানার জন্যে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টাতে — শৃঙ্খলারক্ষার চেষ্টাতে গণ্ডগোলের শুরু। কলকারখানার সস্তা জিনিস গ্রাম কর্মী ও শিল্পীদের আয়ের সুযোগ কমিয়ে তাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে নৈতিক অধিকারকে নষ্ট করে আর্থিক প্রতিপত্তি প্রাধান্য পেয়েছে। যে সমাজ ছিরুপালকে শাসন করতে পারে না, অনিরুদ্ধ তার কর্তৃত্ব মানবে কেন? এইভাবে বাইরের ঐশ্বর্য ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা পুরোনো বিধি বিধানের মর্যাদা নষ্ট করে দিয়েছে। ধনিকের অহঙ্কার ও প্রতিশোধ-চেষ্টা গ্রামীণ জীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

অন্যদের তুলনায় যে চারটি চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে তারা ছাড়াও আরেকটি চরিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পেয়েছে। সে হল অনিরুদ্ধ কামার। তার বিদ্রোহী চরিত্রের জন্যে সে দাম্পত্য সুখশান্তি, সামাজিকতা, আত্মমর্যাদাবোধ সবই হারিয়েছে। স্বেচ্ছায় কারাবরণ তার মনুষ্যত্বের শেষ নির্ভরযোগ্য কীর্তি। এছাড়া শ্রীহরি পালের কথা আগেই বলেছি। তার হঠাৎ জাগ্রত নীতিজ্ঞান ও আদিম বর্বরতার মিশ্রণ তাকে খুব মানবিক করে তুলেছে। কিন্তু দুর্গা মুচিনী তার

স্বাভাবিক স্বৈরিনী প্রবৃত্তির সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি, সহানুভূতি, উদারতা সৎসাহস ইত্যাদির প্রমাণ দিয়ে খুবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আবার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্মও কম আকর্ষণীয় নয়। দাম্পত্য প্রেম অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তার শরীরে-মনে নানা জটিল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মূর্চ্ছা রোগ সত্ত্বেও রাজবন্দি যতীনের প্রতি তার আকস্মিক মাতৃভাবের স্ফূরণে বোধ হয় আরো একটু প্রস্তুতির অবকাশ ছিল। যতীনের মুখেই এই সম্পর্ক নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখা গেছে। এবং যতীন এই গ্রামের জীবনে খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও গ্রামের রাজনৈতিক সচেতনতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্য ছোটখাটো চরিত্রগুলি গ্রামের জটিল সংঘাতের মধ্যে তাদের গৌণ ভূমিকাটুকু পালন করেছে। দেবু পণ্ডিতের প্রখর আদর্শবাদ দ্রুত পতনশীল গ্রামীণ সমাজে খুব যে একটা কার্যকর হবে না তা বোঝাই যায়।

'গণদেবতা'র অনুসরণ হলেও 'পঞ্চগ্রাম' আরো একটু সঙ্কটময় হয়ে উঠেছে জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে। তুলনায় হিন্দু সমাজের আত্মকলহ নিতান্ত গৌণ মনে হয়। কৃষিনির্ভর জীবিকার তাড়নায় বিপর্যস্ত সমস্যার বিশ্লেষণে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত ভেদ ছাড়া অন্য কোন ভেদ নেই। বৃষ্টির জন্যে তাদের একই গান, বৃষ্টির স্নিগ্ধভাব তাদের একই রকমের সৌন্দর্যচেতনা জাগিয়ে তোলে। তবু বলব, মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন ও অনুশাসন, ধর্মগুরুর প্রভাব ও তাদের জীবনের প্রচলিত লোককাহিনীর মধ্যে লেখকের আরো একটু গভীর অনুপ্রবেশ যেন প্রত্যাশিত ছিল। অনেকটা হিন্দু চরিত্রের আদলেই মুসলমান চরিত্রগুলি গড়া। দৌলত শেখ, শ্রীহরি ঘোষ ও কঙ্কনার জমিদারবাবুদের সমগোত্রীয়। ইরশাদ্ দেবু ঘোষের ছোটখাটো সংস্করণ। আর রহমচাচা অনিরুদ্ধের মতোই একগুঁয়ে। তবে অনিরুদ্ধের চেয়ে আরও একটু চড়ামাত্রায় আঁকা। তবে জমিদারের পক্ষে যাওয়ায় তার আত্মগ্লানি এবং দেবুর প্রতি বিরোধিতায় তার স্নেহশীল আবেগপ্রবণতা তাকে অবশ্যই স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

কর বাড়ানোকে কেন্দ্র করে ধর্মঘটের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং হিন্দু মুসলমানের সংহতি সূচনা গ্রামের জীবনে যে প্রাণশক্তি সঞ্চার হয়েছে তা দারিদ্র্যের তাড়নায়, সাম্প্রদায়িক কলহে এবং জমিদারের ষড়যন্ত্রে নষ্ট হয়ে গেছে। একজন আদর্শবাদী ছাড়া আর সকলেই জমিদারের সঙ্গে আপোষ করে নেওয়ায় দেবুর নেতৃত্বের যে অমর্যাদা হয়েছে তাতে উৎসাহে যে ভাঁটা পড়েছে, আদর্শের সঙ্গে আত্মরক্ষার যে দ্বন্দ্ব ঘটেছে তার বর্ণনায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বাসযোগ্যতা এসেছে। এই দ্বন্দ্বময় জীবনে রাত্রির অন্ধকারে ডাকাতির সঙ্কেতধ্বনি, ময়ূরাক্ষীর বন্যার ধ্বংসাত্মক রূপ ও তার প্রতিরোধ চেষ্টায় ব্যর্থতা এবং অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যের বিপর্যয়ের ছবি ঔপন্যাসিকের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ। জীবনযাত্রার বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এই সামঞ্জস্যময় বর্ণনাই সেই দক্ষতার কারণ। রমা-রমেশের রোম্যান্সের পটভূমিতে দেখা গৌণ পল্লীসমাজ নয়, একেবারেই গ্রামের জীবনে মূল বিস্তৃত প্রবাহের ঘোলা জলের গভীরে চোরা স্রোতের টান, প্রেম-অপ্রেম সবই যেন প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে ভেসে চলেছে।

কিন্তু কিছু কিছু নাটকীয় মুহূর্ত পঞ্চগ্রাম উপন্যাসকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ন্যায়রত্নের সঙ্গে তাঁর পৌত্র বিশ্বনাথের আদর্শগত বিরোধ সাংঘাতিক পরিণতিতে শেষ হয়েছে। একটু অতিনাটকীয় বলে মনে যে হয় না তা নয়। বিশ্বনাথের সঙ্গে জয়ার সম্পর্কটা খানিকটা অস্পষ্ট থেকে গেছে। অভাবের তাড়নায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভদ্রঘরের তিনকড়ির ডাকাতের দলে যোগ দেওয়াও খানিকটা রহস্যময়। পদ্মের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, গৃহিণীত্ব এবং

মাতৃত্ব অসুস্থ মনোবিকার থেকে মুক্ত হয়ে হঠাৎই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। খ্রিস্টান জোশেফ নগেন্দ্র রায়ের স্ত্রী হিসেবে নিজের স্বপ্নকে সফল করতে গিয়ে সে যেন নতুন শক্তি পেয়েছে। অন্যদিকে দুর্গাও দেবু ঘোষের সংসর্গে আত্মবিশুদ্ধির পথে খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আদর্শবাদী দেবু ঘোষের বাস্তব জীবনে নেমে আসা। পদ্ম এবং দুর্গার সঙ্গে তার মেলামেশা ও দুর্নাম তাকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। কিন্তু তার অন্তরের পরিচয়টি ধরা পড়েছে বিলু আর খোকনকে কেন্দ্র করে তার স্মৃতিচারণায়। দেশপ্রেমিকের অন্তরে তার হৃদয়-স্পন্দনটি এখানেই ধরা পড়েছে। তার কর্মনিষ্ঠার অন্তরালে অবদমিত গার্হস্থ্য-স্মৃতি তাকে উদাস করে তুলেছে। অনুশোচনাই তাকে তীর্থস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। ময়ূরাক্ষীর নদীগর্ভের বালিতে, শীতের গোধূলিতে, শুকনো পাতার মর্মরে বিলু আর খোকনের মুখর খেলাধূলোর ভ্রান্তি দেবু ঘোষের মনে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার করেছে। এই আত্মবিভোরতা তার দেশপ্রেমিকের বাইরের পরিচয়কে গৌণ করে দিয়েছে। বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেবু ঘোষ চরিত্র হিসেবে খুবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে স্বর্ণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এক নতুন সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

কিন্তু এই চারিত্রিক নাটকীয়তার মুহূর্তগুলিকে ছাপিয়ে উঠেছে সমাজ। গণদেবতা-তে যে রেষারেষি ও দুর্নীতিতে সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, পঞ্চগ্রাম-এ সেই শিথিল সমাজ আরও কিছু কঠিন পরীক্ষার সামনে হাজির হয়েছে। যুগধর্মের সঙ্গে তার ব্যবধান আরও বেড়ে গেছে। এমনকি মুসলমান সমাজও তুলনায় একটু বেশি সাংগঠনিক বলিষ্ঠতা নিয়েও অদূরদর্শিতা ও নৈতিক আদর্শচ্যুতিতে আধুনিক জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। হিন্দু সমাজ তো ধ্বংসের মুখে চলেইছে। ন্যায়রত্ন দেশত্যাগ করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরাজয় প্রমাণ করেছেন। কূলদেবতা কেনা-বেচাতেই তার প্রমাণ মিলছে। পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত ছেড়ে সাম্যবাদ প্রচার করছে — কিন্তু এই সাম্যবোধ মর্মমূলে যেতে আজও অনেক দেরি। চাষী গৃহস্থ ছেড়ে মজুর হয়েছে, শ্রমজীবীরা চাষ-বাস ছেড়ে শহরের কলকারখানায় চলে যাচ্ছে। গণআন্দোলনে যে উদ্দীপনা আসে তাকে স্থায়ী করতে না পারলে আন্দোলনের উদ্দেশ্যই বৃথা। প্রাণধারণের যে গ্লানি নিয়ে সমাজ খুঁড়িয়ে চলেছে তার সামনে দেবু ঘোষের আশাবাদী সুর আপাতত খানিকটা মূঢ়তাই নিয়ে আসে। এই বিমূঢ় সন্ধানী সমাজদৃষ্টিই পঞ্চগ্রামের পরিণতিতে ফুটে উঠেছে।

মন্বন্তর উপন্যাসে সংবাদিকতার প্রাধান্যকে ত্রুটি হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সাংবাদিক ভঙ্গি বিশ্বসাহিত্যের অনেক পরীক্ষামূলক উপন্যাসেরই লক্ষণ। তবু সেগুলিকে যেমন পুরোপুরি সফল উপন্যাস বলব না তেমনি মন্বন্তর-কে সফল উপন্যাস বলা যাবেও না। চক্রবর্তী পরিবারের কাহিনীর মধ্যে যে ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা ছিল তা নষ্ট হয়েছে বোমাবিধ্বস্ত শহরের বর্ণনার ঝোঁকে।

২

'কবি' উপন্যাসটি গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম পর্বেই লেখা। কিন্তু গ্রামীণ সমাজেরই পতিত এবং ডোম বংশের ছেলে নিতাই কবিয়ালের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী এই উপন্যাসের ছোট পরিসরে তীব্র মাদকতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে। প্রেম সম্পর্কে সাধারণভাবে একাগ্র মনঃসংযোগ তাঁর রচনায় খুব কমই দেখা গেছে। একথা তারাশঙ্কর নিজেও যেমন স্বীকার করেন, তেমনি সাধারণভাবেও একথা সত্য। কিন্তু 'কবি' তার ব্যতিক্রমী সৃষ্টি এবং আশ্চর্য সৃষ্টি। বাংলা

উপন্যাসে যে-কটি উৎকৃষ্ট শর্ট ফিক্‌শন বা ছোট উপন্যাস আছে 'কবি' তার মধ্যে একটি। তারাশঙ্কর ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ টেনে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে প্রেম উপেক্ষিত বলে, সে ব্যাখ্যাও এখানে খাটে না। বাস্তব জীবনে প্রেমের এমন বাস্তব এবং স্বপ্নময় রূপ যে দুটি নারীর রূপ ধরে আসতে পারে এবং তাও আবার ডোম বংশের এক কবিয়ালের জীবনে — কুৎসিত পরিবেশের মধ্যেও — তা কবি-উপন্যাসের রূপায়ণটি খুঁটিয়ে লক্ষ্য না করলে যেন বিশ্বাসই হয় না। নৈশ পাঠশালায় একটুখানি পড়াশোনা করে, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিতাই সৎ জীবন যাপনে আগ্রহী হয়। এর সঙ্গে সহজাত কবি-মনও তার ছিল। কবিয়ালের আসরে সে ছিল মুগ্ধশ্রোতা। সেই কবি-গানই শেষ পর্যন্ত তার ভবিষ্যৎ গড়ে দিলে। আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সে প্রথমে এক গোঁসাই বাড়িতে মাহিন্দারি করতে আসে। পরে গোঁসাই-এর নীচতায় ক্ষুব্ধ হয়ে চলে আসে বন্ধু রেলওয়ের পয়েন্টসম্যান রাজনের কাছে। আশ্রয় পায় রেলেরই একটা পরিত্যক্ত কুঠুরিতে। পেশা হয় কুলিগিরি। অবসরে কবিয়াল হবার প্রস্তুতি। ঘটনাচক্রে একটি মেলায় কবিয়ালদের আসরে এক বিখ্যাত কবিয়ালের অনুপস্থিতিতে নিতাই তার মিষ্টি গলায় ও নিজেরই বাঁধা গানে শ্রোতার মন জয় করে। বন্ধুর স্ত্রীর হাসি থেমে যায়। শ্যালিকা ঠাকুরঝির ঘোমটা খসে পড়ে। বেশ-বাস অসংবৃত হয়। ধীরে ধীরে বিবাহিতা তরুণী ঠাকুরঝির সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হয়ে যায়। রোজ ঠাকুরঝি তাকে দুধ দিয়ে যায়। নিতাই তার ঘরের জানলা দিয়ে রোজই দেখে রেললাইন দুটি যেখানে বাঁকের মুখে একটি বিন্দুতে মিশেছে সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে জেগে ওঠে একটি বিন্দু। সেই বিন্দুর ওপর জেগে ওঠে কাশফুলের চলন্ত সাদা একটা রেখা — রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু। সাদা কাপড়-পরা দুধের ঘটি মাথায় ঠাকুরঝির এই হল 'আবির্ভাব' — নিতাইয়ের চোখে। স্বতঃস্ফূর্ত গান লেখা আর গান গাওয়ার মধ্যে নিতাইয়ের ওপর ঠাকুরঝির বড়ই শ্রদ্ধা। ঠাকুরঝির ভালোবাসাই নিতাইয়ের গানের কথা আর সুর যোগায়। কিন্তু ঠাকুরঝি পরের স্ত্রী। তাই নিতাইয়ের মধ্যে পাপবোধ জাগে। সে ঠিক করে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। ঠিক সেই সময় গ্রামে একটি ঝুমুর দল আসে। এক সন্ধ্যায় ঝুমুর দলের নাচ-গানের আসরে গান গেয়ে নিতাই সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। তার ওপর দলের সুন্দরী বসন্তের আকর্ষণেও নিতাই ধরা দেয়। অসুস্থ বসন্ত নিতাইয়ের ঘরে একটি রাত্রি কাটাতে চায়। তাদের ঘনিষ্ঠ আলাপ ঠাকুরঝি জানলা দিয়ে দেখে। অভিমানে ও ঈর্ষায় সে নিতাইয়ের দেওয়া হারখানি ফেলে দিয়ে অদৃশ্য ভাবেই বিদায় নেয়। নিতাইয়ের মনের মানুষ আছে জেনে বসন্তও রাত্রিতে বিদায় নেয়। ঝুমুরের দল নিতাইকে সঙ্গে নিতে চায়। নিতাই যায় না। এদিকে নিতাইয়ের সঙ্গে বসন্তের ঘনিষ্ঠতা ঠাকুরঝিকে প্রায় বিকারগ্রস্ত করে তোলে। ঠাকুরঝির এই অবস্থার জন্য নিতাইকে পুরো দায়ী করে ঠাকুরঝির দিদি তীব্র ভাষায় তাকে আক্রমণ করে। নিতাই গ্রাম ছাড়বে ঠিক করে। রাজন নিতাইকে বলে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঠাকুরঝিকে বিয়ে করতে। কিন্তু নিতাই তাতে রাজি নয়। শিল্পীর যে প্রেরণা হিসেবে ঠাকুরঝিকে নিতাই দেখেছিল তার শেষ হল।

শুরু হল বসন্তকে নিয়ে নিতাই-এর নতুন জীবন। বায়না নিয়ে যেতে যেতে আলেপুরে পৌঁছোলো। পথে যেতে যেতে বসন্তের চিন্তায় কত গানের কলি মনে আসে। বসন্তও তার 'কালো মানিক'-কে পেয়ে অন্য পুরুষদের বিদায় দেয়। কিন্তু দলের নারীদের দেহ-ব্যবসায় ও মদ্যপান নিতাইকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। আরো দিচ্ছিল না ঠাকুরঝির স্মৃতি। পরে রাধাগোবিন্দের

মন্দিরে মোহান্তের সঙ্গে আলাপে তার মনে প্রসন্নতা আসে। বেশ্যা-সংসর্গে মানুষ ছোট হয় না। চিন্তামণি বেশ্যা হলেও বিশ্বমঙ্গলের ভক্ত ছিল। এই কথায় তার মন ঠাণ্ডা হল। রাত্রিতে গানের আসর বসল। কিন্তু অশ্লীলতা-বর্জিত গানে নিতাই আসর জমাতে পারল না। পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষুব্ধ হয়ে বীরবংশী নিতাই-এর বর্বর বংশের বীজাণুগুলো যেন জেগে উঠল। অশ্লীল গান গেয়ে সে আসর মাত করে দেয়। তারপর বসনকে সে তীব্র বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলে। এই উন্মত্ততা সহ্য করার শক্তি নিম্ন শ্রেণীর বসনের স্বভাবেই আছে। তাই তীব্র আবেগে সেও গান গায় 'বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাব কে?' পরের দিন দারুণ ঘৃণায় নিতাই ঠিক করে সে এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু বসন্তের মোহ তো মারাত্মক। তাই সে যেতে পারে না। গরবিনী বসন্তেরও পরিবর্তন এসেছে। আসক্তি আর মুক্তির টানাপোড়েনে খানিকটা নিরাসক্তভাবে নিতাই থাকে। বসনের নাচেও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে না। তবু বসনকে নিয়ে মত্ততা আর শৈশব সুলভ চাপল্যের জীবনেও ঠাকুরঝির স্মৃতি তাকে বিহ্বল করে তোলে। বসনকে নিয়েই যদি জীবন কাটাতে হয় তাহলে তাকে কি সব ভালোবাসাটুকু দেওয়া যায়? না, তার ছাড়াও ঠাকুরঝি থেকে যায়। তাই তার গানেও আক্ষেপ থেকে যায় 'এই খেদ আমার মনে মনে / ভালোবেসে মিটল না আশ — কুলাল না এ জীবনে / (হায়) জীবন এত ছোট ক্যানে।' কিন্তু বসনের সঙ্গে থাকতে থাকতেই তার খেদ আরো বাড়ে। বসন প্রথমে বসন্ত রোগে ভোগে। নিতাই তার সেবা করে। তারপর ক্ষয় রোগে বসন মারা যায়। মৃত্যুকে এত কাছ থেকে নিতাই প্রথম দেখে। শেষ পর্যন্ত ঝুমুর দল থেকে বিদায় নেয় নিতাই। তীর্থে তীর্থে ঘুরে নিতাই ভাব-বিনিময়ের অভাব বোধ করে। গ্রামে ফিরে আসে নতুন দল গড়বে ভেবে। কিন্তু পরিচিত জনেরা তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। বিপ্রপদর-র মৃত্যুর খবর শুনে তার চোখে জল আসে। তারপর সে রাজনের কাছে মস্তিষ্ক বিকারের ব্যাধিতে ঠাকুরঝির মৃত্যুর খবরও শোনে। তীব্রতম বেদনার মুহূর্তটি কেটে যায় এই সান্ত্বনায় যে ঠাকুরঝি মরে নি, সে আছে। এই ধূলোমাটির সঙ্গেই সে মিশে আছে। তাই চণ্ডীমাকে সে প্রণাম করতে যায় রাজনের সঙ্গে। তার মন এই গ্রামের সমস্ত পরিবেশের সঙ্গেই মিশে আছে। মিশে আছে তার সমস্ত মোহ-স্বপ্ন। বসন তার মোহ, ঠাকুরঝি তার স্বপ্ন। তার ভালবাসার স্বপ্ন এবং অদম্য মোহ একই সঙ্গে তার জীবনে দুঃখ এনেছে। সেই দুঃখই তার গানের সুর ফুটিয়েছে। তার নীতিবোধ যেমন তাকে ঠাকুরঝির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তেমন তার অনিবার্য প্রবৃত্তি তাকে বসনের সান্নিধ্যে এনেছে। তার কবিপ্রাণেই সে এই দুটি অভিজ্ঞতাকে নিয়েছে। বসন তাকে আকৃষ্ট করেছে কিন্তু বসনের মৃত্যু সেই বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু ঠাকুরঝি তার ভালোবাসার টানে নিতাইয়ের কবিপ্রাণকে বুঝেও তাকে বাঁধতে চেয়ে মর্মান্তিক আঘাতই পেয়েছে।

৩

গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম-এ যেমন একটি গ্রামের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজের সামগ্রিক গোষ্ঠীজীবনই বিচার্য বিষয়। এই গোষ্ঠীজীবনে বনোয়ারি, করালী, সুচাঁদ, পাখী, নসুবালা, কালো বউ, পরম ইত্যাদি ব্যক্তি ও চরিত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহু শতাব্দী-ব্যাপী সংস্কৃতির মূল থেকেই এরা প্রাণরস পেয়েছে। সেই সংস্কৃতি তাদের রক্তে যে দৈবশক্তি-নির্ভর জীবন-জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে তারই অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে তারা যেন খুঁটির মতো চালিত হয়েছে। নিয়তি ও দৈবশক্তির ওপর বিশ্বাস এই নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলোর

মানসিকতাকে একাধারে বাস্তব ও কল্পনায় মিশিয়ে এক প্রাচীন মন্ত্রতন্ত্রময় সমাজের অন্তর্কলহের ছবি ফুটিয়েছে। নিম্নবর্ণের এই প্রাচীন সমাজ-সংরক্ষণই এই উপন্যাসের উপজীব্য নয়। যে সমাজ এতদিন দেবতার শিলাসন বলে মান্য করা হয়েছে সেই শিলাসনে যেন হঠাৎ ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কাহারদের জীবনদৃষ্টি ও প্রাত্যহিক জীবনযাপন পৌরাণিক কল্পনা, অলৌকিক সংস্কার, কিংবদন্তী ও গল্প দিয়ে তৈরি সেই আপাত-দুর্ভেদ্য সমাজব্যবস্থায় যেন দৈবশক্তির প্ররোচনাতেই প্রবৃত্তি ও অপ্রতিরোধ্য নতুন চেতনা এসে ধাক্কা দিয়েছে। যদি সংরক্ষিত এক নিম্নবর্ণের সংস্কৃতির গল্পই এই কাহিনীর বিষয়বস্তু হত তাহলে তা উপকথাই হত। অপ্রতিরোধ্য আঘাতের ঘটনাগুলোই উপকথাকে উপন্যাস করে তুলেছে। তবু নামে যে 'উপকথা' শব্দটি আছে তা ওই ভাঙনের মুখে প্রাচীন সংস্কৃতির শেষ বারের মতো নাড়া খাওয়া চেহারাটিকে গভীর মমতায় গড়ে তুলবার মধ্যেই আছে। 'উপকথা' নামটি আরও এই কারণে যে, লেখক সাধারণ পরিমিত পরিসরের উপন্যাসের বিবরণ ভঙ্গি থেকে সরে এসে এই গোটা সংস্কৃতির জীবন বিন্যাসটিকে ধীরে ধীরে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার বাহুল্যেই ধরতে চেয়েছেন। চালচিত্রের বহুল ও বিচিত্র অলঙ্করণে যে প্রতিমা পরিণত ও সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে ওঠে, হাঁসুলী বাঁক সেই উপকরণ বাহুল্যের উপকথা। তাই এই উপন্যাসের কাহিনী একটি 'আমূল' সংস্কৃতি-বিপর্যয়েরই ইতিহাস। উঁচু জাতের হিন্দু সমাজে যে সমাজ-সংগঠনশক্তি প্রায় শেষই হয়ে গেছে, 'তথাকথিত' নীচু শ্রেণীর মধ্যে সেই সংগঠন শক্তি অনেক দিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। এই শেষ শিখাটির নির্বাণ, ধর্মীয় আচার-সংস্কার-চালিত জীবনযাপনের এই শেষ শয্যা, এক বিরাট প্রাণশক্তির ধারাপথ-পরিবর্তনই উপন্যাসটির প্রেরণা। কর্তাবাবার বাহনের রহস্যময় শিস্‌ধ্বনিতে সমস্ত কাহার সমাজে যে অতি প্রাকৃত ভীতি সঞ্চার হয়েছে তাতেই উপন্যাসটির চালচিত্রের প্রাথমিক রেখাঙ্কন শুরু হয়েছে। এই বাহনটিকে হত্যা করেই করালী নিজের সমাজের চোখে যে পাপ করেছে তার কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। আত্মীয়দের কাছে সে সমাজচ্যুত হয়েছে। আর করালীকে ক্ষমা করে বনোয়ারি সমস্ত কাহার সমাজের ওপর যে দৈব অভিশাপই টেনে এনেছে এই ধারণা তার রক্তের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। কিন্তু একেবারে শেষদিকে করালীর মনে অতর্কিতে অতীত-ভীতি এসেছে তা চরিত্রসঙ্গতির দিক থেকে আকস্মিক বলা যেতে পারে। তবু সামগ্রিকভাবে কাহার সমাজের চিন্তা ভাবনা ও কাজের মধ্যে তাদেরই গড়ে তোলা দৈবশক্তির প্রভাব খুবই গভীর। তুচ্ছ ঘটনার পেছনে দৈবশক্তির ক্রিয়াকেই তারা কারণ বলে মনে করে। যা কিছু দ্বন্দ্ব-সংঘাত কাহারদের মধ্যে ঘটে তার মূলে হয় এই দৈবশক্তি, নয়তো — তাদেরই ভাষায় — হৃদয়াবেগের 'রঙের খেলা' বলেই তারা মনে করে। এই ধারণাটিকেই তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সংহতি হিসেবে দেখিয়ে করালীর দৃপ্ত প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডে সেই সংহতিকে বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। কিন্তু বিচূর্ণ করার আগে সংহতি যে কত কঠিন ও মহিমময় সেই কথা বোঝানোই যেন ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য বলে মনে হয়।

ঠিক একই রকম গভীর অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে (১৯৫১) প্রায় একই রকম দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে। কাহারদের জীবনযাপনে প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া তবু সহজ, কারণ সে সমাজ ভদ্রশ্রেণীর মানুষের সামনে পরিচয় নেবার বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' যে বেদে সমাজের কাহিনী সে সমাজ অনেক বেশি আত্মরক্ষা সচেতন এবং সেই কারণে বাইরের ভদ্রশ্রেণীর মানুষের পক্ষে ওই সমাজের মানুষের Second self

বা অন্তরঙ্গ হয়ে প্রবেশ করা শক্ত, হয়তো একটু বিপদজনকও বটে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো সর্পসঙ্কুল দেশে যে কারণে মনসা পূজার উৎপত্তি, ঠিক সেই কারণেই বিষবৈদ্য বেদে-সম্প্রদায়ের নানা বিধি নিষেধ-ঘেরা অন্ধবিশ্বাসের জগৎ তৈরি হয়েছে।

উপন্যাসের পরিবেশটি আমাদের কথাসাহিত্য জগতে একেবারেই নতুন। সাপের সঙ্গে মানুষের যে চিরকালের শত্রুতা সেই শত্রুতাকে বেদেরা নিজেদের বহুকালচর্চিত ক্ষমতায় এক অদ্ভুত ধরনের অন্তরঙ্গতায় রূপান্তরিত করে নিয়েছে। এই বেদেদের জগৎ বিষহরির অদৃশ্য উপস্থিতিতে রোমাঞ্চিত। সাপের হিসহিস শব্দ ও ক্ষিপ্র আবির্ভাব ও ক্ষিপ্রতর অন্তর্ধান এই বেদেদের জগৎ-কে রহস্যময় করে রেখেছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলিও এই পরিবেশে কখনো স্তিমিত কখনো উগ্র উন্মত্ত। বেদেদের ধর্মসংস্কার যেমন আর্যধর্ম থেকে আলাদা তেমনি আবার আর্যধর্মানুসারী পুরাণ কল্পনায় ও অদ্ভুত কিংবদন্তীতে বিচিত্রও বটে।

এই যাযাবর জীবনযাত্রার মূল বিষয় হল দলপতি শির বেদের কঠোর শাসন এবং নাগিনী কন্যার দৈব রহস্যের তাৎপর্য দেখানো। দলপতি তাদের লৌকিক জীবনের রীতি-নীতি নির্ধারণ করে আর নাগিনী কন্যা তাদের লৌকিক জীবনেই অলৌকিক জগতের অবশ্য প্রয়োজনীয় বার্তা বহন করে আনে, দেবতার অনুগ্রহ-নিগ্রহের তত্ত্বটি ধ্যানযোগে প্রকাশ করে। শির বেদে সমাজ নেতা, কিন্তু তার কোন দৈবশক্তি নেই। কিন্তু বিষহরির সেবায় নিযুক্ত নাগিনী কন্যা বিশেষ দেহ-চিহ্নিত এক তরুণী নারী। এই নারীই বেদে-জাতির ধর্মবোধের প্রতীক, জাতির চরিত্রশুদ্ধি রক্ষা সে-ই করে। দৈবশক্তির সঙ্গে তারই প্রত্যক্ষ যোগে সে দিব্যদৃষ্টি পেয়েছে। প্রাচীন সমাজে যেসব দৈবশক্তি-দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ বক্তা নারী প্রফেটস দেখা যেত উনিশ শতকে এই আদিম অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাগিনী কন্যা যেন সেইরকমই এক ভবিষ্যৎ বক্তা নারী। সাপের বিষের মন্ত্র এবং ঔষধির মতো এই আদিম সমাজ তার ক্রিয়া কলাপকে বাইরের জগৎ থেকে সংগোপনে আলাদা করে রাখে। মনসাপূজার পেছনে যে কি প্রেরণা ছিল তা এই নাগিনী কন্যার তত্ত্ব থেকে খানিকটা অনুমান করা যায়। হিংস্র নাগিনীর ওপর মাতৃত্বের আরোপ কিংবা ভক্তি সাধনার আরোপ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সমীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। যৌনমিলনোৎসুক নাগিনীর মতোই যৌবনক্ষুধাকাতর নাগিনী কন্যার দেহ থেকে চাঁপার গন্ধ বেরোয় — শারীরিক প্রক্রিয়ার এই সমীকরণ-চেষ্টা তারাশঙ্করের এক দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। বেদেদের কৃচ্ছ্রসাধন ও অবদমিত যৌবনজ্বালা কীভাবে তাদের দেহে-মনে এক কল্পনা বিভ্রম ছড়ায় তার অসাধারণ ছবি আছে এই উপন্যাসে।

দলপতি ও নাগিনী কন্যার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উপন্যাসের মূল নাটক। দলপতি শির বেদে যেমন কঠোর শাসনে নাগিনী কন্যার ব্রত পালনের ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখে, নাগিনী কন্যাও তেমনি আদর্শপালনের অবদমনের আড়ালে তীব্র যৌন কামনায় অস্থির হয়ে উঠে। শিব বেদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বকে নির্মম নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিপর্যয়ে পৌঁছে গেছে। নাগিনী কন্যা শবলা এক তরুণ বেদের প্রতি আসক্ত হয়ে তার ব্রত পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং মহাদেব শির বেদেকে প্রলুব্ধ করে তাকে যমালয়ে পাঠিয়েছে নাথদন্তের আঘাতে। মহাদেবও তাকে সাপের কামড়ে মেরে ফেলবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত নাগিনী কন্যার ব্রত ছেড়ে এক মুসলমান বেদের সঙ্গে সংসার করেছে। তার পরবর্তী নাগিনী কন্যা পিঙ্গলা নানু ঠাকুরের প্রেমে পড়ে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নাগদংশনে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। ব্যর্থ প্রেমিক নানু ঠাকুর শিব বেদকে হত্যা করে সাঁতালি গ্রাম থেকে সমস্ত বেদেদের উদ্বাস্তু করে দিয়েছে।

তারাশঙ্কর এই বিপর্যয়ের ছবিটিকে স্মরণীয় করে তুলেছেন নাগিনী-মানবীর সমীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতায়। সেই লোভন শক্তিই যেন সমস্ত শাসন-শৃঙ্খল ভেঙে চুরমার করে যেমন নিজের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে তেমন বেদে জাতির সমাজবন্ধনও ভেঙে দিয়েছে। সর্পবিদ্যা ও বিষ চিকিৎসার ঔষধি-মন্ত্র আমরা হারিয়েছি, কিন্তু তার অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক প্রতিফলনের জন্যে তারাশঙ্করের অতিদুর্লভ অন্তর্দৃষ্টিকে সাধুবাদ দিতেই হয়।

৪

এই উপন্যাসটির পরের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম বোধহয় 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫২)। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে যেমন জীব জন্তুর সঙ্গে মানুষের সমীকরণ চেষ্টায় আদিম গোষ্ঠীর ধর্মচেতনার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা, এখানে তেমনি চিকিৎসা শাস্ত্রের নিরিখে জীবন-মৃত্যুর রহস্যোপলব্ধির চেষ্টা। নাগিনী কন্যার কাহিনী -তে যেমন একটি প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে দেহ-মনের দ্বন্দ্ব ও সেই ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপর্যয় এখানে তেমনি আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক শাস্ত্রের নিরিখে নাটকীয় পরীক্ষায় বিপর্যস্ত একটি প্রাচীন শাস্ত্র-নির্ভর জীবন সত্য, মৃত্যুর স্বরূপ-জ্ঞান যে জীবন সত্যের মূল লক্ষ। পুরোনো কবিরাজি চিকিৎসা শুধু রোগী সারাবার উপায় নয়। রোগীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ, জীবন সুস্থ রাখার নীতি-নিয়মের দিকে লক্ষ রাখারও চিকিৎসা। সে হিসেবে আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনারও অঙ্গ। কবিরাজের নাড়ীজ্ঞান আসলে প্রাণরহস্যেরই উপলব্ধি, অসংখ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমবায়ে গঠিত প্রাণতত্ত্বের ধর্মভেদ। অনেকটা ব্রহ্মজ্ঞানের মতোই চিকিৎসকের শরীরতত্ত্ব-জ্ঞান তার পক্ষে কেবল উপায় নয়, অন্তর্ভেদী দিব্য উপলব্ধি। আর তার চরিত্রও তাই প্রাণ রহস্যের নিরাসক্তদ্রষ্টার মতোই নির্লোভ অবিচলিত। এই দৃষ্টিকে নিছক অবৈজ্ঞানিক বলে তাচ্ছিল্য করাও মুশকিল।

তুলনায় আধুনিক চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গি বর্হিমুখী— বহির্লক্ষণনির্ভর অর্থাৎ অন্তর্জীবন নিরপেক্ষ। এবং সেই দিক থেকে তার চিকিৎসা বিজ্ঞাননির্ভর। এই বিপরীতধর্মী দুটো মনোভঙ্গির মানুষের টেনশনই সারা উপন্যাসের প্যাটার্নটিকে ধরে রেখেছে।

কবিরাজ জীবন মশাইয়ের জীবনটি স্পষ্ট করে তুলবার জন্যে যে কৌশল লেখক নিয়েছেন তাতে প্রথাগত ধারাবাহিকতা নেই। মানসিক সংকটে বা আবেগঘন মুহূর্তে তাঁর অতীত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি তিনি নতুন করে অনুভব করেছেন। সেই সূত্রেই অল্প বয়সে মঞ্জরীর প্রতি তাঁর মোহ, ভূপী বোসের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মঞ্জরীর ছলনার জন্যে তাঁর অন্তর্জ্বালার কথা জানতে পারি। জানতে পারি, এই অন্তর্জ্বালাকে চাপা দিতে তিনি সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা সম্ভ্রম জানাবার চেষ্টা করেছেন। জানতে পারি, আতর বউ এর অভিমান ও ঈর্ষার খোঁচায় তিনি ভেতরে ভেতরে কীভাবে জ্বলেছেন। বুঝতে পারি, তাঁর যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের চিকিৎসা-সাফল্যের দৃষ্টান্তগুলিকে তাঁর বর্তমান নৈরাশ্য ও সংশয়ের বৈপরীত্যেই দেখানো হয়েছে।

বিশেষ করে দুটি ঘটনা তাঁর চিকিৎসক জীবনকে অতিক্রম করে তাঁর অনুভূতিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। একটি তাঁর পুত্র বনবিহারীর মৃত্যু সম্পর্কে তার পূর্বজ্ঞান ও মানসিক প্রস্তুতি। দ্বিতীয়টি, শশাঙ্কের মৃত্যুর সম্ভাবনায় তার তরুণী স্ত্রীকে সাধ মিটিয়ে খাওয়াবার আমন্ত্রণের রূঢ় প্রত্যাখ্যান। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর আপাত নিশ্চিন্ততা আতর-বউয়ের মনে যে তীব্র অনুযোগ ও তার প্রকাশে যে শ্লেষ এনেছে তার তীব্রতা জীবন মশাইয়ের পারিবারিক জীবনটি নষ্ট করে দিয়েছে এবং তাঁকে অতীতমুখী করে তুলেছে। উপন্যাসে যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার সবই এইসব মর্মান্তিক আঘাতের পরেকার ঘটনা। প্রায়

বছর পাঁচেক কবিরাজ আত্মগত থেকে সমাজ সেবার যে আহ্বান পেয়েছেন, তাতে তিনি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে নতুন করে জেগে উঠেছেন। কিন্তু উপন্যাসে যে জীবন দত্তকে দেখছি তিনি তাঁর 'পূর্বজীবনের প্রেতচ্ছায়া'। তার স্নেহের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে শশাঙ্কের স্ত্রী তাঁকে যে আঘাত দিয়েছে তাতে চিকিৎসক ও রোগী, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে নতুন করে তাঁকে ভাবতে বাধ্য করেছে। মৃত্যু যে জীবনের কাছে সান্ত্বনা নয়, রূঢ় সত্য— এই শিক্ষা তিনি নতুন করে পেয়েছেন। মৃত্যুর নীলবিষ তিনি যেন কণ্ঠে ধারণ করেছেন। তাঁর কল্পনায় মঞ্জরী এসেছে মৃত্যুদূতী হয়ে। আতর-বউ এসেছে মৃত্যুরূপিনী শক্তি হয়ে। তাঁর নিজের মৃত্যু তার কাছে মৃত্যু-রহস্যভেদের শেষ পর্ব। কবিরাজের কাছে মৃত্যু আসছে যেন জীবনে বেদনা বিধুর নগ্ন রূপটি নিয়ে, আর হৃৎপিণ্ডের অন্তিম স্পন্দনটুকু নিয়ে। কোনো ভয়াবহ বীভৎসতা তার মধ্যে নেই। জীবনের গভীর ধ্বংসবীজ যেন ধীরে ধীরে তার অমোঘ রূপটি স্পষ্ট করে তুলেছে। একই সঙ্গে মৃত্যুর তান্ত্রিক ও উপনিষদিক ধ্যানচ্ছবি যেভাবে এই উপন্যাসে এসেছে তার ঔপন্যাসিক রূপ-কল্পনা নাগিনী কন্যার কল্পনার মতোই আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে নতুন।

'কালান্তর' (১৯৫৬) উপন্যাসে তারাশঙ্করের আত্মিকরূপের অনেকটা থেকে গেছে বলে যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, তেমনি এও বলতে হবে, গ্রাম-ছেড়ে আসা গৌরীকান্ত অনেক দিন বাদে গ্রামে ফিরে এসে যতটা পূর্বস্মৃতিভারে আচ্ছন্ন ততটা গ্রামের সঙ্গে তাঁর বর্তমান সম্পর্কে গভীরভাবে যুক্ত নয়। আকস্মিকতাও খানিকটা কাহিনীর ক্ষতি করেছে। তাছাড়াও নাস্তিক বিপ্লববাদ ও অহিংস আদর্শ যতটা তত্ত্ব হিসেবে বিস্তৃত ততটা ঔপন্যাসিক রূপায়ণে সার্থক নয়। নিজের জীবনের বিস্তৃত যুগকে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই যুগ পটভূমি হিসেবেই থেকে গেছে, মূল কাহিনীর মধ্যে তেমন ছড়িয়ে পড়েনি যে পটভূমিতে দেশের সমাজ -অর্থনীতি-রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে তার কাহিনীতে ছোটখাটো বিরোধ ও শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। ধাত্রীদেবতার কাহিনী যেমন দেশকালের ব্যাপক জীবনসত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তেমন কোনো বড় জীবনসত্যের আভাস কালান্তরে নেই। নিজের এই ব্যর্থতার কথা তারাশঙ্কর নিজেও স্বীকার করেছিলেন 'আমার কথা' বইতে (পৃ.১৩-১৪)। কিন্তু পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর এতো ব্যাপক পটভূমি না ধরে কিছু উল্লেখযোগ্য ছোট উপন্যাস লিখেছেন যার মধ্যে জটিল মনস্তত্ত্ব কিংবা মূল্যবোধের সংঘর্ষ এনে গভীরতা আনতে পেরেছিলেন বলেই মোটেই উপেক্ষার যোগ্য নয়। সেগুলির মধ্যে 'বিচারক' (১৯৫৬) 'সপ্তপদী' (১৯৫৭) 'উত্তরায়ণ' (১৯৫৮) 'মহাশ্বেতা' (১৯৬১) এবং 'যোগভ্রষ্ট' (১৯৬০) অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। 'বিচারক' উপন্যাসের আকর্ষণ বিচারকের চোখে আসামীর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক সত্য নির্ণয় চেষ্টাই নয়, নিজের অতীত অপরাধ বোধের পাশাপাশি বিচার চলছিল বলেই তার আকর্ষণ। আসামীর বিচারের সময় বারবারই বিচারক নিজের অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে আসামীর অপরাধকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন এবং তাকে যে ধরণের অপক্ষপাত ন্যায়বিচারের জন্যে প্রয়োজন তারই যেন অভাব ঘটছিল বিচারকের দৃষ্টিতে। যদিও আসামীর অপরাধ ও বিচারকের অপরাধের মধ্যে প্রত্যক্ষ কারণের একটু তফাৎ ছিলো, তবু বাইরের দিক থেকে ওই পার্থক্যটুকু সহজেই অগ্রাহ্য করা যেতো। তবু বিচারককে যে নিজের অপরাধবোধে বিচলিত বিশ্ববিধান-কর্তার সামনে নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবে হাজির করে বিচারক হিসেবে এবং স্বামী হিসেবে কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে একটা ভাব গৌরব সৃষ্টি করা গেছে এটা মানতেই

হবে। সপ্তপদী-র মধ্যেও নর নারীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুটি ভিন্ন মূল্যবোধের সংঘর্ষ এনে দুটি চরিত্রকে দুটি ভিন্ন জীবনপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে আবার দুটি চরিত্র যখন মুখোমুখি তখন একজনের গভীর গোপন প্রভাব অন্যজনকে কীভাবে সদর্থক মূল্যবোধে ফিরিয়ে এনেছে তার মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা উপন্যাসটিকে যুক্ত পরিসরের মধ্যেও গভীরতা দিয়েছে। কৃষ্ণেন্দু যখন সেবাব্রতী কৃষ্ণস্বামী তখন তার প্রসন্ন প্রভাব উদ্ধার পাওয়া নতুন জীবনে— ক্লেটনের স্ত্রী হিসেবে — রিনা যেভাবে উপলব্ধি করেছে তার প্রকাশ দক্ষতাকে প্রশংসা করতেই হয়।

কিন্তু 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসটির পটভূমি চল্লিশের দশকের যুদ্ধ ও দাঙ্গার পটভূমি। প্রবীর তার প্রেমিকা আরতির কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই যে দূরে চলে গিয়েছিল তাদের নতুন করে দেখা পাওয়ার পর প্রবীরের যে জীবনকাহিনী শোনা গেছে তার মধ্যে একটা কঠিন পরীক্ষা আছে। কিন্তু মানবিক দ্বন্দ্ব নেই। যে মোটর ড্রাইভার রতনকে প্রবীর বার্মার জঙ্গলে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য গুলি করে মেরেছে তার মা ও স্ত্রীর পরিবারে সে রতনের ছদ্মবেশে ঢুকেছে। রতনের স্ত্রী তার ছদ্মবেশ ধরে ফেললেও রতনের মা-র প্রাণ বাঁচাতে প্রবীরকেই স্বামী বলে মেনে নিয়েছে। মা-র মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী অভিনয়ের চুক্তি শেষ হয়েছে এবং দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখানে তারাশঙ্কর যে দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি করে মূল্যবোধের পরীক্ষা করতে চেয়েছেন সে পরীক্ষায় মানবিক হৃৎস্পন্দনের ছোঁয়া লাগেনি ব'লে পরীক্ষাটি ব্যর্থ-ই হয়েছে।

তেমনি 'মহাশ্বেতা' উপন্যাসটি একটি বিচিত্র নারী-ব্যক্তিত্বের বিকাশের কাহিনী, যে কাহিনী সাধারণ বাঙালি পরিবারের নানা বিসদৃশ পরিবেশে একটি মেয়ের বিশেষ চরিত্র হিসেবে তৈরি হতে সাহায্য করেছে। বাবা-মাকে হারিয়ে যে মেয়েটি যৌথ পরিবারে স্নেহহীন নৈঃসঙ্গ্যে কাটিয়েছে, যে তার জাঠতুতো বোনের কলঙ্ক নিজের মাথায় নিয়ে অবরুদ্ধ হয়েছে এবং বিয়ের মাধ্যমে যোগ্য আশ্রয়ের সম্ভাবনাকে হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে নানা ক্ষণিক আশ্রয় থেকে এক চিত্রশিল্পীর পরিবারে খানিকটা সুস্থ জীবনের আস্বাদ পেয়েছে, এবং সেখান থেকেই শেষ পর্যন্ত দেশসেবক বিনয় সেনের আশ্রমে থিতিয়ে বসেছে। কিন্তু বিনয়দার সঙ্গে প্রতিমার সম্পর্ককে সে যখন সহ্য করতে পারছে না সেই সময়েই বিনয়ের প্রেম-নিবেদনকে খানিকটা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে বিনয়ের প্রতি তার গোপন আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, প্রতিমার সঙ্গে বিনয়ের সম্পর্ককে সহ্য করতে না পারাতেই সে যে এমন রূঢ় হয়ে উঠেছে তা বোঝাই যায়। তারপর বৃত্তি নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে পড়াশুনা করে ফিরে আসার পর প্রতিমার সঙ্গে বিনয়ের সম্পর্কটির অসারতা সে বুঝতে পেরেছে এবং ক্ষয়রোগগ্রস্ত বিনয়ের প্রতি তার এতদিনকার গোপন ভালবাসা খুব সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম জীবনে নীরা আত্মনিরোধের চেষ্টায় যে বিকৃত রূঢ়তা দেখা দিয়েছিল তা যতটা মনস্তত্ত্বসম্মত শেষ পর্বে তার পরিবর্তন অতি নাটকীয় ও উদ্দেশ্যমূলক মনে হয়। বোঝা যায়, স্বক্ষেত্র ছেড়ে এসে একজন দক্ষ শিল্পী চরিত্রের জটিলতা সৃষ্টি করে তার জট ছাড়াতে গিয়ে ভারসাম্য হারাচ্ছেন।

'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসে ধর্ম ও ভোগসর্বস্ব জীবনবাদের একটা দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে সুদর্শন চরিত্রের বিকাশের মাধ্যমে। ছোটবেলায় সুদর্শন যে ঈশ্বরকে খুঁজেছে তার আত্মপ্রত্যয় ও দুঃসাহসিক জীবনীশক্তির টানে। কিন্তু রাজবন্দি বীরেনবাবু তার মনে ঈশ্বর-সন্ধানের বদলে এক বিকৃত মানবতা নির্ভর আদর্শকে ধরে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে সুদর্শনের মধ্যে

দুটি ভিন্ন মূল্যবোধের দ্বন্দ্বই বেড়েছে। এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে এবং গ্রামবাসীদের মিথ্যা সন্দেহ ও অত্যাচার থেকে বাঁচাবার সূত্রে বিধবা শান্তির সঙ্গে পরিচিতি হয়, কিন্তু তার মোহ কাটাবার জন্যে সে তীর্থ ভ্রমণে যায়। ফেরার পথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রে একটি ধর্ষিতা মেয়ে নীলনলিনী তার আশ্রয়প্রার্থী হলে তার সঙ্গে সে ক্ষণস্থায়ী সাংসারিক জীবনে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু একটি সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পাওয়া সোনার রাধা মূর্তি ভেঙে সুদর্শন যখন তার সোনাটুকু নিয়ে নেয় তখন নীলনলিনী তার ধর্ম চেতনার প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারে না। তাকে ছেড়ে চলে যায়। এই ধাক্কায় সুদর্শনের সন্ন্যাস-খোলসটি খসে পড়ে এবং শান্তির সঙ্গে নতুন করে নিছক দেহগত সম্পর্ক তৈরি করে। কিন্তু তাতেও সে তৃপ্তি পায় না। ইতিমধ্যে কলকাতার দাঙ্গায় তার নির্মম প্রাণশক্তি প্রকাশের সুযোগ আসে। হিন্দু দলপতি হয়ে সে বহু মুসলমান-আক্রমণ ঠেকায় ও মুসলমান হত্যা করে। এবং শান্তি ও স্বগ্রামবাসী বিপ্রপদ মুসলমানদের গুপ্তচর হয়ে যাওয়ায় সে দুজনকেই খুন করে। শেষ কালে ফাঁসির আসামী হয়ে তার এই আত্মকাহিনীর কথক হয়ে পড়ে। এই কাহিনী সূত্র থেকে বোঝা যায় সুদর্শনের জীবনে অধ্যাত্মচেতনা স্থায়ী বা গভীর কোনো ধর্মচেতনা নয়। একটি দুঃসাহসী মানুষই একটা প্রত্যয় খুঁজছিল যে প্রত্যয় তার কাছে কোনো দিনই নিয়ন্ত্রণ শক্তি হিসেবে আসেনি। সুদর্শনের ঈশ্বর-সন্ধান সেইরকমই সামযিকভাবে একটা বিশ্বাসকে আকড়ে ধরার চেষ্টা —কোন গভীর ধর্মচেতনা তার কোনদিনই ছিল না। সেদিক থেকে 'যোগভ্রষ্ট' এই নামটিও খুব উপযুক্ত বলে মনে হয় না।

এই ছোট উপন্যাসগুলি তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক মহত্ত্বকে প্রমাণ না করলেও চরিত্র-প্রধান এই উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের সংকট, আধ্যাত্মিক অভীপ্সা ও দৈহিক ক্ষুধার দ্বন্দ্ব এবং নষ্ট মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের বর্ণনায় তারাশঙ্করের দক্ষতার প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু যে নাটকীয় পরিস্থিতি ও আবেগ তাঁর যুধ্যমান গ্রামীণ চরিত্রে মানিয়ে যায়, নাগরিক জীবনে সেই একই নাটকীয়তাকে অতিনাটকীয়তা বলে মনে হয়। অতিনাটকীয়তা উপন্যাসগুলির সাধারণ দুর্বলতা, যদিও চরিত্রে মনস্তত্ত্ব -বিশ্লেষণে গভীরতার ছাপ যথেষ্টই আছে।

কিন্তু সপ্তপদী ও উত্তরায়ণ-রচনার মাঝামাঝি সময়ে (মার্চ১৯৫৮) তারাশঙ্কর তুলনায় একটু ব্যাপক পরিসরেই আমাদের দেশের ধর্মসাধনার ঐতিহ্যের মধ্যে সংঘর্ষকে দেখতে চাইলেন 'রাধা' — উপন্যাসে। এবং এই সূত্রে তিনি ঐতিহ্যকে ধরে আবার স্বক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। যদিও মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মুখে একটা অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের ঘটনাটি ঘটছে তবু রাজনীতিটা মুখ্য নয়, ধর্মই এখানে মুখ্য। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ধর্মচেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যেমন শক্তির পূজাকে রাজনৈতিক কর্মপ্রেরণায় রূপান্তরিত হতে দেখি, এখানে ধর্মই মুখ্য এই কারণে যে, ধর্মরক্ষার প্রয়োজনেই রাজনৈতিক শক্তির আশ্রয় নিতে দেখা গেছে।

ধর্মসাধনার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে মাধবানন্দের বৈষ্ণবসাধনার পদ্ধতির সংস্কার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে। কৃষ্ণসাধক থেকে রাধাতত্ত্বকে বাদ না দিলে বৈষ্ণবধর্মের নৈতিক মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে পড়ে। তাই মাধবানন্দের রাধাতত্ত্বের প্রতি বিরোধিতা। এবং কৃষ্ণদাসী ও তার মেয়ে কিশোরী মোহিনীর সান্নিধ্যে এসেই এই বিরোধ জেগে উঠেছে। একবড় ব্যাবসায়ীর সাধনসঙ্গিনী এবং সিদ্ধপীঠের অধিকারিণী কৃষ্ণদাসী ও মোহিনী মাধবানন্দের রূপে মুগ্ধ এবং তাদের ভক্তিনিবেদনে দেহসমর্পণকে তারা ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলেই মনে করে। অথচ এই সাধনপদ্ধতির

বিরোধী মাধবানন্দ তাদের প্রত্যাখ্যান করলে মাধবানন্দের সমস্যা বাড়ে।

সমস্যাটা আরো বাড়ে যখন ধর্মসাধনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা ঠিক কি না এ নিয়ে শিষ্য কেশবানন্দের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। যদিও ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মাধবানন্দ জড়াতে চায় না। তবু শিষ্যের প্রভাবে সে জড়িয়েই ফেলে। কৃষ্ণদাসী ও মোহিনীকে দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ী ও বর্গীর হাঁত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাকে অস্ত্র ধরতে হয় হয় এবং রাজনীতির জটিল পাকে সে জড়িয়ে পড়ে। ফলে কৃষ্ণ-উপাসনার সঙ্গে রুদ্রের আরাধনাকে সে ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত করে নেয়। এই মিশ্র ধর্মসাধনায় মাধবানন্দের অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিলতর হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মোহিনীকে উদ্ধারের জন্যে দাস সরকারের দস্যুতার প্রশ্রয় দিতে এবং তার ভাণ্ডার থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করার জন্যে নিজের কাছেই রাখতে হয়েছে। কিন্তু মোহিনী শেষবার তার কাছে আত্মনিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়। এবং প্রত্যাখ্যান ক'রে মাধবানন্দ ধর্মসাধনা ছেড়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রেমের বদলে শক্তির পুজো করতে গিয়ে সে শূন্যতার মধ্যে ডুবে যায়। তারপর নবাব সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে সে আহত হয় এবং অচেতন অবস্থায় তারই প্রত্যাখ্যাত কিশোরীর সেবায় সে জীবন ফিরে পায়। এই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা তাকে আবার রাধাতত্ত্বে বিশ্বাসী করে তোলে এবং একই সঙ্গে তার ও মোহিনীর মৃত্যুতে রাধাকৃষ্ণের যুগল-উপাসনা নতুন করে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু মাধবানন্দের সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ের সংকটগুলি বৈষ্ণব ও শাক্ত দুটি ধর্মশাস্ত্র চর্চা ও ব্যক্তিগত অনুভূতির মিশ্রণে তারাশঙ্কর খুবই দক্ষতার সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। মাধবের মানসিক সংকটে প্রকৃতি — বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি তার বর্ণ-ব্যঞ্জনায় খুবই সংকেতময় হয়ে উঠেছে। চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রেও কৃষ্ণদাসী আমাদের কথাসাহিত্যে এক নতুন চরিত্র, কারণ, যে নবীন সন্ন্যাসী মাধবানন্দকে সে তার মেয়ে মোহিনীর জন্যে চেয়েছিল তার প্রতি তার নিজের আসক্তি দেখিয়ে প্রেমিকের সামনে মা ও মেয়েকে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন লেখক কিন্তু তার হঠাৎ মস্তিষ্ক বিকারের পেছনে তার আপাত-ধীর ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের আড়ালে যে গভীর দাহ ছিল তার যথেষ্ট বিশ্লেষণ নেই বলে তা যতটা অনুমান করতে হয়, ততটা তথ্যনির্ভর হয়ে সহজগ্রাহ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে না। তেমনি মোহিনী প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীভাবে রাধাকৃষ্ণের সাধনভজনে নিজেকে উৎসর্গ করেছে তাও খানিকটা রোম্যান্সের মতো আকস্মিক ও অব্যাখ্যাও থেকে গেছে। তবু উপন্যাসের শেষে তার আবির্ভাব মাধবের জীবনে পরিপূর্ণতার যে আনন্দ এনে দিয়েছে তাতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার ভাবসাধনায় একটি সার্থক রূপকের সুরমূর্চ্ছনা এনে দিয়েছে। কয়ো চরিত্রটিও বোধহয় এই ধর্মসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে একটি বিশিষ্ট চরিত্র। মানুষ হিসেবে সে অপরিণত, কিন্তু বিশেষ করে সেইজন্যেই কৃষ্ণদাসী - মোহিনীর প্রতি তার সহজ আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গ-প্রবণতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তার সহজ আত্মীয়তা এবং মোহিনীর জন্যে তার ব্যাকুলতা এই বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশে খুবই মানিয়ে গিয়েছে। কথাসাহিত্যের ঐতিহাসিকতা যে শুধু বাইরের রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তিচরিত্রের অন্বয়ের ওপরেই নির্ভর করে থাকে না, তার ধর্মজীবনের গভীর চেতনার মধ্যেও তার সাংস্কৃতিক 'ইতিহাস'টি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তারাশঙ্করের এই চেষ্টার বিশেষ মূল্য আছে।

'ভুবনপুরের হাট' উপন্যাসটি (১৩৭০) উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এই উপন্যাসে দ্রুতপরিবর্তনশীল গ্রামজীবনকে বিষয় হিসেবে ধরা হয়েছে। ভুবনেশ্বরের মন্দির, সংশ্লিষ্ট

ধর্মসংস্কার ও আনুষ্ঠানিক দৈবনির্ভরতাকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে ভুবনপুরের হাট। বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি ও নাগরিক রুচির প্রসার, বিলাসী উপকরণের বাহুল্য, আরামের দাবি ও মুনাফার মনোবৃত্তি এখন গ্রামহাটের চেহারা পাল্টেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রেজিস্টারি অফিস, গ্রামোন্নয়ন অফিস, ভূমিসংস্কার অফিস ইত্যাদি সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিচিত্র চরিত্র এসে ভিড় করেছে কিন্তু একমাত্র মালতীই তার নানা অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে নিঃসংকোচ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে এবং পূর্বজীবনের প্রণয় ব্যর্থতার বেদনা থেকে সরে এসে তার সেবাবৃত্তি ও আশ্রয়দানের দাক্ষিণ্যেই নতুন একটি পুরুষকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু মূলত গ্রামের পরিবর্তনশীল যৌথজীবনকেই ঔপন্যাসিক দেখবার চেষ্টা করেছেন। এবং অতীতের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও অনিবার্য পরিবর্তনশীল গ্রাম জনপদকেই তাঁর লক্ষ্য বস্তু করে নিয়েছেন।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল অঙ্গ হিসেবে ধর্মচেতনাকে স্পষ্ট করে তোলাই যেমন রাধা-উপন্যাসের লক্ষ, তেমনি যাত্রাপালা ও তার রূপায়ণে নিবিষ্ট শিল্পীরাও আমাদের প্রাচীন (এবং আধুনিক) সংস্কৃতির ইতিহাসের বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে 'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাসের বিষয়। খুবই দক্ষতা এবং অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে যাত্রার সংলাপ, নাট্যগুণ, কাব্যগুণ, দৃশ্যবিন্যাসের দক্ষতা, চরিত্রের সূক্ষ্ম পার্থক্য এবং অভিনয়ের মাধ্যমে শিল্পীদের প্রাধান্যলাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর লক্ষ করে গেছেন। নটনটীদের ঈর্ষা, নেশা, প্রতিযোগিতা, মান-অভিমান, মর্যাদার দাবি ও অন্যায় প্রত্যাশায় মঞ্জরী অপেরার চরিত্রকাহিনী এক অদ্ভুত প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু যাত্রার অভিনয় করতে করতে কাহিনীর চরিত্রগুলির আত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলি নটনটীদের মনে গেঁথে যায় তা সাজঘরের বাইরে এসেও তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে কাজ করে। অভিনয় ব্যাপারটাই একই সঙ্গে নিরপেক্ষ -সাপেক্ষতার অদ্ভুত মিশ্রণ। শঙ্খচূড় -বেশী কৃষ্ণের প্রতি তুলসীর তীব্র ভর্ৎসনায় মঞ্জরী নিজেরই অন্তর্দাহের প্রকাশ করে ফেলেছে। আবার মোহিনীমায়রূপিনী অলকার অসংস্মৃত নৃত্য দর্শকদের ছাড়িয়ে প্রবীর-রূপী গোরাবাবুর মনে যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে তা বুঝে মঞ্জরী সেই অভিনয় করে গোরাবাবুকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে অলকার মতোই তার মোহসৃষ্টির ক্ষমতা। এইভাবেই পৌরাণিক চরিত্র-সম্পর্কের সমান্তরালে নটনটীদের বাস্তব সম্পর্কের টানাপোড়েনের আশ্চর্য ছবি ফুটেছে লেখকের হাতে অভিনয়ের মাধ্যমে একইভাবে যখন রীতুবাবু ও মঞ্জরীর পারস্পরিক আকর্ষণ প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন মঞ্জরী নিজেকে ভবিষ্যৎ প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়ে তার অপেরার দলটিকে ভেঙে দেয়। তার আদর্শবাদ ও পাতিব্রত্যের কাছে অপেরা-র স্থায়িত্ব গৌণ হয়ে যায়। এইভাবে সমাজের অপাংক্তেয় প্রতিভাধর অসংযত কিছু মানুষের জীবিকা ও হৃদয়াবেগের পারস্পরিক সম্পর্কের মর্মস্পর্শী ছবি এঁকে তারাশঙ্কর নতুন একটি বিষয়কে কথাসাহিত্য মর্যাদা দিয়েছেন।

(৫)

এতক্ষণ পর্যন্ত যে উপন্যাসগুলির আলোচনা করেছি তাতে একটা কথা হয়তো অস্পষ্টভাবে হলেও রয়ে গেছে যে, সঙ্গে সঙ্গে তারাশঙ্করের বেশ কিছু উপন্যাসে দ্রুত মূল্যবোধ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তিবিচারের দ্বন্দ্ব প্রবলতর হয়েছে এবং প্রধান চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে জীবনজিজ্ঞাসার সূত্রে আত্মজিজ্ঞাসা বেড়ে গেছে। যে অর্থে যে-কোনো উপন্যাসই ঔপন্যাসিকের আত্মজীবনী সেই অর্থেই তারাশঙ্কর তাঁর এই সব উপন্যাসে বিভিন্ন

আদর্শ, বিশ্বাস, সংস্কার ও আবেগের সংঘর্ষ এনে নিজের সত্যানুভবকে যাচাই করার চেষ্টা বার বার করেছেন। কালান্তর, বিচারক, সপ্তপদী, রাধা (ঐতিহাসিক পটভূমি হলেও), উত্তরায়ণ, মহাশ্বেতা, যোগভ্রষ্ট,— সর্বত্রই দেখা যাবে, মানুষের আদর্শ বা বিশ্বাস (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ধর্মবিশ্বাস) বিচিত্র বিরুদ্ধও প্রতিস্পর্ধী পরিবেশে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। এক হিসেবে এই জাতীয় নৈতিক পরীক্ষা তারাশঙ্করের দুর্বলতম রচনাকেও খানিকটা Weightage দিয়েছে।

এই নৈতিক পরীক্ষার সূত্রেই তারাশঙ্করের একেবারে শেষ পর্বের সহজকাব্যিক প্রসারের উপন্যাস 'কীর্তিহাটের কড়চা' (শেষখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৩৮৫) বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বোধহয় তারাশঙ্করের শেষবয়সের দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝবার পক্ষেও এই উপন্যাসটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একটি বংশধারাকে অবলম্বন করে তারাশঙ্কর একটি যুগকে ধরেছেন বিশাল হাতে। উপন্যাসটির পটভূমি দেড়শো বছরের ঘটনাবহুল পরিবর্তনশীল কাল। এই গতিশীল প্রেক্ষাপটে দেখি, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের খাস গোমস্তা কুড়ারাম ভট্টাচার্য শেষ জীবনে জমিদারি কিনে উনিশ শতকের সূচনায় রায় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দশ বছরের ছেলে সোমেশ্বরের নামে সেই জমিদারি কেনা হয়। সোমেশ্বর থেকেই 'ভট্টাচার্য' উপাধি উঠে গিয়ে 'রায়' হল। পরে সোমেশ্বর বিশাল জমিদারি কিনেছিলেন। সোমেশ্বরের পর বীরেশ্বর। তারপর রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের তিন ছেলে। বড়ছেলে দেবেশ্বর রায়। তাঁর দুটি ছেলে। যোগেশ্বর ও যোগেন্দ্বর। যোগেশ্বরের একমাত্র সন্তান সুরেশ্বর আর্টিস্ট। তিনিই কীর্তিহাটের শেষ জমিদার। তাঁর আমলেই স্বাধীনতার পরে জমিদারি প্রথা উঠে গেল। আর্টিস্ট হিসেবে সুরেশ্বর সোমেশ্বর থেকে শুরু করে তাঁর সমকাল পর্যন্ত নানা ছবি এঁকেছেন। গোটা কীর্তিহাটেরই রেখাচিত্রশিল্পী তিনি। সেই রেখাচিত্র ধরেই তিনি স্মৃতিচারণ করে চলেছেন সাতপুরুষের। কথক সুরেশ্বর, তাঁরই এককালের প্রেমিকা সুলতা। রায়বংশের রেখাচিত্রশিল্পী আঠারো বছর বাদে পেয়ে রায়বংশের কথাশিল্পী হয়ে উঠেছেন। এক বিচিত্র স্বাধিকার-প্রমত্ত জমিদার বংশের কীর্তিকাহিনী বলে জমিদারি উচ্ছেদের মুহূর্তে তিনি জবানবন্দি করে নিজের বংশগত আভিজাত্য, প্রমত্ততা ও পাপের দেনা শোধ করছেন সুলতার সামনে। উপন্যাসের প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের খানিকটা সুলতার স্মৃতিচারণেই বলা হয়েছে। সে বর্ণনায় সুরেশ্বরের সঙ্গে তার পরিচয়ের ইতিহাস এসেছে। সেই সঙ্গে সুরেশ্বরের পূর্বপুরুষের কিছু কিছু নাটকীয় অংশও এসেছে যা সুরেশ্বরের সঙ্গে পরিচয়সূত্রেই পাওয়া। তারপর শিল্পী পানাসক্ত, কল্পনাবিলাসী, রায়বাড়ির পূর্বপুরুষদের বিচিত্র ভালোমন্দের উত্তরাধিকারী, পূর্বপুরুষের রোমাঞ্চকর নাটকীয় ইতিহাসের উপাদান - সংগ্রাহক সুরেশ্বর বিচিত্র এক মোহগ্রস্ত মানুষের মতো স্বীকারোক্তি শুরু করেছেন।

স্বীকারোক্তি শুধু নিজের নয়, পূর্বপুরুষদের সব রকম ভালোমন্দেরও। সুরেশ্বর এনিক থেকে খুবই আধুনিক মানুষ। শুধু একালের মানুষ বলে নয়, একই সঙ্গে জমিদারি রক্তের ডাক যেমন অনুভব করে, তেমনি এই অভিসপ্ত সম্প্রদায়ের অবসান ও সমাজবাদের অবসানও সে কামনা করে। এই বিপরীতমুখী দুটি টানের তীব্র জ্বালায় সে ভোগে। পূর্বপুরুষের অর্জিত পাপ যেমন তাকে নেশা ধরায়, কামনা ও ভোগবিলাসের দিকে টানে, তেমনি এই শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলনের আত্মসংযম ও আত্মত্যাগও তাকে উদ্বুদ্ধ করে। এবং এই দ্বন্দ্বে সুরেশ্বর শেষপর্যন্ত কুইনী-কে বিয়ে করে জমিদারি আভিজাত্য ভেঙে বেরিয়ে আসে। রায়বংশে গোয়ান রক্ত মিশে যায়। পুত্র 'মানবেশ্বর' অর্থাৎ' মানবতা' বা 'মানব' কি সেই অর্থেই সার্থকনামা হয়?

এইভাবে একজন আত্মসচেতন সংবেদনশীল মানুষের দৃষ্টিতে জমিদারি আভিজাত্যের বিচ্ছিন্নতা ও ধর্মীয় আচরণের সংকীর্ণতার অবসান দেখানো হয়েছে। যে বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতাকে সুরেশ্বর নিজে ভেঙে বেরিয়ে এলেন উদার মানবিক ভূমিতে, তার কারণটা কিন্তু পুরোপুরি সুরেশ্বরের আধুনিক উদার মানবিক বোধ নয়, কুইনীর প্রতি তার রক্তগত টানও বটে। এ আকর্ষণ তিনি বংশগত ভাবেই পেয়েছেন, পূর্বপুরুষের অবৈধ ভালোবাসার সূত্রেই এই কুইনীর মধ্যে সুরেশ্বর জমিদারি রক্তের টান অনুভব করেছেন। সুলতাকে তিনি আত্মবিশ্লেষণের সূত্রে বলেছেন, 'কুইনীর প্রতি এই আকর্ষণ যে কেন এত প্রমত্ত, তা আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি। ঠিক পুরো বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকু বলতে পারি, তার রূপের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যা আমার পুরুষচিত্তকে প্রমত্ত করে। আর একটা কথা .... বার বার মনে হত ও আমাদের, ও আমাদের আমাদের সম্পর্ক আছে ওর সঙ্গে। মনে পড়ত অঞ্জনাকে, রত্নেশ্বর রায়-কে। মনে পড়ত দেবেশ্বর রায় এবং ভায়োলেটকে।' অর্থাৎ একই সঙ্গে রূপ মোহ ও জমিদারি রক্তের টান সুরেশ্বরকে টেনে নিয়ে গেছে কুইনীর কাছে এবং হিন্দু-ক্রিশ্চানের বেড়া ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং নিছক মানবিক মহত্ত্বে সুরেশ্বর যে জমিদারি আভিজাত্য ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন তা নয়, বরং কুইনীর সঙ্গে জমিদারিগত-বংশগণগত আত্মিক টানই সুরেশ্বরের জৈবিক কামনার সঙ্গে মিশে ছিল। হয়তো প্রাথমিক আকর্ষণ হিসেবে জৈবিক ও বংশগত শ্রেণী-চেতনা কাজ করেছে ঠিকই, কিন্তু পরে এই কামনার সঙ্গে মিশেছে প্রেমের অবিচ্ছেদ্য অনুভব। তাহলে সুরেশ্বরের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের তফাত কোথায়? কোথায় তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পর্শ করে আছেন? বিধর্মীদের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের প্রেম ছিল অবৈধ। সুরেশ্বর সেই প্রেমকে কিন্তু আইনগত মর্যাদা দিয়েছেন। এইখানেই তিনি আধুনিক। আরও আধুনিক এই কারণে যে, তাঁর আত্মত্যাগ, রায়বংশের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ও স্বাধীন বিবাহিত জীবনযাপনের চেষ্টা, সম্পত্তিকে জনসমাজে ও জনকল্যাণে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা, স্ত্রীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের কষ্ট, স্ত্রীর স্বাধীন জীবিকাগ্রহণ, সন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে স্ত্রীর কাছে রেখে মানুষ করার চেষ্টা — সব কিছুর ভেতর দিয়ে সুরেশ্বর স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন এক আত্মত্যাগী সহনশীল আধুনিক মানুষেরই মহৎ প্রেমকে মর্যাদা দিয়েছেন — নিছক মানবিকতাই যে প্রেমের অন্য নাম।

এই তপস্যালব্ধ মানবিকতার বলেই অসুস্থ সুরেশ্বর ক্রিশ্চান স্ত্রী কুইনীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে তাকে মানব সাধনার সহধর্মিনী করে নিতে পারলেন, মৃত্যুর ভেতর দিয়ে নির্বিকল্প সেই মানুষটি 'পরিচিত জনতার সরণী'তে নেমে এলেন। বিশাল জমিদারি বিশালতর জনারণ্যে ছড়িয়ে গেল।

মানুষের কালের যে নতুন যবনিকা উঠবে তারই অব্যর্থ প্রতিনিধি হয়ে এল সুরেশ্বরের সন্তান মানবেশ্বর।

সোমেশ্বর রায়ের জমিদারি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে জমিদার, মহাজন, নায়েব গোমস্তা এবং হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান নানা ভূমিনির্ভর সাধারণ মানুষের পরিচয় আছে এই ক্রনিকল্ বর্ণনায়। শহরের আভিজাত্য ও বিলাসিতা, গ্রামের জমিদারদের শহরবাস ও ইংরিজি শিক্ষার আলো পাবার ইতিহাস, তাঁদের রুচি, আভিজাত্য, উচ্ছৃঙ্খলা ও বীভৎস কদাচার, বাইজি ও পতিতালয়ের নতুন আকর্ষণ, শিল্পায়নের সঙ্গে অবক্ষয়িত জমিদারদের যোগাযোগ, জমিদারদের মধ্যবিত্ত জীবনে অধঃপতন, স্বাধীন জীবিকা, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আত্মত্যাগ ও সংগ্রামী

ঐক্যের পরীক্ষা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং জমিদারি উচ্ছেদ ও সমাজবাদের সূচনা — এই সম্পূর্ণ দেশকালের পটভূমিকাকে তারাশঙ্কর এত প্রসারিত করে ইতিপূর্বে আর ধরেন নি। চৈতালী ঘূর্ণি, মন্বন্তর, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা,-পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কিংবা পদচিহ্ন বা শতাব্দীর মৃত্যু ইত্যাদি উপন্যাস এবং রায়বাড়ি, জলসাঘর, অগ্রদাণী, তিনপুণ্য, সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার ইত্যাদি গল্প থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা এবং লোভ-লালসা ও জৈবিক বৃত্তির গল্প ও অলৌকিক বিশ্বাসের নানা কাহিনীর মধ্যে তারাশঙ্কর তাঁর শিল্পচেতনাকে ছড়িয়ে রেখেছেন তার সম্পূর্ণ যোগফল বোধহয় এই কীর্তিহাটের কড়চা।

যোগফল তো বটেই, কারণ এই উপন্যাসে জমিদারবাবুরা তো বটেই , হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান প্রজারা , অন্দরমহলের বিচিত্র মেয়েরা — অন্নপূর্ণা যাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, কলকাতার বিচিত্র মানুষ এবং দেড়শো বছরের কলকাতার নতুন সমাজবিন্যাস। এমনকি কীর্তিহাটের কাহিনীর শ্রোতা সুলতা পর্যন্ত অনেক ব্যক্তিত্বকে আকস্মিকভাবে এবং কখনো কখনো প্রায় একই চারিত্রিক স্বভাবে তারাশঙ্করের অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও দেখা গেছে। বোধহয় বিলেতের পরিবেশটা নতুন । ওখানকার কীর্তিহাট-শাখার হারু রায় এবং চন্দ্রিকা মালহোত্রার মতো চরিত্র তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাস-গল্পে বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। ওই দুটি চরিত্র এক্ষেত্রে নতুন ডাইমেনশন এনেছে। আরও নতুন ডাইমেনশন এনেছে এই দেড়শো বছরের কিছু বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্রের সক্রিয় ভূমিকা। রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দকে অনেক উপন্যাসে পেয়েছি। কিন্তু কর্ণওয়ালিস থেকে শুরু করে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কাজি নজরুল, তিরিশের দশকের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আড্ডার বিখ্যাত মনস্বীরা, প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের গান্ধী প্রমুখ সব কজন উল্লেখযোগ্য নায়ক, আগষ্ট আন্দোলন এবং বিশেষে করে মেদিনীপুরের কীর্তিহাটকে কেন্দ্র করে তার প্রতিক্রিয়া, স্বাধীনতা - উত্তর ভারতের রাজনৈতিক নেতারা এবং পশ্চিমবঙ্গের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এবং মন্ত্রী বিমল কুমার সিংহ পর্যন্ত অনায়াসে এই উপন্যাসভূমিতে বিচরণ করে গেছেন। জমিদারির ক্ষতিপূরণের টাকা নতুন সমাজবাদী সুরেশ্বর মৃত্যুর আগে বিনোবা ভাবে-কে দিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন। এবং সেই সূত্রে এই ঐতিহাসিক বাস্তব চরিত্রটির সঙ্গে কুইনী দেখাও করেছে।

অন্যান্য উপন্যাসে দেখেছি তারাশঙ্কর বরাবরই কালের সঙ্গে পা ফেলে চলেন। কাল-কালান্তরের যোগসূত্র দেখান, কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি অনেকবেশি দৃঢ়ভাবে পা ফেলার চেষ্টা করেছেন। আগেকার উপন্যাসগুলিকে যদি বলি 'লিটারারি এপিক' তাহলে 'কীর্তিহাটের কড়চা'-কে বলব এপিক অব গ্রোথ' । অবশ্য এক মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু সাহিত্যিক জীবনের নানা পর্বে নানা অভিজ্ঞতার ফসল-কে তারাশঙ্কর যেমন ছোটবড় মাঝারি গল্প-উপন্যাসের গুচ্ছে বেঁধেছিলেন তেমনি এখানে সব অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। কংসাবতীর জল ইংলিশ চ্যানেল ছুঁয়ে ফের ফিরে এসেছে কীর্তিহাটে।

ইতিমধ্যে সুরেশ্বরের 'নীলরক্তে' গেরুয়া রং ধরেছে। সাত পুরুষের খোলস ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করেছেন তিনি। হাড়ে-মজ্জায় একেবারেই নতুন মানুষ হওয়া যায় না। সেই জন্যেই সুলতার মনে হয়েছিল, সুরেশ্বরের মৃত্যুতে জমিদারবংশের শেষ অ্যারিস্টোক্র্যাট মানুষটি বিদায় নিলেন। অর্থাৎ নতুন মানুষ না হন, এক মানবসন্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন

সুরেশ্বর। স্ত্রীকে মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, সোস্যালিজ্‌ম্ কম্যুনিজ্‌ম বুঝি না কচইনী। "সব ভূমি গোপালী কি' বললে বুঝতে পারি। মন প্রসন্ন হয়।" তার অর্থই হল, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমর্থনের কাজের চেয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ বেশি হয় ভেবেই ভূদানের প্রতি সুরেশ্বর ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু এও তো ঠিক যে, ব্যক্তি-উদ্যোগে সোস্যালিজ্‌ম্ - এর সূচনা হতে পারে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়া এ চেষ্টা স্থায়ী কোনো কর্মযজ্ঞের সূচনা করে না। ব্যক্তি উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না। আর তার একটা সীমাও আছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, দ্রুত কোনো কার্যকারিতার জন্যেই বিনোবাজী-কে শেষ আশ্রয় করেছেন সুরেশ্বর। কারণ, বিনোবাই তখন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সব চেয়ে উদ্যোগী সমাজবাদী। পরে 'গ্রামের চিঠি-র ৫৯ সংখ্যক চিঠিতে তারাশঙ্করকে লিখতে দেখি : আমি নিজে এককালে বিনোবাজীর ভূদানের কল্পনায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আজ দেখে শুনে মোহ কেটেছে।' বোঝা যায়, সুরেশ্বরের ওই উদ্যোগে সুরেশ্বরের স্রষ্টার আর বিশ্বাস ছিল না। তবু এক বিশেষ সময় সুরেশ্বর তাঁর পুরুষানুক্রমিক খোলসটি ভাঙতে ওই আদর্শে যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাতে উপন্যাসের শিল্পধর্মে কোনো ক্ষতি হয় নি। বাংলা উপন্যাসের জগতে এক বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে গোরা-র মোহমুক্তি নতুন এক মানবসন্ধির সূচনা করেছিল। কীর্তিহাটের সুরেশ্বর ওই রকমই এক বিশাল জটিল প্রেক্ষাপটে আর এক মানবসন্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সমস্ত মোহ-আবরণ খুলতে খুলতে।

গোরার মতোই এই মোহ আবরণ-ভাঙার চেহারাটি খুবই আত্মনিগ্রহময়। অবশ্য এই আত্মনিগ্রহের পর্বে সুরেশ্বর সমাজের মধ্যে নিজেকে খুব বেশি ছড়িয়ে দিতে পারেন নি। তারাশঙ্কর সে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিতও দিয়েছেন উপন্যাসের আদিপর্বেই : 'হয়তো গভীর অন্তস্থলে আরও কিছু আছে। নিজের বংশের ধারাকে সমর্থনও বটে আবার প্রতি বিদ্বেষও বটে।' এবং সারা উপন্যাসেই সুলতাকে রায়বংশের জবানবন্দি দিতে দিতে তিনি আত্মশুদ্ধি ঘটিয়েছেন— নির্লিপ্ততার এক নৈতিক সমৃদ্ধিতে তিনি পৌঁছেছেন - যে সমৃদ্ধি তারাশঙ্করের এই শিথিল, অবিন্যস্ত, পুনরাবৃত্তিময়, অতিনাটকীয়, দীর্ঘস্মৃতিসূত্রজালবদ্ধ ও উচ্ছ্বসিত আদি-মহাকাব্যিক বিশাল কাহিনীর প্রার্থিত ফলশ্রুতি।

ক্রোড়পত্র-১

নজরুল

নজরুল ইসলাম

বুদ্ধদেব বসু

১

আমার বাল্যকাল কেটেছে অজ মফস্বলে। দেশের বৃহৎ বিচিত্র জীবনের বহুমুখী স্রোত সেখানে পৌঁছতো না — যদি বা কখনো পৌঁছতো, সে অনেক দেরি ক'রে এবং অনেক ক্ষীণ হ'য়ে। অনেকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হ'য়ে বালক-মনের প্রবল কৌতূহল যথাসম্ভব মেটাবার চেষ্টা করতুম; ওরই ভিতর দিয়ে রাজধানীর প্রাণকল্লোলের সঙ্গে ছিলো আমার পরিচয়।

ক্বচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে, যার ধাক্কায় স্তিমিততম মফস্বলও থরথর ক'রে কেঁপে জেগে ওঠে। গান্ধিজির প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা। অবাক হ'য়ে দেখলুম নিঃস্ব নোয়াখালিতেও প্রাণের জোয়ার। দেশসুদ্ধ লোক যেন সব-খোয়াবার মন্ত্রে ক্ষেপে গেলো।

সে-সময়ে আমি যদি দশ বছরের বালক না-হ'য়ে বিশ বছরের যুবা হতুম, তাহ'লে নিশ্চয়ই কলেজরূপী সরকারি গোলামখানার ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে ভাগ্যের ভেলাকে ভাসিয়ে দিতুম বিপর্যয়ের অস্থির আবর্তে। কিন্তু আমি এতই ছোটো ছিলুম যে পিকেটিং ক'রে জেলে যাবার পর্যন্ত উপায় ছিলো না আমার। যা-হোককিছু একটা ক'রে উত্তেজনার ধারটাকে ক্ষইয়ে দেবার কোনো পথ আমার খোলা ছিলো না ব'লেই মনে-মনে এই নেশার উচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ ডুবে ছিলুম।

ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময় নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে এলো। 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে — মনে হ'লো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগে অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী। একজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে পরিচয় হ'লো, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন, এবং তাঁর কাছে — কী ভাগ্য! কী বিস্ময়! — একখানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেকগুলি কবিতা। নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা-কণ্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে ব'সে সেই খাতাখানা আদ্যোপান্ত প'ড়ে ফেললুম। তার মধ্যে ছিলো 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ, সত্যের উদ্বোধন', ছিলো 'কামাল পাশা', আর কী-কী ছিলো মনে নেই। সে-সব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগলো, তাদের দুরন্ত অভিনবত্ব আমাদের প্রশংসা করবার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলে। তাঁর নিখাদ-নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।

নূতনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হ'লেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্য-কোনো কবি বিখ্যাত হননি।

কে এই নজরুল ইসলাম? তাঁর সম্বন্ধে একটি মাত্র খবর পাওয়া গেলো যে তিনি যুদ্ধ-প্রত্যাগত। প্রথম-প্রথম তাঁর নামের আগে 'হাবিলদার' এবং 'কাজি' এই জোড়া খেতাব বসানো হ'তো — তার মধ্যে প্রথমটা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝ'রে পড়ে, দ্বিতীয়টা বহুদিন পর্যন্ত ঝুলে

ছিলো। সামরিক বেশে তাঁর ছবি বেরলো মাসিকপত্রে — ঠিক মনে নেই এটাই সেই ছবি কিনা যাতে কবি একটা কামানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে — তরুণ বলিষ্ঠ চেহারা, ঠোঁটের উপর পাৎলা গোঁফের রেখা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। যে-সব ভাগ্যবান কবিকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, তাদের মুখে কালক্রমে আরো শুনলুম যে তিনি বেপরোয়া ফূর্তিবাজ দিলখোলা ভালোমানুষ, এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দুকন্যা।

পটপরিবর্তন ক'রে আসা যাক দশ বছর পরে, ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, 'কল্লোল' - প্রগতি'র যুগে। নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলছেন। 'কল্লোলে' গজল-গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে — তার পরে ব'য়ে চলেছে গানের অফুরন্ত স্রোত — যেন তা কখনো ক্লান্ত হবে না, ক্ষান্ত হবে না। সেবারে ঢাকায় সুধীজনের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, জনসাধারণ তাঁর গান শুনে আত্মহারা, কেবল কতিপয় দুর্জন দুষমনের পক্ষে তাঁর প্রতিপত্তি এত দুঃসহ হ'লো যে তারা শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর গায়ের জোরের গুণ্ডামি ক'রে ঢাকার ইতিহাসে একসঙ্গে অনেকটা কালি ঢেলে দিলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে একটি মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের প্রগতির আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ-কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধ'রে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, বড়ো-বড়ো লাল-ছিটে-লাগা মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা-লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের ফূর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবি এবং তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর — দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট ক'রে চোখে প'ড়ে, তাই।' ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হার্মোনিয়ম, চা, পান, গান, গল্প, হাসি। কখন আড্ডা ভাঙলো মনে নেই — নজরুল যে-ঘরে ঢুকতেন সে-ঘরে ঘড়ির দিকে কেউ তাকাতো না। আমাদের প্রগতির আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতি বারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। এমন উদ্দাম প্রাণশক্তি কোনো মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত ক'রে, মনের যত ময়লা, যত খেদ, যত গ্লানি সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার। জোর ক'রে একবার ধ'রে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না — বড়ো-বড়ো জরুরি এনগেজমেন্ট ভেসে যাবে। ঝোঁকে প'ড়ে, দলে প'ড়ে সবই করতে পারেন। একবার কলকাতায় খেলার মাঠে বুঝি মোহনবাগান জিতেছিলো, না কি এমনি আশ্চর্য কিছু ঘটেছিলো, ফূর্তির ঝোঁকে কল্লোল-দলের চার-পাঁচজন খেলার মাঠ থেকে শেয়ালদা স্টেশনে এবং শেয়ালদা থেকে একেবারে ঢাকায় চ'লে এলেন — নজরুলকেও ধ'রে নিয়ে এলেন সঙ্গে। হয়তো দু'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই এক মাস কাটিয়ে এলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র আদর্শ নয়, কিন্তু এ-চরিত্রে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সেকালে বোহিমিয়ানের চাল-চলন অনেকেই রপ্ত করেছিলেন — মনে-মনে তাঁদের হিশেবের খাতায় ভুল ছিলো না — জাত-বোহিমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর

দায়িত্বহীনতা। সেই যে গোলাম মুস্তফা একবার ছড়া কেটেছিলেন —

কাজি নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিন রাত,
প্রাণে ফূর্তির ঢেউ বয়,
ধরায় পর তার কেউ নয়।

এর প্রতিটি কথা আক্ষরিক সত্য।

কথাবার্তার আসরে তিনি যে খুব দীপ্যমান, তা নয়। নিজের আনন্দেই তিনি মত্ত, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনবার সময় কই। নিজে রসিকতা ক'রে নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি, হাসির চেয়েও বেশি তাঁর গান। একটি হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা-পান দিয়ে বসিয়ে দিলে একসঙ্গে পাঁচ-সাত ঘণ্টা গান গাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। গানে তাঁর আন্না নেই; ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হ'লেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয় তাঁর, ভাঙা-ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু তাঁর গান-গাওয়ার এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস যে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে-সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে — হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে-বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে-গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যে-সব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি-সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়েছিলো। 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী', 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে', 'নিশি ভোর হ'লো জাগিয়া পরান-পিয়া' এ-সব গান ঢাকাতে লিখেছিলেন ব'লে আমার মনে পড়ে। এইমাত্র-শেষ-করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুনি শুনতে-শুনতে আমাদের মনেও নেশা ধ'রে যেতো।

ঠিক মনে পড়ে না কোথায় নজরুলকে প্রথম দেখেছিলাম — ঢাকায় না 'কল্লোল' আপিশে। নিরবচ্ছিন্নভাবে বেশি দিন ধ'রে দেখাশোনা তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই হয়নি — কলকাতায় এসে এখানে-সেখানে মাঝে-মাঝে দেখা হয়েছে, প্রতিবারেই তাঁর প্রাণশক্তির উল্লাস মুগ্ধ করেছে আমাকে। সত্যিই তিনি যেন 'চির শিশু, চির কিশোর।' ইদানিং তাঁর মুখে বয়সের ছাপ দেখে ব্যথিত হচ্ছিলাম — এইজন্যে ব্যথিত যে প্রৌঢ় ঋতুর প্রশান্ত সৌন্দর্য সেখানে ফলেনি, তাঁর মুখে যেন ক্লান্তির ছায়া, যেন নিরাশার কালিমা। শেষ বার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো বছর চারেক আগে — সেবার অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা-কেন্দ্রের আমন্ত্রণে আমরা একদল কলকাতা থেকে যাচ্ছিলাম। স্টীমারে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটলো — দেখলাম তাঁর চোখ-মুখ গম্ভীর, হাসির সেই উচ্ছ্বাস আর নেই। কথা প্রসঙ্গে বললেন, I am the greatest yogi in India.' যোগসাধনা আরম্ভ ক'রে তাঁর গায়ের রং তপ্ত কাঞ্চনের মতো হয়েছিলো, একবার শ্রীঅরবিন্দ সূক্ষ্ম দেহে তাঁর কাছে এসে আধ ঘণ্টা ব'সে ছিলেন — এমনি নানা কথা বললেন। কেমন-কেমন লাগলো। এর কিছুকাল পরে শুনলাম, নজরুল মানসিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকের নজরবন্দি হয়েছেন।

তার পরে তাঁকে আর দেখিনি। আর দেখবো কিনা জানি না। প্রার্থনা করি, তিনি রোগমুক্ত হ'য়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন — তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে, তাঁর জীবনে পরিণত বয়সের

শান্ত গভীর সুষমা প্রতিফলিত হোক। আর এখানেই যদি তাঁর সাহিত্যসাধনার সমাপন ঘটে, তাহ'লেও গেলো পঁচিশ বছর ধ'রে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন, সেই তাঁর অজস্র কাব্য ও সঙ্গীত বাঙালির মনে তাঁকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে। আমরা যারা তাঁর সমসাময়িক, আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের প্রীতি, আমাদের কৃতজ্ঞতা মহাকালের খাতায় জমা রাখলুম।

২

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্র দত্ত তার খ্যাতির চরম চূড়ায় অধিষ্ঠিত, তাঁর প্রভাব সে-সময়টায় বোধহয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না তা নয় — কেনই বা না থাকবে — কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি তাঁর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করলে, স্বীকার করলে — তাঁর বই রাজ-রোষ এবং প্রজানুরাগ লাভ ক'রে এডিশনের পর এডিশন কাটতে লাগলো — অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি। এটা কবির পক্ষে বিরল ভাগ্যের কথা; কিন্তু যে-লেখা বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকপ্রিয় হয় তাকে আমরা ঈষৎ সন্দেহের চোখে দেখি, কারণ ইতিহাসে দেখা যায় সে-সব লেখা প্রায়ই টেঁকসই হয় না। নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একই সঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি — তাঁর পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, এ-সময়য় দুর্লভ, কারণ সাধারণত দেখা যায় যে বাজে লেখাই সঙ্গে-সঙ্গে সর্বসাধারণের হাত তালি পায়, ভালো লেখার ভালোত্ব উপলব্ধি করতে সময় লাগে।

নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ-চৈ অত্যন্ত বেশি—এই কারণেই তিনি লোকপ্রিয়। যেখানে তিনি ভালো লিখেছেন, সেখানে হৈ-চৈটাকেই কবিত্ব-মণ্ডিত করেছেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় দেখা যায়, কিপলিঙের মতো তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন। এ-ধরনের কবি হবার বিপদ এই যে জোর আওয়াজ হ'তে থাকলেই মনটা খুশী হয়, সে-আওয়াজ যে অনেক সময় ফাঁকা আওয়াজ সে-খেয়াল একেবারেই থাকে না। নজরুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি — অনেক লেখা তিনি লিখেছেন যাতে শুধু হৈ-চৈ আছে, কবিত্ব নেই। প্রেমের বা প্রকৃতির কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে — একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, অনর্গল অচেতন বাক্যবিন্যাসে ঘোলা। গদ্যলেখক হ'য়ে তিনি জন্মাননি, কিন্তু গদ্য তিনিও লিখেছেন, এবং গদ্যে যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা সবচেয়ে দুঃসহ হ'য়ে প্রকাশ পাবে, সে তো অনিবার্য।

অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ — এবং প্রধান দোষ। প'ড়েই বোঝা যায় যে যা-কিছু তিনি লিখেছেন, হু হু ক'রে লিখেছেন; ভাবতে বুঝতে মাজা-ঘষা করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি। সম্পাদক বন্ধুরা কিছুতেই লেখা আদায় করতে না-পেরে কাগজ কলম আর চা-পান দিয়ে তাঁকে একটা ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছেন — ঘণ্টাখানেক পরে পাওয়া গেছে আস্ত একটি কবিতা। আশ্চর্য ক্ষমতা সন্দেহ নেই, কিন্তু সব সময় এতে কাজ হয় না, আর যখন হয় না তখন ফল হয় খুবই খারাপ। এ ক্ষমতা চমকপ্রদ কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। এ-দিক থেকে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে — সেই

কাঁচা, কড়া, উদ্দাম-শক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা, কাব্যের কলকব্জার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য, শৈথিল্য, সেই রসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্খলন। গোয়টে বায়রন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য : The moment he thinks, he is a child.'

'আমি চির শিশু, চির কিশোর' — এ-কথা বিদ্রূপের বাঁকা হাসির সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে সত্য হয়েছে। পঁচিশ বছর ধ'রে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েন নি, বয়স্ক হন নি, পর-পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রতিভা-প্রদীপে ধীশক্তির শুভ্র শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হ'তে পারেনি কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপলোক থেকে ভাবলোকে উত্তীর্ণ করেনি। প্রেরণার প্রবলতা বিপথগামী হয়েছে আত্মস্থ স্বাধীন সচেতনতার অভাবে; রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্বন্ধে যেমন বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও তেমনি বলা যায় যে তাঁর 'প্রতিভা ছিলো, কিন্তু প্রতিভার গৃহিণীপনা ছিলো না।' যে-সম্পদ নিয়ে জন্মেছিলেন তার পূর্ণ ব্যবহার তাঁর সাহিত্য-কর্মে এখনো হ'লো না; সেখানে দেখতে পাই তাঁর আত্ম-অচেতন মনের অনেক হেলাফেলা, অনেক ফেলা-ছড়া, অনেক ছেলেখেলা।

গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে বেশি ক'রে দিতে পেরেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাঁর গানের। বীর্যব্যঞ্জক গানে — চলতি ভাষায় যাকে স্বদেশি গান বলে — রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই তাঁর স্থান, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী। সাধারণভাবে বলা যায় যে তাঁর গান তাঁর কবিতার চেয়ে বেশি তৃপ্তিকর—গানের ক্ষুদ্র আকারে তাঁর অতিকথনের দোষ প্রশ্রয় পেতে পারেনি—'বুলবুল', 'চোখের চাতকে' কিছু-কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে বেশি বলা হয় না। আরো বেশি গান যে অনিন্দ্য হয় নি, তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রুচির দোষ। কত গান সুন্দর আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর চ'লে এসেছে, কিন্তু শেষ স্তবকে কোনো-একটা অমার্জিত শব্দ-প্রয়োগে সমস্ত জিনিশটিই গেছে নষ্ট হয়ে। তাঁর প্রেমের গান সরস, কমনীয়, চিত্র-বহুল; কিন্তু তার রস আমাদের মনের মধ্যে ঘনীভূত হ'তে-হ'তে হঠাৎ কোনো স্থূল স্পর্শ এসে প্রায়ই মনকে বিমুখ ক'রে দেয়। গীতরচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিলো — শুধু যদি এই দোষ না থাকতো, শুধু যদি তাঁর রুচি নিখুঁত হ'তো, তাহলে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম। কিন্তু একটি দোষে অনেক গুণ ব্যর্থ হ'লো।

শোনা যায়, নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি — পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এত বেশি গান লেখেননি। কথাটা অসম্ভব নয়— শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির ফরমাশে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন ক'রে যাচ্ছিলেন — প্রেমের গান, কালীর গান, ইসলামি গান, হাসির গান — সব রকম। সে-সব গান বোধহয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয়নি, তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা জানিনে। নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে যেগুলি ভালো সেগুলি সযত্নে বাছাই ক'রে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়—সেখানে আমরা যাঁর দেখা পাবো তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম-কোমল, আবেগপ্রবণ উদ্দীপনাপূর্ণ। সে-কবি শুধুই বীররসের নন, আদিরসের পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা, এমন কি হাস্যরসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ

নয় তাঁর। 'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা 'সর্বহারার' কবি হিশেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানিনে, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়ে দিয়েছেন, সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়। আর কবিতাতেও তাঁর আসন নিঃসংশয়, কেননা কবিতায় তাঁর আছে শক্তি, আছে স্বাচ্ছন্দ্য, আছে সচ্ছলতা, আর এগুলিই কবিতার আদি গুণ।

আমার সুন্দর

নজরুল ইসলাম

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী'-তে, তারপর এই 'নবযুগে' তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল, আর তা এল রুদ্র তেজে, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। বল্‌তে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন সর্বপ্রথম হক্ সাহেবের দৈনিক-পত্র 'নবযুগে'ই কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নেই ; কিন্তু পনের দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, তখন অজস্র অর্থ, যশঃ-সম্মান, অভিনন্দন, ফুল, মালা— বাঙলার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা পেতে লাগলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশন-ব্রত পালন করি রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে, আমাকে জেলের নানারকম শৃংখল-বন্ধন ('লিঙ্ক ফেটার্স', 'বার ফেটার্স' 'ক্রস ফেটার্স' প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব জ্বালা-যন্ত্রণা, অনশন- ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মত নগন্য তরুণ কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেন নি। আজ এই প্রথম মনে হ'ল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার 'সুন্দরের' আশীর্বাদ এসেছিল জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু এ-কথা মনে হয়নি।

তখনো এ-কথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার নয়। এ লেখা আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা-বিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃংখলের কঠিন মালা পরিয়েছিলেন হাতে পায়ে; জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাঙ্গালা দেশ দিয়েছিল ফুলের শৃংখল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধরে বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট-বড় গ্রামে ভ্রমণ ক'রে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে', কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাঙ্গালা দেশকে ভালবাসলাম। মনে হ'ল এই আমার মা। তাঁর শ্যাম স্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা নীলে আমার দেহ-মন প্রাণ শান্ত উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর-রূপে, আমার জননী জন্মভূমি-রূপে।

আমি সেদিনের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীদের আহ্বানে বাঙ্গালা দেশ পরিক্রমণ করেছি; আমি তরুণদের সাথে মিশেছি—বন্ধু ব'লে, আত্মার আত্মীয় মনে ক'রে। তা'রাও আমায় আলিঙ্গন করেছে বন্ধু ব'লে, ভাই ব'লে— কিন্তু কোনোদিন আমার নেতা হবার লোভ হয়নি, আজও সে লোভ হয় না। আমার কেবলই যেন মনে হ'ত, আমি মানুষকে ভালোবাসতে

পেরেছি। জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেন নি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে। বাইরে মোমের মত ছিল সে সুন্দর; মমতার মধু-মাধুরী, রস-সুরভি ভরা ছিল তার অন্তরে। সে আমাকে আত্মার মত জড়িয়ে ধরল। যেখানে যেতাম, সে আমার সাথে যেত। আমার সাথেই সে খেল্‌ত, মান-অভিমান করতো। যে সুর শিখাতাম, সে সুর দু'বার শুনেই সে শিখে নিত। তখন তার তিন বছর আট মাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, বাবা, চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশী বাজিয়ে ডাকছে।' হঠাৎ আমার দেহে মনে কি যেন বিষাদের, বিরহের বেদনার ঢেউ দুলে' উঠ্‌লো। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এল। ভীষণ, বসন্ত রোগে ভূগে' হাস্‌তে হাস্‌তে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে চলে গেল।

আমার সুন্দর পৃথিবীর আলো যেন এক নিমেষে নিভে গেল। আমার আনন্দ, কবিতা, হাসি,গান যেন কোথায় পালিয়ে গেল, আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক-সুন্দর!

এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগল—কোন্ নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু সুন্দরকে কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হয়ে আমার সর্ব অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। চারিদিকে কেবল ধ্বনি উঠতে লাগল, 'সংহার কর! ধ্বংস কর! বিনাশ কর!' কিন্তু শক্তি কোথায় পাই? কোথায়, কোন্ পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের, সংহার-সুন্দরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম! কোথা হতে একজন সাথী এসে বললেন — 'ধ্যান কর, দেখতে পাবে।' আমি বললাম 'ধ্যান কি?' তিন বললেন, ' একমাত্র তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।' এই প্রথম এলেন আমার ধ্যান-সুন্দর। মাঝে মাঝে ভালো লাগত, মাঝে মাঝে লাগত না। মাঝে মাঝে ভ্রান্তি, মায়া আমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগলো। তা'রা বলল, ' আমরা তোমার প্রলয়-সুন্দরের প্রলয়-শক্তি; আমাদের সাথে পথ চল, তাহ'লে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে— তাহ'লে আমাদের শক্তিকে সংহার করতে পারবে।' আমার যে সহজ সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, 'যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রসমাধুরী ছিল, এদের সাথে পথ চলে' যেন সব শুকিয়ে গেল।

আমি আমার প্রলয়-সুন্দর কে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম, 'পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও!' কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, 'কোরান পড়, বেদান্ত পড়; ওতে যা লেখা আছে, তা পড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে — আমারও উর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।' আমি নমস্কার ক'রে বললাম, 'তুমিই কি আমার কবিতায়, লেখায় বিদ্রোহ হয়ে বিপ্লব-বাণী হয়ে আমার কল্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে'? তিনি আমায় বললেন ' হ্যাঁ, আমি তোমারই পূর্ব-চেতনা, প্রি-কন্‌স্যাস্‌নেস্।' ইংরেজীতে বললেন, বোধ হয়, আমি যদি পূর্ব-চেতনার অর্থ না বুঝি তাই। আমি বললাম, 'আবার তোমার সাথে দেখা হবে?' তিনি বললেন 'আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি; আমি যে তোমার বন্ধু!' তিনি চলে গেলেন। সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেল;

কিন্তু শিরায় শিরায় অণু-পরমাণুতে সেই স্বপ্নের আনন্দ-অমৃতের শিহরন সর্ব- অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুষ্পমালার মত হয়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম, বেদান্ত, কোরান। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোন বজ্রনাদে ও তড়িৎ-লেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরো, আরো উর্ধ্বে যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণ-সুন্দর জ্যোতিঃ। এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতিঃ-সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।

সহসা যেন কোন্ করাল ভয়ঙ্কর শক্তি আমায় নীচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, 'তোমার মাতৃঋণ — তোমার স্বদেশের ঋণ শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?' আমি বললাম 'সাবধান ! আমার মাঝে আমার প্রলয়-সুন্দর আছেন।' সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি, প্রবল-বেগে নিম্নপানে টানতে লাগল। বলল, 'সেই প্রলয়-সুন্দর তোমার মত অজ্ঞানোন্মাদ নন; তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ মানব রূপী তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণ শোধ না ক'রে তুমি যেতে পারবে না।' আমি বললাম 'তুমিই কি কোরানে লিখিত অভিশপ্ত-শক্তি শয়তান!' সে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম। কোরানে কি পড় নাই, আমার ঋণ শোধ না ক'রে তুমি স্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাঁকে দেখতে পাবে না, আমার বাধাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না।' অনুভব করতে লাগলাম, আমার প্রলয়-সুন্দর আর যেন সাহায্য করছেন না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মত প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন। আমি বিদ্রোহ ক'রে এ বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সে ভয়ঙ্কর শক্তি পৃথিবীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগলেন। আমার সহধর্মিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্দ্ধ পঙ্গু ক'রে, শয্যাশায়ী ক'রে দিলেন। অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ ঋণ-দেনার রজ্জুবন্ধন ক'রে প্রহার করতে লাগলেন।

আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধরে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন। আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালোবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম। আমার সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল। আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙ্গলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে' দেখলাম; দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হয়ে গেছেন; তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৈত্য-দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। আমি উচৈঃস্বরে চীৎকার ক'রে বললাম, 'আমি ব্রহ্ম চাইনা, আল্লাহ্ চাই না, ভগবান চাই না। এইসব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন। আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী-মাতার ঋণ আছে। আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার ক'রে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।'

ভয়ঙ্কর শক্তি আনন্দে হেসে উঠলো। আমি বললাম, 'এ তোমার অভিনয়!' সে বলল, 'এই আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি ক'রে হাসলাম, অভিনয় করিনি।' চেয়ে দেখি, আমার পানে চেয়ে' পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝরে পড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে বুকে তুলে বললাম, 'কেন

তুমি ঝরলে?' ফুল বললে, 'আমার মা লতাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার রূপ-রস-সুরভি মধুকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি যে এই পৃথিবীর সুন্দর মানুষ, তোমার মাঝে আমার সুন্দর আছেন, সেই সুন্দরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে পড়লাম।' ফুল বলল, আমার সুন্দরকে পেয়েছি, আমার এই রূপ-রস-মধু-সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হয়ে থাকব।' এই আমি প্রথম পুষ্পিত সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকাল সন্ধার অরুণ কিরণ, ঘনশ্যাম-সুন্দর বনানী, তরঙ্গ-হিল্লোলিত ঝর্ণা-তটিনী, কূলহারা নীল-ঘন সাগর, দশদিক-বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মত সখার মত কথা কইল। আমায় 'আমার সুন্দর' ব'লে ডাকল।

সহসা এল ঊর্ধ্ব-গগনে বৈশাখী ঝড়, প্রগাঢ় নীল কৃষ্ণ মেঘ-মালাকে জড়িয়ে। ঘন ঘন গম্ভীর ডমরু-ধ্বনিতে, বহ্নি-বর্ণা দামিনী নাগিনীর ত্বরিত চঞ্চল সঞ্চরণে আমার বাহিরে অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হয়ে, সুর হয়ে আবির্ভূতা হ'ল — ' এল রে প্রলয়ঙ্কর-সুন্দর বৈশাখী ঝড় মেঘ-মালা জড়ায়ে!' আমি সজল ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলাম, 'তুমি কে— কে ?' মধুর, সহজ কণ্ঠে উত্তর এল, 'তোমার প্রলয়-সুন্দর বন্ধু।'

আমি তখন বললাম,'তুমি তো আমায় ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিলে, আবার কি জন্যে এলে?' সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ' তুমি স্রষ্টাকে সংহার ক'রে, তোমার মাকে সংহার করতে, মাতৃহত্যা করতে চেয়েছিলে, আত্মসংহার করতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমার দুধারী তলোয়ার কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে, তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ — সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে , আকাশে, বাতাসে, রস-ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীরণে, তোমার সৃষ্টি-সুন্দরকে প্রকাশ-স্বরূপে দেখেছ। তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম, পরম বন্ধুকে পেতে, বিপুল অসহ্য তৃষ্ণা, স্বপ্ন, সাধ, কল্পনা, বাধা-না-মানা বেগ-সহ অসীমের প্রাণে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে ঊর্ধ্বের পানে চলেছিলে; আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির, পরম মুক্তির আনন্দবাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার বন্ধু হয়ে। এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে। তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে; সর্ব অসাম্য, ভেদকে দূর করতে হবে। মানুষ যে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম বিলাস, পরম বিহার ।'

শুনে' আমি অপরূপ আনন্দে মাভৈঃ ধ্বনি ক'রে বললাম, 'তবে দাও বন্ধু আমায় দুধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙ্গা, দাও আমায় অসুর-দৈত্য-সংহারী ত্রিশুল ডমরু-ধ্বনি। দাও আমায় ঝঞ্ঝার জটিল জটা, দাও আমায় বাঙ্গালার সুন্দরবনের বাঘাম্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমায় জটাজুটে শিশুশশীর স্নিগ্ধ হাসি! দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর-দানব-সংহারের শক্তি। দাও আমার কণ্ঠে এই পৃথিবীর বিষ, করো আমায় বিষ-সুন্দর নীলকণ্ঠ। দাও আমায় দামিনী-তড়িতের কণ্ঠমালা। দাও আমার চরণে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছন্দ।'

বন্ধু হেসে বললেন, ' সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই ! আর কিছুদিন দেরী আছে। তুমি

অভিমান ক'রে বিদ্রোহ ক'রে নিজের কি ক্ষতি করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্য-কন্টক-কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত শক্তিহীন ক'রে ফেলেছ। তোমার এই সব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয়-সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মত জড়িয়ে ধরবে, তাঁর না-শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মত ঝরে পড়বে। আমি বললাম 'তথাস্তু!' প্রলয়-সুন্দর বললেন, 'সাধু! সাধু! তথাস্তু!'

দৈনিক 'নবযুগ'
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

নজরুল ইসলাম

তখন আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদী। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনী বলে ফেলেছিলাম। ... এরি মধ্যে একদিন এসিস্ট্যান্ট জেলার এসে খবর দিলেন — আবার কি মশাই, আপনি তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, আপনাকে রবি ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করেছেন!

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আরো দু'একটি কাব্য-বাতিকগ্রস্ত রাজ-কয়েদী। আমার চেয়েও বেশী হেসেছিলেন সেদিন তাঁরা। আনন্দে নয়, যা নয় তাই শুনে। কিন্তু ঐ আজগুবী গল্পও সত্য হয়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যি সত্যিই আমার ললাটে 'অলক্ষণের তিলক-রেখা' এঁকে দিলেন। অলক্ষণের তিলক-রেখাই বটে! কারণ এর পর থেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ রাজবন্দী বন্ধুরাও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যাঁরা এতদিন আমার এক লেখাকে দশবার করে প্রশংসা করেছেন, তাঁরাই পরে সেই লেখার পনের বার নিন্দা করলেন। আমার হয়ে গেল বরে শাপ!

জেলের ভিতর থেকেই শুনতে পেলাম, বাইরেও একটা বিপুল ঈর্ষা-সিন্ধু ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস হ'ল না। বিশেষ করে যখন শুনলাম, আমারি অগ্রজপ্রতিম কোন কবিবন্ধু সেই সিন্ধু-মন্থনের অসুর-পক্ষ লীড্ করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিসীম ভালোবাসার কথা শুধু যে আমরা দু'জনেই জানতাম তা নয়, দেশের সকলেই জানত তাঁর গদ্যে-পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা-গানের ঘটা দেখে।

সত্য-সুন্দরের পূজারী বলে যাঁরা হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বেড়ান, তাঁদের মনও ঈর্ষায় কালো হয়ে ওঠে, শুনলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

এ খবর শুনে চোখের জল আমার চোখেই শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম শুধু আমি— বাইরের এই লাভে অন্তরের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমার। মনের মনে কেঁদে বল্‌লাম, হায় গুরুদেব! কেন আমার এত বড় ক্ষতিটা করলে!

বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন ক'রে ভক্ত তার ইষ্টদেবকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোক কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন।

এমন কি, আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্র-বিদ্বেষী কোন এক জনের মাথার চাঁদিতে আজও অক্ষয় হয়ে লেখা আছে। এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ কথা ফাঁস করে দিলেন। কবি হেসে বললেন— যাক, আমার আর ভয় নেই তাহলে।

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। নিজের লেখা দু'চারটে কবিতা গানও শুনিয়েছি—অবশ্য কবির অনুরোধেই। এবং আমার অতি সৌভাগ্যবশতঃ তার অতি প্রশংসা লাভও করেছি কবির কাছ থেকে। সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কোনদিন এতটুকু প্রাণের দৈন্য বা মন-রাখা ভাল-বলবার চেষ্টা দেখিনি।

সঙ্কোচে দূরে গিয়ে বসলে সস্নেহে কাছে ডেকে বসিয়েছেন। মনে হয়েছে, আমার পূজা সার্থক হ'ল, আমি বর পেয়ে গেলাম।

অনেক দিন তাঁর কাছে না গেলে নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় বসে মন্ত্র গ্রহণের অবসর করে উঠতে পারলাম না। বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল। এই নিয়ে কতদিন তিনি আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন— তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছ— তোমাকে জন-সাধারণ একেবারে খানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে— ইত্যাদি।

আমি দেখেছি, এ গৌরবে আমার মুখ যত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো নাম-করা কবির মুখে কে যেন তত কালি ঢেলে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরাই এম নি করে শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। আজ তিন চার বছর ধরে এই শুভানুধ্যায়ীরা গালি-গালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ্ মিটল না। বাপ রে বাপ! মানুষের গা'ল দেবার ভাষা ও তার এত কস্‌রতও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

ফি শনিবারে চিঠি! এবং তাতে সে কী গাড়োয়ানী রসিকতা, আর মেছো-হাটা থেকে টুকে-আনা গালি! এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমি এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ্!

বাংলায় রেকর্ড হয়ে রইল আমায় দেওয়া এই গালির স্তূপ। কোথায় লাগে ধাপার মাঠ! ফি হপ্তায় মেল (ধাপা-মেল) বোঝাই। কিন্তু এত নিন্দাও সয়েছিল। এতদিন তবু সান্ত্বনা ছিল যে, এ হচ্ছে তন্তুবায়ের বলীবর্দ ক্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। বাবা, তুই নখদন্তহীন নিরামিষাশী কবি, তোর কেন এ ঘোড়ারোগ— এ স্বদেশ-প্রেমের বাই উঠল! কোথাকার তুই হাঁ ক'রে খাবি গুলবদনীর গুলিস্তানে মলয় হাওয়া, দেখবি ফুলের হাই-তোলা, গাইবি 'আয় লো অলি-কুসুম-কলি' গান, — তা না করে দিতে গেলি রাজার পেছনে খোঁচা! গেলি জেলে, টানলি ঘানি, করলি প্রয়োপবেশন, পরলি-শিকল-বেড়ী, ডাণ্ডাবেড়ী, বইগুলোকে একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত, এ কোন্ রকম রসিকতা তোর? কেনই বা এ হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ!

হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে সাহিত্যের বেণু-বনে। এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশী অসুরের কোঁৎকা হয়ে উঠেছে! ছুট ছুট! যত মোলায়েম ক'রেই বেণু-বন বলি না কেম, তাতে ঝড় উঠলে যে তা চিরস্তনই বাঁশ-বনই হয়ে ওঠে, তা কোন্ পাষণ্ড অবিশ্বাস করবে!

বেচারী তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্ত মহারথীর সমাবেশ! বাইরে ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল! ঘন ঘন হাততালি! বলে, 'এই! বাঁশ-বাজি দেখতে যাবি, দৌড়ে আয়।' কিন্তু, শুধুই কি সপ্ত মহারথীর মার! তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ। ধুলো কাদা গোবর মাটি —কোনো রুচির বাছ-বিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে।

মহারথীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আনা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামীতে সাহিত্যের বেণু-বন যে পুকুর-পাড়ের বাঁশবাগান হয়ে উঠল!

পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে! ওদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিক্‌টিকি পুলিশের চেয়েও ক্রুর, অভদ্র। যেন চাক-ভাঙ্গা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।

পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক্ এতদিনে একবার প্রাণ ভ'রে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন ক'রে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব! ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত!

কপাল, কপাল! পালিয়েও পার আছে? হঠাৎ একদিন সপ্ত-রথীর সপ্ত প্রহরণে চকিত হয়ে

উঠলাম। ব্যাপার কি!

জানতে পারলাম, আমার অপরাধ, আমি তরুণ। তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তা'রা আমার লেখার ভক্ত।

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, আজ্ঞে, এতে আমার অপরাধটা কিসের হ'ল?

বহু কণ্ঠের হুঙ্কার উঠলো — ঐটেই তোমার অপরাধ, তুমি তরুণ এবং তরুণেরা তোমায় নিয়ে নাচে।

বললাম, আপাততঃ আপনাদের ভয়ে আজই তো বুড়ো হয়ে যেতে পারছিনে। ওর জন্য দু-দশ বছর মার খেয়েই অপেক্ষা করতে হবে। আর, যারা আমায় নিয়ে নাচে, আপনারাও তাদের নাচিয়ে ছেড়ে দিন। গোল চুকে যাবে। আমায় নিয়ে কেন এত টানাটানি!

আবার নেপথ্যে শোনা গেল, তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠরক্ষী। তোমাকে মারতে পারলেই একে কতল করতে দেরী লাগবে না।

দেখাই যাক। ...

এতদিন আমি উপেক্ষাবশতঃই এ ধোঁয়াবাণের প্রত্যুত্তরে ধোঁওয়া ছাড়িনি—না উননের, না সিগারেটের; ভেবেছিলাম, সস্তাটে সস্তাটে যুদ্ধ, দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু হাতিতে হাতিতে লড়াই হলেও নলখাগড়ার নিস্তার নেই দেখছি। কাজেই, আমাদেরও এবার আত্মরক্ষা করতে হবে। প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়ায় কোন পৌরুষ নেই।

পলিটিক্সের পাঁককে যাঁরা এতদিন ঘৃণা করে এসেছেন, বেণু-বনের বাঁশের প্রতি তাঁদের এই আকস্মিক আসক্তি দেখে আমারই লজ্জা করছে— বাইরের লোক কি বলছে তা না-ই বললাম। এবাঁশ ছোঁড়ারও তারিফ করতে হবে। কোনো বিশেষ একজনের শির লক্ষ্য ক'রে না ছুঁড়ে এঁরা ছুঁড়ছেন একেবারে দল লক্ষ্য ক'রে। কারণ, তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লজ্জা নেই। বীর বটে! এতদিন তাই পরাস্ত মেনেই চুপ ক'রে ছিলাম। কিন্তু ঐ চুপ ক'রে থাকি বলেই ও-পক্ষ মনে করেন, আমরা জিতে গেলাম। তাই এবার মাথা বেছে বেছেই বাঁশ ছোঁড়া হচ্ছে—বাণ নয়। অবশ্য, সে বাঁশে বাঁশীর মত গোটাকতক ফুটো ক'রে সুর ফোটাবার আয়াসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তার খোঁচা আর স্থূলত্বই বলে, ও বাঁশী নয়—বাঁশ।

বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। পালোয়ানী মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা ত বলা দুষ্কর।...

আজকের 'বাঙ্গলার কথা'য় দেখলাম — যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের পক্ষ হয়ে পঞ্চ পাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী কবি-গুরু এই অভিমন্যুবধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি। বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন —এইটেই এ যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে ক'রে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় 'রক্ত'কে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপী-পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠে কেন, বুঝতে পারিনে।

এই আরবী ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ক'রে গেছেন।

আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ্য ক'রে আসছি। সভ্রান্ত হিন্দুবংশের অনেকেই পায়জামা-

শেরওয়ানী-টুপী ব্যবহার করেন, এমন কি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় তখন ওরিয়েন্টাল। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তা'রা হয়ে যায় 'মিঞা সাহেব'। মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিয়োগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুস্কিল— তবু ও নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের আর অন্ত নেই।

আমি তো টুপী পায়জামা শেরওয়ানী দাড়িকে বর্জন করে চলেছি শুধু ঐ 'মিঞা সাহেব' বিদ্রূপের ভয়েই—তবুও নিস্তার নেই!

এইবার থেকে আদালতকে না হয় বিচারালয় বলব, কিন্তু নাজির পেশ্‌কার উকিল মোক্তারকে কী বলব?

কবিগুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালীকে উদ্দেশ ক'রে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে—'উতারো ঘোমটা' তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। ঘোমটা-খোলা শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। 'উতারো ঘোমটা' আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও-জায়গাটায়, তা'ত কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভালো-শোনাবার লোভেই, ঐ একটি ভিন্‌দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পেছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানী বা বল্‌শেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও-দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করচেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু 'খুন' নয় —বাংলার চলতি আরো অনেক আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্য-লক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রী হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে গেছেন।

বাংলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী 'জেওর' পরালে তাঁর জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও 'খুব সুরত'ই দেখায়।

আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানী ঢং-এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তা ছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবি-গুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায়, কালার বক্সে (colour box) এবং তা খুন-করা, খুন-হওয়া ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়, হৃদয়েরও 'খুন -খারাবী' হ'তে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান-পাড়া লেনেই হয় না।

আমার একটা গানে আছে—

'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

এই গানটি সেদিন্ কবি-গুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও-কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে —'উদিবে সে রবি মোদেরি রক্তে রাঙিয়া পুনর্বার'ও করা চল্‌ত। কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত। আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম ন্যাশনাল সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে

'রক্তধারা' লিখবার , সেখানে জোর করে খুনধারা লিখি নাই। তাই বলে রক্ত-খারাবীও লিখি নাই, হয় রক্তারক্তি, না হয় খুন-খারাবী লিখেছি।

কবিগুরু মনে করেন, রক্তের মানেটা আরোও আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে। চলে, কিন্তু তখন ওতে রাগ মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন 'খুন' ফোটে না; তেমনি রক্তও ফোটে না— নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে খুনা-খুনি খেলি না, খুন-সুড়ি হয়ত করি।

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাদের কাছ থেকে টুপি আর আচকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে, ফুল-বনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য-সভায় ভিড় না ক'রে হিন্দু-সভারই মেম্বার হন গিয়ে।

যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নুতন নুতন শব্দ সৃষ্টি ক'রে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর এই নুতন শব্দ-ভীতি দেখে আমরা বিস্মিত হই। মনে হয় তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক-কেহ এবং অনেক-কিছু আছে। আরো মনে হয়, আমার শত্রু সাহিত্যিকগণের অনেক দিনের অনেক মিথ্যা অভিযোগ জমে জমে ওঁর মনকে বিষিয়ে তুলেছে। নৈলে আরবী-ফার্সি শব্দের মোহ ত আমার আজকের নয়; এবং কবি-গুরুর সাথে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই, এতদিন ত কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে।

সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন দেখি কতকগুলো জোনাকিপোকা রবিলোকের বহু নিম্নে থেকেও কবিত্বের আস্ফালন করে। ভক্ত কি শুধু ঐ নোংরা লোকগুলোই, যারা রাত-দিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত সুন্দর মনকে নিরন্তন বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলছে? আর, আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে বলেই হয়ে গেলাম তাঁর শত্রু!

কবিগুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু ওদের প্ররোচনায় আমাদের অহেতুক সন্দেহ পোষণ ক'রে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই।

আমাদের উদ্দেশ ক'রে ওঁর আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়ত আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনে।

কি ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়— লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবি গুরু কোনদিন আমাদের মত সাহিত্যিকদের কুটীরে পদার্পণ করেন নি— হয়ত তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ হ'ত না তাতে—নৈলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবন-যাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন

ক'রে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা ত দূরের কথা, বাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়াতেও লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে ব'সে সর্বদাই মন খুঁত খুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছি! বাইরের দৈন্য অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে।

কবিগুরুর কাছেও শুধু ঐ দীনতার লজ্জাতেই যেতে পারিনে। ভয় হয়, এ লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি দেখে তাঁর দারোয়ানেরাই ঐ সুর-সভায় প্রবেশ করতে দেবে না।

দীন ভক্ত তীর্থ যাত্রা করতে পারল না ব'লে দেবতা যদি অভিশাপ দেন, তা হ'লে এই পোড়া কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া কীই বা বলবার আছে!

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়ত সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত-আপনার এই দারিদ্র্য - যন্ত্রণাকে উপহাস ক'রে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ঐ নির্মমতাটাই সইবে না।

কবিগুরুর চরণে ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন— যদি আমাদের দোষত্রুটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নেব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিৎ বিদ্রূপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে, তাঁকে তাদেরি বাহন হ'তে দেখলে আমাদের মাথা লজ্জায় বেদনায় আপনি হেঁট হয়ে যায়। বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন — রবিলোক — কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহু উর্ধ্বে।

কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র শনিবারের চিঠিওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দেন আর যাই করুন (জানিনা, এ সংবাদ সত্য কিনা), ঐ দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেন নি। অসহায় মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি এত বড় করে দেখেছেন ব'লেই আজ তাঁর আসন রবি-লোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

একদিন কথাশিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত আয় দিয়ে 'পথের কুকুর'দের জন্য একটা মঠ তৈরী ক'রে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘু'রে বেড়ায় যে সব হন্যে কুকুর, তারা আহার ও বাসস্থান পাবে ঐ মঠে — ফ্রি অব্ চার্জ। শরৎচন্দ্র নাকি জানতে পেরেছেন, ঐ সমস্ত পথের কুকুর পূর্বজন্মে সাহিত্যিক ছিল, ম'রে কুকুর হয়েছে। শুনলাম, ঐ মর্মে নাকি উইলও হয়ে গেছে।

ঐ গল্প শুনে আমি বারংবার শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বলেছিলাম, 'শরৎদা সত্যিই একজন মহাপুরুষ। সত্যিই আমরা—সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতই আমরা না খেয়ে এবং কামড়া-কামড়ি ক'রে মরি। তাঁর সত্যিকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার-রূপ দেখতে পেয়েছেন।'

আজ তাই একটি মাত্র প্রার্থনা, যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচব।

আত্মশক্তি। ২য় বর্ষ। ৩৭ সংখ্যা
১৪ই পৌষ ১৩৩৪। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৭

প্রতিভাষণ

নজরুল ইসলাম

(১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, বাংলা ১৩৩৬ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনা-সভার সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের পর জাতির পক্ষ থেকে 'নজরুল-সংবর্ধনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ' কবিকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। সভায় মানপত্রটি পাঠ করেন মি: এস্.ওয়াজেদ আলী। অভিনন্দনের উত্তরে কবি নিম্নলিখিত 'প্রতিভাষণ' দান করেন। কবির প্রত্যুত্তরের পর শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু আবেগোচ্ছল কণ্ঠে কবির স্বদেশী-সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধমূলক কবিতার প্রশংসা ক'রে এক বক্তৃতা দেন।)

বন্ধুগণ! আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে' দিলেন, আমি তা' মাথায় তুলে' নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত মাথার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে' উঠ্‌লো! নদীর জল মঙ্গল-অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি, আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে নদীর জলধারা, সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুন্‌তে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তা ছাড়া, আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্ততঃ আজ্‌কের দিনে যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভ-দৃষ্টির বধূর মত লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুঁনে মেয়েই হয়, অন্ততঃ আজকের দিনে তাকে নাচ্‌তে বল্‌বেন না।

আজ হয়ত সত্যি-সত্যিই আমার অভিনন্দন হয়ে গেল। এ শুধু আপনাদের যাঁরা এ-সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বল্‌ছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বল্‌ছি, যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না এবং হয়ত একটু বেশী ক'রেই স্মরণ করছেন,— ফুল ফোটানোর চেয়ে শুল ফোটানোতেই যাঁদের আনন্দ!

ও-দিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই একটু বেশী রকমের প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু, তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালোবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উল্টো, তাঁরা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি-সত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পান্‌সে বন্ধুত্বের চেয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই ক'রে জড়িয়ে ধরতে না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি। আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অ-বন্ধুর দল তেমনি নিন্দার ধুলো-বালি-কাদা-মাটি চড়িয়েছেন, এবং ঐ দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু

টল্‌তে হয়নি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে'-টাকে ভালো ক'রে বল্‌তে পারার এই উৎসবে আমার একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ ক'রে মুক্তি দিন। আমাকে বড়-বলার বড়-বলি করবেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শান্তির ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তাহ'লে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্ল চন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।...

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্ততঃ তাঁরা জানেন যে, সত্যি-সত্যিই আমি ভালো মানুষ। কোনো অনাসৃষ্টি করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। পড়-পড় বাড়ীটাকে কর্পোরেশনের যে-কর্মচারী এসে ভেঙ্গে দেয়, অন্যায় তার নয়, অন্যায় তার, যে ঐ পড়-পড় বাড়ীটাকে পুষে রেখে আরো দশজনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা ক'রে রাখে।

আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচ্‌ড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

এ কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠ্‌তে পারিনি। সুন্দরের ধ্যেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র — (Beauty is truth, truth beauty).

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে; কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি, আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি! যেন মরু-পথে পথ না হারাই! — এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ-শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি — এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে বাঁকে-বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ প্রখর-দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখর-দংশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে', নির্লিপ্ততা দেখে'। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আস্‌বে তার পূর্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে' — তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের ক'রে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি ব'লেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল

দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই কবি। বনের পাখী নীড়ের ঊর্ধ্বে উঠে গান করে ব'লে বন তাকে কোনোদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে ব'লে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আম গাছকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টো এ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।

যৌবনের রক্ত-শিখা মশাল ধ'রে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই ব'লে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না — আমিও আছি তাঁদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদ্দাররূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যান-মূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে, সেদিন আমিও আস্‌ব ঐ মেলায় শাহজাদা খুর্‌রমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপ্ন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্ত্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি, ও-দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তা হলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।...

বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধূলো-বালি, এত ধোঁওয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপ-বর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে আমিও মরব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর-মন্থনের হলাহলই হয় তা হলে ঐ সমুদ্র-মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়া ত এ সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপার সহজ হ'ত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা — বসে থান, অমৃত আছে, সে উঠ্‌ল বলে।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ।

নজরুল - প্রমীলা ও একটি পত্র

ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত

আমাদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে একমাত্র নজরুলই যে মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক তা কখনও প্রমাণের অপেক্ষায় ছিল না। বলতে গেলে সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের তিনি শুধু পুরোধাই নয়, বলা যায় সেই সম্প্রীতি ও ঐক্যভাবনার তিনি সদর্থে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ব্যক্তিজীবনে সেই সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ভাবনার সপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি লড়াই করার ক্ষেত্রে প্রায় নিঃসঙ্গ। অসহায় হয়েই এগিয়ে গিয়েছেন। অজস্র বাধা আর নিরন্তর প্রতিকূলতা ছিল তাঁর আজীবন সঙ্গী। মৌলবাদীরা যে তাঁকে মেনে নেবেন না এ বিষয়ে তিনি নিজেও নিশ্চিত ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অসহযোগ বা বিরোধিতা এবং কুৎসা প্রচারের কারণও তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু যখন আঘাত এসেছে তাঁর নিজের মানুষজনের দিক থেকে তখন কষ্টে ও বেদনায় তাঁর বুক ফেটে গেলেও তিনি কিভাবে তা হজম করতে বাধ্য হয়েছেন তা অনেকেরই প্রায় জানা নেই। প্রমীলা-নজরুল বিবাহ পর্বে কবির পরিচিত মানুষজনের কাছ থেকে তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন তার কথা আজ অপ্রাসঙ্গিক হলেও কবির জীবনকাহিনী রচনার বেলায় এই সব ঘটনার গুরুত্ব নেহাৎই মূল্যহীন নয়।

সকলেই জানেন যে, ২৫শে এপ্রিল ১৯২৪ শুক্রবার কলকাতায় ৬ নং হাজী লেনের বাসায় নজরুল-প্রমীলার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ হুগলীর মিসেস এম রহমানের উদ্যোগ ও সহায়তায়। সেকালে তাঁকে মুসলিম সমাজের 'অগ্নিকন্যা' বলা হত। বিয়ের আসরে পুরোহিত বা কাজী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মঈনউদ্দীন হোসায়ন এবং উকিল হিসেবে ছিলেন কুমিল্লার আবদুল সালাম আর বিয়ের সাথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন। মেয়ের অর্থাৎ পাত্রী প্রমীলার পক্ষে একমাত্র সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন পাত্রীর বিধবা মাতা গিরিবালা দেবী। সহজেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে পাত্রীর নিজের বাড়ি অর্থাৎ কুমিল্লার কান্দীর পাড় থেকে আর কেউ মেয়ের বিয়েছে কলকাতায় হাজির বা উপস্থিত ছিলেন না কেন?

আমরা জানি, নজরুল আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গ্রামে যাবার সময় চট্টগ্রাম মেলে কলকাতা থেকে যাবার পথে প্রথমে কান্দীর পাড়ে গিয়েই উঠেছিলেন। বছর চারেক আগে প্রথমবারই কান্দীর পাড়ের ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলেই নজরুলকে আপন করে নিয়েছিলেন। ইন্দ্রকুমারের ছেলে বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত যিনি কুমিল্লায় স্কুলে পড়ার সময় আলী আকবর খানের সহপাঠী ছিলেন তিনি নজরুলের সঙ্গে কুমিল্লায় সবসময় থাকতেন। এমন কী, ১৭ ই জুন ১৯২১ তারিখে আয়োজিত দৌলতপুরের নার্গিস-নজরুলের বিবাহ বাসর ছেড়ে নজরুলকে নিয়ে এই বীরেন্দ্রকুমারই বর্ষার রাত্রে গোপনে তিরিশ মাইল রাস্তা হেঁটে কান্দীর পাড়ে নিজের বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু সেই বীরেন্দ্রকুমারই চারবছর পরে কলকাতায় নিজের খুড়তুতো বোন বাড়ির মেয়ে আশালতার বিয়েতে অনুপস্থিত ছিলেন কেন? তাঁর মা বিরজাসুন্দরী দেবী নজরুলকে প্রথম দিন থেকেই আপন করে নিয়ে কান্দীর পাড়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে মেলামেশা এবং দিনের পর দিন সেনগুপ্ত পরিবারে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সেনগুপ্ত পরিবারে থাকাকালে কবিতা ও গান গেয়ে

সারা শহরকে মাতিয়ে তুলেছিলেন নজরুল ইসলাম। বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধেই হুগলী জেলে এক বছর আগে নজরুল উনচল্লিশ দিন অনশনের পর তাঁর হাত থেকে লেবুর জল খেয়ে কবি অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। অথচ বিয়েতে সেই বিরজাসুন্দরী সেনগুপ্তও অনুপস্থিত রইলেন। শোনা যায়, বিরজাসুন্দরী বিয়ের খবর আগে থেকে আঁচ করতে পেরে কলকাতায় এসে বড়ো জা' বিধবা গিরিবালা দেবীকে এ বিয়েতে মত না দেবার জন্যে পীড়াপীড়িও করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এই অনুরোধ গিরিবালা দেবী রক্ষা করতে অসমর্থ হন। আগে থেকেই কান্দীর পাড়ে নজরুলের যাতায়াত নিয়ে কিছুটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। ক্রমশঃ গিরিবালা দেবীর ওপর মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুদূর কান্দীর পাড়ে সামাজিক পরিস্থিতি ভিন্ন ও অনেক বেশি অনুদার থাকায় নানাদিক থেকেই সেনগুপ্ত পরিবারের উপর চাপ আসতে শুরু করেছিল। বাড়িতে আর একটি মেয়ে জটু অর্থাৎ বিরজাসুন্দরীর মেয়ে কমলা সে'ও তখন বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠছিল। ফলে প্রতিবেশীদের চাপ ও সমালোচনা যখন নিন্দা ও কুৎসার আকারে দেখা দিতে শুরু করল তখন বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে স্বয়ং গিরিবালা দেবী অসহায় অবস্থায় বিবাহযোগ্যা মেয়েকে নিয়ে একা আশ্রয়ের খোঁজে কলকাতার অনিশ্চিত পথে পাড়ি দিতে বাধ্য হন।

বাড়ির সহোদর ভাইবোনেরা সকলেই দূরে। বিয়েতেও কেউ এল না। ফলে প্রমীলা বা গিরিবালা দেবীর বিয়ের সময় মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল তা অনুমান করা সহজেই সম্ভব। কিন্তু সেই বিয়ে নিয়ে কলকাতায় এবং কুমিল্লায় প্রতিকূলতার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে, নজরুল-প্রমীলার বিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বিরুদ্ধাচারণ করে এসেছেন প্রবাসী গোষ্ঠীর ব্রাহ্মরা। সেনগুপ্ত পরিবারও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত বলে তাঁরা আরও বেশি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করায় মুসলিম নজরুলের 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে কবিতা লিখে 'প্রবাসী' পত্রিকা থেকে টাকা পাবার আর নজরুলের কোনো সুযোগ রইল না। বিশেষ করে সরলা দেবী চৌধুরাণী এই বিয়ের বিরুদ্ধে খুবই সরব হয়েছিলেন। এমন কী, তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় এই বিবাহের বিরুদ্ধে একটি লেখা ছাপিয়ে চারদিকে হঠাৎ খুব হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই রচনার প্রতিবাদে স্বয়ং ব্রাহ্ম গিরিবালা 'পরিণয়ে প্রগতি' নামে একটি নিবন্ধ লিখে 'প্রবাসী' পত্রিকা দপ্তরে পাঠিয়ে তা ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিয়েতে যেমন নজরুল ও প্রমীলার প্রিয় 'রাঙাদা' (অর্থাৎ বীরেন্দ্রকুমার) আসেননি তেমনি দেখা যায়নি নজরুলের ঘনিষ্ঠ অনেক বন্ধুকেও। পরবর্তীকালে কবির সেই সব শুভার্থীরা সকলেই এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। এ বিয়ে উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল। ২৬ শে মার্চ ১৯২৪ তারিখে প্রকাশিত সেই পত্রটির লেখক ছিলেন প্রমীলার সেই 'রাঙাদা' অর্থাৎ স্বয়ং বীরেন্দ্রকুমার সেন। পত্রটি বিয়ের ঠিক এক মাস আগে লিখে তিনি তা আনন্দবাজারে ছাপাবার উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছিলেন। উৎসাহী পাঠকের জ্ঞাতার্থে তা সেদিনের অর্থাৎ ২৬শে মার্চ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলম থেকে তুলে ধরা হল।

'শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার সেনের পত্র'

শ্রীযুত 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু —:

মহাশয়,

বিগত ১৯ শে মার্চের দৈনিক 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কলিকাতা শহরে জোর গুজব উঠিয়াছে, — 'ধূমকেতু' সম্পাদক সুকবি কাজী নজরুল ইসলামের সহিত 'যুগান্তর' সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ সেনের ভগিনীর বিবাহ হইতেছে। তারপর উক্ত পত্রিকায় গত ২৪শে মার্চ সোমবারের সংখ্যায় আমার ভূতপূর্ব 'সহযোগী যুগান্তর' — সম্পাদক শ্রীমান্ শিবরাম চক্রবর্তী ভ্রম-সংশোধন করিয়া জানাইয়াছেন যে 'যুগান্তর' সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ সেন নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, — ছিলেন বীরেন্দ্রকুমার সেন এবং বোধ হয় তাঁহার ভগিনীর সহিত কাজী কবির বিবাহ হইতে চলিয়াছে। — ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে বলিয়া এই প্রস্তাবিত বিবাহ সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করিলাম। অসবর্ণ বিবাহ, — এমন কি, আন্তর্জাতিক বিবাহেরও আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়া থাকি; — কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ বিবেচনায় আমি এই কার্য্যে সহায়তা করিতে পারিতেছি না — এবং আমার জ্যেষ্ঠতাত ভগিনীর বিবাহে আমার কর্তৃত্বও নাই। আমার পিতামাতাও এই বিবাহপ্রস্তাবে সম্মতি দান করেন নাই। নিবেদন ইতি ২৫ শে মার্চ ১৯২৪ সন।

শ্রী বীরেন্দ্র কুমার সেন

বোঝা যায় যে, এই পত্র বিয়ের বিরোধিতা করে লিখে তা পত্রিকায় মাত্র একমাস আগে ছাপা হয়ে যাওয়ায় বীরেনবাবু দুলির বিয়েতে যোগ দিতে আর ভরসা পাননি। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও মনের পরিবর্তন হয়েছিল এবং বিবাহোত্তর কালে দুলি বোনের বাসায় অর্থাৎ প্রমীলার সংসারে বহুবার বীরেন সেন যাতায়াত করেছেন, যোগাযোগ রেখেছিলেন নিয়মিত বোনের বাড়ির সঙ্গে। বিরজাসুন্দরী দেবীও পরে মত পরিবর্তন করে কলকাতায় গিরিবালা দেবী ও নজরুল প্রমীলার সংসারে স্নেহের টানে অনুরূপভাবে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কান্দীর পাড়ের সহোদরা বোনেরাও যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করতে এরপর আর দ্বিধা করেননি। ব্যতিক্রম শুধু গোঁড়া হিন্দু আর মৌলবাদী মুসলিম সমাজের কিছু মানুষ। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে বিয়ের পর নজরুলের সক্রিয় বিরোধিতায় পথে নেমেছিলেন। আর ব্যতিক্রম ছিলেন সেই বিদুষী ব্রাহ্ম প্রগতিপন্থী সরলা চৌধুরাণী। নাঃ, তিনি এর পরেও কোনদিন এ কাজের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে নজরুলের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সমর্থনে এগিয়ে আসেননি। তার মত মহিলার এই গোঁড়ামীর কারণ আজও উন্মোচিত নয়।

সূত্র : অজানা নজরুল — শেখ দরবার আলম।

ক্রোড়পত্র-২

উৎপল দত্ত

উৎপল দত্তের অপ্রকাশিত ছবি

উৎপলের ডায়েরি ঃ ল্যাঙ্কাস্টার আন্তর্জাতিক নাট্যসম্মেলনে

শোভা সেন

নিয়মমাফিক, দৈনিক দিনলিপি লেখার অভ্যাস উৎপলের কোনওদিনই ছিল না। অন্তত আমি যবে থেকে তাকে দেখছি অর্থাৎ সেই পাঁচের দশক থেকে শেষ সময় অবধি। তবে অত্যন্ত মেথডিক্যাল ছিল বলে সে 'নোট্স্' রাখত সবসময়ই — না রেখে উপায় ছিল না, তার কাজের ব্যাপ্তি ও জটিলতা এতো বিচিত্রগামী ও বহুমুখী ছিল, অসামান্য স্মৃতিধর হওয়া সত্ত্বেও সে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি থেকে তার দরকারের অংশটুকু লিপিবদ্ধ করে রাখত বিশেষত তার সারা জীবনের নাট্যচর্চাই যখন মার্কসবাদ - লেনিনবাদের উপর আধারিত, মার্কস-এংগেলস্-লেনিন-স্তালিন-ট্রট্স্কি-মাও থেকে তোগলিয়াত্তি, গ্রামশ্চি, লুকাচ্, কডওয়েল, অল্টঝার কতো নাম করব — এছাড়া কান্ট্-হেগেল-ফয়ের বাখ্-রাংকে প্রমুখ দার্শনিকদের রচনা তাকে বারংবার পঠনের মাধ্যমে আত্মস্থ করতে হয়েছে। এছাড়া বলা বাহুল্য, আমাদের অধিকাংশ নাটকই যেহেতু ইতিহাসভিত্তিক — সে 'অঙ্গার', 'কল্লোল'ই হোক কিংবা 'তিতুমীর' বা 'মহাবিদ্রোহ' — সমকালের ইতিহাস এবং অতীতের ইতিহাস দুয়েরই অনুপুঙ্খ বিবরণী, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ ক'রে, নোট ক'রে তাকে নাটকগুলি লিখতে হয়েছে। যাতে তথ্যে ও তত্ত্বে কোনও ছিদ্র না থাকে, খামতি না থাকে।

আবার যখন গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছে — 'শেক্সপিয়ার' কিংবা 'গিরিশ' তখন তো বিবিধ গ্রন্থাগারে গিয়ে পাতার পর পাতা তথ্যসংগ্রহ কতে হয়েছে, একেকটা বইয়ের পিছনে প্রায় দশ/বারটা লম্বা খাতা ব্যয়িত হয়েছে। শুরুতে যা বলেছিলাম তাতে একটু ভুল রয়ে গেছে — ১৯৭৯ সালের শেষার্ধে যখন আমরা চীন যাই তখন প্রতিদিনের বিশদ রোজনামচা লিখেছিল উৎপল, যা থেকে পরে 'চীনযাত্রী' বইটি রচিত হয়।

এই লেখার সঙ্গে যে টুকরো দিনলিপিটি সংযোজিত হল তা ১৯৯০-এর ৫-৯ই এপ্রিল ল্যাঙ্কাস্টারে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক নাট্য আলোচনাচক্র তথা উৎসবের, যার শিরোনাম ছিল 'পয়েন্টস অফ কন্ট্যাক্ট : পারফর্মেন্স, আইডিওলজি অ্যাণ্ড পলিটিকস।' উৎপল ছিল অন্যতম আমন্ত্রিত বক্তা, ওর বিষয় ছিল : থিয়েটার ও মতাদর্শ : ভারতীয় পটভূমি। আলোচনাচক্র চলাকালীনই ও কিছু 'নোট্স্' নিয়েছিল যার মধ্যে নাটকের ছাত্রদের খুবই কাজে লাগবে সম্প্রতি নোবেল জয়ী দারিও ফো-র নাটকীয় শিক্ষণ পদ্ধতির বর্ণনা। গ্রেট বৃটেনের ঐ উৎসবে সারা পৃথিবী থেকে এসেছিলেন নাটকের শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও তাত্ত্বিকেরা। আমরা যে থিয়েটার করি অর্থাৎ মতাদর্শভিত্তিক থিয়েটার তার বিখ্যাত প্রবক্তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিরল সুযোগ ঘটেছিল সেবার, মতামত আদানপ্রদান করেছিলাম আমরা, উপকৃত হয়েছিলাম প্রভূত।

By looking at me you have created space within a space, which I call a ~~static~~ aesthetic space. (নান্দনিক স্পেস)
The first inventn. of man. Animals cannot create ~~static~~ aesthetic space by concentrating attentn. And gives power to actor by this ~~static~~ aesthetic space which ~~has 2~~ is a dychotomiser; i.e. the actor becomes 2 persons — the narrator + the person; man can observe himself observing; no other animal can.
Man exists now, he can also think of tomorrow; so he invents words to expr. ~~vate~~
Variability of time; a century compressed into a minute is man's sp. capacity: dichotomy.
Th. is ~~telescopic~~ tele- + microscopic: 100 yr. old story told as if happening now. A handshake can become huge ~~soon~~ on stage by people's attentn. (micro-)
What is human being? Senses respond: part of head responds
3 parts of brain: sensatn. (সংবেদন), emotn. (আবেগ), Reason (বুদ্ধি).
Einstein on disc. $E = mc^2$ exctd.: "Newton, forgive me!"
all three parts of brain operated together. (একযোগে)
(চেতন) What is consciousness? When we can verbalize an emotn.
(অবচেতন) Sub-consc.: not verbalised, but verbalisable
(অচেতন) Unconsc.: do not do exc. thru dreams

Why do we like Oedipus? Not ∵ we love incest, but ∵ our unconsc. identifies with Oedipus

Actor, as human being has all the devils + angels that attend humans. Actor keeps them controlled ∵ of we

Exercise

Two by two: face to palm "Hypnosis"
1 leader + 2 follow: both palms

2 of equal strength, hands on each other's shoulders, or ~~back to back~~ push to throw him out of balance — but just before wing, must relieve pressure.
Back to back, sit down + stand up.
Feet to feet, hands clasped, see-saw — lie down, stand up.
4 — same, feet together, hands clasped. One stands up, sits. Then all 4 stand up

1 Chief + 4 bodyguards. 4 ~~imitate~~ exact sounds + movements of chief. Then change ~~chief~~ (mirroring)

Machine: 1 person rhythmic movement + sound. Others join with their own movement + sound. All join
Same aggressive machine.
Same: "Engl. Today". [[illegible]: Sounds, not words!]
[illegible]: machine of love, hate — [illegible]
We're more embarrassed to show love than hate.

Seeing. Embrace with eyes closed. Then part + retreat, with eyes closed + advance to embrace
Same, only shaking hands.
[illegible] Find a partner, 1st person you touch. Feel over face + hair; visualise his face. Then open eyes + ck.

উৎপল দত্তের অপ্রকাশিত দিনলিপি

ল্যাঙ্কাস্টার আন্তর্জাতিক নাট্য সম্মেলন

[৫-৯ই এপ্রিল ১৯৯০]

৪ঠা এপ্রিল। রাত ৮টা : মূল অধিবেশনের আগে

জন আর্ডেন : Serjeant Mnsgraves, Dance শুরু হয়ে মরে গিয়েছিল, আবার বাঁচলো। আমার ও ব্রিটিশ সেনার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। সাইপ্রাসে ব্রিটিশ সেনার অত্যাচার দেখে লেখা। যা লিখি তাতে সমাজের কিছু এসে যায় না, তবে নাট্যকার আশায় থাকেন। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংলণ্ড আবার তাই করছে। বুর্জোয়া থিয়েটার সে জায়গায় নয় যেখান থেকে রাজনৈতিক প্রচার করা উচিত। হয় অন্যের দাসত্ব, নয় অন্যকে নিজের দাসত্ব করাতে হবে। D'arey ও আমি এ জন্যে নাটক লেখাই ছেড়ে দিলাম। তখন Radio -র জন্য লিখছি।

জোয়েল শেখটার (গ্রীন পার্টির সদস্য) : খোলাখুলি "politics has become theatre in our time+theatre politics."

মার্গারেটা জার্সি।। gaps between 1st world + 3rd world, between man + woman I Radio is solution.

হুগো মেদিনা।। (চিলি)।। পিনোচেত-এর সাম্প্রতিক পতনের পর চিলির থিয়েটারের অবস্থা বলতে চাই। বন্দীর বাবা জানতে চান কোথায় ছেলে। বলেনি। পিতা রাজপথে নিজের গায়ে আগুন দিয়ে মারা যান। যে বাড়িতে বন্দীদের নির্যাতন, তার দিকে আঙুল তুলে মৌন মিছিল। সেই আঙুল যেন আমাদের বুকের দিকেও : কী করছিলে? Each of us carries a little pinochet within.

Pol. Th. আমাদের এই সব প্রশ্ন করবে।

চেক রাষ্ট্রপতির (সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা) প্রতিনিধি আমার থিয়েটার জীবন ও নাট্যজীবন এক হয়ে থেকেছে। To speak the truth is a political act.

রিচার্ড শেখনার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ।। Pol. Th. সৃষ্টি হয় নির্যাতন থেকে। Theatre is political artion censorship in USA eqt "Obscenity" need widely, eqt ideas.

৫ই এপ্রিল সকাল ৯টা

শেখনার - গ্রীন পার্টি - ওয়ার্কশপ। থিয়েটারকে কি করে গ্রীনরা ব্যবহার করেছেন। নির্বাচনেও দাঁড়িয়েছি। U.S. politics is tragi-Comedy, fitting subject for theatrical satire, capturing media - TV coverage.

৫ই বিকেল ৪ টে : আমার বক্তৃতা : Theatre & Ideology in India.

৫ই সন্ধ্যা : দারিও ফো' : ভিডিও সাক্ষাৎকার ও দৃশ্যাংশ।

ফো ।। পূর্ব য়ুরোপে যা ঘটেছে তার গুরুত্ব অসীম। এরপর যা হবে পুঁজিবাদ বড় করুণ চেহারায় পূর্ব য়ুরোপে ঢুকতে চাইবে। ঢুকতে দিলে দুদিন বাদেই দেখা যাবে করুণ দয়াময় চেহারাটা মুখোশমাত্র। সে মুখোশের তলায় রয়েছে হত্যাকারীর মুখ।।

ইটালির বামপন্থী আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাই আজ কম্যুনিস্ট পার্টি-সহ সব বামপন্থী পার্টি নিজেদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। মাদক সমস্যা ধনীরা সৃষ্টি করেছে। এখন বুর্জোয়া থেকে ছড়িয়ে গেছে শ্রমিক পরিবারগুলিতে। মাদক দিয়ে ওরা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে। যে সমস্যার সমাধান করবে ডাক্তার ও মনোবিজ্ঞানী, সে সমস্যায় ওরা পুলিশকে নামিয়ে দিয়েছে।

Scenes from his play where the pope (To) hillariously fails to solve Italy's problems of drug crime.

ওলে সোইংকার ভি ডি ও সাক্ষাৎকার।

৬ই সকাল

শেখ্নার।। Irony of our democracy. — freedom of speech not to change Society. But to prevent change.

মদ ও যৌনতার স্বাধীনতা = বহুদিনের বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; মহত্তর সব স্বাধীনতা = সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ। e.g. excesses of at bij of revolution মঞ্চে হত্যা আসলে জনতার উদ্যমকে by proxy চরিতার্থ করা- e.g. G Real tragedy. উৎসবের আকার বৃত্ত। সরজারী কুচকাওয়াজ চতুষ্কোণ। উর্দীও এক।

বোয়াল।। তিনটে বোর্ডে লেখা : What is theatre? What is an actor? What is the human being?

Lope de Vega's definite of th : 2 humans, 1 passion 1 platform.

So 2 persons, 1 he wants conflict betw. them. Mere thoughts of one man is not drama.

1 passion : theatre not concerned with superficial things but something passionate, imp. for human platform : lights, costume, stage not necessary only a platform.

But is platform necessary platform marks off space for actors. But if— and looks at a pt. it is already symbolically created. The platform

necessary either?

By looking at me you have created space within a space, which I call a aesthetic space (নান্দনিক স্থান) . Th first inventor of man, Animals cannot create aesthetic space by concentrating attention. and gives power to actor by this aesthetic space which is a dychotomiser i.e. the action becomes 2 persons — the narrator and the person; man can observe himself observing; no other animal can.

Man exists now; he can also think of tomorrow; so he invents words to express.

Variability of time; a century compressed into a minute is man's special capacity; dichotomy.

This is telemicroscropic : 100 yr old story told as if happening now. A handshake can become huge on stage by people's attention. (micro).

What is human being? Senses respond : part of head responds 3 parts of brain : sensatn. (সংবেদন), emotion (আবেদন), reason (বুদ্ধি), চেতন, অচেতন, অবচেতন।

Einstein on disc. $E = mc^2$ Exclaimed, "Newton, forgive me!" all three parts of brain operated together. What is consciousness? When we can verbalize (বাক্যায়িত) an emotion. Sub-conse. : not verbalised, but verbalises unconscious : do not do exc. thru' dreams. Why do we like Oedipus? not : We love Greece but : our unconsc. identifies with Oedipus.

Actor : as human being has all the devils, + angels that attend humans. Actor keeps them controlled of soc. normal fear of law. Actor keeps all that locked, what comes out like smoke is personality. Actors have to play chs. 99% of whom are sick. People go to theatre to see violence & bloodshed.

Macbeth lives within actor, explosion on stage & Macbeth comes out. Only it was not active in daily life, but was present.

In theatre of oppression the healthy actor goes into his own personality and bring out sickness. Dangerous, yes. Some professionals refuse to do it & want to retire into tricks.

In politics my theatre brings out positive qualities — leadership, initiative etc. change socialistic.

প্রশ্নোত্তর।। In Brazil + Latin Am. the enemy was clear & visible - the oppressor. In N Eur, whee people are eating enough they tell me : "I cant communicate", I feel empty" etc.

hestup (2-30 pm)

Body - no exercise in oppr. Th. only to make body easily adaptable to action. No competition except to exceed oneself.

1. Feel what you touch
2. Listen, not hear
3. Close eyes to dev, other senses
4. Look closely, see whether the other is sador happy etc.

Exercise

Two by two : face to palm "Hyponis"

leader + 2 follow : both palms

2 of equal strength, hands on each others shoulders, push hard to throw him out of balance - but just before win, must relieve pressure.

Back to back, sit down & stand up

Feet to Feet, hands clasped. see-saw lie down, stand up

4 some, feet together, hands clasped, one stands up sits then all 4 stand up

1 chief. + 4 body guards, 4 exact sounds & dance movements, of chief. Then change mirroring chief.

Machine : 1 person rythmic movemt, & sound. Others join with their own movement. & sound. All join same aggressive machine same : "England Today" [বোয়াল : sounds, not words;]

আলোচনা।। একজন : Machine of love, hate -এর চেয়ে কঠিন! We are more embarrassed to show love than hate.

Seeing, Embrace with eyes closed. Then part & retreat, with eyes closed & advance to embrace

Same, only shaking hands.

নীরবে সবাই চোখ বুঁজে স্টেজে ঘোরো। Find a patners, 1st person you touch. Feel over face & hair, visualise his face. then open eyes & cp.

Boal : Suppose I create an image & declare, it's my father's everybody accepts. If I say what does this image look like, 100 opinions will come - 'policeman', 'doctor' etc. [Typewriter এর ভঙ্গী] আমার হাতে কী? [সবাই : typwr. তেমনি "piano", "drink". You are relying on mnemonic words, thats why you are all agreed each time. In switzerland. I once mind Car-steeving & they said, "milking cow", an image familiar to them.

Dialogue in images. 2 persons shake hands. one freezes, the other leaves, comes back to create image with diff. meaning.

Walk around. I'll shout : noon! 7 a.m. Sat. eve. etc. You must start doing what you do at that hearing inclining improvised dialogue.

Exercises (mime)

1. Double—take in mime : a mimes pleasantry
   B pleased; A slips in disartrous news; B conts. pleasure; then realizes.
2. A sits & watches B, who mimes feeding him, trying to please him, A knows B has betrayed him. Watch in cold hatred. B while serving food is trying to look non chalant, but is disturbed by A's stare. B is guilty.
3. A procession fired on; one falls (i) shock (ii) rage of the people; then (iii) tableaux round corpse.
4. The murderer & the Corpse : 2 Corps bring in prisoner to identify a corpse. Normal quing & noting of answers, until a cop uncovers the Corpse's face. Murderer cannot face it hysterical resistance, Corps hold him. Trying to escape the sight of his handiwork.
5. Bloody hands. B enters A's house. A hides his hands behind him while B visits him. They sit down to tea. A takes tea without showing hands. B curious. A silently screams: Blood on my hands! Here see. Here's a stain. B must establish there's nothing on his hand. Tries to show him, hands clean. A tears away, trance.
6. Identification - comedy. Cop with photo catches thief; thief alters face; cop cheats height; thief becomes shorter; Cop checks tummy; theatre becomes thinner or fatter. Cop hits him on head — 3 times, no effect. Cop runs away.

পরিচিতি

দারিও ফো (১৯২৬-) ইতালীয় অভিনেতা, প্রযোজক ও নির্দেশক। সম্প্রতি সাহিত্যে নোবেলজয়ী (১৯৯৭) কিন্তু তাঁর থিয়েটারের রাজনৈতিক বার্তা কম্যুনিস্ট ও রক্ষণশীল দুপক্ষকেই ক্ষুব্ধ করেছে অতীতে। মিলান শহরে অপেশাদারী থিয়েটারের মাধ্যমে তাঁর নাট্যজীবন শুরু, এমনকি ক্যাবারে পারফর্মান্স্-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন (১৯৫৩য়) — স্ত্রী অভিনেত্রী ফ্রাঙ্কা রামের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেন — নিজেদের দল খুলে (১৯৫৭য়)। এখানেই তিনি লেখেন তাঁর প্রথম 'প্রহসন'গুলি যথা 'আর্চএঞ্জেলস্ ডোন্ট প্লে দ্য পিন - টেব্‌ল্‌স' (১৯৫৯), 'স্টিলিং আ ফুট মেক্‌স্ ইউ লাকি ইন লাভ' (১৯৬১), এবং 'সেভেন্থ' : দাও শ্যাল্‌ট্ স্টিল আ লিট্‌ল্ লেস' (১৯৬৪)। ছয়ের দশকের মধ্যভাগ থেকেই কিন্তু ফো'র কাজকর্ম ক্রমশ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়, মূলত তাঁর অত্যন্ত 'পার্টিজান' রাজনৈতিক মতামত — সমাজ ও সরকার — দুতরফেরই চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬৮ তে যে চরম বামপন্থী মতবাদের ঢেউ ওঠে সারা ইউরোপ জুড়ে তারই অভিঘাতে ফো তাঁর পুরনো নাট্যদল তুলে দিয়ে গঠন করেন 'কম্পানিয়া নুভা সিনা' (Compagnia Nuova Scena) —এই দল কারখানায়-মাঠে-ময়দানে ঘুরে অভিনয় করতে থাকে। ১৯৬৮ তে ফো লেখেন 'দ্য গ্রেট প্যান্টোমাইম', ১৯৬৯তে 'মিস্টেরো বুফো' যা দূরদর্শনে ১৯৭৭-এ প্রদর্শিত হয় এবং ভ্যাটিকান চার্চ-এর তীব্র ভর্ৎসনার সম্মুখীন হয়।

১৯৭০-এর ফো আরেকটি নতুন দল গঠন করেন মিলানে — 'লা কমুনো' মুখ্যত বামপন্থী নাটকের প্রসারের জন্য। ১৯৭০-এ লিখিত হল ফো'র সবচেয়ে বিখ্যাত ও পরিচিত নাটকটি 'দি অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ্ অফ্ অ্যান অ্যানার্কিস্ট' যা বাংলায় উৎপল দত্ত প্রথম প্রযোজনা করেন 'বাংলা ছাড়ো' নামে। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলি যা বাংলায় অনূদিত রূপান্তরিত ও প্রযোজিত হয়েছে তা হল 'কানট পে? ও'নট পে!' (১৯৭৪, বাড়তি দাম দেব না/ ক্লাস থিয়েটার); 'ট্রাম্পেটস অ্যাণ্ড রুশবেরিজ্' (১৯৮২, হচ্ছেটা কী? / অন্য থিয়েটার)। তাঁর অন্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে দি ওপেন কাপ্‌ল্ (১৯৮৭), দ্য ভারচুয়াস বার্গলার, ওয়ান, ওয়াজ ন্যুড অ্যাণ্ড ওয়ান ও'র টেইলস্ ইত্যাদি। তাঁর নিজস্ব ওয়ার্কশপভিত্তিক বইটির নাম 'দ্য ট্রিক্‌স্ অফ্ দ্য ট্রেড' (১৯৮৭)।

ওলে সোইংকা-র জন্ম নাইজেরিয়ায় ১৯৩৪-এ। শিক্ষা স্বদেশে এবং লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজি থিয়েটারে কিছুদিন কাজ করার পর ১৯৬০-এ পশ্চিম আফ্রিকায় ফিরে আসেন। ১৯৮৬ তে প্রথম আফ্রিকান সাহিত্যিক হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর নাটকের মধ্যে রয়েছে 'দ্য ফেরো প্লেজ' (১৯৬০, ১৯৬৬), দ্য রোড (১৯৬৫), দ্য লায়ন অ্যাণ্ড দ্য জুয়েল (১৯৬৬), ম্যাডমেন অ্যান্ড স্পেশালিস্ট্‌স্ (১৯৭১), আ প্লে অফ্ জায়ান্ট্‌স্ (১৯৮৪), 'আ স্কুল অফ হায়াম্বিস্ট্‌স্' (১৯৯১), এবং 'ফ্রেম জিয়া, উইথ লাভ' (১৯৯২)। তাঁর উপন্যাসগুলির অন্তর্গত হল 'দি ইন্টারপ্রিটার্স' (১৯৭৩) ও 'সীজন্ অফ অ্যানমি' (১৯৮০), কবিতা সংকলনও আছে তাঁর 'ইজনরে' (১৯৬৭), 'আ শাট্‌ল ইন দ্য ক্রিপ্ট্' (১৯৭২) (শেষোক্ত কবিতার বইটি কারান্তরালে বিচারের অপেক্ষায় দিন গুণতে গুণতে দু বছরের সময় সীমায় রচিত) এবং ম্যান্ডেলা'জ্ আর্থ (১৯৯০)।

আত্মজীবনীমূলক রচনাও লিখেছেন যথা 'আর্কে', দ্য ইয়ার্স অফ্ চাইল্ডহুড (১৯৮১), ইসারা (১৯৮৯) ও 'ইবাদান' (১৯৯৪)। তাঁর প্রবন্ধ সংকলনটির নাম, 'আর্ট, ডায়ালগ অ্যাণ্ড আউটরেজ্', প্রকাশিত হয় ১৯৮৮তে।

জন আর্ডেন (জন্ম ১৯৩০)। ইংরেজ নাট্যকার। জন্ম বার্নসাল, ইয়র্কশায়ারে। ১৯৫৭ সালে রয়াল কোর্ট থিয়েটারে 'দি ওয়াটার্জ অভ্ ব্যাবিলন' নাটক প্রযোজিত হলে নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। 'লিভ্ লাইক্ পিগ্‌স্' (১৯৫৮) নাটকে একটি আবাসনে সামাজিক সংঘাত ও দ্বন্দ্ব বিক্ষোভের বাস্তববাদী চিত্রণ থেকে অচিরেই ১৯৫৯-এর 'সার্জেন্ট মাস্‌গ্রেভ্‌স্ ডান্স্'-এ তিনি কাব্য, লোকগাথা ও প্রাচীন গদ্যের সম্পদে সমৃদ্ধ এক অন্য নাট্যরূপে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৫ সালেই তাঁর মার্গারেটা ডারসির সঙ্গে পরিচয় ও যৌথভাবে নাটক রচনার সূত্রপাত। আয়র্ল্যান্ড-এর স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত মার্গারেটার সঙ্গে একত্রে আর্ডেন যে-নাটকগুলি লিখেছেন তাতে ইংলন্ড ও আয়ার্ল্যান্ড-এর ইতিহাস, বিশেষত ইংলন্ড-এর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণের বৈপ্লবিক আবেগ ও চেতনা এক 'এপিক' মাত্রায় মূর্ত হয়েছে 'দ্য ব্যালিগম্‌বীন বিক্‌ওয়েস্ট' (১৯৭২), 'দি আইল্যাণ্ড অফ দ্য মাইটি' (১৯৭৪) প্রভৃতি নাটকে। সমকালীন রাজনীতির বোধ ও ব্রেখ্‌ট্-এর নাটক (যা তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি মতে তাঁর 'সংলাপ ও মঞ্চভাবনাকে' প্রাণবন্ত করে তোলে) আর্ডেন-এর নাট্যকৃতিকে পরিপুষ্ট করেছে। আর্ডেন ও মার্গারেটা ডার্সি সত্তরের দশকে ভারতে এসে বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। দুজনেই বর্তমানে আয়ার্ল্যাণ্ড নিবাসী, নানা প্রগতিশীল আন্দোলনে ও প্রতিবাদী অভিযানে সক্রিয় ও কর্মব্যস্ত। তাঁদের প্রতিবাদী রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই তাঁদের নাটক ইংলন্ড-এর পেশাদার রঙ্গমঞ্চে বর্তমানে সমাদৃত নয়। কলকাতার 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায় সম্প্রতি বেইজিং নারী মহাসম্মেলনে মার্গারেটা ডার্সির অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। (শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়)

আউগুস্তো বোআল, (জ. ১৯৩১-) 'নির্যাতিতের নাট্যশালা' (১৯৭৯), 'অভিনেতা ও অনভিনেতাদের জন্য ক্রীড়া প্রণালী', (১৯৯২) এবং অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা ব্রাজিলীয় নাট্যপরিচালক ও বিপ্লবী আউগুস্তো বোআল সারা পৃথিবীতেই খ্যাত তাঁর চরম বামপন্থী ও বৈপ্লবিক নাট্যপ্রয়োগরীতির জন্য। থিয়েটারের সঙ্গে তিনি মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন সার্কাস থেকে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণবাদের। ব্রাজিলে বিশাল ফুটবল স্টেডিয়ামে তিনি অভিনয় করিয়েছেন তাঁর অভিনেতাদের দিয়ে, কার্নিভালের রীতিতে তাঁর থিয়েটার এক বর্ণাঢ্য উৎসবের চেহারা নেয়। সম্প্রতি তিনি পশ্চিমবঙ্গেও এসেছিলেন একটি প্রথাবিরোধী নাট্যদলের আমন্ত্রণে।

শেখ্‌নার রিচার্ড — প্রথমে নিউ ইয়র্কের 'দ্য পার্মফর্ম্যান্স গ্রুপ' ও পরবর্তীকালে 'লিভিং থিয়েটার' দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য শেখ্‌নার, তাঁর নাটকীয় জীবনে বহুবার, মত ও পথ বদল করেছেন। পরবর্তীকালে 'শিকড়ের সন্ধানে', (Theatre of the Roots) তিনি ভারতবর্ষে 'রামলীলা' সম্পর্কেও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তবে মূলত ছয়ের ও সাতের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হতাশা ও তজ্জনিত চরমপন্থী বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল (ভিয়েতনাম যুদ্ধ সহ) শেখ্‌নার এখনও তাঁরই প্রতিনিধিরূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিশ্বের নাট্যজগতের সবচেয়ে 'সমীহ-উদ্রেককারী' পত্রিকাটিরও (TDR — দ্যা ড্রামা রিভিউ) প্রধান

সম্পাদক তিনি।

ছগো মেদিনা - চিলির বিপ্লবী নাট্যকার - পরিচালক।

(আশ্চর্যজনকভাবে উপরোক্তদের মধ্যে অধিকাংশদের সম্পর্কেই বিদেশী নাট্য অভিধানগুলি নীরব। নিহিত কারণটি অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না — এঁদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাই এঁদের বোধকরি এখনও ব্রাত্য করে রেখেছে মূলধারা থিয়েটার থেকে।)

অন্যতম শেষ ইচ্ছা ছিল রাহুলকে নিয়ে নাটক লেখার

সৌভিক রায়চৌধুরী

'শোনো, এবার শীতে আমরা দুজনে কিন্তু অবশ্যই বহরমপুর যাচ্ছি, ঠাণ্ডাটা বেশ ভাল মতন পড়ুক একটু... দুজনে মিলে হাজার দুয়ারিটা ভাল করে দেখব। সারাদিন খুব ঘুরব।... বহরমপুর অনেক বদলে গেছে, না? চেনা যাবে? কবেকার কথা ছেলেবেলায় কতদিন ছিলাম, সাত-আট বছর বয়স তখন...'

অথবা

বারান্দায় নেমে আসছে শীতের বিকেল। দুজনে আধো অন্ধকারে দুঘণ্টা অবিরাম কথায় মগ্ন। মাঝে ঘরে ফেরা পাখিদের কোলাহলের মাঝে একটি বালক রাস্তা থেকে হাত নেড়ে গেল আমাদের উদ্দেশ্যে। বাড়ি ফাঁকা। নিভৃত একান্ত আলাপনের, ভাব বিনিময়ের এমন সুযোগ দুজনের বড় একটা মেলে না। কিন্তু গত দু'ঘণ্টায় গোটা পাঁচেক শব্দও আমার বিপরীত প্রান্ত থেকে উচ্চারিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। নিবিষ্টচিত্তে এই প্রতিবেদকের প্রগল্‌ভ, বল্গাহীন বকবকানি চলেছে। এরই মাঝে আরেকবার চায়ের জন্য অনুরোধ। উঠতে যাব, সচকিত প্রশ্ন, 'সেকি, এত তাড়া কিসের? টিভিতে তো আজ ভাল ফিল্‌মও নেই কিছু! (প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি, আরেকটু বসেই যাও না।) তাড়া আছে বলে কিছুটা হয়তো অভিমানাহত করেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি, একটু আগেই লোডশেডিং হয়ে গেছে, পিছনে ভেসে এল স্বভাববিরুদ্ধ আবেগমথিত কণ্ঠস্বর, 'সাবধানে যেও, দেখে যেও, সিঁড়িটা যে বড় অন্ধকার!'

না। উপরের দুটি ঘটনা কোন প্রেমিক প্রেমিকার নিভৃত কথোপকথনের উদাহরণ নয়, নয় দুই সমবয়সী অভিন্নহৃদয় বন্ধুর ঘনিষ্ঠতার বিবরণী। প্রথম সংলাপটির উচ্চারণস্থল লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে ট্রাফিকে আটকে পড়া গাড়ির ভিতর — তেষট্টি বছরের 'শিক্ষক' ও পঁচিশ বছর বয়স্ক 'ছাত্র'র মধ্যে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার বাবার বদলিসূত্রে আচার্যকে তাঁর শৈশবে বেশ কিছুকাল কাটাতে হয়েছিল বহরমপুরে। প্রথম শৈশবের সেই স্মৃতি কিন্তু জাগরুক ছিল — বিস্মরণ ঘটেনি সেখানকার পরিবেশ, দিনযাপনের। দ্বিতীয় ঘটনার পটভূমি উৎপল দত্তের বাসভবন, মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে — সঙ্গীত বিষয়ক সাক্ষাৎকারের কথাও উঠল, তখনকার মতো ধামাচাপা পড়লেও, প্রয়াণের মাত্র এক সপ্তাহ আগে (১১ই জুলাই, ১৯৯৩) ব্যক্ত করলেন সেই অকপট, অনায়াস উপলব্ধির বিস্তৃত বৃত্তান্ত। কালক্রমে, সেটিই হয়ে দাঁড়াল তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার। যে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন কলেজ জীবনে কনসার্ট পিয়ানিস্ট হয়ে ওঠার দুর্দম বাসনায় পার্ক স্ট্রিটে 'কাবিনা দেলা ম্যুজিকা'য় মিসেস গ্রীণ হলের কাছে ভর্তি হওয়ার কথা, সারারাত জেগে ফুটপাতে বসে বিলায়েত খাঁ সাহেবের 'দেশ' রাগ বাজানো শোনার কথা, ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে কিভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটল পাশ্চাত্য মার্গ সঙ্গীতের চেম্বার মিউজিক থেকে সুবিশাল অর্কেস্ট্রার সেই ঐতিহাসিক জন্মবৃত্তান্ত। বেঠোফেন, মোৎসার্টদের সৃষ্টি হল। এবং পরিশেষে সেই বিস্ফোরক মন্তব্য, ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের একটা বৃহদংশ কতো সস্তায় বাজিমাৎ করা যায় সেই মতলবই আঁটে শুধু!

বহরমপুরের ছেলেবেলায় একটি ঘটনা পরবর্তীকালে উৎপলকে প্রভাবিত করেছিল

গভীরভাবে। জেলের কোয়ার্টারে থাকাকালীন বাবার (গিরিজারঞ্জন দত্ত — যিনি উৎপল দত্তের ভাষায়, একদা বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক, নিছক অর্থলোভে ও ইংরেজতোষণে পুলিশের চাকরিতে যোগ দেন এবং দ্রুত বিপ্লবী ঠেঙানোয় তুমুল খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন) উপর আক্রমণের চেষ্টা হয়। সর্বদাই চাপা ত্রাসের আবহাওয়ায় থাকতে হত দত্তগুপ্ত পরিবারকে। দারোগা-বাড়ির ছেলেমেয়েদের সর্বত্র স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর উপায় ছিল না। একদিন সত্যিই ঘটল বিপদ। সন্ধ্যার মলিন আলোয় বাবা শেক্‌স্‌পিয়ার পড়ে শোনাচ্ছেন ছেলেদের দালানে বসে, হঠাৎ-ই কে যেন হেঁটে আসছে দূর থেকে, দেখা গেল, চাদরের তলায় লুকনো রিভলভার... খোদ পুলিশ মহল্লায়-বসতির মধ্যে এই অসমসাহসিক প্রয়াস! উৎপল দত্ত বলেছিলেন : 'শালা, সাহস দেখে চমকে গেলাম! জানে, ধরা পড়লে ওখানেই কুকুরের মতো গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকবে, তবু... astonishing!' সেই অনমনীয় বিপ্লবীর দৃঢ়চেতা শৌর্য ও বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস তিনি বহুকাল অন্য কারো মধ্যে খুঁজে পাননি। বিপদ তুচ্ছ করে এগিয়ে চলার শিক্ষা তিনি প্রথম পেয়েছিলেন ওই বালক বয়েসেই। মনঃসমীক্ষণবাদী পরিভাষায় যাকে বলা হয় in corporation— নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে অপরের গ্রহণীয় সত্তার অংশটুকু আত্মস্থ করার যে প্রয়াস তা সম্পন্ন হয়েছিল সম্ভবত ওই ঘটনার মাধ্যমে।

সেন্ট লরেন্স স্কুলে ঐচ্ছিক ক্ল্যাসিকাল ভাষার মধ্যে লাতিনই বেছে নিয়ে ছিলেন উৎপল রঞ্জন কিন্তু মৃত্যুর আগে 'যদি আবার গোড়া থেকে শুরু করা যেত' এই মনোভঙ্গিমা থেকে জানিয়েছিলেন, এখন হলে তিনি পালিই নিতেন, প্রাচ্যের ইতিহাস-সংস্কৃতি ও সাহিত্য তথা সমাজকে নিবিড়ভাবে জানার জন্যে। দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন যুদ্ধের জন্য স্কুল ইভাকুয়েটেড করা হল। ফলে ভর্তি হল সেন্ট জেভিয়ার্সে। ওই স্কুলেই দু'ক্লাস নিচুতে পড়তেন আজকের 'স্বনামধন্য' কংগ্রেসি নেতা আবু বরকত গণিখান চৌধুরী। পরিচয় ছিল? 'ফুঃ! পুঁচকে ছোঁড়া এলেবেলে, আমরা ওদের পাত্তা দিতে যাব কেন? আর তাছাড়া তখন থেকেই তো জানতাম যে ওকে নিয়ে পথনাটিকা লিখতে হবে!' শেষ বাক্যটি বলেই অট্টহাস্যে ফেটে পড়া আপন রসিকতায়। স্কুল বদলানোয় রেজাল্ট 'খারাপ' হয়েছিল। তাঁর আপন বয়ানে 'এখন সেসব তলিয়ে গেছে কিন্তু তখন দুঃখ হয়েছিল তো বটেই!'

তাঁর নিজের স্বীকারোক্তিতে কলেজে ইংরেজি অনার্স নেওয়ার একটা মস্ত হেতু ছিল 'ফাঁকি দেওয়া যাবে বেদম।' কেন নিলেন না ইতিহাস, তাঁর প্রিয় বিষয়? সহজ জবাব — তাহলে আর পাশ করতে হত না। 'ও শালার এমন সিলেবাস যার শুরুও নেই, শেষও নেই। অতো পড়ার সময় কোথায়? আর তখন ইংরেজি থিয়েটারও শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। সেটা তো তাহলে শিকেয় উঠবে — সেটা করবে কে? তাই ইংরেজি নিলাম কারণ বানিয়ে আজামোজে যা হোক কিছু অন্তত লিখতে পারব।' অনৃতভাষণ, ঘোর মিথ্যাচার, সন্দেহ নেই। যিনি স্নাতক স্তরেই 'রেকর্ড' নম্বর পেয়ে নজির সৃষ্টি করেছিলেন, অধ্যাপক পুরুষোত্তম লালের 'সাক্ষাৎ' অনুসারে যিনি কলেজ জীবনেই তাঁর ঈর্ষণীয় বুদ্ধিমত্তা, অনুসন্ধিৎসা এবং বৌদ্ধিক সর্বত্রগামিতার সামগ্রিক নিদর্শন স্থাপন করেছিলেন তিনি ইতিহাসে অসফল হতেন এমনটা 'টিপিক্যাল' উৎপল দত্তীয় রসিকতা হিসেবে গ্রহণীয়, সত্য হিসেবে নয়।

হাস্যরস ও রসবোধে জারিত ছিল তাঁর জীবন ও শিল্পের সবটুকু। শুধুমাত্র হাসতে হাসতে

হল ফেটে পড়ছে এইটুকু দেখার জন্যে যিনি নাটকের গুণগত মান বিসর্জন দিতেও বিন্দুমাত্র ইতস্তত করতেন না, তিনি নিশ্চয় আমৃত্যু চালিত হয়েছিলেন বারটোল্ট্ ব্রেখ্‌টের প্রবাদ প্রতিম উক্তি দ্বারা — 'যে থিয়েটারে হাসা নিষেধ, সে থিয়েটার নিজেই আসলে হাস্যকর' উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯-এ যা ব্রেখ্‌ট জীবনীকার রোনাল্ড গ্রে'র মতে ব্রেখ্‌টের প্রথম প্রচারমূলক (propagandist) নাটিকার রচনাসন। ব্রেখ্‌টের মৃত্যুদিবস ১৪ আগস্ট ১৯৫৬ উৎপলের ১৯ আগস্ট ১৯৯৩। ব্রেখ্‌ট শতবর্ষে এই সমাপাতনটি? গবেষকদের ঔৎসুক্যের কারণ হতে পারে। ব্রেখ্‌টের জীবনীকারেরা যেমন কেউ কেউ এমত পোষণ করেছেন যে নিজের শৈশব তথা ছেলেবেলা নিয়ে ব্রেখ্‌টের স্বগত ভাষ্য প্রায় একেবারেই মূল্যহীন কেন না এই সবক্ষেত্রে, 'he is notoriously unreliable!' উৎপল যেমন সর্বদা বলে এসেছেন তাঁর জন্ম শিলঙে (যদিও আসলে তা বরিশালে) নেপথ্য হেতু হল শিলঙ স্থানটি যে বড় রোম্যান্টিক! যদিও সচরাচর তাঁকে এই অভিধায় বিশেষিত করা হয় না তবু যথার্থ সদর্থেই স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির এই 'আঁফাঁ তেরিব্‌ল্' (enfant terrible) 'দামাল শিশু' আজীবনই সারল্য ও জটিলতার এক বহু কৌণিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাজ করে গেছেন। যিনি নগণ্য অপরিচিত নাট্যকর্মীর হাত থেকে সর্বসমক্ষে খৈনি মেখে মুখে পুরে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না, তৃষ্ণার সময়ে একগেলাশ জল এগিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে অকপট আবেগে উচ্চারণ করতেন : 'আমি তোমার কেনা গোলাম' কিংবা প্রয়াণের অব্যবহিতকাল পূর্বে যখন নাটকসমগ্রের জন্য তাঁর সব লেখাগুলি জড়ো করা হচ্ছে, তখন শিশুসুলভ সারল্যে ব্যক্ত করে উঠছেন : 'অ্যাত্তো লিখে ফেলেছি? আমি? কী সর্বনাশ!' তখন উৎপল বিরোধীদের মনে হতে পারে চরিত্রাভিনেতার মজ্জাগত ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রকাশ কিন্তু সবটুকুই সাজানো, বানানো মেকী-এও কী সম্ভব! 'আজকের শাজাহান'-এ কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তীর মুখ দিয়ে নিজের জীবনের, শিল্প দর্শনের সারকথাটুকু বলিয়েছিলেন তিনি : ক্রমান্বয়ে সাফল্য এক অসহনীয় আলস্য! কোনও কিছু সফলভাবে চলতে দেখলেই আমার হাত নিশপিশ করতে থাকে, মনে হয় সব ভেঙেচুরে আবার গোড়া থেকে শুরু করি। পাঠকদের অজানা নেই এই 'অতৃপ্তি', এই শৈল্পিক অভাববোধের ক্ষোভ বিরাজমান ছিল ভ্যান গখ্ কিংবা পিকাসোর চিত্রকলায় বেঠোফেনের সংগীতে, রামকিঙ্করের ভাস্কর্যে, লে করবুসিয়রের স্থাপত্যে। নিত্যনতুন পরীক্ষা চালানোই যে শিল্পীর স্বাভাবিক ধর্ম, নতুন পথের খোঁজ করা, বারবার নিজের পূর্বতন সৃষ্টিকে অতিক্রম করার অদম্য তাগিদ — এ সব কিছু মিলিয়েই সময়োত্তীর্ণ স্রষ্টার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। নিজে প্রায় কয়েক হাজার নাটক পড়েছিলেন এবং অবচেতনের প্রভাব যে সদা ক্রিয়াশীল সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই 'কুণ্ঠিত' হতেন নাট্যকার পরিচয়ে। এ তাঁর মধ্যবিত্তীয় বিনয় নয়, আত্মোপলব্ধিরই উচ্চারিত ভাষ্য।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে তাঁর শৈল্পিক জীবনের বিবর্তনে স্খলিখিত তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের গরমিল অল্পবিস্তর সর্বত্রই ঘটেছে। এতে শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রতিভা ও ক্ষমতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না উপরন্তু একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয় যা একান্তভাবেই ইয়োরোপিয় বা আরো বিশদভাবে বলতে গেলে ফরাসি রসবোধের সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছিল শ্রেষ্ঠ বৃটিশ চাপা হাস্যরসের। কিংবা হয়তো তাঁর প্রিয় ব্রেখটিয় চরিত্র শেয়েইকই তাঁকে এক্ষেত্রে প্রাণিত করেছিল — নিজের নাটকে ('যুদ্ধং দেহি' তে বেঙা, 'ঠিকানা'য় রশিদা নাঁনী, 'দুঃস্বপ্নের

নগরী'তে কৃষ্ণচূড়া) যেমন তিনি অনন্য দক্ষতায় আত্তীকরণ করেছেন 'দ্য গুড সোলজার শোয়েইক'কে। আবার থ্রিলার (গুরু ব্রেখ্‌টের মতো রহস্যোপন্যাসের গভীর অনুরাগী ছিলেন) উৎপল-এর মেজাজ তাঁর নাট্যশৈলীকে প্রভাবিত করেছে বারংবার। যাত্রাপালা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'-ই হোক কিংবা অতি পরিশীলিত রাজনৈতিক 'টেস্টামেন্ট' (দলিল) 'স্তালিন - ৩৪' — দর্শককে উৎকণ্ঠায় ডুবিয়ে রাখতে জুড়ি ছিল না তাঁর। এ ধারার শ্রেষ্ঠ নমুনা বোধ করি 'রাতের অতিথি'।

যাঁরা কালানুক্রমিকভাবে উৎপল দত্তের নাটক দেখে এসেছেন অর্থাৎ, তাঁর তন্নিষ্ঠ দর্শকমাত্রেই অনুভব করেছিলেন ক্রমশই তিনি মঞ্চমোহমায়ার জাদুকরী বৃত্ত থেকে সরে আসছিলেন। ছয়ের/ সাতের দশকের প্রযোজনাসমূহে যে মঞ্চ চিত্রকল্পনির্ভর রাজনীতিকতা ('অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'মানুষের অধিকারে', 'তীর' প্রভৃতি) দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত; তাঁর সবচেয়ে বিরোধী সমালোচকও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন 'the undisputable master of spectacle of Indian theatre' তিনি আর আলোছায়া ও মঞ্চবৈচিত্র্যের চমৎকারিত্বে সেভাবে আর আস্থাশীল ছিলেন না। শেষপর্বে যেমনটি ঘটেছিল 'তিতাসে' কিংবা 'অজেয় ভিয়েতনামে'। নাটকের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার ইডিয়ম প্রকাশরীতি এ-পর্বে তাঁর কাছে আরো তীব্র অন্তর্মুখী পর্যবেক্ষণের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। ফর্ম (আঙ্গিক) থেকে কনটেন্টের (বিষয়বস্তুর) দাঢ্যতায় নিবদ্ধদৃষ্টি স্রষ্টা পরিচালকের ভাবনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠছিল।

চলচ্চিত্রাভিনেতা উৎপল দত্তের শেষ মহৎ রূপায়ণ সত্যজিৎ রায়-এর 'আগন্তুক'-এ মনোমোহন মিত্র। ওই একটি ভূমিকায় রূপদানের জন্য কী পরিমাণ পাঠ/অধ্যয়ন তিনি করেছিলেন, চরম অসুস্থতার মধ্যেও তা বোধ হয় এই ভাগ্যহীন নিবন্ধকারই জানে। মার্ক্স্ এংগেল্স্-এর নৃতত্ত্বভিত্তিক যাবতীয় রচনাকর্ম পুনরায় ঘেঁটে দেখা ছাড়াও ('উৎপল দত্ত গ্রন্থাগার' সম্প্রতি ছাত্র-গবেষক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে, পাঠক গিয়ে দেখে আসতে পারেন কীভাবে প্রায় পরীক্ষার্থী ছাত্রের মতো তিনি পাঠ করেছেন মার্ক্স্-এংগেল্স্-লেনিন-স্তালিন-মাও-লুকাচ্-গ্রামসি সহ যাবতীয় মার্ক্স্বাদী রচনাসম্ভার) তিনি যেসব গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা নিচে দেওয়া হল :

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড	:	টোটেম অ্যাণ্ড ট্যাবু দস্তয়েভস্কি অ্যাণ্ড প্যারিসাইড
কার্ল গুস্তাভ য়ুং	:	মেমোরিজ্, ড্রিম্স্, রিফ্লেকশন্স্ (আত্মকথা)
		সাইকোলজি অ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ণ রেলিজিয়ন
		সাইকোলজি অ্যাণ্ড দি ইস্ট
মরিস ব্লখ্	:	মার্কসিজম্ অ্যাণ্ড অ্যানথ্রোপলজি
হেনরি লিউইস মর্গান	:	এনশেণ্ট সোসাইটি
গর্ডন চাইল্ড	:	হোয়াট হ্যাপেনড্ ইন হিস্ট্রি?
তদেব	:	ম্যান মেক্স্ হিমসেল্ফ্
ভল্মহেল্ম্ রাইখ্	:	দ্য মাস সাইকোলজি অফ ফ্যাশিজ্ম্
গ্র্যাণ্ট অ্যালেন	:	এভ্যুলিউশন অফ্ দি আইডিয়া অফ গড
ক্লোদ লেভি স্ট্রাউস	:	স্ট্রাকচারাল অ্যানথ্রোপলজি

		দ্য র' অ্যাণ্ড দ্য কুকড্ (দুখণ্ড)
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	:	লোকায়ত দর্শন ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গ
স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত)	:	উপনিষদ গ্রন্থাবলী (তিন খণ্ডে)

এ ছাড়াও (বৌদ্ধ) জৈন-দর্শন সম্পর্কিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণা গ্রন্থ। এবং নতুন করে পড়েছিলেন কুলদারঞ্জন রায় অনূদিত 'আশ্চর্য দ্বীপ'। আর পড়া শুরু করতে চেয়েছিলেন আবারও জিম করবেট অমনিবাস—জুলাই মাসেযা সংগ্রহ করা হয়েছিল, অসুস্থ অথচ ভীষণ 'সুস্থ' মানুষটির অসীম আগ্রহে। শেষ হয়েছিল পড়া স্পাইক লী'র 'ম্যালকম এক্স' চিত্রনাট্য। হ্যাণ্ডেলের 'মেসাইয়া' শুনছিলেন ডায়ালিসিসের শেষ দু তিনদিন, সঙ্গে প্রিয় বেঠোফেন ও মোৎসার্ট তো ছিলেনই। এই প্রতিবেদকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল তাঁর দুটি অন্তিম অভিলাষের কথা : এক, মার্ক্স্বাদ ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা; দুই, রাহুল সাংকৃত্যায়নকে নিয়ে একটি জীবনী নাটক রচনার ভাবনা। শেষ ইচ্ছাটির প্রমাণ, এই নিবন্ধকারকে দিয়ে 'আমার জীবনযাত্রা', 'ভোলগা থেকে গঙ্গা', থেকে 'দর্শন দিগ্‌দর্শন', তিনি রাহুলের সবকটি গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। লিখিত হলে কেমন হতো সে নাটক তা নিয়ে আজ শুধু জল্পনাই হতে পারে। তবে অনন্য কোনও উৎপলকে পাওয়া যেত নিশ্চিত।

আজকের বাংলা থিয়েটারে নাটককার ও নাট্যকারের দ্বন্দ্বে সবচেয়ে বড় শূন্যতা যা অনুভূত হচ্ছে তা হল ব্যক্তি শিল্পীসত্তার অন্তর্গত মানস-বিভাজন প্রক্রিয়া তথা বহুমাত্রিকতা। উৎপল দত্তের নাটকের ক্ষেত্রে আজকের প্রজন্মের পাঠক কখনওই কল্পনা করতে পারবেন না কী আমূল রূপান্তর ঘটে যেত প্রায়োগিক উপস্থাপনায়। তা 'মানুষের অধিকারে'ই হোক অথবা 'তিতাস...' কিংবা 'দুঃস্বপ্নের নগরী'র প্রথম দৃশ্য। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে 'লাল দুর্গ' (১৯৯০) নাটকের কথাই—যা তুলনায় সাম্প্রতিক এবং অনেকেরই স্মৃতিতে সজীব। মূল নাটকে মঞ্চ-আসবাব-প্রতিবেশের যে বর্ণনা, নাট্যভাষ্যের মঞ্চায়নে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রাণ পায় দ্বান্দ্বিকতার ভিন্ন মাত্রা, ভিন্ন তাৎপর্য। যে প্রত্যাশা নিয়ে নাটক-পাঠ ক'রে দর্শক প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন, যবনিকা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পঠিত চিত্রকল্পের বদলে গড়ে ওঠে নতুন ছবি, সে ছবির বর্ণ-বিন্যাস ও চিত্রল রূপময়তা একেবারেই ভিন্ন। চরিত্রগতভাবে নাটক তাই বোধহয় সঙ্গীতের সবচেয়ে কাছাকাছি। স্টাফ নোটেশনের পাতায় কিংবা রাগরূপের কঠোর নিগড়ে তাকে বেঁধে রাখা যায় না। নাটক তাই আধুনিক নন্দন তাত্ত্বিকদের ভাষায় 'শূন্যতার মধ্যে' রচিত হয় (created in emptiness vacuum) — তার মধ্যে স্বভাবতই রয়েছে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার, ফুরিয়ে যাবার উপাদান। 'অঙ্গার', 'কল্লোল', কিংবা 'তীর' যিনি দেখেননি তাঁকে নির্ভর করতে হয় দ্বিতীয় ব্যক্তির মূল্যায়নের উপর। নাটককার নির্দেশকের এই যে দ্বৈত সত্তা (ব্যক্তি যখন একই) যখন নাটক লিখছেন একজন মানুষ তখন তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ রচনাশৈলীর উপর নিবদ্ধ কিন্তু ঐ একই ব্যক্তি যখন পরিচালক, যদি তিনি সত্যিই বড় মাপের প্রতিভা হন (শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্ত এমনটা হতেই হবে তা নয়) তাহলে দুটি সৃজনশীল সত্তার বিভাজিত স্তর — compartmentalisation কাজ করবে নইলে কোনওদিনই রচিত নাটক পাবেনা সার্থক মঞ্চায়নের ভাষা তথা প্রকাশভঙ্গী। সমীপকালীন বাংলা থিয়েটারে এ জাতীয় প্রতিভার অভাবটাই সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করা যাচ্ছে, তাই পড়তে গিয়ে যে নাটককে মনে হচ্ছে 'মহৎ'/

'এপিকাল' তার মঞ্চরূপ দর্শককে হতাশ করছে। মিডিয়ার সর্বগ্রাসী যুগে এহেন অমনোযোগিতা অনেক পরিচালকের কাজের মধ্যে প্রতীয়মান। তাছাড়া প্রতিভার গুণগতমান / তারতম্য ও অন্যান্য কালোত্তীর্ণ বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি তো আছেই।

উৎপল দত্তের বিভিন্ন রচনা নিয়ে তথ্য পরিবেশন নিয়ে বারংবার বিতর্ক উঠেছে, আজও সে বিতর্কের অবসান ঘটেনি। সে সব বিতর্কিত বিষয় আপাতত উত্থাপিত হচ্ছে না — তবু বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি নাটক লিখেছেন যিনি, লিখেছেন দুশটির বেশি গবেষণা গ্রন্থ, অভিনয় করেছেন চারশতাধিক চলচ্চিত্রে — স্বাধীন ভারতে দুবার কারাবরণ করেছেন নিছক 'নাটক' করার অপরাধেই, তাঁর মূল্যায়নে যে কোনও সহমতস্তরে পৌঁছতে আরো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, প্রয়োজন ঐতিহাসিক দূরত্বের। তাঁর 'মুচলেকা' দিয়ে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া নিয়ে মতভেদ আজও দূরীভূত হয়নি। এই প্রতিবেদককে তিনি শুধু একটি সরল প্রশ্নই করেছিলেন 'যদি আমি পুলিশের কাছে মুচলেকাই দিলাম তাহলে ভবিষ্যতে সেটি গেল কোথায়? এবং পরবর্তীকালের রাজনৈতিক নাটক করব না বলে সেখানে যে লেখা আছে বলে কথিত, তা সত্ত্বেও 'দুঃস্বপ্নের নগরী', ব্যারিকেড', 'এবার রাজার পালা'র মতো নাটক আমি করলাম কিভাবে?'' এই আপাতসহজ কঠিন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায় সকল সচেতন নাট্যকর্মীর।

অবশেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উত্তর বামপন্থী সংস্কৃতিচর্চার এক জটিল স্ববিরোধী পরিণতির দৃষ্টিকোণেই বিচার্য হয়ে যান উৎপল দত্ত, বারংবার তাঁকে বিচ্যুতির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, বাম দক্ষিণ দুপক্ষ থেকেই। তাঁর চিরবিদায়ের পর কেটে গেল পাঁচ পাঁচটি বছর, অনেকানেক লেখা হল তাঁকে নিয়ে, কিন্তু আজও যেন এক ছদ্ম আস্তরণেই ঢাকা পড়ে রইলেন তিনি, আমাদের সাধ্যে কুলোল না, নিজেদের নয় তাঁর মতো করে তাঁকে বিচারের। যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন থিয়েটারের ক্ষুদ্র, পাল্টা পৃথিবীতেই (the little alternative world) আছে বিভেদহীন শোষণমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখার গুপ্ত দরজার চাবিকাঠি — থিয়েটারের প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হল এই পৃথিবীর মধ্যে আরেকটা পৃথিবী গড়ে তোলা — যে ছোট্ট পৃথিবী শুধু যে বাইরের পৃথিবীকে (the greater world) -কে প্রতিবিম্বিত করবে এটুকুই নয়,— সেই হৃদয়হীন, নিষ্করুণ, শ্রেণী বিভাজিত বিশ্বতে আরো সৎ-সুস্থ ভালোভাবে বেঁচে থাকবার জন্যে কী কী জরুরি তারও হদিশ বাতলাবে। সে হদিশ জানাবে থিয়েটারি কায্যেরই ভাষায় — স্থূল প্রোপাগাণ্ডায় নিছক নয়, যেমন উৎপল নিজেই করেছিলেন 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা' নাটকে :

'ইতিহাস যখন নিদ্রা যায়, তখন সে কথা কয় স্বপ্নের ভাষায়। ঘুমন্ত জনতার কপালে তখন বিন্দু বিন্দু রক্তের নক্ষত্র-মণ্ডলীর রূপে জেগে থাকে এক কবিতা। ইতিহাস যখন জেগে ওঠে, কল্পরূপ তখন কর্মে পরিণত হয়। কবিতা তখন পরিপূর্ণ। কাব্য তখন করে যুদ্ধযাত্রা।'

আজীবন তাঁর থিয়েটার চর্চায় উৎপল দত্ত এই যুদ্ধযাত্রারই ছবি এঁকেছেন বারংবার, কে জানে এ জন্যেই তাঁকে ভুল বুঝেছি আমরা —এখনও তাই চলেছি হয়তো — কারণ মানুষটাকে আমাদের আজও তো দ্বান্দ্বিক সামগ্রিকতার আলোয় দেখা হয়ে উঠল না।

ক্রোড়পত্র-৩
গল্প

প্রেত কাহিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ইহা দুই প্রেতের কাহিনী। দুইটি নিদারুণ অতৃপ্ত আত্মা। পরস্পরের চির প্রতিদ্বন্দ্বী। জীবনে এবং মরণোত্তর কালেও। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশে আবদ্ধ বলিয়াই ইহাদের মুক্তি নাই।

উভয়েরই বাস বৃক্ষ শাখায়। পরস্পরের প্রতি চরম ঘৃণা, তবু একজন আর একজনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তিন দিক সমুদ্র বিধৌত এই বিশাল ভূখণ্ডে বনস্পতির অভাব নাই, একজন উত্তরে, অন্যজন দক্ষিণে, অথবা পূর্বে ও পশ্চিমে ইহারা পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করিতে পারে, কিন্তু তাহা করিবে না। একজন অপরের পশ্চাতে ধাবিত হইবেই। একজন যদি লুকাইবার চেষ্টা করে, তবু অন্যজনের শ্যেন চক্ষু হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না কিছুতেই।

ইহাদের নিদ্রা নাই, শুধু চির জাগরণ। ক্ষুধা বোধ নাই, তবু অনন্ত অতৃপ্তি। নিজস্ব কিছুই সম্বল নাই, তবু রহিয়াছে তীব্র অহংবোধ।

জীবিতকালে উভয়েই ছিল উচ্চ বংশ এবং উচ্চ বিত্ত পরিবারের সন্তান। উচ্চ শিক্ষিতও বটে। এখন নিতান্তই দুই প্রেত।

প্রেতাত্মার কোনো নাম থাকে না। সমাজে চিহ্নিতকরণের জন্য জীবিত মানুষের নাম দেওয়া হয়। পদবী বা পিতৃ পরিচয় যুক্ত থাকে। ধরা যাউক কোনো মনুষ্যের নাম রাম কিংবা রহিম, যতক্ষণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে, অর্থাৎ সে জীবন্ত, ততক্ষণই সেই শরীরখানি রাম কিংবা রহিম, শ্বাস বন্ধ হইলেই সে একটি জড় পদার্থ। পচনশীল। তবু সেই মৃতদেহকে অনেকে পূর্বনাম ধরিয়া ডাকে, বিলাপ করে, কিন্তু তাহা নিতান্তই মায়া।

প্রেতাত্মাদের সমাজ নাই, তাই নাম রাখিবার দায় নাই। দেহ নাই, তাই পূর্বনামও অবান্তর। প্রেতাত্মা সম্পূর্ণ নিরাকার নয়, কখনো কখনো একটি কঙ্কালের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই হাড়ের খাঁচা দেখিয়া ইহাদের পূর্ণ-শরীর কল্পনা করাও অসম্ভব। কখনো কখনো ইহারা পশু-পক্ষীর রূপ ধারণ করিতে পারে, এমনকি নর রূপ ধারণ করিতেও সক্ষম, কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু তাহা অন্য মানুষের রূপ। কোনো রহস্যময় কারণে, ইহাদের মনুষ্য জীবনের স্বমূর্তি ধরিবার ক্ষমতা নাই।

কাহিনীর সুবিধার জন্য এই দুই জনকে পৃথকভাবে ভূত ও প্রেত নামে ডাকা যাইতে পারে। কথায় বলে ভূত-প্রেত। তাহা হইলে ভূত ও প্রেত নিশ্চয়ই একেবারে এক নহে। শ্রেণী বিভেদ আছে। যেমন পেতনী ও শাকচুন্নী এক নহে, যেমন ব্রহ্মদৈত্য ও মামদো ভূত এক হইতে পারে না। তবে পৃথক শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও এই কাহিনীর ভূত ও প্রেত কেহই অন্যজনের তুলনায় ছোট কিংবা বড়, তাহা বলা যায় না, সমান বলিয়াই ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে।

উভয়েরই পূর্ণ বয়সে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখন দুইজনেই নিতান্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের মতন কলহ পরায়ণ। ভাষাও অতি কদর্য। প্রাক্তন শিক্ষা-দীক্ষা-সহবতের কোনো চিহ্নই নাই।

এক শৈল ঘেরা মনোরম উপত্যকায় এক ঘন পত্রবহুল বৃক্ষে লুক্কায়িত হইয়া বিশ্রাম লইতে ছিল প্রেতটি। শূন্যপথে ধাইয়া আসিয়া ভূতটি চঞ্চল মানুষের মতন ইতি-উতি গন্ধ শুকিতে লাগিল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীটি চক্ষের আড়ালে থাকিলে সে এক দণ্ড সুস্থির হইতে পারে না।

অবিলম্বেই খুঁজিয়া পাইয়া সে বৃক্ষের পত্ররাজি মথিত করিয়া প্রেতটির একেবারে উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। এবং বলিল, শুয়োরের বাচ্চা, তুই ভেবেছিলি আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে লুকোবি? হিঃ হিঃ হিঃ

প্রেত বলিল, অরে বেল্লিক, তোর গায়ের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। দূর হয়ে যা!

ভূত বলিল, আর তোর গায়ে বুঝি আতর ছড়ানো? তুই তো একটা নর্দমার গুবড়ে পোকা!

প্রেত বলিল, তুই তো মড়া গরুর এঁটুলি! হারামজাদা, একটু সরে বোস অন্তত!

— কেন সরবো রে গু খেকোর ব্যাটা? এই গাছটা আমার!

— তোর? বাপের সম্পত্তি বুঝি?

— তবে কি তোর বাপের ? যা ভাগ!

— আমি এই গাছটার দখল আগে নিয়েছি, এইটা আমার!

— মারবো পেছনে এক লাথি, তারপর যাবি?

পার্শ্ববর্তী সমতুল্য একটি বৃক্ষে পক্ষিরা শিস দিতেছে। ডালপালা ছড়ানো, আরামে বসিবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত, কিন্তু সেখানে উহারা কেহ যাইবে না। ঐ বৃক্ষেই গুঁতাগুঁতি করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে চলিতে লাগিল গালি গালাজ।

অকস্মাৎ পাহাড়ের আড়াল হইতে উপত্যকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গর্জিয়া উঠিল কামান। ছুটিয়া আসিতে লাগিল রাশি রাশি আগুনের গোলা। ভূত ও প্রেতের মৃত্যু ভয় নাই! তাহারা বিবাদ ভুলিয়া আনন্দে খলখল করিয়া হাসিতে হাসিতে করতালি দিতে লাগিল। মানুষ যেমন বিশুদ্ধ সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হয়, কামান-বন্দুকের শব্দ ইহাদের কানে তেমনই সুমধুর শোনায়।

ভূতটি বলিল, আসছে, আসছে, এবার দেড়ে মুশে দেবে এদের!

প্রেতটি বলিল, আর এরা বুঝি ছেড়ে কথা কইবে! এক্ষুনি এমন ঝাড় দেবে যে বাপের নাম ভুলে যাবে।

ভূতটি বলিল, দূর দূর, এদের মুরোদ কত জানা আছে। ওরা যখন হুড় হুড় করে নেমে আসবে?

প্রেতটি বলিল, তখন এরা ওদের পোকা মাকড়ের মতন টিপে টিপে মারবে

— তুই শালা যুদ্ধের কী জানিস রে?

— তোর বাবা কোনোদিন যুদ্ধ করেছে?

ইহারা কে কোন দলে সে প্রশ্ন অবান্তর। একজন একপক্ষ লইলে অন্যজন বিপরীত দিকে যাইবেই। যুদ্ধের রক্তারক্তিতেই ইহাদের আনন্দ। সাধারণ মানুষ ভয়ার্ত হইয়া পালাইবার চেষ্টা করিবে, আহত হইয়া আর্তনাদ করিবে, কাতরাইতে কাতরাইতে মরিবে, এই দুই ভূত ও প্রেত মহানন্দে উপভোগ করিবে, সেই দৃশ্যাবলী। নর রক্তে গড়াগড়ি দিতে ইহাদের বড় আমোদ!

দুধ পক্ষেই গোলাগুলি বর্ষণ শুরু হইয়া গেল প্রবল তেজে, বৃক্ষ ছাড়িয়া এই দুইজন ওড়াউড়ি করিয়া ফূর্তিভরে দেখিতে লাগিল হত্যালীলা।

কখনো এমন হয়, দুইজনে আকাশ পথে উড়িতেছে, উড়িবার সুবিধার জন্য বাজপাখির রূপ ধারণ করে। তখনো ইহারা এমন বিবাদ শুরু করে যে অন্যান্য বাজ পক্ষিদের বিস্ময়ের শেষ থাকে না। এত বড় আকাশ, সেখানে উড়িতে প্রবৃ চ বাজপক্ষিদের কোনো অসুবিধা হয় নাই, যে যেমন খুশি যেদিকে যাইতে পারে । এই অদ্ভুত পক্ষিদুইটি কোথা হইতে আসিল?

* * *

বাজপক্ষি রূপী এই দুই ভূত ও প্রেত ঝটাপটি শুরু করে, একে অপরকে গোঁত্তা দিয়ে হঠাইতে চায়।

একজন বলিল, বেজন্মা বেটা, তুই এদিক দিয়ে যাচ্ছিস কোন্ সাহসে? জানিস এখানে আমার দাগ টানা আছে?

অপরজন বলিল, ছুঁচোর মুখে বড় বড় কথা! আকাশে দাগ টানা? ছোঃ!

আগেরজন বলিল, আলবৎ দাগ টানা আছে! এ এলাকা আমার!

অপরজন বলিল, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ! আমার দেখাদেখি বাজ সেজেছিস কেন? চড়ুই পাখি, তুই ব্যাটা এক চড়ুই ! আকাশ ভাগ করতে এসেছে! যা যা সরে যা !

আগেরজন বলিল, আমি যদি চড়ুই হই, তুই তা বলে একটা মশা! টিপে মেরে ফেলবো!

— আয় না দেখি!

— এই দেখ শালা!

একে অপরকে ঠোকরাইতে ঠোকরাইতে, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, গতিবেগ হারাইয়া পড়িতে লাগিল নিচের দিকে।

নিচে, সমতলভূমিতে মানুষের জীবন লীলা প্রবহমান। ছোট ছোট সংসার, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ । এক একটি নিস্তরঙ্গ গ্রাম, কোনো সম্পদ নাই, শ্রী নাই । এখানকার মানুষদের দুই বেলা উদর পূর্তির জন্য পর্যাপ্ত অন্ন জোটে না, প্রবল শীতের কামড় হইতে শরীর রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত বস্ত্র পায় না, তবু মানুষ নিরানন্দ থাকিতে পারে না সর্বক্ষণ। ইহারই মধ্যে কিছু মানুষ আপন মনে গান গায়, যাত্রা-পালার মহড়া দেয়, নিদেনপক্ষে কয়েকজনে মিলিয়া তাস পিটায়।

এ বৎসর বেশ শীত পড়িয়াছে বটে। হিমেল হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়। একটি সামান্য গৃহস্থ বাড়ির উঠানে কাঠ-কুঠা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালানো হইয়াছে। চার-পাঁচটি বালক বালিকা শীত নিবারণের জন্য নৃত্য করিতেছে সেই আগুন ঘিরিয়া। তাহাদের জননী একটি কস্তা ডুরে শাড়ি পরিধান করিয়া একটি জামরুল গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে এবং হাত চাপড়ি দিতে দিতে গান গাহিতেছে মৃদু স্বরে। সে গানের সুরের তেমন বৈচিত্র্যও নাই, হয়তো রমণাটি ঐ একটি মাত্র গানই জানে, তবু কী মধুর শুনাইতেছে সেই সঙ্গীত! পরিবারের অধিপতিটি একটি খাটিয়ায় শয়ন করিয়া অলস চক্ষে দেখিতেছে তাহার সন্তানদের। বালক-বালিকাগুলি বেতাল নৃত্যের সঙ্গে হাসিতেছে খল খল করিয়া। ইহা যেন এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

এই শিশুগুলি দুগ্ধ পান করিতে পায় না, তাহার বদলে ভাতের ফ্যান খায়। ইহাদের ক্রীড়া বলিতে শুধু বৃক্ষে বৃক্ষে উলম্ফন, কিংবা জলে নামিয়া দাপাদাপি কিংবা ধূলায় গড়াগড়ি। এখন ইহাদের মুখে কী নির্মল হাস্য! জননীর পরিধানের বস্ত্রে অন্তত শতটি ছিদ্র, শীতের নির্দয় বাতাস সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া তাহার শরীর দংশন করিতেছে, তবু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে তন্ময় হইয়া গান গাইতেছে। স্বামীটির বিড়ি ফুরাইয়া গিয়াছে। একটি পোড়া বিড়িই সে হাতে ধরিয়া আছে অভ্যাসবশত, এখন তাহার কোনো অভাববোধ নাই, সে পরম তৃপ্তিতে উপভোগ করিতেছে প্রতিটি মুহূর্ত। শিশুদের হাস্যে বিশ্বের সব মলিনতা মুছিয়া যায়।

শীতের সন্ধ্যায় এই দরিদ্র পরিবারটিতে যে-রূপ শান্তি নামিয়া আসিয়াছে, তাহা বহু রাজ-রাজড়ার গৃহেও দুর্লভ।

বাজ পক্ষিরূপী ভূত ও প্রেতদ্বয় পরস্পরকে আঁচড়াইতে কামড়াইতে কামড়াইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ এই গৃহটির উর্ধ্বে আসিয়া থামিয়া গেল। আশ্রয় লইল জামরুল গাছটির উচ্চ শাখায়। এই পারিবারিক আনন্দময় ছবিটি দর্শন করিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ ও হতবাক। যে কোনো শান্তির দৃশ্যেই যেন তাহাদের বক্ষে শেল বিদ্ধ হয়!

এই সময়ে দ্বন্দ্বের কথাও তাহাদের মনে থাকে না। উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল তীব্র চক্ষে। দুইজনেরই মনে একই প্রশ্ন। এই তুচ্ছ মানুষগুলি এমন আনন্দে মাতিয়া থাকে কী করিয়া? কোথা হইতে সে অধিকার পাইল? না, সে অধিকার কাহারো নাই। তাহা হইলে যে এই দুই অশরীরীর সব উদ্যমই ব্যর্থ।

ইহা সীমান্ত অঞ্চল নহে, এখানে সহসা কামানের গোলা উড়িয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। দুই যযুধান বাহিনী মাটির উপরের দাগ লঙ্ঘন করিয়া এখানে অগ্নিবৃষ্টি শুরু করিবে না। এই পল্লীটিতে যুদ্ধের আঁচ লাগে নাই কখনো। তা বলিয়া কি অশান্তি সৃষ্টি করিবার অন্য কোনও পদ্ধতি নাই? অবশ্যই আছে। বহু প্রকারের অশান্তির পলিতা চতুর্দিকে ছড়াইয়া আছে, শুধু একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি ঘর্ষণের অপেক্ষা। আর কিছু না হোক, কোনো মন্দিরের চত্বরে যদি কেহ চুপি চুপি একটি গরুর মুণ্ড রাখিয়া দেয় কিংবা কোনো একজন একটি মসজিদের সিঁড়িতে ছুঁড়িয়া দেয় একটি শূকরের ঠ্যাং, অমনি ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়া যাইবে।

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ গরু ও শূকর বধ করিয়া পৃথকভাবে মহানন্দে ভোজন করিতেছে, তৃপ্তিতে ঢেঁকুর তুলিতেছে তাহাতে কোনো বিসম্বাদ নাই। কিন্তু ধর্মস্থানে ঐ একটুকরো মাংস পড়িলেই যায় যায় রব উঠিবে, শুরু হইবে ধ্বংস ও হত্যালীলা, যাহারা মন্দির-মসজিদের ধারে কাছেও থাকে না, তাহারাও পাইবে না নিস্তার। এই শান্ত সন্ধ্যায় যে পরিবারটি নিজেদের লইয়া মশগুল হইয়া আছে, তাহাদের উপরেও ঝাঁপাইয়া পড়িবে হামলাকারীরা। প্রথমে আগুন ধরাইয়া দিবে বাড়িটিতে, পুরুষটির মস্তক চূর্ণ করিবে, শিশুগুলিকে নিক্ষেপ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে, রমণীটিকে শ্বাস রোধ করিয়া হত্যা করিবার পূর্বে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া ধর্ষণ করিবে অন্তত দশজন।

সেই সম্ভাবনার চিন্তাতেই পুলকিত হইয়া ভূত ও প্রেত যথাক্রমে কোনো গোমাংস ভক্ষক ও কোনো শূকর মাংস ভক্ষকের সন্ধানে আবার উড়িতে লাগিল।

কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারীকা, পেশোয়ার হইতে নাগাল্যাণ্ড পর্যন্ত ইহাদের অবাধ গতি। সর্বত্র ইহারা অশান্তি খোঁজে। যেখানে শান্তি বিরাজমান, সেখানে এই দুই প্রেতাত্মার ছায়া পড়িলেই মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি লকলক করিয়া উঠে।

কয়েকদিন ধরিয়া অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। তাহার মধ্যেও এই দুইজনের লড়ালড়ির বিরাম নাই। এত বড় ভূখণ্ডের যেখানে সেখানে যখন তখন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ওঠে, ইহারা যথাসময়ে সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অশান্তির ক্ষুধা মিটাইয়া লয় বটে, তবু ভূমিতে দাগ কাটা সীমান্ত অঞ্চলই এই দুইজনের বেশি পছন্দ। কেননা সীমান্ত অঞ্চল সর্বসময়েই ঘটনাবহুল।

অদ্য তাহারা উড়িয়া আসিয়াছে পূর্ব সীমান্তে। এখানে রহিয়াছে কয়েকটি বড় বড় বনস্পতি। দুইজনে দুইটি বৃক্ষে আশ্রয় লইলেই বহাল তবিয়তে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা তো হইবার নয়। এমন কি একই বটবৃক্ষে অনেকগুলি বড় বড় শাখা আছে, ইহারা দুইটি পৃথক শাখাতেও বসিবে না, একই শাখায় ঠেলাঠেলি শুরু করিয়াছে পরস্পরে। সেই সঙ্গে চলিয়াছে কুৎসিত ভাষার বিনিময়।

একবার একজন অপরজনের ধাক্কায় শাখাচ্যুত হইয়া নিচে পড়িতে পড়িতে আবার উঠিয়া আসিতেছে, নব বিক্রমে সে সরাইয়া ফেলিতেছে অপরজনকে। এরকম চলিতেছে তো চলিতেছেই। সন্ধ্যা পার হইয়া রাত্রি গাঢ় হইল, তবু ইহাদের রেশারেশির বিরাম নাই। যদি কোনো দর্শক এই দুই বাল স্বভাব ভূত-প্রেতের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে সেও দেখিতে দেখিতে এতক্ষণে ক্লান্ত হইয়া যাইত, কিন্তু ইহারা ক্লান্তি কাহাকে বলে তাহা জানেই না।

ভূত-প্রেতের কি মানব জন্মের পূর্ব স্মৃতি থাকে? যতক্ষণ না আমরাও ভূত প্রেত হইতেছি, ততক্ষণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইব না। তবে ইহাদের আচরণ দেখিয়া মনে হয়, হয়ত কিছু কিছু ক্ষীণ স্মৃতি থাকিয়া যায়। নচেৎ এই দুইটি আত্মার এমন কলহ পরায়ণতার আর কি যুক্তি থাকিতে পারে?

ইহাদের তীব্র, তিক্ত বিবাদ শুরু হইয়াছিল মনুষ্যদেহে জীবৎকালেই।

একদা এই তিনদিক সমুদ্র বিধৌত ও তুষার কিরীট দেশ ছিল বিদেশী শাসনাধীন। অনেককাল রাজত্ব করিবার পর নানাদিক হইতে নানারকম গোঁত্তা খাইয়া সেই বিদেশী শাসকগণ একসময় এদেশ হইতে পাততাড়ি গুটাইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তখন তাহাদের পরিত্যক্ত কুর্সিতে কে বসিবে তাহা লইয়া এদেশীয়দের মধ্যে লাগিয়া গেল কাজিয়া। এই কাহিনীর ভূত ও প্রেত তৎকালে ছিল ঐ কুর্সির প্রধান দাবীদার। একই কুর্সিতে দুইজনের স্থান নাই, তবু একে অপরকে ল্যাং মারিয়া জবর দখল করিবেই। একবার এ বসে, ও পড়ে। আবার ও আসিয়া পিছন হইতে ধাক্কা মারে। চলিতে লাগিল শুণ্ড-নিশুম্ভের লড়াই। ইহা থামিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই দেখিয়া কিছু কিছু লোক পরামর্শ দিল, তাহাদের মধ্যে প্রাক্তন প্রভুরাও ছিল, তাহারা বলিল, কুর্সিখানা ভাঙিয়া পড়িবে যে, তোমরা দুইজনে দুইখানি কুর্সি লও না বাপু!

ততক্ষণে পুরানো কুর্সিখানি সত্য সত্যই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মানুষের লোভ ও ক্ষমতা লিপ্সা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে, আর বিলম্ব করিবার ধৈর্য থাকে না, তখন পূর্ণের বদলে অংশ লইতেও সম্মত হইয়া যায়। সেই পুরাতন কুর্সির ভগ্ন কাষ্ঠ দিয়া নির্মিত হইল দুইটি পৃথক কুর্সি, স্থাপন করা হইল অনেক দূরে দূরে, এবং যাহাতে উহাদের আর মুখ দেখাদেখি না হয় তাই মাটি চিরিয়া নির্ধারিত হইল সীমান্ত রেখা। প্রাক্তন শাসকরা মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল সমুদ্রের পরপারে।

হায়, কুর্সির লড়াই তবু থামিল না। এ বলে, উহার কুর্সির চেয়ে আমার খানি অনেক উত্তম। ও বলে, ছোঃ, উহার কুর্সিখানা তো পোকায় খাওয়া। এ বলে, বটে, দেখাচ্ছি মজা, তোর কুর্সিটাও আমি নিলুম বলে! ও বলে, পোঁদে লাথি খাবার আবার শখ হয়েছে বুঝি!

ইহাদের দেখাদেখি উভয়পক্ষের চ্যালা চামুণ্ডারাও বলিতে লাগিল, আমরাও কুর্সি চাই। কুর্সির লোভে তাহারা উন্মত্তবৎ আচরণ করিতে লাগিল, সর্বত্র রব উঠিল, কুর্সি, কুর্সি। একজন আরেকজনের পশ্চাৎদেশ হইতে আচমকা কুর্সি সরাইয়া লয়, যে ধরাশায়ী হইল, সে থুতু ছিটাইতে লাগিল। কেহ কেহ কুর্সিতে প্রস্রাব ও পায়খানা মাখিয়া রাখিতেও দ্বিধা করিল না।

এই কুর্সি দখলের কোন্দলের ফলে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহ, বাস্তুভিটা, নিজস্ব জমি হারাইল, সেদিকে উহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। একদা যাহারা ছিল প্রতিবেশী ও আত্মীয়বৎ, তাহারা পরস্পরের বক্ষে ছুরি বিদ্ধ করিতে লাগিল। যাহারা পরস্পরের উৎসব ও পালা-পার্বণে আনন্দ ভাগ করিয়া লইত, তাহারাই এখন পরস্পরের গৃহে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া ভাবিল, ইহারই নাম আনন্দ। এই ফাঁকে শান্তি চলিয়া গেল নিরুদ্দেশে।

মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিবার পরও সেই দুই আত্মা এখনো পূর্বস্বভাব ভুলে নাই। পূর্ব সীমান্তের একই বট বৃক্ষের শাখায় ভূত ও প্রেত যখন লড়ালড়ি করিতেছে, তখন সেই স্থানে অন্য একটি দৃশ্যের অবতারণা হইল।

দিবাকালে এই সীমান্ত এলাকায় প্রচুর মানুষজন যাওয়া আসা করে। বড় বড় পণ্যবাহী গাড়ি যায় বিকট শব্দে, দুই দিকের প্রহরীরাও ব্যস্ত থাকে। মধ্যরাত্রে চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ। তখনও মানুষজনের যাতায়াত থাকে বটে, কিন্তু তাহারা শব্দ করে না, প্রহরীরাও বাম হস্ত বাড়াইয়া তাহাদের নিকট হইতে দক্ষিণা লয়, অন্য প্রান্তের প্রহরীরাও তাহাদের প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া হাসিমুখে পারাপারের সম্মতি দেয়। প্রতি রাত্রেই এই রূপ চলে, তাহাতে কোনো বৈচিত্র্য নাই।

অদ্য দৃশ্যটি অন্যরকম। দশ-বারো জনের একটি দলকে প্রহরীরা জোর করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছে, আর সেই দলের নারী পুরুষরা ক্রন্দন করিয়া বলিতেছে, ওগো, আমাদের তাড়িয়ে দিওনা, আমরা এখানকারই মানুষ! প্রহরীরা তবু নির্দয়ভাবে তাহাদের ঠেলিতেছে।

গা-জুয়ারি থামাইয়া ভূত ও প্রেত সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। ব্যাপারটা প্রথমে তাহাদের ঠিক বোধগম্য হইল না। রাত্রির যাতায়াতকারীরা তো সহজেই স্বেচ্ছায় যায় ও আসে, ক্রন্দনের তো প্রশ্ন নাই! অন্য একটি সম্ভাবনা থাকে অবশ্য।

সীমান্তের দুইদিকের প্রহরীদের মধ্যবর্তী অংশটি এক এক সময় লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠে। অন্য প্রান্তে গমনেচ্ছু যে সব রমণী প্রহরীদের খুশি মতন দক্ষিণা মিটাইয়া দিতে পারে না, তাহাদের দেহ দান করিতে হয়। এই লীলাক্ষেত্রে বসন উন্মুক্ত করিয়া তাহাদের দক্ষিণা গায়ে গায়ে শোধ হইয়া যায়। কখনো কখনো স্বামী ও স্ত্রী যদি এক সঙ্গে থাকে, তবে স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার চক্ষের সামনেই স্ত্রীর শরীরে অনুপ্রবেশ করিতে প্রহরীরা বেশি উল্লাস বোধ করে। সেইরকম কোনো দৃশ্য উপভোগ করিবার প্রত্যাশায় ভূত ও প্রেত ব্যগ্র হইল।

কিন্তু সেরকমও কিছু ঘটিল না। এ দিকের প্রহরীরা পিটাইতে পিটাইতে দলটিকে রেখার ওপাশে ঠেলিয়া দিল। দীর্ঘ সময় ধারাবর্ষণের ফলে মধ্যবর্তী অংশটি কাদায় থিক থিক করিতেছে, তাহারই মধ্য দিয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে উহারা হামাগুড়ি দিয়া আগাইতে লাগিল।

মহা আশ্চর্যের ব্যাপার, ওপারের প্রহরীরাও তাহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিল না, এমনকি দক্ষিণা পর্যন্ত দাবি করিল না। তাহারা যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, লগুড় তুলিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল, এদিকে এসেছিস কেন? যাঃ যাঃ দূর হয়ে যা!

সেই লোকগুলি ডুকরাইয়া বলিতে লাগিল, ওগো, আমরা এদেশেরই মানুষ, ওরা ওদিকে থাকতে দিল না! আমাদের বাঁচাও।

প্রহরীরা সেই আকুল আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া নির্মমভাবে তাহাদের ঠেলিয়া দিল রেখার ওপারে। সেই অসহায় মানুষগুলি এপারে আসিয়া প্রহরীদের পায়ের ওপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, ওগো, ওরা আমাদের ঢুকতে দিল না, আমরা যাবো কোথায়, আমরা এই দেশেরই লোক, বিশ্বাস করো, আমাদের ঘরে ফিরতে দাও!

এ দিকের প্রহরীরা উহাদের আরও হিংস্র ভাবে ঠেলিয়া পার করাইয়া দিল। উহারা বাধ্য হইয়া ফিরিয়া গেল অন্যদিকে, সেখানকার প্রহরীরাও উগ্রতর ভাবে বলিল, যা যা, দূর হয়ে যা!

এই ভাবেই চলিতে লাগিল। মানুষ নয় যেন গরু ছাগল, একবার ওইদিকে তাড়া খায়, একবার এইদিকে।

ভূত ও প্রেত কিছুক্ষণ বিস্মিত হইয়া রহিল। তাহারা প্রচুর গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড, লুটপাট, উদ্বাস্তুদের স্রোত দেখিয়াছে, প্রহরীদের সংঘর্ষ ও গুলিচালনাও নতুন কিছু নয়, কিন্তু নিরীহ মানুষদের লইয়া এমন ঠেলাঠেলি প্রত্যক্ষ করে নাই।

একজন বলিল, এই মেয়ে মদ্দাগুলো তোর ভাগের লোক, ওদের নিচ্ছিস না কেন? এদিকে পাঠাচ্ছিস যে!

অন্যজন বলিল, কে বলিল আমার ভাগের? ওদের গায়ে ছাপ মারা আছে? ওদের পাঠিয়ে জমি জবর দখল করতে চাস, সে মতলব বুঝি না?

— দূর হারামজাদা : তোর ওদিকে লোকে খেতে পায় না, সেখানে কে যাবে? খেতে না পেয়েই তো ওরা এদিকে আসছে!

— ও খেকোর ব্যাটা, তোদের এদিকে বুঝি খাবারের ছড়াছড়ি? হিঃ হিঃ হিঃ! ধুঁকতে ধুঁকতে মানুষ মরছে দেখতে পাস না, চোখের মাথা খেয়েছিস?

— এখন কথা ঘোরাচ্ছিস? ওদের চেহারা দেখলে, ওদের ভাষা শুনলেই তো বোঝা যায়, ওরা কোন্‌দিকের। ওদের নাম করেই তো তুই দেশটা ভাগ করলি! এখন দায়িত্ব নেবার মুরোদ নেই।

— আমি দেশ ভাগ করেছি? তুই কুর্সিটা আমায় ছাড়লি না কেন? তাহলে এসব কিছুই হত না।

— মামারবাড়ির আবদার! আমি এত বছর জেল খাটলাম, আর তুই শুধু ফুটানি করে...

— বেশ করেছি!

— আমিও বেশ করেছি!

— এগুলোকে ওদিকে ঢুকতে দেব না।

— আমিও এগুলোকে এদিকে আসতে দেব না!

সেই নারী পুরুষের দলটিকে দুইদিকের প্রহরীরাই ঠেলাঠেলি চালাইয়া যাইতে লাগিল। প্রহরীরা জানেই না, তাহারা যা করিতেছে, তাহার মধ্যে কর্তব্যবোধ নাই, দেশপ্রেম নাই, তাহারা চালিত হইতেছে দুইটি দুষ্ট প্রেতাত্মার কৃতকর্মের প্রভাবে। যে-সব ওপরওয়ালার নিকট হইতে এই নির্দেশ আসে, তাহারাও এই দুই আত্মার মতনই কুর্সি দখলের লড়াইয়ে প্রাণপণে রত। প্রেতের মানবিকতা নাই। তাহাদের নির্দেশে কুর্সির দখলদাররাও সেই বোধ হারাইয়াছে।

একসময় সেই উভয়পক্ষের প্রহরীরাই ক্লান্ত হইল। সেই অসহায়, নাগরিকত্বহীন নাগরিকগুলি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল মধ্যস্থলে। রাত্রি ঝিমঝিম করিতেছে। মৃদু বাতাসে শিরশির করিতেছে গাছের পাতা। দুই সীমান্তের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ইংরাজীতে 'নো ম্যান্‌স ল্যান্ড' কহে। এখন সেই স্থানে যে শরীরগুলি কুণ্ডলি পাকাইয়া পড়িয়া আছে, তাহরাও যেন মনুষ্য পদবাচ্য নয়, পাশাপাশি দুই দেশই তাহাদের স্বজন মনে করে না। যদিও তাহাদের মান আছে, তবু তাহরা যেন ঘৃণ্য রোগী, এই মৃত্তিকা শয্যা যেন তাহাদের শ্মশান বা কবরস্থান। কুক্কুর ও শৃগালেরা একটু দূর হইতে চক্ষু সঙ্কীর্ণ করিয়া উহাদের লক্ষ করিতেছে। এই স্থান হইতে বহু দূরে, যাহারা এখন কুর্সির দখলদার, তাহারা এই মধ্য নিশীথের ঘুমের মধ্যেও হঠাৎ সভয়ে জাগিয়া উঠিতেছে কুর্সি হারাইবার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া।

ঐ অচেতন নারী-পুরুষগুলি আবার হয়তো জাগিয়া উঠিবে, কিন্তু উহাদের কোনো আগামীকাল নাই। উহারা নিতান্তই অতীত। ভূত ও প্রেত আবার বৃক্ষ শাখায় ফিরিয়া আসিয়া হাতাহাতি শুরু করিতে যাইবে, এমন সময় তাহাদের চোখ পড়িল আরেকটি প্রেতের উপর।

এই প্রেতটি বড় শান্ত প্রকৃতির। কাহারো সহিত বিবাদ করে না, কেহ গালি দিলেও প্রত্যুত্তরে গালি দেয় না। অনেক সময় সে নীরবে একাকী অশ্রু বর্ষণ করে। এখন সে অচৈতন্য মানুষগুলির পাশে ছলছল নেত্রে দণ্ডায়মান।

একমাত্র এই তৃতীয় প্রেতটিকে দেখিলেই পূর্বোক্ত ভূত ও প্রেতের মনোভাব এক হইয়া যায়। উভয়ে একই রকম কৌতুক বোধ করে।

দুইজনে একই সঙ্গে বলিয়া উঠিল, এই রে, ছিঁচকাঁদুনিটা এসে গেছে! এখন ভেউ ভেউ করে শুধু কাঁদবে আর কাঁদবে, আর তা কিছু পারে না! কাঁদরে, যত ইচ্ছে হয় কেঁদে যা!

জোয়ার জলের কাব্য

ইমদাদুল হক মিলন

অন্ধকারে কুয়াশার মতো নিবিড় হয়ে নেমেছে বৃষ্টি।

জোয়ার জলে কিংবা গাছের পাতায় বৃষ্টির কোনও শব্দ হয় না। হলে আমিনুলদের বাড়ির নামায় মিয়াদের ছাড়াবাড়ির সীমানায় পড়েছে যে হিজলগাছ সেই হিজলতলায় ঘাপটি মেরে বসা শফিজদ্দি এবং হাফিজদ্দি শব্দটা পেত। বৃষ্টির শব্দ তারা পায় না। তারা পায় দূরের আউশ আমন খেতে ডাকা কোলাব্যাঙের ডাক, পাটখেত ভেঙে জোয়ার জলে ছপছপ শব্দ তুলে গেরস্ত বাড়ির দিকে খাদ্যের খোঁজে আসা শেয়ালের ডাক। আর ঝিঁঝিঁর ডাক তো আছেই, রাতপোকা, কীটপতঙ্গের ডাক তো আছেই। এসব ডাক, এসব শব্দ রাতেরবেলা চিরকাল ধরেই হয়। ফলে দেশগ্রামের মানুষ এই সব শব্দকে শব্দ মনে করে না।

শফিজদ্দি হাফিজদ্দিও মনে করছিল না।

মাথার ওপরকার হিজলগাছ থেকে আসছিল হিজলফুলের মৃদু মোলায়েম একখানা গন্ধ। হিজলের ফুল হয় দুরকমের। কোনও কোনও গাছের ফুল লালরঙের কোনও কোনওটার গোলাপি।

এই গাছটির ফুলের রঙ লাল।

লাল হিজলফুলের গন্ধ কি সামান্য তীব্র হয়?

এই গাছের ফুলের গন্ধ যেন একটু তীব্র লাগছে!

জোয়ারে বাতাস থেকে থেকে বইছে। সাঁ সাঁ করে এই এল, এই উধাও হল। বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় কেমন একটা আলোড়ন ওঠে চারদিকে। হিজলের ফুল বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে। জোয়ার জলে টুপটাপ ঝরে দুএকখানা কচি হিজল ফল। হারিকেনের আলো লাফিয়ে ওঠে। বাতাস উধাও হলে আবার নির্জন হয় চারদিক। জোয়ার জলে আসে শান্ত সমাহিত ভাব। হারিকেনের আলো ফিরে পায় আপন স্বভাব। সেই আলোয় শফিজদ্দি হাফিজদ্দি দেখে আমিনুলদের বাড়ির দক্ষিণ দিককার পুকুরের জল উপচাতে শুরু করেছে। উপচে আস্তে ধীরে নেমে আসছে পুবমুখী।

বাড়ির পুবদিকে, বাড়ি থেকে নামা পথখানা চলে গেছে জাহিদ খাঁর বাড়ির সামনের সড়কের দিকে। এই পথের উত্তরে, আমিনুলদের বাড়ির লাগোয়া পুকুরখানা হাজামদের। আর দক্ষিণে মিয়াদের ছাড়াবাড়ি। পথ এবং ছাড়াবাড়ির মাঝ বরাবর দুই শরিকের সীমানা করেছে দেড় দুহাত চওড়া একখানা নালা। আমিনুলদের পুকুর থেকে নেমে পুবে চলে গেছে নালাটি। খরালিকালে চোখে পড়ে না এই নালা, আছে কি নেই বোঝা যায় না। বর্ষার মুখে মুখে মূল্যবান হয়ে ওঠে। পুকুরের জল উপচে এই নালা দিয়ে নামে। সঙ্গে নামে মাছ। সবই গুঁড়োগাড়া মাছ। তবু মাছ তো! মূল্যবান বস্তু। এই মাছের লোভে নালার মুখে সরু বাঁশের খোটাখুঁটি পুঁতে ভেশালের মতো করে জাল পাতে মেন্দাবাড়ির ছেলেরা। তাদের সঙ্গে থাকে আমিনুল। তিনচারটা দিন, দিনভর রাতভর মাছ ধরে তারা।

দিন তিন চারেকের মধ্যে যখন পুকুর ডোবা ভরে জল নামার জায়গা থাকে না তখন এই নালাটি আবার খরালিকালের মতো মূল্যহীন, আছে কি নেই বোঝা যায় না।

আজ বিকেলে এই নালার মুখে, হিজলতলায় এসে জাল পেতে বসেছে শফিজদ্দি হাফিজদ্দি। এখনও জোয়ারটা পুরো আসেনি, পুকুরের জল পুরোপুরি উপচাতে শুরু করেনি। একটু একটু করে নামছে জল। বিকেল বেলা জল নামার আয়োজন দেখতে পেয়েছিল হাফিজদ্দি। সে গিয়েছিল মেন্দাবাড়ি। ফেরার সময় জলের ভাব দেখে বাড়ি এসে শফিজদ্দিকে বলেছিল, ও শইগ্গাদা, কাম করবিনি একখান?

শফিজদ্দি একটু নির্বিকার, নরম ধরনের ছেলে। উদাস গলায় বলল, কী কাম?

মিয়ার ছাড়ার লগে জাল পাতবিনি?

কেমতে? ওহেনে জোয়ার আইছে?

হ। ইট্টু ইট্টু আইছে।

আমিনুল দেহে নাই?

কইতে পারি না। মনে হয় দেহে নাই। দেখলে তো মেন্দাবাড়ির পোলাপানগ খবর দিত। বেবাকতে মিল্লা জাল পাইত্তা বইত।

না দেখলেও কাইল বিয়ানে দেইক্কালাইব।

কাইল বিয়ানে দেখলে আমগ কী?

কথাটা বুঝতে পারল না শফিজদ্দি। বোকাসোকা মুখ করে হাফিজদ্দির দিকে তাকাল। আমরা যদি মাছ ধরতে যাই, যদি জাল পাইত্তা বহি, আমিনুল উদিস পাইলে কাইজ্জা লাগাই দিব না!

শফিজদ্দি যেমন নরম আর সরল ধরনের হাফিজদ্দি ঠিক তার উল্টো । খুবই চতুর ধরনের ছেলে সে। বারো তেরো বছর বয়সেই বেশ তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠেছে। আলকাতরার মতো তেলতেলে কালো গায়ের রঙ। মাথায় কদমের রোয়ার মতো চুল। চালচলনে বেশ একখানা ডাকাবুকো ভাব। বেজায় সাহসী। তবে গলাখানা খুব সুন্দর হাফিজদ্দির। দেশগ্রামে শোনা বয়াতিদের গান খুব ভাল গাইতে পারে। গানের নেশা খুব। মাওয়ার বাজারে গিয়ে, কাজির পাগলা জশলদিয়া বাজারে গিয়ে, মঙ্গলবার দিন গয়ালীমান্দ্রার হাটে গিয়ে যেসব দোকানে ট্রানজিস্টার রেডিও আছে সেইসব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আব্বাসউদ্দিন আর আবদুল আলীমের গান খুব মন দিয়ে শুনে আসে। তারপর দিন নেই, রাত নেই, গলায় হাফিজদ্দির শুধুই ওসব গান।

ভারি স্ফূর্তিবাজ ছেলে সে।

দেশগ্রামের বিয়ে বাড়িতে বিয়ের দুতিন দিন আগ থেকে মাইক বাজান হয়। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও এক দুদিন থাকে মাইক। ওই ধরনের অনুষ্ঠানাদি পেলে বাড়ির লোকে আর হাফিজদ্দিকে খুঁজে পায় না। সে গিয়ে ঢোকে বিয়ে বাড়িতে।

বিয়ে বাড়ির আবার সবখানে নয়। বাংলা ঘরে। যে ঘরে গাদা গাদা রেকর্ড, ব্যাটারি কলের গান, এসব নিয়ে বসে মাইকম্যান। যে ঘরের চালার ওপর কিংবা ঘরের পাশে গাছে বসান হয় মাইক, সেই ঘরে ঢুকে এককথা দুকথায় মাইকম্যানের সঙ্গে খাতির করে ফেলে। দুএকঘন্টা পর দেখা যায় হাফিজদ্দি ছাড়া মাইকম্যান আর কাউকে বুঝতেই চাইছে না, কাউকে চিনতেই চাইছে না। মাইকম্যানের খাওয়া শোয়ার তদারকি থেকে শুরু করে সব কাজই হাফিজদ্দি করছে। মাইকম্যান হয়ত ঘুমোচ্ছে, দেখা গেল তার আসল কাজটাই করে দিচ্ছে হাফিজদ্দি।

কলের গান পাম্প করছে, রেকর্ড বদলাচ্ছে, ভোঁতা হয়ে যাওয়া পিন বদলে নতুন পিন লাগাচ্ছে।

আসলে যে কোনও ধরনের নতুন কাজে, মজাদার, দুঃসাহসী কাজে অপরিসীম উৎসাহ হাফিজদ্দির। আমিনুলদের বাড়ির নামায় জাল পাতার উৎসাহটাও এই জন্যই হয়েছিল। শফিজদ্দির কথা শুনে সে বলে, আমিনুল কাইজ্জা লাগবই না। আমিনুল হইছে অর বাপের লাহান। মাইনষের লগে কাইজ্জা কিত্তন করে না। তয় আমিনুলের মায় লাগাইব।

তাইলে কেমতে ওহেনে গিয়া জাল পাততে চাস তুই?

এমতেঐ চাই।

তারপর একটু থেমে নিজের বুদ্ধিটা খুলে বলেছিল হাফিজদ্দি। এখনও জোয়ার তেমন আসেনি জায়গাটায়। দুপুর নাগাদ পুরোপুরি আসবে। তখন গিয়ে জাল পাতলে একটা দুটো মাছ যাই পাওয়া গেল অসুবিধা নেই। রাত দুপুরে জোয়ারটা যখন পুরো আসবে তখন নামবে মাছ। আমিনুলদের পুকুরটা জংলা মতন। ওই পুকুরে নানান পদের মাছ। শিং মাগুর কৈ শোল গজার টাকি ফলি নলা আর পুঁটি টেংরা তো আছেই। রাত দুপুর থেকে সকাল পর্যন্ত ধরলে দু'তিন ডুলা হবে। সকালবেলা আমিনুলদের বাড়ির লোকজন জেগে ওঠার আগেই জাল গুটিয়ে বাড়ি চলে আসবে।

শুনে শফিজদ্দি বলল, তয় অহন গিয়া জাল পাতলে যদি অরা দেইক্কালায়?

হাফিজদ্দি বলল, দেখব না। আর যদি দেহেও কোনও অসুবিধা নাই। অহন গিয়া জাল পাতুম আমগ সীমানায়। তাইলে ওরা দেখলেও কথা কইব না। হাজ অওনের লগে লগে জাল উডাইয়া ইজল গাছতলায় নিয়া পাতুম। রাইতে আমিনুলগ বাড়ির মাইনষে ঘর থিকা বাইর হয় না।

ব্যাপারটা তারপর বুঝল শফিজদ্দি। বুঝে তারও বেশ উৎসাহ হল। কিছু একটা করতে পারলে মন্দ হয় না। এরকম মেঘবৃষ্টির দিনে শরীরের ভেতর কেমন একখানা ম্যাজম্যাজে ভাব হয়। ভারি অলস লাগে। একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকলে ভাল লাগবে।

দুভাই তারপর বিপুল উদ্যমে কাজে লেগেছিল। নিজের কথা মতো কাজ করেছে হাফিজদ্দি। প্রথমে গিয়ে নিজেদের সীমানায় জাল পেতেছে। ফলে ওই নিয়ে কোনও কথা হয়নি। যদিও জাল পাতার সময় আমিনুলের ছোট বোন হামিদা দেখে ফেলেছিল। সে গিয়ে মাকে ডেকে এনেছে। কিন্তু তাদের সীমানায় নয় বলে ওই নিয়ে কথা বলেনি আমিনুলের মা। সন্ধের পর জাল তুলে আসল জায়গায় এনে পেতেছে শফিজদ্দি হাফিজদ্দি। দুটো একটা মাছ তারপর থেকে পাচ্ছে। তবে আমিনুলদের পুকুরের আসল মাছ নয়। পুটি কিংবা টেংরা পাচ্ছে। আসল মাছ নামবে গভীর রাতে। কৈ শিঙ মাগুর ফলি নলা শোল গজার টাকি কিংবা বোয়ালের বাচ্চা। সেই আশায় নালার দুপারে বসে থাকে দুভাই । ওপারে হিজলগাছের তলায় হাফিজদ্দি, এপারে শফিজদ্দি। মাঝখানে ভেঁশালের মতো পাতা জাল। হাফিজদ্দির পায়ের কাছে হারিকেন আর ডুলা। গুঁড়ো বৃষ্টিটা বাড়ছেই। চারদিককার অন্ধকার অন্ধকারের মতো গাঢ় হয়ে আছে। এই অন্ধকারে হারিকেনের আলো পার্থিব কোনও আলো মনে হয় না। মনে হয় এ এক অপার্থিব আলো। কোথাকার কোন অচিনলোক থেকে এসে মিয়াদের ছাড়াবাড়ির হিজলগাছের তলায় পড়েছে।

সন্ধের পর থেকেই উপচাতে শুরু করেছে পুকুরের জল। ছোট্ট নালা ঠেলে নামতে শুরু

করেছে। আস্তে ধীরে বেগ বাড়ছে জলের। জোয়ার বেশ জোরাল হয়েছে। ফলে নালার জলে কলকল কলকল শব্দ। এই শব্দে আস্তে ধীরে চাপা পড়ছে চারপাশের ঝিঁঝিঁর ডাক, রাতপোকা, কীটপতঙ্গের ডাক। গেরস্ত বাড়ির পালা কুকুরের ডাক শোনা যায় না। শেয়ালের পায়ে জল ভাঙার শব্দ পাওয়া যায় না। আউশ আমনের খেত থেকে, পাট খেতের নিবিড় অন্ধকার থেকে মুছে যায় কোলাব্যাঙের ডাক। ডিম ছাড়ার ক্লান্তিতে বুঝি ঘুমিয়ে পড়ে ব্যাঙেরা। মাথার ওপর দিয়ে বাদুড়ও উড়ে যায় না। সম্পূর্ণ নির্জন হয় প্রকৃতি।

এই নির্জনতার মানে কী?

এই নির্জনতা কি শুধুই মাছেদের জন্য?

এরকম নির্জনতা না পেলে কি জঙ্গুলে পুকুরে বহুকাল ধরে ঘাপটি মেরে থাকা মূল্যবান মাছ তার পরিচিত আবাস বদল করে না? জোয়ার জলে গা ভাসিয়ে নেমে যায় না যে দিকে দুচোখ যায়?

প্রকৃতি কি মাছেদের জন্যই তৈরি করে এমন নির্জন, সুনসান সময়!

এই পরিবেশটা যেন হঠাৎ করেই খেয়াল করল শফিজদ্দি। জালে এখন অবিরাম মাছ পড়ছে। দু একখানা কৈ, দু একখানা ফলি, টাকি কিংবা শিং। থেকে থেকে জাল তুলছে হাফিজদ্দি, মাছ তুলে রাখছে ডুলায়। কাজ যা করার সেই করছে। শফিজদ্দি আছে উদাস হয়ে।

তার উদাসীনতা কেটে যায় নির্জনতায়। মনের ভেতর কেমন একটা ভয় ভয় ভাব হয়। মৃদু শব্দে গলা খাঁকারি দেয় শফিজদ্দি। ওই হাইপ্পা!

হাফিজদ্দি ডুলায় মাছ রাখতে রাখতে বলল, কী?

তুই কিছু খ্যাল করছস?

কী খ্যাল করুম?

চাইরমিহি কেমুন নিটাল হইয়া গেছে?

হইবঐতো। রাইত দুইফরে নিটাল হইব না?

এমুন নিটাল হয় না।

হাফিজদ্দি থিক করে হাসল। না হইলে আজ হইছে কেমতে?

এইডাঐতো তরে কইতে চাই।

আইচ্ছা ক।

আমার কেমুন জানি লাগে।

কেমুন লাগে?

ডর করে।

কিয়ের ডর?

তুই বোজচ না?

না।

জোয়াইরা মাছের লগে তারা থাকে।

তারা কারা?

কইতে ডর করে।

হাফিজদ্দি নির্বিকার গলায় বলল, তাইলে কইচ না।

শফিজদ্দি ভীতু গলায় বলল, না কইয়াঐ তো পারতাছি না।

তারপর ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে মাথার ওপরকার অন্ধকারে হিজলগাছটির দিকে তাকাল শফিজদ্দি। ফিসফিসে গলায় বলল, এই গাছে একজন আছে।

হাফিজদ্দি খুবই অবাক হল।

চঞ্চল চোখে মাথার ওপরকার গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকা হিজলগাছটির দিকে তাকাল। কে আছে এই গাছে? কেডা?

উত্তেজনায় তার গলার স্বর বেশ চড়েছে। কোথাও কোনও শব্দ ছিল না। চরাচর ডুবেছিল সুনসান নীরবতায়। এই নীরবতার খুব ভেতর থেকে কলকল কলকল শব্দে ভেসে আসছে জল নেমে আসার মৃদু মোলায়েম একখানা শব্দ। ঝিঁঝিঁ কিংবা কীটপতঙ্গের ডাকের মতো এই শব্দকেও এখন আর শব্দ মনে হয় না। মনে হয় এই শব্দও বুঝি নীরবতার অংশ। ফলে হাফিজদ্দির গলার স্বর ডিম ছাড়ায় মত্ত কোলাব্যাঙের ডাকের মতো তীক্ষ্ণ মনে হয়।

শুনে শফিজদ্দি কেমন ভড়কে গেল। দিশেহারা গলায় বলল, আস্তে কথা ক।

হাফিজদ্দি সরল গলায় বলল, ক্যা, আস্তে কথা কমু ক্যা? কী হইছে? কেডা আছে গাছের ওপরে ক আমারে! রাতে দুইফরে কে আইয়া ইজলগাছে উইট্টা বইয়া রইছে?

হাফিজদ্দি যত চড়া গলায় কথা বলে, শফিজদ্দি গলা তত নামায়। তুই বোজছ নাই?

না।

কোনও মানুষজন না।

তয়?

শফিজদ্দি ভয়ে ভয়ে আবার হিজলগাছের দিকে তাকাল। কাতর গলায় বলল, রাইত দোফরে এহেনে বইয়া এই হগল কথা তরে কেমতে কই?

ক্যা, কইলে কী হইছে?

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে নির্বিকার ভঙ্গিতে জাল তুলছে হাফিজদ্দি, মাছ তুলে রাখছে ডুলায়। তোলার সময় কোনও কোনও মাছ খলবল খলবল শব্দ করে। জাল থেকে ডুলায় তোলার পরও শব্দটা সহজে কমে না, ডুলার অন্যান্য মাছের সঙ্গে মিলেমিশে লাফঝাঁপ দেয়। তারপর হঠাৎ আসা জোয়ারে বাতাসের মতো যেমন করে আসে তেমন করেই যেন থেমে যায়।

জলের বেগ এখন আরও বেড়েছে। কলকল কলকল শব্দে পুকুরভাসা জল ছুটে আসছে। জলের সঙ্গে জলের বেগে আসছে মাছ। আমিনুলদের পুকুরের আসল মাছ। কৈ শিং ফলি শোল টাকি গজার টাকি দুএকখানা ছোট বাইন, একটা তারাবাইনও এসেছে খানিক আগে।

তারাবাইন বাইন হয়েও পদে অন্য। বিঘত দেড়েক লম্বা হয়। বড় শিংয়ের মতো মোটা। শরীরে তারার মতো ফোঁটা।

মাছটা দেখে হাফিজদ্দি খুব খুশি হয়েছিল। একটু নতুন, একটু অন্যরকম যে কোনও ব্যাপারে তার ভারি আমোদ।

বৃষ্টি এখন আছে কি নেই বোঝা যায় না। থাকলেও কুয়াশার মতো মিহিন হয়ে ঝরছে। হিজলের পাতায় জমে জমে, বড় ফোঁটার আকার ধরে ক্ষণে ক্ষণে টুপটাপ ঝরে। জোয়ার জল কিংবা গাছতলায় বসা হাফিজদ্দি শফিজদ্দির মাথায় পিঠে মুখে বুকে পড়ে।

জলে থেকে জলের কথা কে ভাবে!

শফিজদ্দি হাফিজদ্দিও ভাবছিল না।

তবে হারিকেনের চিমনিতে কাচে দুচার ফোঁটা জল পড়লেই, জোয়ারে বাতাসে হারিকেন নিভু নিভু হলেই দুভাই একসঙ্গে ব্যস্ত হচ্ছিল। যদি হারিকেন নিভে যায়! যদি বৃষ্টির জলে আর আগুনের তাপে চট করে ফাটে কাচ!

ওই হলে আর মাছ ধরা হবে না। এমনিতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার, হাতের কাছের মানুষ চোখে পড়ে না। তার ওপর আছে হিজলের অন্ধকার, বৃষ্টি। অন্ধকারে মাছ তুলতে গিয়ে পোকা শিংয়ের কাঁটা খাবে। ওই কাঁটায় জব্বর বিষ। হলুদ বাটা আর চুন লাগিয়ে রাখলেও তিনদিন লাগবে সারতে।

তার ওপর আছে সাপ।

জলের সাপ, ঢোড়া, মেটেপোড়া। লোকে বলে ধোরা, মাইট্টাপোড়া।

জোয়ার জলে ভেসে, জলের টানে বাইন মাছের মতো জালে এসে জড়ায় এই দুরকম সাপ। অন্ধকারে বাইনমাছ মনে করে ধরলেই হল! কামড়ে বিষ তেমন নেই, তবে খুব জ্বলুনি হয়।

আর বাইন মাছই বা কী নিরীহ মাছ?

কায়দা মতো ধরতে না পারলে পেটের ভেতর লুকিয়ে রাখা বেলকাটার মতো মোটা চকচকে কাঁটাখানা বের করে হাতের তালু ফালা ফালা করবে।

সাপ এবং বাইনের মতো আছে আরেকখানা জীব। কুইচ্চা। কুইচ্চাও আসে যখন তখন। কুইচ্চার কামড়েও বিষ কম। কেউ কেউ বাইন মাছের কায়দায় রেঁধে খায়। খুব নাকি তেল! হাজাম বাড়ির কেউ কুইচ্চা খায় না।

হাফিজদ্দির খুব ইচ্ছা করে তেলতেলে মোটা একখানা কুইচ্চা একবার রেঁধে খায়। খেতে কেমন, খেয়ে দেখে।

শফিজদ্দি বলল, কী রে হাইপ্পা, কথা কচ না ক্যা?

মাছ তোলায় ব্যস্ত হাফিজদ্দি কখন থেমে গিয়েছিল খেয়াল করেনি। শফিজদ্দির কথা শুনে বলল, কইলাম তো! তুইঐত্তো কচ না।

কইতে ডর করে।

তুই একখান ডরহিয়াইপ্পা।

হোনলে তুইও ডরাইবি।

কে কইছে তরে?

কে আবার কইব? আমিঐ কই।

তুই কইলেই অইবনি! আমি কিচ্ছুরে ডরাই না।

তয় মনে হয় তুই বোজছস।

হাফিজদ্দি খিক করে হাসল। না বুঝি নাই। তুই ক। কইলে বুজুম।

কওনের পর তো এহেনে বইয়া আর মাছ ধরতে চাবি না নে।

কে কইছে তরে?

আমি কই।

না। তুই অহন গেলেগাও আমি যামু না।

শফিজদ্দি খুবই অবাক হল। একলা একলা মাছ ধরবি?

হ।

হারারাইত?

তয় ধরুম না? এমুন মাছ আর কোনওহানে পামুনি। আইজ রাইতের পর তো আর এহেনে আইয়াও বইতে পারুম না। কাইল বিয়ানেঐত্তো আমিনুলের লগে মেন্দাবাড়ির পোলাপানে আইয়া জাল পাতব। আমগ মাছ ধরতে দিব না।

শফিজদ্দি চুপ করে রইল।

হাফিজদ্দি বলল, কচ না?

না থাউক।

ক্যা?

এমতেঐ।

তয় চুপ কইরা থাকবিনি?

হ।

না, চুপ কইরা থাকলে আমার ভাল্লাগে না। ইজলগাছে কেডা আছে কওন লাগব তর। এই হগল কইতে যদি ডর করে তর তাইলে অন্যকথা ক। কিচ্ছা ক একখান। তুই কিচ্ছা ক আর আমি মাছ ধরি। দেখবি রাইত কেমতে পোয়াইয়া যায়।

এ সময় শাঁ শাঁ করে ছুটে আসে জোয়ারে বাতাস। গেরস্ত বাড়ির গাছপালায়, শফিজদ্দি হাফিজদ্দির মাথার ওপরকার হিজলগাছে, হিজলের ডালপালায় সাড়া পড়ে।

জোয়ারে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় মাছেরা যেমন সাবধান হয়, যতক্ষণ বাতাস বয় জল নামে ঠিকই, মাছ নামে না। হারিকেনের আলো নিভু নিভু হয়ে আসে। দুহাতে চিমনি ঢেকে হাওয়া আড়াল করে আলো বাঁচায় শফিজদ্দি।

জোয়ারে বাতাস উধাও হওয়ার পর শফিজদ্দি ফিসফিস গলায় বলল, তুই কোনও গন্দ পাচ হাইপ্পা?

কিয়ের গন্দ?

নাক পাত পাবি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে, ওপর নিচ তাকিয়ে দুতিনবার নাক টানল হাফিজদ্দি। না পাই না তো!

কোনও গন্দ পাচ না?

হ পাই। মাছের গন্দ, পানির গন্দ।

আর কিছু পাচ না?

হ পাই। হারিকলের গন্দ পাই, কেরাসিন তেলের গন্দ পাই।

শফিজদ্দি একটু অস্থির হল। আরে না, এই হগল গন্দের কথা আমি কই না।

তয় কিসের গন্দের কথা কচ?

ফুলের গন্দ। ফুলের একখান গন্দ পাইতাছস না?

হ পাই তো?

কী ফুলের গন্দ ক তো?

কী ফুল আবার! ইজলফুল। ইজলফুলের গন্দ পাইতাছি। জোয়াইরা বাতাস ছাড়লে

ইজলফুলের গন্দ ছোড়ে।

না এইডা ইজলফুলের গন্দ না।

তয়?

শফিজদ্দি চুপ করে থাকে। শফিজদ্দি কী ভাবে!

হাফিজদ্দি বলল, কীরে, কচ না কী ফুলের গন্দ?

এই ফুলের নাম আমি জানি না।

গন্দডা আহে কই থিকা?

তর মাথার ওপরের ইজলগাছ থিকা।

ইজলগাছ থিকা অন্য ফুলের গন্দ কেমতে আহে? ইজলগাছে কি অন্য ফুল ধরেনি?

না। একগাছে আরেক ফুল কেমতে ধরে?

তয়?

এই গাছে যে আছে গন্দডা তার।

হাফিজদ্দি আবার চমকাল। কী?

হ।

এবার হাফিজদ্দি একটু নড়েচড়ে উঠল। চড়া গলায় বলল, তর কথাবার্তা আমি কিছুঐ বুজতাছি না শইপ্পাদা। তুই যা কইতে চাছ কইয়া ফ্যালা। আমি ডরামু না। ডর ভয় আমার নাই। আর যেই কথা তুই কবি, আমার খালি মনে হয় এই রাইত দুইফরে ইজলতলায় বইয়া জোয়াইরা মাছ ধরতে ধরতে হেই হগল কথা হোনতে আমার খুব আমদ লাগব।

শফিজদ্দি মিনমিনে গলায় বলল, এমুন জাগায় বইয়া এই হগল কথা তো কেঐ কয় না।

কয় না ক্যা?

হোনলে মাইনষের ডর আরও বাড়ে। এই হগল কথা মাইনষে কয় দিনদোফরে। রাইত বিরাইতে কইলেও ঘরে বইয়া কয়।

আমার কাছে দিনদোফর আর রাইতদোফর এক কথাঐ, ঘর আর ইজলতলা এক কথাঐ। তুই ক গাছে কেডা, গন্দ কী ফুলের?

তর নাইলে ডর নাই আমার তো আছে!

ভাইকে সাহস দেয়ার গলায় হাফিজদ্দি বলল, ডরাইচ না। আমি আছি। আর আমি তো আছি ইজলতলায়, তুই আছস ইট্টু দূরে। তর কিয়ের ডর? তুই ক।

শফিজদ্দি তবু দ্বিধা করে। তবু বলতে চায় না।

গভীর রাত তখন আরও গভীর হয়। নির্জনতা জোয়ার জলের মতো ধেয়ে আসে। বৃষ্টি আর অন্ধকার মিলেমিশে একাকার হয়। আউশ আমনের খেতে, পাটের খেতে মৌন হয় মুখর ঝিঁঝি। অন্ধকারে আকাশ দেখা যায় না, অন্ধকারে গাছপালা জলমাটি দেখা যায় না।

এসময় হিজল ফুলের গন্ধ কি চড়া হয়!

অন্য সময়ের তুলনায় এরকম রাত দুপুরে আপন গন্ধে কি বিভোর হয় হিজল!

নাকি এ সত্যি সত্যি অন্য এক গন্ধ?

অচিন গন্ধ!

কোন সুদূর থেকে ভেসে আসে কেউ জানে না!

নাকি এই গন্ধ আসে খুব কাছ থেকে!

নাকি এই গন্ধ কোনও আলৌকিক গন্ধ! মাথার ওপর কিংবা পাশে বসে ছড়িয়ে যায় কোনও অশরীরী অস্তিত্ব!

হাফিজদ্দি বলল, ও শইপ্পাদা কচ না গাছে কেডা? গন্দ কিয়ের?

ধীর গম্ভীর গলায় শফিজদ্দি বলল, এই গাছে যে থাকে সে এখন আসছে। গন্দখান তাগ শইল্লের। তাগ শইল্লে নানান পদের গন্দ। কেঐর শইল্লের গন্দ পচা মাছের, কেঐর শইল্লের গন্দ খাডাসের। কেঐর শইল্লে মুদ্দারের গন্দ, কেঐর শইল্লে গোলাপ ফুলের। এই গাছে যে আছে তারডা হইল গোলাপ ফুলের।

হাফিজদ্দি বলল, হেয় কে?

হেয় একখান শকশ।

শফিজদ্দির কথা শুনে তার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল হাফিজদ্দি। তারপর হেসে ফেলল। ক'জন আমারে ডর দেহাইতাছস শইপ্পাদা? ডর দেহাইয়া লাব নাই। আমি ডরামু না।

শফিজদ্দি আগের মতোই গম্ভীর গলায় বলল, ডর দেহাই না। তরে ডর দেহাইয়া আমার লাব কী! অনিষ্ট হইলে তো দুই ভাইয়েরঐ হইব! এই গাছে যে একখান আছে তুই জানচ না? হোনচ নাই?

হুনছি। তয় এই হগল আমি বিশ্বাস করি না। নিজের চোক্কে যা না দেখি, তা আমি বিশ্বাস করি না। তুই যে আমারে কইতাছস, তুই কোনওদিন দেকছস?

না, আমি দেহি নাই, তয় মেন্দাবাড়ির পোলাপানে দেখছে। আমিনুল দেখছে।

কবে?

আর বছর। জোয়াইরা দিনে।

কী দেখছে?

এহেনে বইয়া মাছ ধরতাছিল। আমিনুল ছানা সেন্টু রব মোতালেব। তালেব আছিল, না,না, আছিল কইতে পারি না, তয় আজাদ আছিল। রাইত দোফরে, চাইর মিহি যহন এমুন নিটাল হইছে, ছাড়াবাড়ির ওপরে থিকা, ওই যে গাবগাছটা আছে, ওই গাছের মিহি থিকা হা হা হা হা, হা হা হা হা আওজ হুনা গেল। পয়লা পোরথম অরা কিছু বোজতে পারে নাই। মনে করছে জোয়াইরা বাতাসে গাছের ডাইলে ডাইল লাইগগা এমন আওজ হইতাছে। কেঐ আর খ্যাল করে নাই। বাতাস থাইমমা যাওনের পর আবার ওই রকম আওজ। এইবার আওজটা আরও সামনে আউগগাইয়া আইছে, আরও জোরে হইতাছে। গাবগাছতলা থিকা যেন এই ইজলগাছ মিহি আউগগাইয়া আইতাছে কেঐ আর আওজ বাড়তাছে। তিনবারের বার সেন্টু পয়লা বোজছে। বুইজজা জাল ডুলা হালাইয়া, মাছ ধরন হালাইয়া ফাল দিয়া উটছে। অর দেহাদেহি বেবাকতে মিল্লা দৌড় দিছে। দৌড় দিয়া আমিনুলগ বাইত্তে গিয়া উটছে। বেবাক কথা হুইন্না আমিনুলের বাপে কইল, ওইডা তেমুন খারাপ জিনিস না। খারাপ হইলে তগ অনিষ্ট করত। খারাপ না দেইক্কাঐ দূর থিকা আওজ দিয়া তগ সরাইয়া দিছে। ইজলগাছটায় থাকে তো, তরা এতডি মানুষ ইজলতলায় বইয়া মাছ ধরতাছস, এতডি মাইনষের সামনে হেয় আসে কেমতে! এর লেইগা অমুন করছে। তারবাদে তগ মইদ্যে আছে মামু ভাইগনা। মামু ভাইগনাগ সামনেও হেরা আইতে পারে না।

এসব কথা হাফিজদ্দি যেন গায়েই মাখল না। জালে আটকে কি একটা মাছ ছটফট করছিল।

তাড়াতাড়ি জালটা তুলল সে। তুলে খুশি হয়ে গেল। বিঘতখানেক লম্বা একখানা সরপুঁটি পড়েছে জালে। সন্ধে থেকে এই এতটা রাত অব্দি এতপদের মাছ পড়েছে জালে কিন্তু সরপুঁটি পড়েনি একটাও।

এই মাছটা খুব পছন্দ হাফিজদ্দির। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন স্বাদ।

অতিযত্নে মাছটা মুঠোয় চেপে ধরল হাফিজদ্দি। তারপর হারিকেনের আলোয় চোখের সামনে তুলে ধরল। কায়দার একখান মাছ পাইলাম শইল্লাদা!

শফিজদ্দি আছে নিজের ভিতরে, অন্য এক জগতে, অন্য এক বিষয় নিয়ে। ফলে সরপুঁটিটা সে দেখতেই পেল না। চিন্তিত চোখে হিজলগাছটার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাছটা ডুলায় রেখে হাফিজদ্দি বলল, জিগাইলি না কায়দার মাছখান কী?

শফিজদ্দি নির্বিকার গলায় বলল, কী?

সরপুডি।

শফিজদ্দি কোনও উৎসাহ দেখাল না।

হাফিজদ্দি চটপটে গলায় বলল, আইচ্ছা ক তারবাদে কী হইল?

শফিজদ্দি বলল, কিছু হয় নাই। তারা আর রাইত দোফরে এহেনে বইয়া মাছ ধরে নাই।

কচ কী?

হ। হারাদিন ধরছে। হাজ হওনের লগে লগে বাইত গেছে গা।

এ কথা শুনে আনন্দে একেবারে ফেটে পড়ল হাফিজদ্দি। ইবারও যদি রাইত্রে তারা মাছ না ধরতে বহে তাইলে একখান কাম হইব।

কী কাম?

তুই আর আমি আইয়া বমু।

কেমতে?

বুদ্ধিটা তারপর খুলে বলল হাফিজদ্দি। বিয়াল থিকা আমগ বাড়ির ঘাডে বইয়া থাকুম আমি। বইয়া বইয়া দেহম কুনসুম তারা জাল উডাইয়া বাইত্তে যায়গা। তারা যাওনের লগে লগে জালডুলা লইয়া, হারিকল লইয়া তুই আর আমি আইয়া বমু। তারা ধরব হারাদিন, আমরা ধরমু হারারাইত। রাইতেঐ আসল মাছটি পাওয়া যাইব। দেহচ না এই যে পাইতাছি!

শফিজদ্দি ভীতু গলায় বলল, তা তো পাইতাছস! তয় আমার যে ডর করে?

ডরের মইদ্যে ডরের কথা কইলে আর ডর থাকে না। ক, মামা ভাইগনার কথাডা ক। মামা ভাইগনা এক লগে থাকলে তারা সামনে আইতে পারে না।

অগ লগে মামা ভাইগনা আছিল কেডা?

আজাদ আছিল না? আজাদ তো রব মোতালেবের ভাইগনা। আমিনুলেরও ভাইগনা। আপন ভাইগনা না, চাচাতো ভাইগনা।

আমি হুনছি লগে আগুন থাকলেও তারা সামনে আহে না।

হ। আগুনরে তারা ডরায়।

তাইলে যে তুই কইলি এই গাছে যে থাকে সে অহন আইছে? কেমতে আইব? আমাগ লগে তো আগুন আছে? এই যে হারিকলডা আঙতাছে।

শফিজদ্দি কেমন একটা চিন্তায় পড়ল। তাইলে অচিনফুলের ঘেরানডা আইল কই থিকা?

অচিনফুলের ঘেরান আহে নাই। আইছে ইজলফুলের ঘেরান।

না ওইডা ইজলফুলের ঘেরান না।

তাইলে ঘেরানডা অহন পাইতাছি না ক্যা? ঘেরানডা গেল কই?

শফিজদ্দি কথা বলে না। নিজের মধ্যে যেন ডুবে থাকে।

হাফিজদ্দি বলল, তাগ শইল্লের ঘেরানের কথা তুই জানলি কেমতে?

হুনছি।

কার কাছে?

কত মাইনষের কাছে। তেজাবার বাইয্যাকালে তাগ শইল্লের ঘেরান পাইছিল সেন্টু আর আজাদ। আজাদগ কোষা লইয়া তারা গেছিল বষ্টিছাড়ার লগে যে চন্দ্রেরবাড়ি ওই বাইত্তে ধরাছি খেলা দেখতে। হাজ খালি হইছে, কোষা লইয়া বাইত মেলা দিছে অরা। দারগা বাড়ির পুব দক্ষিণ কোণায়, চর্দরি বাড়ির পুকঐরের লগের খাল দিয়া আইতাছে, খালের দক্ষিণ মিহির বাড়ির একখান গাছ থিকা আইজকার লাহান অচিন একখান ফুলের ঘেরান আইল। কোষায় মিলনও আছিল। অরে কোষার মাঝখানে বহাইয়া সেন্টু পাছায় থিকা নৌকা বায় আর আগায় বইয়া আজাদ বইডা টানে। ঘেরানডা পয়লা পাইল মিলন। পোলাপান মানুষ তো, বোজে নাই। ঘেরান পাইয়া খুশি হইয়া গেল। কইল, কী সোন্দর ফুলের ঘেরান আইতাছে। ও সেন্টুদা, এইডা কী ফুল? কী ফুলের ঘেরান?

সেন্টু আর আজাদ দুইজনে ঐ ঘেরানডা তহন পাইয়া গেছে। আজাদ কিছু বোজে নাই, তয় সেন্টু বোজছে। বুইজজা নিজে তাড়াতাড়ি বইঠা চাপ দিল। আজাদরে কইল তাড়াতাড়ি টান দে। বাইত্তে আহনের পর বেবাক হুইন্না আজাদের বুজি কইল, জাগাডা ভাল না। যেই গাছ থন ফুলের ঘেরান আইছে ওই গাছে একজন থাকে। কালী সন্ধ্যায় তাগ শইল্লের ঘেরান পাওয়া যায়। নিশি রাইতে পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় কোনও কোনও দোফরে। যহন দিন দোফরে রাইত দোফরের লাহান নিটাল হয় চাইর মিহি।

হাফিজদ্দি এবার কেমন বিরক্ত হল। ধুৎ এই হগল প্যাচাইল হোনতে হোনতে কান বয়রা হইয়া গেল। বাদ দে এই প্যাচাইল। এই হগল মিছা কথা। যুদি নিজের চোক্কে কোনওদিন কিছু দেহচ তয় বিশ্বাস করবি। এহেনে তুই আর আমি ছাড়া কেঐ নাই। ইজলগাছেও নাই, আমগ সামনেও নাই। ফুলের কোনও ঘেরানও আহে নাই। যেই ঘেরান আসছে ওইডা ইজলফুলের ঘেরান।

শফিজদ্দি তবু বলল, তয় আরবছর কিয়ে ডর দেহাইছিল আমিনুলগ?

হেইডা আমি কেমতে কমু?

আর ঐযে ফুলের ঘেরানডা পাইছিল আজাদ মিলন আর সেন্টু? ওইডা কোন ফুলের ঘেরান?

ঐ বাইত্তে মনে হয় কোনও ফুল ফোটছিল। ঐ ফুলের ঘেরান মনে হয় আগে কোনও দিন অরা পায় নাই।

তাইলে আজাদের বুজি কি মিছা কথা কইছে?

যা মন চায় কউকগা। এই প্যাচাইল তুই বাদদে। তর যুদি এহেনে বইয়া মাছ ধরতে ডর করে, তুই বাইত্তে যা গা। আর যুদি থাকচ তয় বুজিচ এহেনে কিচ্ছু নাই। তুই কইলে আমি ইজল গাছে উইট্টা দেখতে পারি। দেহুম?

শফিজদ্দি মিনমিনে গলায় বলল, কাম নাই।

হাফিজদ্দি হাসল। তয় একখান কাম করি?

কী কাম?

শকশডারে ডাক দেই। যদি থাকে তাইলে হুমইর দিব।

শফিজদ্দি ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। কচ কী তুই!

হ। ডাক দিয়া দেহি।

বলেই গলা সামান্য চড়াল হাফিজদ্দি। সেই অলৌকিক শকশকে ডাকল। হাচাঐ আপনে আছেননি এহেনে? আ? আছেন? থাকলে হুমইর দেন। ও মিয়াভাই, কোন পদের শকশ আপনে? হুমইর দেন না ক্যা?

হাফিজদ্দি তার মতো করে ডেকে দেয়, কোথাও কোনওদিকে থেকে সাড়া আসে না। মাথার ওপরকার হিজলগাছ আপন স্বভাবে বিভোর হয়ে, রাত দুপুরকার অন্ধকার আর বৃষ্টিতে, জোয়ারে বাতাসে জুবুথুবু হয়ে থাকে। আমিনুলদের পুকুরের পুকুরভাসা জল জলের স্বভাবে নেমে আসে। কলকল কলকল শব্দে টের পাওয়া যায় জলের চলাচল। ভয়টা কেমন কাটতে থাকে শফিজদ্দির। মনের গহনে চাপা পড়া সব শব্দ যেন একটু একটু করে জেগে ওঠে। চারদিককার ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে পায় সে। রাতপোকা, কীটপতঙ্গের ডাক শুনতে পায়। আউশ আমনের খেতে, পাটখেতের গহন অন্ধকারে ডিমছাড়ায় মত্ত কোলাব্যাঙের ডাক শুনতে পায়। পায়ে জল ভেঙে গেরস্ত বাড়ির দিকে হেঁটে যাওয়া শেয়ালের শব্দ পায়। গেরস্ত বাড়ির পালা কুকুর খেউ খেউ করে। মাথার ওপর দিয়ে ডানায় অন্ধকার আর বৃষ্টি মেখে উড়ে যায় বাদুড়। থেকে থেকে আসে হিজল ফুলের গন্ধ। হাফিজদ্দি জাল তোলে, জাল ফেলে। হিজল ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয় জোয়ারে মাছের তাজা গন্ধ।

শফিজদ্দি বেশ বড় করে একটা শ্বাস ফেলল। তারপর খোলামেলা গলায় বলল, তয় এইডা কইলাম ঠিকরে হাইপ্পা, জোয়াইরা মাছের লগে শকশ থাকে।

ডুলা তুলে মাছের ওজন দেখল হাফিজদ্দি। থাকলে থাকুক গা।

তুই সিন্দুইরা বোয়াল গজারের কথা হোনছস?

হুনছি। তয় ভাল কইরা হুনি নাই।

হুনবি?

ক। তয় তর যুদি ডর করে তাইলে কইচ না।

না অহন আর ডর করে না।

তয় ক।

সিন্দুইরা গজার থাকে মাইনষের পুকঐরে। তয় সব পুকঐরে থাকে না। বেশি খাই যেই

হগল পুকঐর ওই হগল পুকঐরে থাকে। জংলা নিটাল পুকঐরে থাকে। ঠাকুর বাড়ির মাঝেখানকার পুকঐরে একখান আছে। বিরাট গজার। কপালে সিন্দুরের লাল একখান ফোডা। এই গজার আসলে গজার না। এই গজার হইল শকশ। এই গজার দেইক্কা কেঐ যুদি ঝাকিজাল দিয়া খ্যাও দেয়, পলো দিয়া চাব দেয়, জুতি টেডা দিয়া কোপ দেয় তাইলে অর মরণ। গজারের শইল্লে তো জুতি টেডার কোপ লাগবঐ না, ঝাকিজাল আর পলোর তলে তো হেই মাছ পড়বঐ না, কামডা যে করব, তার জানডা যাইব।

কেমতে?

জুরজুারি হইয়া মরব।

ঐ মাছখান আমি দেখতে চাই।

কী?

হ। দেখলেঐ হালারে জুতি দিয়া কোপ দিমু। তারবাদে দেহুম কেডা মরে। মাছ না আমি।

শফিজদ্দি ভয়ার্ত গলায় বলল, খবরদার হাইপ্পা, এমুন কথা কইচ না।

হাফিজদ্দি হাসল। ঠাকুরের পুকঐরে তো আছে সিন্দুইরা গজার?

হ।

তাইলে অরে আমি খাইছি।

শফিজদ্দি আর কথা বলে না। কী রকম চোখ করে হাফিজদ্দির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাফিজদ্দি বলল, তুই ইবার সিন্দুইরা বোয়ালের কথা ক।

শফিজদ্দি মৃদু শব্দে গলা খাঁকারি দিল। সিন্দুইরা বোয়াল থাকে বিলে। কপালে সিন্দুরের ফোডা থাকে আর বোয়ালডা হয় বিরাট । মাইনষের সমান। যাগ খুব জোয়াইরা মাছ ধরনের নিশা, পিরের বোয়াল মারণের নিশা, জোয়াইরা দিনে, নিশিরাইতে আইয়া কে জানি তাগ ডাক দেয়। হেই ডাক হুইন্না জুতি পলো হাতে যে বাড়িত থনে বাইর হয়, বিলে যায়, তার আর বাঁচন নাই। মাছের আশায় পানি ভাইঙ্গা হাঁটতে হাঁটতে তারা খালি পিরের বোয়ালের আওজ পায়। সামনে আওজ, পিছে আওজ। ডাইনে আওজ, বাঁয়ে আওজ। তারা খালি আওজ পায় আর আউগগায় আর পানি খালি বাড়ে। এমুন করতে করতে ডুইব্বা মরে।

আমি বিশ্বাস করলাম না।

শফিজদ্দি অবাক হল। ক্যা?

যারা মাছ ধরে তারা সাঁতর না জাইন্না পারে না।

সাঁতর জানলে কী হইব?

সাঁতর জানইন্না মানুষ পাইনতে ডুইব্বা মরে না।

মাইনষে তো ডুইব্বা মরে না, সিন্দুইরা বোয়ালের ছইল ধইরা থাকে যে শকশ হেই শকশে তাগ চুবাইয়া মারে।

শুনে হাফিজদ্দি একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, এই রকম সিন্দুইরা বোয়াল আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করে শইপ্পাদা। কেমতে মাইনষেরে চুবাইয়া মারে দেখতে ইচ্ছে করে।

শফিজদ্দি ভয়ার্ত গলায় বলল, অলইক্কা কথা কইচ না।

হাফিজদ্দি আর কথা বলে না। তার চোখ থেকে তখন মুছে গেছে মিয়ার ছড়ার হিজলতলার এই পরিবেশ। চোখে ভেসে উঠেছে আমন আউশ আর পাটে নিবিড় হয়ে থাকা, জলেডোবা আদিগন্ত এক বিল। বিলের মাথার ওপর ঝুঁকে আছে ম্যাটম্যাটে জ্যোৎস্নামাখা আকাশ। এই আকাশের তলা দিয়ে, একহাতে জুতি আরেক হাতে পলো, হাফিজদ্দি একাকী হেঁটে যায় বিলমুখী। তার সামনে পেছনে, ডানে বাঁয়ে অবিরাম খলবল খলবল করে কপালে সিঁদুরের টিপ দেয়া অতিকায় বোয়াল।

হাফিজদ্দি এগিয়ে যায় আর গভীর থেকে গভীরতর হয় বিলের জল।

টোটেম

মানব চক্রবর্তী

কুলগাছের ঝাঁকড়া মাথা যখন বনলতার অত সখের ফায়ারবল-কে রোদ্দুর পেতে দেয়না যথাযথ, আর রোদ্দুর বিনে অমন যৌবন মদমত্ত ফুলগাছটির প্রণয়ে খাই-খাই লালিমা যখন তার মাহাত্ম্য হারায়, লালে সেই গাঢ়তম উজ্জীবন যা রক্তেরও অধিক সুন্দর বা হিংস্র যাই হোক ফায়ারবলীয় সৌন্দর্যকে ফিকে জল্‌সা করে, বনলতার মানসিক স্থৈর্যের ব্যাঘাত ঘটায় — তখন, কুলগাছের অপরাধী সত্তা বড়ই প্রকট; হয়ত বা সেই মুহূর্তে বেঁচে থাকার হক্‌টুকুও হারায়। যেহেতু মানুষ বৃক্ষবিলাসী বটেই তবু তারই হাতে মৃত্যু নামে অহংকার, তারই হাতে বাঁচা-মরা বা উদ্বাস্তু - জীবনের শুরুয়াতটুকু ঘটিত হয় — যদিও পক্ক অবস্থায় কুলগুলি বড় মিষ্টি, মনোলোভী, ডাগর-ডোগর।

বনলতা, দুদিন আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এক গাছকে বাঁচাতে অন্য গাছের মৃত্যু ঘটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই, যদিও সে বৃক্ষবিলাসী, নানা গাছ, প্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য, এই বাগানটির শোভা বাড়ায়। আম্রপালি মল্লিকা আলফানসোর পাশাপাশি সবেদা আঁশফল গোলাপজামেরা স্বীয় ক্ষমতাবলে বীরদর্পী — ছায়াচ্ছন্ন দেড়বিঘা বাগান শুধু, মোরাম-বিছানো পথ প্রায় শ'খানেক ফুট গিয়ে তবে ভূপ্রকৃতি যেখানে আচমকা পোয়াতিসদৃশ, হঠাৎ চড়াইয়ের কারণে টিলামতন — সেখানেই 'দত্তভিলা'। সম্মুখের অংশে মনোরম ফুলের বাগান, ঝুরোমাটি গোবরসার ও অস্থিচূর্ণের সহাবস্থানে স্প্যাঞ্জি করোনেশন এ্যাস্টর ইন্‌কা জুবিলি কত কী-তে রঙের মেলা, চোখ ফেরানো দায়। এত প্রেম, প্রকৃতিতে এত বাৎসল্য, তবু একটি বৃক্ষকে মরতেই হয় বুঝি — একজনের মৃত্যু ছাড়া অন্যজনের জীবন বাঁচেনা; বৃক্ষে যেমন, সমগ্র প্রাকৃতিক পরিমন্ডলেও তাই — যেমন মাছ ও মানুষ, তৃণ ও ছাগ, বা এইমত আরও যা পারস্পরিক দ্বন্দ্বমাঝে নিয়ত দৃশ্যমান বা কিছু কিছু থাকে হয়ত দৃশ্যের বাইরেও যার খুব আপাতসরল উদাহরণ হতে পারে মানুষ ও মানুষ।

বনলতার সিদ্ধান্ত পাকা, কাটা যাবে কুলগাছটি, এই সুন্দরতম সমারোহ মাঝে সে ব্রাত্য, সে বড় ঝাঁকড়া, নিষেধের তোয়াক্কা করেনা বা যৌবনের অপচয়ে সিদ্ধকাম — অমন সখের দামি ফায়ারবল-কে মহার্ঘ রোদ্দুর পেতে বাধা দিলে তা মার্জনার অতীত অপরাধ — যেহেতু সে ফায়ারবল, আগুনের গোলা, রক্তের অধিক লাল; আর মানুষের যাবতীয় আকর্ষণের থিতু, পক্ষপাত, জীবনের ভরকেন্দ্রই হয়ত বা কেন যে ঐ মত গভীরতম উচাটনে তা নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা চলতেই পারে।

অপেক্ষা ছিল শুধু তরখু টিগ্‌গা-র। গত দু'দিন সে আসেনি দত্ত ভিলায়। বনলতা এ-প্রসঙ্গে তার সদাব্যস্ত ব্যবসায়ী স্বামী সুখেন্দুবিকাশ-কে মৃদু রসিকতায় 'যা ভুলোমন, হয়ত ঘিয়াডোবা ডিষ্টিলারির —' বলেই হাসিটিকে ছর্‌রা করেছিল একচোট, এবং রহস্য না ভাঙলেই তা যথার্থ রহস্যময় তাই অল্প থামা দিয়ে সম্মুখের নেবুভাসন্ত জিনের গেলাসে আলতো চুমুক দিয়েছিল, ম্যাস্‌কারাক্রান্ত আই-ল্যাশ্‌ দু'পাতা আবেশে মিলিজুলি এক্‌সা হয়েছিল মোহিনীমুদ্রায়, তারপর ফের 'এ্যাবসাঁথ খেয়ে না-জানি হুমড়ে পড়ে আছে' বললে হুইস্কির গেলাস হাতে সুখেন্দুবিকাশ আরক্তিম চক্ষু দুটি তুলেছিল, মৃদু ভ্রুকুটি সহযোগে 'লতা —তরখু মুনিষ, বেশি

লাই দিও না' বলেই এক চুমুক পাতিয়ালা পেগ মেরে স্থির।

বনলতা এমন খোঁচা হজম করতে পারেনি, সে ঝাঁঝ উগরায় যেন মানবিকতার কাছে দায়বদ্ধ খুব বা নিছক হারবো না এই মনোভাবে, যাই হোক, তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল 'বাঃ মুনিষ বুঝি মানুষ নয়!' জবাবটা দিয়েই অবশ্য বনলতার মনে হয়েছিল একটু কি বেশি নাটুকে হয়ে গেল! রাসভারি সুখেন্দুবিকাশের কাছে এহেন জবাব যেন অন্য তাৎপর্য না পায় সে-জন্যই বনলতা, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নিজের সমর্থনে তথ্য-সংগ্রহে মনে-মনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল— ঘিয়াডোবা, অর্থাৎ তরখুদের গ্রাম, আরও বলা ভাল ওঁরাও-মুন্ডাদের গ্রাম, স্বাধীনতার আগে যেমন ছিল আজও তাই— মাটির অনুচ্চ ঘরগুলি মানুষ ও শুকরছানার সহাবস্থানে মুখর, পিলেচোগানো ন্যাড়া ন্যাংটা বাচ্চারা ধুলোগড়াগড়ি খেয়ে দিনরাত্রি এক করে, আর নিউট্রিশনের অভাবে রোগে ভুগে কত যে মারা যায় — এ তো গেল মানবিকতার প্রসঙ্গ; এবারে রসিকতার কথাটি বলতে হয় — ঘিয়াডোবা গাঁয়ের মরদেরা ঘরে তৈরী যে মহুয়ার মদে নিজেদের রসসিক্ত রেখে সম্ভবত খিদের গলিঘুপচিকে নিশ্ছিদ্র করে তাকে 'এ্যাবসাঁথ' ও গোটা গ্রাম্য প্রক্রিয়াটিকে, বাখরমেশানো পচনতন্ত্রকে 'ডিস্টিলারি' আখ্যাত করলেও সুখেন্দুবিকাশ তাতে হাসেনি মোটেও; এ হেন রসিকতা উপযুক্ত সঙ্গতের অভাবে মাঠে মারা গেলে সুন্দরী শিক্ষিতা বনলতার মুখ ক্ষোভে গুমটিলা হতেই পারে, হয়েও ছিল; আর এভাবেই বনলতার যুক্তিগুলি জুতসই হয়ে উঠতে থাকলে সে ফের স্বাভাবিক, দর্শনে মাষ্টার ডিগ্রি বনলতা এরপর সুখেন্দুবিকাশকে হয়ত বা জাগাতে চেষ্টা করেছিল তার ব্যবসার পলি-ঢাকা ইগো-র অন্তঃস্থলে মৃদু খোঁচা দিয়ে — 'ব্যবসা আর ব্যবসা, সেন্স অব হিউমার একটুও নেই—'

বাস্তবে, সুখেন্দুবিকাশ অধিকাংশ সন্ধ্যাই কাটায় ক্লাব ও পার্টিতে, ব্যবসার খাতিরেই এইসব, এই সময় ঘরে থাকা ব্যতিক্রম, তবু আজ ছিল এবং জিন ও হুইস্কির যৌথ উল্লাস খাম্বিরাপ্রাণ্ড সুখে পরিণত হবার পূর্বমুহূর্তে তরখু-প্রসঙ্গ ছন্দপতন ঘটালে — সেই তরখু, যে একজন নগণ্য মুনিষ বিনে কিছু নয় — সুখেন্দুবিকাশ রাগ করেছিল, কিন্তু তার রাগ বা অভিমান এতই ভদ্রজনোচিত, সংস্কৃতমনা, যে সে আর একটিও কথা কয়নি, শুধু আধভর্তি গেলাসটি হাতে নিয়ে দোতলার ব্যালকনিতে আন্দামান কেন-এর লম্বাটে আরামকেদারায় গা এলিয়ে চেয়ে ছিল অন্ধকারে — যেখানে বাগানের আঁশফল আর সবেদাগাছ মাথায়-মাথায় সেতু বেঁধেছে।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম ক'বছর অবশ্য বনলতাও এইসব ক্লাব বা পার্টি বা যাকে সামাজিক সৎসঙ্গ বলে তেমন মেলামেশায় সঙ্গ দিয়েছে সুখেন্দুবিকাশের, যদিও এইসব অনুষ্ঠানগুলিতে একটু হুল্লোড়বাজি থাকেই— খুব খারাপ লাগত না প্রথম প্রথম; তবে আর্থিক বুনিয়াদ পোক্ত হলে মানুষ কেন বোকাটে দর্শায় নাকি ঐ ভান-ই আভিজাত্যের পলেস্তারা তা ভেবে মনে মনে দুঃখ হত— আবার এমনও হতে পারে দর্শন তত্ত্বের বাইরে কোন তত্ত্বেরই অবস্থান আদপেই সম্ভব নয় তাই দূরবর্তী পিছনের দিকটা দেখবার প্রথম থেকেই আগ্রহ দর্শনের এম. এ. বনলতার পুরোমাত্রায় থাকার কারণে ক'বছরের মধ্যেই ঐ স্টিরিও টাইপ মজলিশ বড় পান্‌সে ক্লান্তিকর বোধ হতে শুরু করেছিল, হয়ত — যে জন্য পরের দিকে বনলতা সন্তর্পণে গুটিগুটি নিজেকে সরিয়ে নেয়। সুখেন্দুবিকাশ এটাকেই বনলতার সন্তানহীনতার কারণে সৃষ্ট ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সের নমুনা ধরে নিয়ে মাঝেমধ্যে খোঁটা দিত, রেগে গেলে আজও দেয় — কিন্তু বনলতা কিছুতেই বুঝতে পারেনা না—সন্তান জনিত কারণে যে অপার দুঃখ বা একটু-আধটু পিছু

হঠা, বিশেষত মেয়েদের কাছে, এই স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম ব্যাপারটাকে সুখেন্দুবিকাশ কেন একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে না! ঐ একটা অন্ধকার, বা ধরা যাক্ ল্যাপ্স-ই, তা কি জীবনের আরও অন্য অন্য দিকগুলিকে খুব আলোকিত করতে পারে না! কথাটা সহমর্মিতা থেকেই শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু তা না করে একজনকে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সের তকমা মেরে দিলে অন্যজন যে সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সের দোষে দুষ্ট হয়, আর যৌথজীবন যৌথ থাকে না, বড় নিজের নিজের, তা কি সুখেন্দুবিকাশ বোঝে না! তবু জীবন যেহেতু একটা, মাত্র একবারই, তাই জীবনতুল্য প্যারাডক্স আর কী— সে তো কর্দমতুল্য — জল পড়লে অনুতে-অনুতে মিশে যায়, জলবিহনে খাদ — ইনফিরিওরিটি ও সুপিরিয়ারিটির এহেন দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দিয়েই একটা গোটা জীবনের বিন্যাস বা আর্মেচার ওয়াইণ্ডিং-ও বলা যায়— এর বাইরে যা, যেটুকু, তাতে ভ্রান্তির বকলমা, যেন লোক দেখানো, যেন ফিরিওলার মত ডেকে-ডেকে বলা 'দেখো দেখো আমরা কত সুখী—'

তবু তো এভাবেই বারোটা বছর — কুড়ি থেকে আজ বত্রিশ বনলতা, পাক্কা আটবছরের বড় সুখেন্দুবিকাশ, চল্লিশ ক্রমসমৃদ্ধির পথে। তা হলে যা দাঁড়ায়— কোন একটির, যা কিছু হোক, চরম ঘাট্‌তিতেও জীবন দাঁড়ায় না, যে যথাযোগ্য দৌড়োয় — প্রথম না হোক্ দ্বিতীয় না হোক্, সে চলেই — আবার হতেও পারে প্রথম দশের যে কোন এক; কেন সুখেন্দুবিকাশ কি হয়নি, অর্থাৎ জীবনকে জীবিত রাখাই যেখানে মুখ্য। যাই হোক, এরই মাঝে আরও একটি দিন গত হয় এবং বনলতার বড় সখের ফায়ারবল রোদ্দুর পায় না বলে মুখ গোঁজ— লাল ঠিক লাল নয়, হিমোগ্লোবিন তিন-এ নেমে গেলে, যেমন অতিরিক্ত ফ্লুইডিটি বিরাজ করে, লালও হালকা, তেমনই দেখাচ্ছিল, যাদের, অন্তত এসময়, জেগে ওঠার কথা ছিল প্রবল বিক্রমে।

চতুর্থ দিন সকালে এল তরখু টিগ্‌গা, হাতে তরবারিসম একহাতি ধারালো কাটারিখানি যুদ্ধাস্ত্র যেমন, পরনে বনলতার-ই দেওয়া একটা বার্মুডা প্যান্ট ঢোলা ও লম্বাটে, কিন্তু পেশিবহুল যুবক তরখুকে তা মান্যতা দিয়েছে বোঝা যায়— চুলগুলি আগোছালো, দীর্ঘ, আর থুতনিতে পলকা দাড়ির সামান্য জুটবান্ধি ওর সারল্যকে যীশুসুলভ করেছে; শুধু গায়ের টার্কিশ গেঞ্জিটা হয়ত তা নিজের পয়সায় বহুদিন পূর্বে কেনা— গলা অনেকটা ঝুলে পড়েছিল, আর বগলফাটা, ক্রশ-চিহ্নটি কালো কার বাঁধা, রোদ্দুরে চিকমিক।

সে কোমর ঝোঁকান দিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গীয় বাও দিলে বনলতা ঐ আনুগত্যে খুশি হয়, তখন তরখু টিগ্‌গা, নিপাটসোজা, যেন মাতা মেরি সম্মুখে এমনই ভক্তিময়তায় বনলতা-কে 'মা— হেঁ হেঁ, হুকুম দিয়েন বাগানে আজ কী কাজ—' বলেই ঘাড় তুলে টানটান, ঋজু, একখন্ড ব্ল্যাকস্টোন। বুকের উদোম পেশিতে রোদ্দুর তখন জঙ্গুলে কোব্‌রার দেহে আলোর চক্‌মা ঢালছিল।

ততোমধ্যে সুখেন্দুবিকাশ, এই সকালে দু'গাল কামানো, ফর্সায় নীলীভাব আদ্‌জাগন্তে চিবুকখানি পৌরুষেয়, পরিপাটি পোষাক, জুতোর অগ্রভাগে মিঠে রোদ চমকায় এতটাই পালিশগ্রস্ত মুখখানি, অতিরিক্ত চুপ — বেরিয়ে আসতে তরখু একই ভঙ্গিমায় কোমরসিয়া মাথা নত করে। মনে মনে সুখেন্দুবিকাশ 'ধুঃ কেতা খুব জানে—' বলেই পূর্ববৎ গম্ভীর। বনলতা জানে স্বামীর স্বভাব — দশটা পাঁচতলা ফ্ল্যাটের সবে তিনতলা রুফ-লেবেল অবধি হয়েছে কুলটির ওধারে, ই.সি.এল-এ খানদশেক ডাম্পার ভাড়া খাটে কয়লা বহনের কাজে,

আরও এক লগ্নীকারক সংস্থা 'নাভানা ফিনান্স' তার হাতের পাঁচ— এমন মানুষ যে কাজে বেরুনোর আগে পাক্কা বিশ মিনিট কারও সঙ্গে কথা কয়না তার নাম কনসেনট্রেশন। খোলা বাগানের এক পাশে বিস্তৃত ধানক্ষেত্ অন্যদিকে সবেদা - আঁশফল - নানা জাতের আমগাছ — ঐ দিকে মুখ-করা সুখেন্দুবিকাশের কপালের ভাঁজগুলি তার ব্যবসাবৃদ্ধির সহায়ক বুঝি — কখনও তা ভাঙ্গছিল, কখনও বঙ্কিম, কখনও সিধে, খুব টানা; পাশে দাঁড়ানো বলতা এই তাকে দেখেও না দেখার অশিষ্টতায় গা করছিল না, হতে পারে এই-ই তার পাল্টা জবাব।

এই অবস্থায় তরখু ভাবছিল সাহেব নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছেন যেহেতু সে গত তিনদিন আসেনি, বাগান পরিষ্কার হয়নি ঝাঁট পড়েনি তা ছাড়া আরও যা টুকটাক ফরমাশ — তাই সে কিছু বলবে ভাবছিল কিন্তু রাশভারি সাহেবের গোঁফজোড়ার প্রান্তভাগ কশাদৃশ সূক্ষ্মতায় তলমুখী দেখে পলকেই তরখু মুখ ফেরায় বনলতার দিকে যেন সেখানেই যাবতীয় মার্জনা — আর করুণতর স্বরে টুকরো ব্যাখ্যাসমেত বলে ওঠে 'তাইলে মা — অন্যায্য করিছি বটে, এই কান মুলি — উহ্ দুটা দিন যাই - যাই বিষ বাতায় শরীল ডহ্ ডহ লড়লে চড়লে, কী থকান যে — এবারে হুকুম দিয়েন মা —'

তরখুর মুখে বার দুই 'মা' ডাক বাস্তবিকই অসহিষ্ণু করে বনলতাকে, সবে বত্রিশ সে দেখায় আরও কম, প্রসাধন ও রূপচর্চার প্রতিটি পর্ব অতি যত্নে সমাপন করে সে, খাওয়া - দাওয়া ফুড - ভ্যালুর হিসেব রেখে, ক্যালরি মেপে, ফলে নিভাঁজ শরীরে বয়সের দাঁত পিছলে যায় এ - হেন বনলতা সুখেন্দুবিকাশের কাছ-ঘেঁষে বলে ওঠে 'কাণ্ড দেখেছ ! মা — সত্যি আমাকে বুড়ি না বানিয়ে ছাড়বে না দেখছি, এ্যাই , এ্যাই তরখু কদ্দিন না বলেছি আমাকে মা বলে ডাকবি না, কেন আন্টি বলতে— '

মা ডাকের প্রতি বনলতার অনীহা তরখুকে অবাক করছিল, সে একবার সুখেন্দুবিকাশকে দেখে, পরক্ষণেই বনলতাকে — এইভাবে পালাক্রমে মালিক ও মালকিনকে দেখার মধ্যে ভিন্নগ্রহী দৃষ্টিটি প্রকট — সে 'আন্টি 'তে সড়গড় হতে চেয়েও পারছিল না তাই হয়ত কথাগুলি উল্টোপাল্টা হয়ে যায় — ' হেঁ হেঁ আন্টি , মা-র বদলিতে, কী বলি শুনায় যানি কেমন-কেমন' বলামাত্র সজোরে ধমকে দেয় বনলতা — 'গাধা'!

এইবারে বরং তরখুর হাসিটি খোলসভাঙ্গা, সাবলীল, সে গা মোচড়ানি দিয়ে হাসছিল আর নিজস্ব বোধবুদ্ধির বিচারে 'গাধা' শব্দটির প্রয়োগ যথার্থ ভেবে জবাব দেয় — 'হোঃ, উয়েই ভাল, গাধো — পিঠে মোট, চালে হিড়িপ-দিড়িপ, চোকগুলান'কী শান্ত —

সুখেন্দুবিকাশ বিরক্তিতে একশেষ, ঘড়ি দেখছিল ঘনঘন, তাড়া ছিল; তখনই চোদ্দো ফুটের ফুলপাতাময় বাহারি গ্রীলের চাকালাগানো লম্বাচওড়া গেটখানি গভীর সুখের আড়মোড়া ভাঙ্গে মিহি ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে। ড্রাইভার রঙ্গলাল। সম্মুখে সাহেব ও মেমসাহেবকে দণ্ডায়মান দেখে সে কেতাদুরস্ত সেলাম ঠুকলে দত্ত ভিলা-র সকালটা ছন্দে ফেরে।

একতলার ড্রইংরুমের দেওয়ালে দুটি চমৎকার বাবুই পাখির বাসা এমনই স্বর্গীয় আর্কিটেক্টের বুনন যে চোখ ফেরানো যায়না — তাকেই আধুনিকতম ফ্লাওয়ার ভাস্-এ রূপান্তরিত করতে বনলতা-কে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি শুধুমাত্র ঐ অকৃত্রিম অফ্ - হোয়াইট খড়কুটোর বুকে এ্যাপকোলাইট -এর হালকা নীল স্ট্রাইপ কিছুটা ছেড়ে-ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন। ও -দুটি তরখুই এনে দিয়েছিল। পূবের দেওয়ালে বড় একটি তৈলচিত্র— পাঁচ বাই তিন, সুখেন্দুবিকাশ একবার ব্যবসার কাজে কলকাতা গিয়ে আরও কজন ব্যবসায়ী বন্ধুর পাল্লায় পড়ে নিজের আভিজাত্য

অটুট রাখতে ঐ তৈলচিত্রটি নগদ বারো হাজার টাকায় কিনে এনেছিল এক প্রদর্শনী থেকে। একটি বেঢপ আকৃতির আদ্শয়ানে মহিলা, রক্তাল্পতায় ফ্যাকাসে, উদরদেশ স্ফীত, বেড়ালকে আদর দিচ্ছিল শারীরিক ওমে যা দেখে চাঁদ বড় পুরুযালি ভাঙ্গা জানালার ওপারে থমকে। অমন দৃশ্যে কতটা নান্দনিকতা তা না বুঝলেও কিনেছিল সুখেন্দুবিকাশ আর এই নিয়ে গালভরা ব্যাখ্যাও শুনিয়েছিল বনলতাকে যেন সে ছবি-টবি বোঝে খুব। এ ভিন্ন মসৃণ প্লাষ্টার অফ্ প্যারিসের বুকে ওয়াইল্ড লিল্যাক-এর পোঁচ, নিচে সেন্টার টেবিল ঘিরে সোফা, কার্পেট, দরজার ওপর ঝিনুকদোল পর্দা।

গ্যারাজের চাবি সুখেন্দুবিকাশ ঘর থেকে এনে টেবিলের ওপর রেখেছিল, রোজই সকালে এমন রাখে, জানে রঙ্গলাল। সে জুতো খুলে ড্রইংরুমে ঢোকে এবং চাবি হাতে বেরুনোর মুখে তরখু-কে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে 'এ্যাই কি করছিস র‍্যা — হুঁঃ ক্যালাকার্ডিক, আয় তো আমার সঙ্গে, পাল্লা খুলবি' এমন অনর্থক, কর্কশ ধমক দেয় যেন এটুকুই বোঝাতে যে সে মাসমাইনের চাকুরে, রঙ্গলাল, আর ও মুনিষ — একবেলার খাওয়া ভিন্ন পূজাপালিতে বক্শিস ছাড়া যার উপার্জনের শিকড় হাওয়ায় ভাসে।

যত তাচ্ছিল্যই থাক্ তরখু রঙ্গলালের ঐ প্রস্তাবে সোল্লাসে রাজি কারণ গ্যারাজস্থিত দুধসাদা মারুতি গাড়িটি তার কাছে বিস্ময়ের অতি — কী নাবাল শব্দে তার গতায়াত যেন শান্ত পাখিটি এ-ডাল থেকে ও-ডালে ফুরুত্ দিয়ে যায়। রঙ্গলালের পেছন পেছন তরখু গ্যারাজের সামনে এসে দাঁড়ায়।

তালা খুলে ভারি দরোজা দু'হাতে টেনে খোলে তরখু আর স্বপ্নের পাখিটি ঘুমে কাদা — একঠায় চেয়ে ছিল সে। রঙ্গলাল এগিয়ে যায় সম্মুখে, সবে তিন-চার পা গেছে কি যায়নি অকস্মাৎ প্রবল চিৎকারে সাত-পা পেছিয়ে আসে। আচমকা এহেন দ্রুতগতির, ঝটিকায়, পশ্চাদপসরণে সে হয়ত বেতাল, পড়েই যেত, কিন্তু পড়ে না সে ভাগ্যি — পরিত্রাহি চিৎকার করছিল রঙ্গলাল 'উরি বাবারি সাপ সাপ উরিরি কী লম্বা আর দাগ দাগ ওফ্ —'

এমন ভয়ার্ত চিৎকারে সুখেন্দুবিকাশ ও বনলতা দুজনেই তড়িঘড়ি এগিয়ে আসে, গ্যারাজ থেকে কিছুটা নিরাপদ দুরত্বে দাঁড়ায়, রঙ্গলাল তখনও আমতানি-তোতলামিসহ সচিৎকার বাখানে মত্ত — 'সাহেব, আজ নিঘ্যাত মরে যেতাম, উহ্, বনেটে লম্বা দিয়ে শুয়ে কী বিরাট সাপ ভয়ে বুক ঠাণ্ডা —'

'ওহ্, কামড়ায়নি যখন, তখন এত চিৎকার করার কী আছে, কই দেখি ' বলেই সুখেন্দুবিকাশ এক-পা আন্দাজ এগনো মাত্র বনলতা নীরব কাকুতিতে হাত চেপে ধরে, চক্ষু তার দাম্পত্য প্রেমে টলোটলো অল্প ছলকেই বুঝি জল গড়াবে গালে — সুখেন্দুবিকাশ তখন চরকি-নজরে এদিক-ওদিক চাইছিল তেমন একটা লাঠির খোঁজে।

এই বাগানে গাছের শেষ নেই, গাছ ও ছায়া, নিচে নিচে রোদ, পাতাগুলি অবধি ঝেঁটে ফেলা হয়, লাঠি বা ডাল বা তেমনতরো কিছু যেখানে - সেখানে পড়ে থাকা মানেই তরখু-র পক্ষে কর্মে গাফিলতির প্রমাণ বিশেষ, ধারে কাছে কিছুই ছিলনা — রোদ্দুরের জড়ি গলে-পড়া গাছেদের তলে চড়ুই-শালিখের বিস্তস্ত খুনসুটি ভিন্ন।

রঙ্গলালের পাশে থাকা সুখেন্দুবিকাশ তবু একপা-দু'পা এগোয়, এদিকে বনলতার চেপে ধরা হাতখানি আরও শক্ত, মৃদু কাঁপন দিচ্ছিল — 'না যেও না' সে বলেনি বটে, তবে তরাসে ঠোঁটের আমসিপারা বিশুষ্কতা ও দুই চোখের তারাগ্রন্থিত আর্তিটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু

সুখেন্দুবিকাশের না-এগোনো পৌরুষেয় নয়, ড্রাইভার রঙ্গলাল ও তরখু-র সামনে অন্তত এই বিপদে, এইভাবে, স্ত্রীর হস্তবন্দী নিরাপত্তায় অন্যতর এক বিপন্নতা বিরাজ করতে থাকলে সুখেন্দুবিকাশ এই মুহূর্তে একজন অতি সাধারণ মানুষ বা ছাপোষা বা গড়পড়তা হিসেবে মেহনতী জনগণেশ বলতে যা বোঝায় তাই অর্থাৎ অতি আভিজাত্যের খোলস ছিঁড়ে, রেগে উঠে, এক ঝটকান মেরেছিল বনলতার চেপে ধরা হাতে, হয়ত এমনটাই হয়ে থাকে আপৎকালে — 'আঃ ছাড় তো, তুমি না একটা ওফ্ কী বলব— লেট মি সি, সামান্য ব্যাপারেই এত নার্ভাস হয়ে যাও যে —'

সুখেন্দুবিকাশ খানিকটা এগোয়, বুকের মধ্যে শিরানি দিচ্ছিল কিন্তু কিছুটা না গেলে বা স্বচক্ষে সাপটিকে না দেখলে বীর্যবান মালিকত্ব বুঝি অসার এমনতরো বোধ-ই তাকে আরও দু'পা টেনে আনে প্রায় গাড়ির হাতছোঁয়া দূরত্বে, একপাশে ঘাড়ও কাত দেয় অতি সাহসে, আর তখনই বনেটের ওপর থেকে ঝুলে পড়া লেজটির কিয়দংশ দেখা মাত্র বুকের ভিতর একটা শীতল স্রোত বয়ে যায়। আরও কাছে যাওয়া এবার যথার্থ বিপদের এটুকু বুঝে সুখেন্দুবিকাশ লম্বা পায়ে পেছিয়ে আসে বনলতার পাশে এবং, এতক্ষণ পরে নিজেই ওর হাত চেপে 'মাই গড, বনেটে' বলেই মৃদু আকর্ষণে একপাশে টেনে এনে ফের 'ঐ যে, ঐ যে লেজটা দেখতে পাচ্ছ না কালো - হলদে স্ট্রাইপ' ইত্যাদি কথাগুলি যে স্বাভাবিকতায় বলতে চাইছিল তা বজায় থাকছিল না— অন্তত সুখেন্দুবিকাশের হাতের তালু ঘেমে-ওঠা টের পেয়ে বনলতা-র তেমনই মনে হচ্ছিল।

থম্-ধরা মুহূর্ত ক'টি অচিরেই সমাপ্ত হয় যখন বনলতা-র চোখ পড়ে তরখু-র দিকে — যেন সে-ই ত্রাতা হতে পারে এমন বিপদকালে এমন একটা সূক্ষ্ম আশা বনলতাকে উতলা করছিল — 'তরখু ... তরখু বনেটে সাপ —' অনুনয়ে কম্পিত হলেও স্বরে মালকিনসুলভ ঝাঁঝ এসে পরক্ষণেই সে বলে ' ইস্ ... এখন কি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় — তরখু উ ... ' শেষদিকটা খুব চড়া আর চিরে চিরে যাচ্ছিল গলা।

তরখু অতি সুবোধ আজ্ঞাবহ, মুনিষ, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হেলদোলহীন এগিয়ে আসে — সুখেন্দুবিকাশ ও বনলতা দেখছিল তার অবিচলিত ভাবভঙ্গী, হাতের কাটারিটি মাটিতে ফেলে যেভাবে সে এগোয় তাতে মনে হচ্ছিল না যে খুব একটা গা আছে; ফলে বিরক্তিতে ছত্রাখান সুখেন্দুবিকাশ ঝেঁঝে ওঠে, 'দেখেছ, কী হাঁদা একটা এমন এমার্জেন্সিতেও কোনও চাড় নেই, ধুত্ —'

তরখু এমন শুনলেও মুখে রা কাড়েনা, তার সাদা দাঁতের একপাটি দেখা যাচ্ছিল যা অন্য সবাইকার উৎকণ্ঠাই শুধু বাড়ায়, আসলে সবাই তখন ভুল বুঝছিল তাকে— হাটমাঠ বনজঙ্গল চষে বেড়ানো যুবক তরখু যে 'রে রে' শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েনি এটাই একধরনের শ্রেণীগত অসহ্যতার জন্ম দিচ্ছিল, বাঁধা মুনিষের জান-কবুল ভঙ্গিটুকুই বড় মূলধন — অন্তত মালিক-মালকিন যখন সম্মুখে, আপৎকালে এর ব্যত্যয়টুকু অসহ্যেরও অধিক।

যে কাজটি তরখু করতে চলেছিল তা বিপদজনক এই বোধটুকু তরখু-র ছিল বলেই সে অতিমাত্রায় ধীর-স্থির, বাহ্যিক উত্তেজনার আঁচটুকু ঠেকিয়ে রেখেছিল মানসিক প্রত্যয়ের বর্মে। সাপটি তখনই ধীরে ধীরে দুধসাদা বনেটের ওপর দিয়ে মাথাখানি সম্মুখে ঝোঁকায় কার্বোরেটারের জালি অভিমুখে, আর লেজটি ততই ক্রমশ ক্রমশ উঠে আসছিল উপরে, একসময় তা উইণ্ডস্ক্রিনের বুকে ওয়াইপার সদৃশ নাড়াচাড়া করতে থাকলে সমবেত রোল

ওঠে 'উরিব্বাস্ ... কী সাংঘাতিক, ওহ্ —'

তরখু নিঃশব্দে একটু একটু করে গাড়ির দরোজার খুব কাছ অবধি যায়, তারপর সহসা, অসম্ভব দ্রুত, উইণ্ডস্ক্রীনে ঘষটানো লেজের প্রান্তভাগ মুঠো করে ধরেই ঝটকা টানে সাপটিকে টেনে বার করে আনে, সে বড় সহজেই মুখ বাঁকিয়ে তরখু-র হাতের নাগাল পেতে ফোঁসাচ্ছিল — এমন কাণ্ড জীবনে দেখেনি বনলতা, আতংকে সে বুঝি মূর্ছা যাবে ভাগ্যিস স্বামী - তে অঙ্গাঙ্গী ছিল, রঙ্গলাল দুপদাপ ক'পা পেছিয়ে চিৎকারে লাগামছেঁড়া — তখনই, তরখু চক্রাকারে মাথার ওপর খানিকক্ষণ পাক খাওয়ায় সাপটিকে তারপর নিচের শান-বাঁধানো মেঝেতে প্রচণ্ড আছাড় মারে যেন সে কুস্তির 'ধোবিপিছাড়' আঙ্গিকে দড় খুব — ফের আরও বারকয় ঐমত ভুঁয়ে-সাপ্টান আঘাতে সাপটি শরীর ঢিলে দেয় সম্পূর্ণত, ছ'ফুট আন্দাজ, ততোমধ্যে গ্যারাজের তাকে রাখা খালি একটি ক্যাস্টরল-টিন মুমূর্ষু সাপটির মাথা - বুকের মাঝে সজোরে চেপে ' হাঃ হাঃ হোই ' শব্দে হাসতে থাকে তরখু — সে হাসিতে যুদ্ধজয়ের উল্লাস নয় বরং অতি সহজ কোনও কার্য সমাধা-র বালখিল্যতা মিশে ছিল — সাপটির মাথা ও লেজ দুই-ই তখনও আঁছড়াচ্ছিল শানের উপর—

এত সহজেই এমন ভয়ংকর ঘটনাটির সমাধান হবে তা বনলতা - সুখেন্দুবিকাশের কল্পনাতেও ছিলনা, ওরা তরখু-র এইমত কেরামতিতে বাহবা দিতেও ভুলে যায় বা ধন্যাদের মানসিক উচ্ছলতা একটু বেশি-ই নিয়ন্ত্রিত বোধ হয় — কিন্তু তখন ভিতরে - ভিতরে দারুণ স্বস্তিবোধ বিরাজ করছিল দুজনার, ফলে বিপদ আর বিপদ নেই এই বোধ বা ঐ যে 'স্বস্তিবোধ' বলা গেল যাকে, তারই ফলপ্রভাবে ক্ষণপূর্বের ঘটনাটির নানা ইফ্স এ্যান্ড বাট্ নিয়ে মাথার মধ্যে ক্রিয়া ঘটতে থাকে বনলতার। যদি ঐ সাপটি বনেটে না থেকে গাড়ির ভিতরে — স্টিয়ারিং-এ, সিটের নিচে, ড্যাস-বোর্ডের আশেপাশে বা অন্য কোথাও থাকত (সে সম্ভাবনা ছিলনা কারণ রঙ্গলাল জানালার কাচ উঠিয়ে ভাল করে লক্ দিয়ে রাখে) তবে কী কাণ্ডটাই না হত ! আরও যা যা হয়নি অথচ হতে পারত যেমন রঙ্গলালের সর্পদংশন বা তরখুর বা সুখেন্দুবিকাশই যদি — ওফ্ ভাবা যায় না, তবু যে বনলতা ভাবছিল তার কারণ এইসব সমুদয় চিন্তা ভাবনাই নাকি মানুষের যুক্তিবাদকে ধারালো করে, আর নিজেদের প্রতিপন্ন করে সামাজিক।

সাপটির হলুদ-কালোয় লম্বাটে চেহারাটা চোখের 'পরে ভাসছিল বনলতার — জীবিত অবস্থায় যেমন দেখেছিল সে, শক্তি আর সুন্দর, দুইয়ের মিলিত আধারে ঐ মুহূর্ত ক'টি এক চূড়ান্ত বন্য-আভিজাত্যে উজ্জ্বল — এটুকু ভেবেই বনলতা মনে মনে হাসল, হ্যাঁ, 'বন্য-আভিজাত্য' 'উজ্জ্বল', কত কী বিশেষণ আসছে, কারণ সে পর্যুদস্ত, এমনই হয়, মৃত্যুর পরেই তো উন্মোচিত হয় স্বরূপ— বনলতার মুখে এখন বিহ্বলতার পর্দা-সরানো হাসির বুনন, টিন-চাপা সাপটি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিল।

একটু পরেই টিন সরিয়ে সাপটিকে দোলাতে-দোলাতে বাইরে আসে তরখু, তখনও সে মাথা অল্প বাঁকিয়ে শরীর দোমড়ানি দিতে চেষ্টা করছিল — জিভের লকলক এগোনো - পিছোনো স্পষ্ট দেখা যায়, আর তাতেই রঙ্গলাল আরও একবার চিৎকারে ফালাফালা করে চারপাশ — 'বেঁচে আছে ... বেঁচে আছে —'

তরখু শুধুমাত্র হাসিতে রঙ্গলালের কথার সমর্থন জানায়, তারপর শান্তস্বরে 'ঢ্যামনা — জানে মারলে লাভ কী, পিথিবীতে বাঁচি রইবার হক্ সবাকার-ই, যাই জোড় পিরায়ে ধানক্ষেতে

ছাড়ি দেই—' বলামাত্র আতংকময় কঁকানিতে বনলতা জবাব দেয় 'না... না... শুনেছি ওদের নাকি জোড়া থাকে যদি ফের প্রতিশোধ নিতে অন্যটা — ওকে মেরে ফেল তরখু —

একথা শোনামাত্র তরখুর মুখখানি বিষণ্ণতায় ম্লান, সে মাথা দুলিয়ে যেন ভারি বিজ্ঞজন— ধুস্, সাপে বড় সিধা, পিতিশোধ মানুষ ছাড়া কি কেউ নেয়!

বনলতার স্বর তীক্ষ্ণ হচ্ছিল ক্রমশ, যদিও সে দর্শনশাস্ত্রে পারঙ্গম, জানা-বোঝার বহর অনেক বিস্তৃত, তবু তরখুর এ-জাতীয় বোকাটে কথাবার্তা যা অজান্তে শিকড়হীন নিরন্ন মানুষের অন্যতর এক দর্শনকেই উন্মোচিত করছিল তাকে নস্যাত করে ঝাঁঝালো ধমকে — 'না, না, যা বলছি তাই কর, ওটাকে মেরে ফেল, নইলে ভয়ে কেউ গ্যারাজে ঢুকতে পারবেনা—'

তরখু একমুহূর্ত দাঁড়ায়, কিছু একটা চিন্তা করছিল, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে থাকে ক'মুহূর্ত কিন্তু তার অনিচ্ছাটুকু শালীনতা ছাড়ায় না— ড্রাইভার রঙ্গলালের দিকে চেয়ে শান্তস্বরে 'আস তবে রঙ্গাদাদা, তুমিও পারবে,' বলেই সে মৃদু হেসে ফের বলে 'আমার যে মন সায় দেয় না—'

কথাটা কি রঙ্গলালকে সামনে রেখে বনলতাকে বলা? না, অত স্পর্ধা তরখুর হবে কি করে! তবু কথাটা কানে বাজে আর তাতেই বনলতার নজর যায় তরখুর উচ্চতার দিকে, ওঁরাও-দের ছেলে তরখু টিগ্গা কতটা লম্বা হবে! পাঁচ দশ না ছয়, সুখেন্দুবিকাশের চেয়ে একটু বেশি-ই দেখায়।

তরখু ও রঙ্গলাল গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। বনলতা সুখেন্দুবিকাশের দিকে ফিরে বলে ওঠে 'কী সাহস — অথচ মুখচোখ দেখলে বোঝাই যায়না, শান্ত, বোকাটে —'

সুখেন্দুবিকাশ এখন ভুরু কুঁচকে স্বমহিমায় — তিনতলা ফ্ল্যাটগুলি কত তাড়তাড়ি পাঁচতলা হতে পারে সে জটিল ভাবনায় নিহিত, তারই মাঝে বনলতার কথা-সূত্রে ছোট্ট করে জবাব দেয় 'সাহস কারও শরীরে লেখা থাকেনা, ওটা মনের ব্যাপার, আর তাছাড়া সাপ ধরাটা ডিপেন্ড করে টেকনিকের ওপর, সাপুড়েদের দেখ না কত বিষাক্ত সাপ —'

মিনিট দশেক পরেই রঙ্গলাল ও তরখু ফিরে আসে — একজনের মুখচোখ যন্ত্রণায় গুমগুম, মাটিতে নিবদ্ধ, অন্যজন উল্লাসে ফাটোয়ারা, সর্পনিধনের কৃতিত্ব জানান দিতে বকবক করছিল 'এ্যাঁ — এমনভাবে থেঁতলে দিয়েছি মাথাটা, এমনভাবে যে — একদম ছাতু —'

বাগানের কলে সময় নিয়ে হাতমুখ ধোয় রঙ্গলাল ও তরখু। এরপর যার যা কাজ — রঙ্গলাল গাড়ি বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দুধসাদা মারুতি গাড়িটি ব্যাক গিয়ারে বেরোয়, পরে ফের মাথা অল্প ঘুরিয়ে প্রশস্ত গেটের সামনে যখন সোজা, এই তবে যাবার বেলা, তখনই, সুখেন্দুবিকাশের মনে একটা দুশ্চিন্তা দোল দিয়ে যায়; তার সঙ্গত কারণ-ও হয়ত ছিল। আজ বিশেষ একটি দিন, ছ'টা ওভারহেড ওয়াটার-ট্যাঙ্ক-এর টেন্ডার জমা দেবে সে, গত ক'দিন অনেক ভেবেচিন্তে অনেক ক্যালকুলেশন করে রেট ভরেছে, প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার কাজ। এমন দিনে বেরোনোর পূর্বমুহূর্তে এ জাতীয় সর্পবিভ্রাট না জানি কোন অশুভ ইঙ্গিত। তবে কি তাতিয়া কনস্ট্রাকশানের কাছে হেরে যাবে দত্ত-এন্টারপ্রাইজ ? এইসব যত ভাবছিল সুখেন্দুবিকাশ ততই তার উজ্জ্বল ভাবটুকু মিইয়ে আসছিল, ফলে দু'পা এগিয়েও পিছিয়ে আসে সে, আচমকা বনলতাকে জিজ্ঞাসা করে 'আচ্ছা লতা, এই যে সকালে বেরুনোর মুখে বনেটে সাপ, আই মিন একটা বাধা, এটা অশুভ নয় তো?'

বনলতা সুখেন্দুবিকাশের দুশ্চিন্তার ভাষাটুকু খুব বুঝতে পারে — পকেটে ঐ যে সোনালি-টোপর পার্কার পেন, আজ দশবছর ধরে দেখে আসছে ঐ পেন ছাড়া টেন্ডার ফর্ম ভরেনা সুখেন্দুবিকাশ, অন্যকাউকে হাত ছোঁয়াতেও দেয় না। ঐ ট্রাউজার, কালচে-সবুজ, দশ বছর আগে প্রথম যে দিন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ পায় 'দত্ত-এন্টার প্রাইজ', ওটা পরেই নাকি টেন্ডারফর্ম জমা দিয়েছিল। তারপর থেকে সিভিলের কাজের টেন্ডার ঐ ট্রাউজার ছাড়া জমা দেয়না সুখেন্দুবিকাশ। দশ বছরে ঈষৎ স্ফীত হয়েছে উদর, ঐ কালচে-সবুজ ট্রাউজার দর্জির কেরামতিতে কোমরে বেড়েছে, আর বেড়েছে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। এই বিশেষ দিনগুলোর জন্যই প্যান্টটা তোলা থাকে। এমন আরও সব নানা ছোটখাট ব্যাপার যা সুখেন্দুবিকাশ-কে জড়িয়ে আছে, ফলে 'এটা অশুভ নয়ত' প্রশ্নে বনলতা প্রথমটা দিশা পায় না, কিন্তু স্বামীর ম্রিয়মান মুখচ্ছবি স্পষ্ট বুঝতে পারে; সে জবাব দিতে একটু দেরি করছিল কারণ সঠিক উত্তর জানা ছিলনা— ওদিকে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে — এমন সময় তরখু, সম্ভবত সুখেন্দুবিকাশের প্রশ্ন তার কানে গিয়ে থাকবে, বা হতে পারে আলৌকিক যোগাযোগ, অথবা নিরক্ষর তরখু-র এই এক বাচালত্ব, যাই হোক — 'শুরুতে সাপের দর্শন খুবেই ভাল মা— মনোবাঞ্ছা পুরে' বলেই সে হেসে ওঠে।

সুখেন্দুবিকাশ চমকে মুখ ফেরায় —'এ্যাঁ কি বললি! ফের বল, বল বলছি' বলেই সে প্রায় হামলে পড়ার মত — চোখদুটি উত্তেজনায় গনগনে — যেন তাতিয়া কনস্ট্রাকশান-কে হারিয়ে দত্ত-এন্টার-প্রাইজের লোয়েস্ট রেটেড হওয়া সবেমাত্র ঘোষিত — সুখেন্দুবিকাশের যাবতীয় গাম্ভীর্য চুরমার হয়ে যেতে থাকে, সেই মুহূর্তে যা কিছু যুক্তিবাদ বা আধুনিকতা সব অন্তর্হিত ; বদলে অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, যে সকল সুপারস্টিশন-এ এ যাবৎ সে অভ্যস্ত তার বাইরে আরও একটি — সুখেন্দুবিকাশ যে কতটা কাবু হয়ে পড়েছিল তা বোঝা যায় উত্তেজনার শিখর-ছোঁয়া স্বরের কেঁপে ওঠা তড়িঘড়ি জিজ্ঞাসায় — 'সত্যি বলছিস তুই? এ্যাঁ?'

তরখু-র জানা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা তার চেয়েও বড় দত্ত-ভিলার মালিক ও মালকিনের সহাস্য মুখ, তার অন্নদাতা, ওদের দুজনের হেম-নিকষিত উজ্জ্বল মুখ বড় তৃপ্তি দিচ্ছিল — সে সজোরে মাথা হেলিয়ে 'হ্যাঁ সত্যি, মনোবাঞ্ছা পুরে' ফের বললে সুখেন্দু বিকাশ তরখু-র ময়লা টার্কিশ গেঞ্জির পিঠে হাতখানি উল্লাসে বুলিয়ে দেয় আদুরে-চাপড়ে যার সঙ্গে প্রিয় ডোবারম্যান-কে আদর করার ভঙ্গির মিল ছিল খুব, কিন্তু যেহেতু তরখু একটা জলজ্যান্ত মানুষ তায় অমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতবাণীর উদগাতা তাই হয়ত সুখেন্দুবিকাশের মুখে সারমেয়-বোধ্য 'চুকচুকি'র বদলে লেগে ছিল খুশিয়াল ভাষা— ' ঠিক আছে, তা যদি হয় তো তোকে আজ একটা দারুণ গিফ্‌ট দেব।'

অন্যদিকে বনলতাও ক্রমশ সুপারস্টিশনের শিকার হয়ে পড়ছিল কারণ নেশা-জাতীয় সম্পর্কের সঙ্গে এ-জাতীয় ভাবনার অমিল বিশেষ নেই— ' মনোবাঞ্ছা পুরে' কথাটির গভীরতর ব্যাখ্যায় হারিয়ে যাচ্ছিল সে। এই দত্ত ভিলা-য় সম্পদের অভাব নেই , জাগতিক সুখের ঢেউ অগুন্তি, অথচ তারই নিচে শূন্যতারও শেষ নেই, নিঃসন্তান বনলতা তরখু-কে কিছু আশা কিছু সংশয়ে এমনভাবে দেখছিল যেন সে কোনও বাক্‌সিদ্ধ —

সুখেন্দুবিকাশের মারুতি হাজার নিঃশব্দে চলে যায় পলিউশান সচেতনতায়। ধোঁয়াটুকুও দেখা যায় না— এই মসৃণতা তরখু-র মনে ঘিয়াডোবা ও তৎসন্নিহিত জোড়বাড়ি কুসুমকানালি

মালবহাল বড়মুড়ি ইত্যাদি গ্রামগঞ্জের আদাড়ে-বাদাড়ে ঝোপজঙ্গলে উড়ে বেড়ানো পাখিদের নিঃশব্দ উড়াল-কে মনে পড়ায় খুব — সে গাড়ি ছুটে যাওয়া পথপানে চেয়েছিল মোহমগ্নতায় — সর্পঅধ্যায় তাকে ছেড়ে গেছে কখন। কিন্তু পশ্চাতে দন্ডায়মান বনলতা-র চোখে তখনও সাপটিই প্রধান চরিত্র— ভাল কি মন্দ কে জানে ঐ ভাবনা, দীর্ঘ সবল সাপটি মৃত্যুর পরেও জীবন্ত হয়ে উঠছিল ভীষণ, সেইসঙ্গে তরখু-র শেষের কথাটির সুচারু - মিশ্রণ নানা প্রকার সম্ভব - অসম্ভব আলোছায়ে শ্লীল বলো আর অশ্লীল বলো ক্রমশ জাগ্রত। নারীত্বের দৈন্যটুকু ক্রমউলতায় বিশাল ব্যাপকভাবে ছেয়ে যেতে থাকলে হয়ত সে কিছুটা মরীয়া হয়ে উঠেছিল, আর পরিণাম যত ভয়ংকর-ই হোক্ না কেন সম্মুখে দন্ডায়মান তরখু-কে পূর্ণচোখে দেখছিল বনলতা — কালো পেশীবহুল দীর্ঘ যুবক তরখু-র সূর্যমুখী ছবিখানি ক্রমউজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকলে সে যথার্থই মুনিষ থেকে মানুষ, রৌদ্রজল-বর্ষাবাদলের যাবতীয় প্রাকৃতিক ছোবল যার কিছুই হরণ করতে পারেনা বরং পূর্ণতা দেয় এমনতরো মানুষে পরিণত হচ্ছিল। বনলতা-র স্বর এখন খুউব নরম, আত্মীয়তায় জারানো, যেন মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাওয়া এ্যাষ্টরের প্রজাপতি-রং পাপড়ির কাঁপন গলার স্বরে — 'তরখু ... খুউব সাহস তো তোর—' বস্তুত বনলতা, কী ও কতটা বললে তা অসমীচিন হয়ে যাবে সেই দ্বন্দ্বে পুড়ে যাচ্ছিল।

এমন প্রশংসাসূচক ধ্বনি-বৈচিত্র্যে তরখুর ভাবান্তর হয়না, সে জানেই না তার সাহস কতটুকু বা কী তার ভূমিকা, শুধু মালকিন সম্মুখে এই জ্ঞানে সে মাথা নত করে; বনলতা তাকে লজ্জায় জড়োসড়ো ভেবে আরও নৈকট্য স্থাপনে আগ্রহী, হঠাৎ-ই প্রসঙ্গ পালটে 'আচ্ছা তা হলে তরখু মানে কী, হ্যাঁ' বললে তরখু টিগ্‌গা মুখখানি ওপরপানে তোলে যেন সে ভাবছিল কিছু গভীরভাবে। তারপর সেই কোন্ ছোটকালে মালবহাল গীর্জার ফাদার কিংসলে-র দেওয়া এই নামের জটটুকু খুলে দেয় অকৃত্রিম সরলতায়— 'হেঁ হেঁ কী বলি মা — তরখু মানে নাকি চিতা — পাদরি সাহেব বলেছিল—' কথাটি শেষ করতেই তরখু হঠাৎ বনলতার বলা 'খুব সাহস তো তোর' এমন বাক্যটির সঙ্গে 'চিতা' শব্দের সাজুয্যে বেশ বলার মত একটা কথা পেয়ে যেতে সে ফের বলে ওঠে —'চিতার কিসের ডর সাপকে, জলে-ডাঙ্গালে কতই না দেখা হয় দুজনাতে হাঃ হাঃ, ঠিক কিনা মা —'

নাম মাহাত্ম্যে আগ্রহ ছিলনা বনলতার, সে ঐ 'মা' ডাক নস্যাতে বড় উতলা, একটু রাগ-রাগ, একটু অভিমান— হয়ত গোটাটাই ছদ্মবেশ, তাই বনলতা কিছুতেই ক্রোধের ভঙ্গিটুকু ফোটাতে পারেনা উল্টে শোনায় করুণ 'আঃ ফের মা, আর যদি বলিস তো' বলেই ফর্সা হাতখানি তরখু-র কানের কাছে এগিয়ে আনে।

কান-মলা হেন নির্দোষ খেলায় তরখু শরীর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে, হাসির দমকে যতই সে প্রকৃতিসন্তান ততই মালকিন ও মুনিষের সম্পর্কটুকু ঘুচে যাচ্ছিল— মরশুমি ফুলেরা এ সময় কী সুন্দর, কত রঙ , কত তাদের আঙ্গিক, আর বড় বড় গাছের তলে রৌদ্রছায়ায় ছৌকাবুকি।

কুলের কাঁটা হাতে ফুঁড়তে যন্ত্রণায় মুখ বেঁকে যাচ্ছিল তরখু-র, মাটি থেকে আন্দাজ ফুট দশেক উঁচুতে দু'ডালের ওয়াই - আকৃতি সংযোগে তার পা, অদূরে বনলতা 'হ্যাঁ... ঐ... ঐটে, ঐ ডালটা আগে কাট — ইস্ আমার ফায়ারবল —' এমনতরো ধারাভাষ্য দিয়ে যাচ্ছিল থেমে-থেমে। তরখু তখন বাঁ-হাতের কনুই বেড় দিয়ে ডালে, ডান-হাতের নখে কাঁটা বার

করার চেষ্টা করছিল। এগাছে কাঁটার অন্ত নেই তাই তরখু নিচেকার ডালে গেঁথে রাখা কাটারিটা টান মেরে খোলে আর যে ডাল সে ধরেছে তার ওপর-নিচ-ক'বার খুব ঘষটান দেয়— এতে কিছু কাঁটা উৎখাত হয়, কিছু জেগেও থাকে তবে বিষতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভেঙ্গে গেলে কাঁটা আর কুলীন থাকেনা, তরখু-র হাত বাগিয়ে ধরতে সুবিধে হয়। গোটা দুই কাঁটা হাত থেকে বার করার পরেও আরও কাঁটা বিঁধেছিল কিন্তু উৎসুক বনলতা বড় উতলা, নানা কথায় কলকল— তরখু কাঁটার জ্বালা আমল না দিয়ে সমানে কাটারির কোপ মারতে থাকে। হাঁপাচ্ছিল তবুও। এভাবে সে একটা ডাল কেটে একটু দম নেয়, পরের ডালটাও কাটে, মড়াৎ শব্দে নিচে তা পড়ামাত্র রোদ্দুর বুঝি এতক্ষণ ওৎপাতা হায়না— লাফিয়ে পড়ে ফায়ারবলের মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে বনলতা কিশোরী মুদ্রায় নেচে ওঠে 'রোদ এসেছে .... রোদ এসেছে—'

এরপর আরও একটি ডাল বাকি ছিল কিন্তু সে উঁচুতে, পড়ে যাবার বিপদও হয়ত ছিল কিন্তু বনলতার অকৃত্রিম খুশিটুকু তরখু-কে দারুণ শক্তি জোগায়, সে খুব ক্লান্ত হলেও কাটারির কোপ্ মারতে থাকে আর বনলতা আশংকায় থরোথরো 'সাবধান তরখু... সাবধানে... পড়ে গেলে কিন্তু বিপদ হবে ... ওহ কী দস্যি ছেলে —' এমন কথায় উৎকণ্ঠা আর অকৃত্রিম টান মিশে থাকা হেতু নিজের গলা নিজের কাছেই অন্যরকম শোনাচ্ছিল, উৎসমুখ খুলে গেলে ঝর্ণাজল যে কলকল ধ্বনিতে বয়ে যায়, মাটি - পাথর - উচ্চ - নিচ - মানেনা, অরণ্য - প্রান্তর মানেনা, সম্ভবত যাবতীয় না - মানাই ধর্ম হয়ে ওঠে— তেমনই বনলতা কত কি বলতে থাকে, চঞ্চল পদক্ষেপে এপাশ -ওপাশ, আর নিজেকে ফিরে পাওয়ার তারল্যটুকুও একধরনের সুখের আবেশ দিয়ে যায়। ক্রমে শেষের ডালটি কাটা হতে তরখু হাসি - উদ্ভাসিত মুখে, অন্যপাশে, যেখানে কর্তিত কুলডাল ছিলনা, 'হই... ই হাঃ' এমন প্রাকৃত উল্লাস-সহকারে ঝাঁপ দিতেই বনলতা চক্ষু বন্ধ করে ভয়ে। কিন্তু এও সত্যি — চোখ বন্ধ করেও সে তরখু-র ঐ দামাল ঝাঁপ দেওয়ার ভঙ্গিটুকু দেখতে পাচ্ছিল স্পষ্ট — চোখ খোলার পরেও, ফলত একসময় সে খুব দুর্বল বোধ করতে থাকে। নিজের ওপর আস্থা কি কমে আসছিল? দ্রুতপায়ে বনলতা ঘরে ঢুকে যায়।

হাতের তালু জ্বালা করছিল তরখু-র — অনেক যন্ত্রণার মত এও সে গ্রাহ্য করে না— বাগানে তখনও বহু কাজ বাকি। গোটা বাগানটা ঝাঁট দিতে হবে, ঝুরি ভরে শুকনো পাতা বাইরে ফেলতে হবে, তারপর মরশুমি ফুল— কনোনেশন পিটুইনিয়া স্প্যাজ্জি ইন্‌ফা-তে জলসিঞ্চন, তবে গিয়ে আজকের কাজ শেষ।

বাগান পরিষ্কারের কাজে টানা ঘন্টা-দেড়েক লেগে থাকার পর তরখু-র ক্ষিধে বোধ স্পষ্ট হচ্ছিল খুব, অথচ আজ সকালের জলখাবারের দেরি দেখে মাঝে-মাঝেই মাথা তুলে চাইছিল দত্ত - ভিলার ঘর-পানে। এই বুঝি খেতে ডাকল, এই বুঝি। এরই মধ্যে তার নজর যায় বাগানের কলের দিকে, আর ক্ষিধের কাটান দেবে জলের ভাসানে এইমত ভাবনায় সে যখন কল খুলে আঁজলা পেতে দাঁড়ায় তখনই দত্ত-ভিলার কাজের লোক নব'র মা মনোদা ডাকতে আসে। মনোদার স্বর চাপা, কিছুটা বিদ্রূপে ত্যাড়াবাঁকা হাতে আজ বাটি নেই রুটি নেই সে খালি হাতে — 'ড্যাক্‌রা, চোখ উঠায়ে কি ভালিস হুঁ: ভাগ্যি বটে তোর — বলেই মনোদা দীর্ঘায়িত স্বরে 'মেমসাহেব' শব্দটিকে যথেচ্ছ বিকৃতি দিয়ে ফের বলে 'তোকে ডাকছে আজ ঘরে বসে খাবি, হুঁ: কালেদিনে কত যে রঙ্গ দেখি—'

তরখুও বিস্মিত কম নয়, এ ভাবে অন্দরে তার ডাক পড়েনা, বাইরে, বাগানের বড় বড়

গাছের ছায়াতলেই সে সকালের রুটি তরকারি খায়; আর সত্যি বলতে কি এই খোলা বাগানেই সে যথার্থ সাবলীল। তবু বনলতার ডাক উপেক্ষা করে এমন অবাধ্য সে নয়, তড়িঘড়ি কলের জলে হাত-মুখ ধুয়ে সে এগোতে থাকে। মনোদা তখনও তাকে ভিন্-নজরে দেখছিল আর বিড়বিড় করছিল— 'বেজাত, নোংরা, গায়ে গন্ধো — ইস্ ছুটলোককে ঘরে নে খাওয়াবে ম্যাগো, বড়লোকের ঢঙ-ঢাঙ বুঝা দায়—'

তরখু এজাতীয় কথায় সরল সপাট হাসতে থাকে, তারপর, মনোদা এ বাড়ির কাজের লোক বলেই হয়ত একটু রসিকতা করার সাহস পায়— 'খাওয়ার আগেই খালি জাত — কি বল মাসি! তা বাদে সবই দুর্গন্ধ, উঁ:, রাজাউজির তুমি আমি সবই সমান গো উঁ: ওয়াক্' বলেই নাকে হাত-চাপা দিয়ে ভঙ্গিটি বিষ্ঠাদর্শনের সমার্থক করলে তাতে মনোদার ঝাঁঝ আরও বৃদ্ধি পায় — 'চুপ্ ছুটলোকের কথার ছিরি কত, ওঁরাও থিকে খিরিস্তান, তায় মাগ্ নাই পুত্ নাই ভদ্দর হবে কমনে — ছুটলোক —'

এ জাতীয় আপ্যায়ন, দত্ত-ভিলায়, তরখু-র জীবনে প্রথম — সকালের জলখাবার ডায়নিং টেবিলে। চারটি ঝকঝকে চেয়ার চারদিকে, সম্মুখে বনলতা, সানমাইকা শোভিত ডাইনিং - টেবিলে চিনেমাটির নক্শা-মণ্ডিত প্লেটে মাখনের প্রলেপ দেওয়া টোস্টেড ব্রেড তায় নুন-গোলমরিচের গুঁড়ো বাহার খুলেছে, সেদ্ধ ডিম, আর একজোড়া পাকা কলা— দৃশ্যত অপ্রস্তুত তরখু, কুণ্ঠায় তার ঘাড় কাত্ হয়ে আসছিল, কোনটি প্রথম আর কোনটিতে শেষ হবে ঐ মহার্ঘ আহার্য এমন ভাবনায় দিশাহীন সে কী করে যে মুখে দেয় এই-ই সমস্যা যখন, তখন বনলতাই নরম স্বরে বলে — 'খা'।

তরখু তার করুণ মুখখানি তুলে বনলতা-কে দেখামাত্র শিশুকালে হারানো মা-য়ের মুখচ্ছবিটি আবছা মনে পড়ে, দুটি ছবিতে মিল না থাকা সত্ত্বেও ইত্যাকার স্নেহসুলভ আন্তরিক আচরণে মিল ছিল খুব, তাই তার গলা ভারি-ভারি, চোখও ঝাপসা — খাবে কী, গোবর-নিকানো উঠোন আর সোঁদা-মাটির গন্ধে নিরন্ন গাঁয়ের ডাহুক ডাকা দুপুরগুলি ভীষণ জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকলে সে ব্রেড হাতে জবুথবু— এমন বালকবৎ স্থবিরতা বনলতা-র মনে দুই ভিন্ন - মেরুর স্ট্যাটাস-জনিত কারণগুলিকেই মনে পড়াচ্ছিল, সে নিজস্ব ভাল-লাগা কৌতুকবোধ দমিত রাখে আপ্রাণ সামাজিকতায়, পরক্ষণেই তরখু-র অপ্রস্তুত দশা দেখে সহমর্মি স্বরে বলে ওঠে — 'খা, আমি একটু আসছি —'

বনলতা উঠে আসে নিঃশব্দে, যাতে তরখু খাওয়াটুকু সারতে পারে নিজের মত করে, কুণ্ঠাহীনভাবে। বস্তুত তাই করছিল তরখু, বনলতা উঠে যেতে সে দ্রুত খাচ্ছিল, একটু বেশিই দ্রুত— সে আবার বাগানে ফিরতে চাইছিল যতটা সম্ভব সময় নষ্ট না করে।

জলখাবার খাওয়া শেষ হতে দ্রুত উঠে পড়ে তরখু, আর তৃপ্ত মুখখানি কৃতজ্ঞতায় ভাংচুর দেয় একসা, সে বনলতা-র মুখোমুখি তাকাতে মোমগলা হয়ে যায়, ঘাড়মাথা নুয়ে আসছিল, কোনক্রমে 'যাই, বাগানে মেলা কাজ' বলেই সুচারুশোভিত অন্দর থেকে বেরিয়ে আসলে ফের একবার মনোদার ঝাঁঝ-নজরের মুখোমুখি হয় — তরখু তা গ্রাহ্য করছিল না, মালকিন-সান্নিধ্যের স্মৃতিটুকু তাকে এই মুহূর্তে শ্লাঘাবোধে পূর্ণ করছিল ফলে মনোদার অখুশি মুখখানিকেও সে উপভোগের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে যাকে ঔদ্ধত্য ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারছিল না মনোদা। তরখু-র এ-জাতীয় শ্রেণীগত পরিবর্তন চ্যুতি বলেই ঠাওরায় মনোদা, সে সহ্য করতে পারছিল

না; আবার কর্তা-মার পছন্দের বিরুদ্ধে গাওনা দেওয়া বিপদজনকও বটে, এমন দোলাচলে সে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ গালাগালিটুকুই, জাত্যাভিমান-সংক্রান্ত, বেছে নেয় 'বেজাত কুথাকার, হুঁ:, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ — ইচ্ছা করে ফ্যাপড়া দি —'

তরখু ততোমধ্যে বাগানে নেমে পড়েছে। ঝাঁঝরি হাতে বাগানের কলে জল ভরছিল। ফুলের সমারোহ তাকে হাতছানি দিচ্ছিল। গত কদিন গাছগুলো জল পায়নি। আজ ভাল করে দিতে হবে।

।। ২ ।।

দুপুরে চান সেরে ফাঁপানো চুল বুকে এলিয়ে বনলতা এই অলস মুহূর্তগুলিকে কী ধন্য কী সুন্দর এমন প্রেক্ষিতে ভরভরাট করতে চাইলেও এক অবিমিশ্র শূন্যতা তাকে গ্রাস করে ফেলতে থাকে।

দামি পারফ্যিউমের গন্ধে যে সতেজ সজীবতা তার অঙ্গে অঙ্গে ছুঁয়ে, বিষয়-বৈভবের যে ঔজ্জ্বল্য চারপাশে প্রকটভাবে বর্তমান, দত্ত-ভিলার স্ট্যাটাস-সম্বলিত ঘেরাটোপে আধুনিক নগর-সভ্যতার কুহকময় এই যে জীবন যেখানে কোনও 'নাই' এর অস্তিত্ব নেই, সকলই আছে এবং প্রয়োজনের অধিক অত্যন্ত জাগ্রতরূপে, সেখানেই বনলতা আজ, বস্তুত, চরম আকর্ষণহীন — পাওয়ার পরিমাণ সীমিত না হলে হয়ত তা যন্ত্রণার-ই প্রতিরূপ— সন্তানহীনতার কথা হয়ত ক্লিশে শোনাবে, সে থাক্, বনলতা তাকে আমল না দিলেও এই মধ্যদুপুরে কুবোপাখির হঠাৎ-হঠাৎ ডেকে ওঠা বা জানালা পথে গাছেদের পাতাখসার নিঃশব্দ মুহূর্তগুলি তার অন্তরে বড়ো বেশি বাজছিল। জীবন পূর্ণ না অপূর্ণ সে তত্ত্বের ভাষা, কিন্তু যা জল-হাওয়া-ভাত-কাপড়ের মতই জরুরি, জীবন জীবিত কিনা, তারই ক্রমভাবনায় শিকড়ে-শিকড় জড়িয়ে যাচ্ছিল বনলতার। তার আলস্যশয়ান বুকে ফ্যাশানের বিদেশি পত্রিকা ছিল প্রায়-নগ্নিকার শারীরিক বিন্যাসে পোষাক যেখানে বাহুল্য, একেবারে হাল-ফ্যাশানের স্বল্পবাসিনী শরীরে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাওয়া প্রিমিটিভ-এ্যাপ্রোচ্ বনলতা-র দর্শনতত্ত্বের গভীরের খোরাক হতে পারত সে সম্ভাবনাও ছিল— কিন্তু সব এড়িয়ে তার চোখ ছিল শূন্যে — রোদ্দুরে থৈ থৈ বাগানে। বাতাসে মাথা দোলনরত করোনেশন এ্যাস্টর পিটুইনিয়ার অফুরান বর্ণবিলাস চারদেওয়ালের ইন্টিরিয়ার লাবণ্যকে দারুণ ফিকে করে তুলছিল— এরই মাঝে ঘর্মাক্ত তরখু-র বিরতিহীন পরিশ্রমে নিমগ্ন প্রকৃতিপ্রেম — বনলতা-র দীর্ঘশ্বাসটুকুও হায় আভিজাত্যের শৃঙ্খলে বাঁধা।

তখনই বেজে ওঠে ফোন। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে এলানো হাত দিয়ে রিসিভার তোলে, তারপর-ই আচমকা সোজা হয়ে বসে। বনলতা-র নিষ্প্রভ চক্ষুজোড়া এসময় ঈষৎ রোমাঞ্চ - ছোঁয়া - লাস্যে উজ্জ্বল ও বড় বড়, ভুরু বাঁক নিচ্ছিল আর আদ্‌ফুটি হাসিতে ঠোঁটদুটি ফাঁক হলে গজদন্তের চিকণ মহিমা উদ্ভাসিত। ওপ্রান্তের ভেসে আসা প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছিল, মৃদু 'হুঁ... হ্যাঁ' করছিল, একটু একটু করে চঞ্চল হয়ে উঠছিল মন। 'দত্ত-এন্টারপ্রাইজ' ওভারহেড ট্যাঙ্কের টেন্ডারে বাজিমাত করেছে এহেন মহার্ঘ সুসংবাদের মধ্যে থেকে আজ সকালেই তরখু-র বলা 'মনো বাঞ্ছা পুরে মা' কথাটির বাকি আর যা যা সম্ভাবনাসকল এ যাবৎ ভিতরে ভিতরে বনলতা-কে এক প্রচন্ড দুরাশার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে সাহায্য করেছিল তা ক্রমশ দীপ্য হয়ে উঠতে থাকে। কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস, যা থেকে মুক্ত বলে এই এতকাল বনলতা নিজেকে জানত এবং তুলামূল্য বিচারে অন্তত এই একটা জায়গায় সে সুখেন্দুবিকাশের চেয়ে এগিয়ে বলে সাময়িক সুখবোধের কারণ ছিল, তা যেন ক্রমশ ধ্বস্ত হয়ে যেতে থাকে। কী

প্রচন্ড ক্ষমতাবান এইসব বিশ্বাসগুলি, কী প্রচন্ড! ওপার থেকে সুখেন্দুবিকাশের উচ্ছ্বাস লাগামছেঁড়া, যেন তরখু-কে এই মুহূর্তে হাতের সামনে পেলে মাথায় তুলে নাচতে দ্বিধা করত না— ওপার থেকে তখনও উত্তেজিত স্বর ভেসে আসছিল 'ওকে ছেড়ো না, সন্ধে অবধি আটকে রেখো, ওর জন্য একটা গিফ্‌ট ... ওহ্ গড' — এই অবধি শুনেই বনলতা ফোন নামিয়ে রাখে আচমকা, বুকের ভিতর তার গুমগুম মেঘ ডাকছিল, 'মনোবাঞ্ছা পুরে মা' কথাটির অন্য বহুতর অর্থের মধ্যে থেকে একটাই ছবি ভাসতে থাকে বনলতা-র চোখের সামনে — একটি শিশুর মুখ — এরপর গোটা বাড়িটা দারুণ নিঝুম হয়ে আসে।

বনলতা ধীর পায়ে শোবার ঘর থেকে সম্মুখের ড্রইংরুমে আসে, বাহারি গ্রীলের ফাঁক দিয়ে তার চোখ তরখু-কে খুঁজছিল। পরিশ্রান্ত তরখু এতক্ষণে বিশ্রামের কোলে ঠাঁই নিয়েছে, সে শুয়েছিল চালতাগাছের দীঘলপাতার ঠাসবুনোট ছায়ার নিচে — এমন দৃশ্যটি বনলতা-কে ঘরের বাইরে টেনে আনে, সে পায়েপায়ে অনেকটা এগোয়, হ্যাঁ, রোদ্দুরের দু'চারগাছি সুবর্ণলতা তরখু-র দেহে, আর সে ঘন পাতার দিকে মুখ করে চোখ বুঁজে শুয়েছিল যেন এই ত্রিসংসারে তার যাবতীয় একাকীত্বকে দারুণ কান মুলে দেয়।

বনলতা মিহিস্বরে ডাক দেয় 'তরখু — ওঠ্, খাবিনা, — এ্যাই তরখু—'

এমন সুরেলা সম্ভাষণ না জানি কোন অজানা পাখির ডাক— ক্লান্ত তরখু শুয়েই ছিল চক্ষু বুঁজে, পরক্ষণেই ফের 'তরখু, এ্যাই ওঠ্ খাবিনা' শুনেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, আর চোখ কচলে 'মা, আপনি! বাগানের কাজ শ্যাষ, তা একটু — রাতে যা জাড় উঁহু ঘুমাতে লারি—' বলেই শীতের কামড়-সংক্রান্ত ভঙ্গিটি সম্পূর্ণ করে, আর বনলতা স্নেহার্দ্র স্বরে যেন মাতৃত্বের আস্বাদটুকু পূর্ণ উপভোগ করতে চায়— 'মনোদা-র কাছ থেকে তেল চেয়ে নে, গায়ে মেখে ভাল করে চান কর ঘুম কেটে যাবে— তোর সাহেব, জানিস—' বলেই থমকে যায়, বাকি কথাটা বলা হয়ত অর্থহীন। ওভারহেড ওয়াটার-ট্যাঙ্কের কনস্ট্রাকশান যদি 'দত্ত - এন্টারপ্রাইজ' পেয়েই থাকে তাতে তরখু-র কতটা, কী, যায় আসে এমন ভাবনাই সম্ভবত বনলতাকে মধ্যপথে থামায়।

'নে, আর দেরি করিস না—, বনলতা ফিরে যাচ্ছিল ঘরের দিকে, এসময় সে নিজের মনেই একটা মজার কথা, হ্যাঁ, মজারই বটে, কারণ নিজের কি তার ঈর্ষা হচ্ছিল কারও ওপর— এমনটাই ভাবছিল, আর 'মজা' এজন্যই বলা যে সে সম্যক বুঝে উঠতে পারছিল না ঈর্ষা কার প্রতি, কতটা, হওয়া উচিত; প্রাপ্তির শিখর - ছোঁয়া সর্বার্থে সফল সুখেন্দুবিকাশকে, নাকি ঐ চালতাছায়ে জল- মাটি-পাথরের সংজ্ঞায় শুয়ে থাকা তরখু টিগ্‌গাকে— বনলতার হাসিটি এখন যত করুণ, ততটাই তির্যক, সূর্য একটু হেলে— ফায়ারবলের লাল রোদ্দুরে দাউদাউ।

তরখু টিগ্‌গা যাবে-যাবে করছিল, বনলতাই যেতে দেয়নি। সন্ধ্যা উতরে গেছে। আজ অনেক তাড়াতাড়ি গেটের কাছে দুটি চোখের আলো জেগে উঠল, বাগানের দু পাশে মরশুমি ফুলেদের ফুল্ল আঁধার-কেলি সাময়িক আলোর দাপটে ছিঁড়েখুড়ে একসা — সুখেন্দুবিকাশের মারুতি বার দুই হর্ণ দিতে তরখু-ই দৌড়ে এসে গেট খুলে দেয়, বনলতা সব দেখছিল। এত তাড়তাড়ি ফিরে এসেছে সুখেন্দুবিকাশ যাকে অসময়-ই বলা চলে। দুধ সাদা মারুতি গাড়ি অতি ধীরে গ্যারাজে ঢুকে যায়। ফেরার সময় রঙ্গলাল, এই অসময়ে তরখু-কে সাহেবের বাড়িতে দেখে কর্তৃত্বে - ভরপুর স্বরে 'কিরে তোর ঘরদুয়ার নাই' বলতে নিরাসক্ত মুখে

হাতখানি নাড়ু ঘোরানো ভঙ্গি করে, কথা কয়না, আর তাতে তরখু-র ঐ মুদ্রাটি এতই নির্দোষ ও অর্থবহ হয় যে, যেন তা বসুধৈব কুটুম্বকম বা শূন্যেরও শূন্য যা তাই পূর্ণ — এমন গোলমেলে দর্শালে রঙ্গলাল কড়া ধমক দেয় 'হাঁদারাম'!

আর তখনই সুখেন্দুবিকাশ অখুশি মুখে সম্ভবত এই প্রথম রঙ্গলাল - কে, মাসমাইনের অভিজ্ঞ ড্রাইভারকে, ভর্ৎসনার স্বরে বলে ওঠে 'আ: ছেলেটার ত্রি সংসারে কেউ নেই, ওকে এমন করে বলছ কেন— বেচারা—'

গ্যারাজের চাবি রেখে চলে গেছে রঙ্গলাল। তরখু তখনও বসেছিল বাইরের অন্ধকারে, শীতের দাপটে শিরানি দিচ্ছিল শরীরে, অন্ধকারে গাছগুলি ও সে একাকার; চোখে রাজ্যের ঘুম ছিল, আর ছিল দীর্ঘ রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতার মাঝে ঘিয়াডোবা গ্রামের বেজে-ওঠা মাদলের 'ডুডুম্ ডুডুম্' ক্ষীয়মান ধ্বনির মত অভিগ্রস্ত অভিলাষ — বাখর মেশা মহুয়ার রসে, কুপির মিরগি -কাঁপা আলো মাঝে যৌবনের ছায়া কোন্ মুদ্রায় নাচে—

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে, সুখেন্দুবিকাশের ততোমধ্যে গা-হাত পা ধুয়ে, পোষাক ছেড়ে পাঞ্জাবি-পাজামা ও শাল শোভিত ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্যে কলকল করছিল, নিজের সৌভাগ্যের আস্বাদ দান বিনে পূর্ণ নয়— তাছাড়া তরখু-কে গিফ্‌ট দেবে এমন কথাও দিয়ে রেখেছিল সে, যার জন্যে ছেলেটাকে এই এতক্ষণ আটকে রাখা—

মনোদা এসময় বাইরে এসে হাঁক দেয় 'এ্যাই ড্যাক্‌রা কোতা গেলি, আয়, সাহেব ডাকছেন—'

তরখু গাছের ছায়া থেকে উঠে আসে আলো মাঝে, মনোদার ক্রোধী মুখচোখ আলোতে কিম্ভুত দেখাচ্ছিল কিন্তু এসবে অভ্যস্ত তার মুখে মানুষের দুর্বুদ্ধি ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে ওঠা গাছ, যে শুধু মানুষ নয় মায়াময় এই জগৎ, শস্য - জলাশয় - পাহাড় সব দেখতে পায়— মৌনতায় দেখাগুলি আরও খোল্‌তা দেয় আরও বোধ্য — তরখু মন্দ-মন্দ হাসছিল শুধু।

সুখেন্দুবিকাশ টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছিল তরখু-র জন্য কেনা একটা রঙ্গীন পুরো-হাতা শার্ট, আন্দাজে কেনা একটা রেডিমেড ফুলপ্যান্ট, লাল-হলুদ ফুল তোলা সোয়েটার আর মাংকিটুপি, গভীরনীল।

'নে, সব তোর—' সুখেন্দুবিকাশ এমন বললে তরখু বিস্ময়ে থ, এতদিন এ বাড়িতে কাজ করছে সে, সৌভাগ্যেরও তো একটা সীমা থাকে, আজ সম্ভবত তাও ছিল না, বস্তুত সে থম্‌ধরা — এই মূল্যবান পোষাকসমূহ তার হতে পারে বিশ্বাসে কষ্ট হচ্ছিল, তবু মালিকের কথা বলে কথা, তাছাড়া বনলতা স্নেহার্দ্র ও আন্তরিক স্বরে 'নে সাহেব দিয়েছেন পরবি' বললে সাফল্যে উচ্চকণ্ঠ সুখেন্দুবিকাশ দরাজগলায় হেসে ওঠে 'পরবি মানে! যা এগুলো পরে আমার সামনে আয়, দেখি তরখু-বাবুকে কেমন লাগে—'

তরখু খুব বিব্রত বোধ করছিল, সে ইতস্তত করতে থাকে আর তাতে ধৈর্য-কম সুখেন্দুবিকাশ ধমকে ওঠে ' কী হলো ওগুলো পরে আমার সামনে আয় বলছি—'

করুণ মুখে একবার বনলতা একবার সুখেন্দুবিকাশের দিকে চেয়ে নিস্তার কোথাও সম্ভবত নেই এটুকু বুঝে সব পোষাক বগলদাবা করে ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে যায় তরখু, সুখেন্দুবিকাশ স্বীয় সাফল্যকে উপভোগ করার মেজাজে একটা হাত বনলতার কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বলে — 'দেখেছ, ছেলেটার মুখে তবু হাসি নেই।'

অল্পক্ষণ পরেই নতুন পোষাকে রঙ্গীন তরখু ফিরে আসে, আর সেই মুহূর্তে পাশের ঘরে

শিকলবাঁধা সুখেন্দুবিকাশের ডোবারম্যান দুই-পা তুলে প্রবল ডাকতে থাকে যেন ডাকাত পড়েছে। ভয়ে জড়োসড়ো তরখু অনেকটা সরে আসলে সহসা দেয়ালের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায় — নিজেকে চিনতে পারছিল না সে— আলোর মাঝে সে যেন অন্য কেউ এমনভাবে গুটিগুটি দাঁড়ায় মাথানিচু। সুখেন্দুবিকাশ হো হো করে হাসছিল, তার স্ফীত উদর থলথল করে কাঁপছিল, এরই মাঝে ডোবারম্যানের আক্রোশী হুংকার আর নব্য - পোষাকে তরখু-র মাথা নিচু ভঙ্গিতে জড়োসড়ো দাঁড়ানো — সব মিলে ওভারহেড-ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাজ জিতে নেওয়া সুখেন্দুবিকাশ যথার্থ রিল্যাক্সড — দানের মহিমা এতক্ষণে সম্পূর্ণ — শুধু রেডিমেড বলেই ফুলপ্যান্টটা বেশি ঢোলা, তবু ছোট তো নয়, বড়ই, 'দুটো ফোল্ড দিয়ে নেবে নিচে — তা ভিন্ন রঙ্গীন জামা সোয়েটার মাংকিটুপিতে কালো ছেলেটা এখন নগর-সভ্যতার উপযোগী, সাহেবের এখন প্রিয়পাত্রও; পিঠ চাপড়ে সুখেন্দুবিকাশ 'গাঁয়ে আজ তোকে কেউ চিনতে পারবে না, যা বাড়ি যা' বললে কথাগুলি কশাঘাতের মতই তীব্র মনে হচ্ছিল বনলতা-র।

তরখু-র চোখ কৃতজ্ঞতায় প্রণত, ছলোছলো, নতুন প্যাকেটে তার পুরানো ছিন্ন পোষাক বগলে পুটলিকৃত, মুখ দেখে খুশির আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল না— ফিরে যাচ্ছিল।

একসময় অন্ধকারে লোহার গেট বন্ধ করার শব্দ হলে বনলতা গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে 'লাল, হলুদ, নীল— সত্যি ছেলেটাকে জোকার বানিয়ে ছাড়লে!'

সুখেন্দুবিকাশের হাসি, চার দেয়ালে লাট খেতে থাকা, থেমে যায় — 'জোকার! কেন? সত্যি' খুঁত ধরাটা তোমার একটা স্বভাব, এতগুলো টাকা খরচ করে কিনে দিলাম অথচ —' কথা শেষ করেই সুখেন্দুবিকাশ টেবিলে রাখা ব্রীফকেসটা খুলতে থাকে।

জানালার ফাঁক দিয়ে ঝুপসি অন্ধকারে ছন্নমতি চালতাগাছের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল বনলতা, যেখানে আজ দুপুরে শুয়েছিল তরখু টিগ্‌গা— ওকেই কি সমাহিত বলে!

বনলতা ফিরেও তাকায়নি সুখেন্দুবিকাশের দিকে, কারণ ও নির্ঘাৎ জানে, এই দিনে, এমন সাফল্যের দিনে, মাঘের ঠান্ডা — সুখেন্দুবিকাশ 'অ্যাটোয়াল এন্ড সন্স'-এর কিনে আনা দামি হুইস্কির বোতল বার করছিল ব্রিফকেস থেকে —

শঙ্খুয়া

এযা দে

ডাঙার সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধা রিভার কুইন-এর পাটাতনে এক লাফে উঠে পড়ে ইভলিন। সুকান্ত-র বাড়ানো হাত অগ্রাহ্য করে। লঞ্চের চালক খালাসি হেলপার সুকান্ত-র বাবার অধঃস্তন ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার রেঞ্জার পিএ ও পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু কৌতূহলী স্থানীয় ছেলে ছোকরাদের সকৌতুক সপ্রশংস দৃষ্টি সর্বাঙ্গে মাখতেমাখতে । তার স্বদেশে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ হেন পরিস্থিতিতে কেউ চেয়েও দেখত না। লঞ্চে চোখে রোদ না লাগা সবচেয়ে আরামের বসার জায়গাতে তাদের সসম্মানে স্থান গ্রহণ। সমাদর স্বাভাবিক। তারা বড় সাহেবের আমেরিকা-বাসিন্দা পুত্র ও নববিবাহিত পুত্রবধূ। যথাবিহিত হাঁকডাক ও কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলার মধ্যে রিভার কুইন রওনা। ক্রমে নদীর মধ্যে। এবারে গতিবৃদ্ধি। পিছনে লম্বা ল্যাজের মতো তরঙ্গ ভঙ্গের রেশ। দুদিকে দূরে প্রান্তর ইতঃস্তত গাছপালা। অবিন্যস্ত হাল্কা বাদামি চুলে হলুদ খয়েরি জ্যামিতিক ছাপা স্কার্ফ বাঁধতে বাঁধতে ইভলিন প্রশ্ন করে,

— এটা কী নদী?

— বৈতরণী।

— বাইটারানি। মানে কী?

শ্বশুরবাড়ি ইন্ডিয়ায় পা দেওয়া ইস্তক ইভলিন যেন ছাত্রীজীবনে ফিরে গেছে এবং সুকান্ত তার এনসাইক্লোপিডিয়া ইনডিকা, জলজ্যান্ত ভারতীয় বিশ্বকোষ। আর পাঁচজন শহুরে ভারতীয় মধ্যবিত্তের মতো পরিবেশ পারিপার্শ্বিকের প্রতি বরাবর উদাসীন সুকান্ত। শিক্ষকের ভূমিকায় যথেষ্ট বিব্রত।

— মানে তার কী। ওটা জাস্ট একটা নাম। তবে আমাদের পুরাণে বলে নদীটা নাকি যমের দরজা পর্যন্ত গেছে। যম, ইয়ামা হচ্ছে মৃত্যুর দেবতা, গড অফ ডেথ।

— রিয়েলি! তোমাদের সব কিছুতেই একটা কাহিনী থাকে। সো ইন্ট্রেস্টিং।

ইভলিনের অভিজ্ঞতায় ইন্ডিয়া হচ্ছে কতগুলো বিশেষণের সমষ্টি — মজার আশ্চর্য কী ভাল কী সুন্দর কী চমৎকার। এবং সর্বত্র নির্বিচারে প্রযোজ্য হাউ ইন্ট্রেস্টিং। সে আধুনিক মার্কিন উঠতি বুদ্ধিজীবী। গত কয়েকশ বছর ধরে পৃথিবীতে পশ্চিমি সভ্যতার আধিপত্য, যুক্তিবাদ বিজ্ঞান কারিগরী বিদ্যার দাপট, প্রখর প্রতিযোগী মনোভাব ইত্যাদির ঘোর বিরোধী। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার স্মরণে প্রতিবাদ মিছিলে সে সামিল, বিপন্ন প্রকৃতি সংরক্ষণে সবুজ আন্দোলনে সে সোচ্চার। তার কাছে পশ্চিমী সভ্যতার হীনতম অভিব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক অত্যাচার যার মূর্ত প্রকাশ সাদাকালো বৈষম্যে। হাইস্কুলে কলেজে সে বেছে বেছে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে ভাব করেছে। গবেষণা সহযোগী সুকান্ত রায়কে স্বামীত্বে বরণ তার প্রতিবাদী জীবনদর্শনের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি — যদিও সুকান্তর গায়ের রঙ রীতিমতো ফর্সা, পশ্চিমবঙ্গে যাকে বলে গৌরবর্ণ, তবুও ভারতীয় হিসেবে সে পশ্চিমি দৃষ্টিতে কৃষ্ণাঙ্গ।

যে মুষ্টিমেয় অনাবাসী ভারতীয়ের কৃতিত্ব ইংরিজি ও বিভিন্ন দিশি সংবাদপত্রে ফলাও

করে ছাপা হয় সুকান্ত অবশ্য তাদের একজন নয়। সে গরিষ্ঠের দলে, অর্থাৎ একটি মাঝারি শ্রেণীর মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সোস্যাল সায়ান্সে পি. এইচ. ডি.। একটার পর একটা এবং বছরের পর বছর বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত; যাদের সম্বন্ধে দেশে বাবা মা সগর্বে আত্মীয়পরিজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে বড় মুখে বলে থাকেন 'ছেলে তো আমেরিকায়'। মনে মনে উদ্বিগ্ন ছেলের বয়স তিরিশের ওপর, এখনো স্থায়ী চাকরি জুটল না। ফলে জোটেনি দেশি পাত্রীও। আজকাল উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েরা এবং তাদের বাবা মায়েরা অতি সেয়ানা। পাত্র পাত্রী বিজ্ঞাপনে ডলার-রুপী আপাত আকর্ষণীয় সমীকরণে রিসার্চ ফেলোশিপ মোটা অঙ্কের হলেও তাদের প্রলুব্ধ করে না। কাজেই সুকান্ত যখন ইভলিনকে বিবাহের সিদ্ধান্ত বাড়িতে টেলিফোনে জানাল — তাদের বছরখানেক একত্র বসবাসের খবর অনাবশ্যক বিবেচনায় গোপন রেখে — বাবা তখন খুশিই হয়েছিলেন। এত খরচাপাতি করে ছেলেকে প্রথম বিশ্বের অধিবাসী করেছেন, এখন অন্তত মার্কিন নাগরিকের স্বামী হওয়ার সুবিধা পাবে। ইভলিনের ছবি হাতে পেয়ে মা অবশ্য একটু মিনমিন করে বলেছিলেন,

— চেহারার মধ্যে আছে শুধু ঢ্যাঙঢ্যাঙে পা জোড়া, গড়নপেটনে বারো বছরের মেয়ে, কি একটা অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করে সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার প্রজেক্টে। দেশে আমাদের কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে। বাঙালি মেয়েরা আজকাল কী না হচ্ছে। এম.বি.এ. চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট একজিকিউটিভ — বাবা থামিয়ে দেন।

— কোন রূপসী বিদ্যেবতী তোমার ছেলের গলায় মালা দেবে বলে এখানে বসে আছে। কতবার তো কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে। কী পদের সব মেয়ে পেতে পার দেখলে তো। যা জুটেছে তাই ঢের ভাগ্য। এ নিয়ে একেবারে ঘ্যান ঘ্যান করবে না।

অতএব ছুটি ও অর্থের ব্যবস্থা করতে পেরেই যুগলে আগমন। প্রীতিভোজে তারকার ভূমিকা, শ্বশুরকুলের সঙ্গে পরিচয় এবং বাড়তি লাভ ইন্ডিয়া দেখা। শুধু সময়টা একেবারে বেয়াড়া এপ্রিল মাস, চৈত্রের শেষ বৈশাখের শুরু। মোটেই অনাবাসী মরশুম নয়। সুকান্ত একটু উদ্বিগ্নই ছিল, গরম নোংরা ধুলো ইভলিন কতটা হজম করতে পারবে। সে আগেভাগেই গেয়ে রেখেছে তাদের তিন পুরুষের বাস কটক। কলকাতার মত ইংরেজদের তৈরি অবাচীন শহর নয়, খুব পুরনো। নতুন পৃথিবীর নাগরিক ইভলিনের কাছে যত পুরনো তত ভাল। তার আগ্রহ বেড়েছে।

— কত পুরনো?

— তা হাজার বছর হবে।

— হাজার! মাস্ট বি ইন্ট্রেস্টিং।

কটকের আঁকাবাঁকা সরুগলি, দুধারে খোলা নর্দমা ধসাপচা বাড়িঘর তাকে খুব একটা বিপর্যস্ত করে না। বাঙালিশাহীতে সুকান্তদের বাস। চকমিলান অট্টালিকার সদর দরজা দিয়ে ঢুকে চতুষ্কোণ বাঁধানো চত্বর, চারিদিক সারি বাঁধা ঘর ও টানা বারান্দা। অঙ্গনের মাঝখানে পরিপাটি তুলসী মঞ্চ। সুকান্ত ব্যাখ্যা করে।

—বেসিল, আমাদের কাছে সেকরেড প্ল্যান্ট। সন্ধে বেলা রোজ প্রদীপ জ্বালানো হয়, শাঁখ

বাজে। তুলসীর পাতা খুব কাজের, আয়ুর্বেদিক মূল্য আছে।

ইভলিন চমৎকৃত। প্রাচীন সভ্যতা প্রকৃতির সঙ্গে কত সুসমঞ্জস সুকান্তর বাবা — ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট থেকেই ওদের সঙ্গে — বাড়ির সঙ্গে নববধূর পরিচয় সুরু করেন। একতলায় বৈঠকখানা, রান্না খাওয়া। ছোট ছোট ঘরগুলোয় পুরনো ভৃত্য, দূঃস্থ দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের বাস। ইভলিন ভাবে একান্নবর্তী পরিবারে ব্যক্তির নিরাপত্তা আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ব্যবস্থার চেয়ে কিছু কম নয়। মনে মনে সে একটা নিবন্ধের পরিকল্পনা শুরু করে, একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত সমাজকে সে ভেতর থেকে দেখার দুর্লভ সুযোগ পাচ্ছে —আ রেয়ার অপরচুনিটি। দোতলায় উঠে এসেছে সবাই। সারি সারি শোবার ঘর — তার মধ্যে সুকান্তর ঘরটি তাদের জন্য সজ্জিত — সমান্তরাল লম্বা বারান্দা। দক্ষিণে কাঠজুরি নদী থেকে ঝিরঝিরে হাওয়ায় মনোরম বসার জায়গা। ইভলিনের মন্তব্য, সো নাইস! জলবায়ু অনুযায়ী খাঁটি দিশি স্থাপত্য। বাড়িটি যে পুরোপুরি ইংরেজ আমলের নির্মাণ সে তথ্যটি সুকান্ত চেপে যায়। ইতিমধ্যে সে স্বস্তি বোধ করেছে যে অন্যান্যবারের মত কাঠজুরি শুকিয়ে তপ্তখোলা হয়ে যায়নি এখনো তার গরম তেতে ওঠা বালির তাপে আশেপাশে মহল্লার দরজা জানালা সারাদিন বন্ধ রাখতে হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস অবশ্যই এক প্রান্তের সাবেকি বাথরুম ও ময়লা নিষ্কাশনের আদিম বন্দোবস্ত। মার্কিন মানে নির্ঘাৎ অপরিষ্কার। তবে সুকান্তর দ্বিধা ও সঙ্কোচ হাল্কা হেসে উড়িয়ে দিয়ে ইভলিন জানাল তার কাছে সব ফানি অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ। প্রীতিভোজের ধুমধাম আলো সাজসজ্জা সুবেশ অতিথি এত পদ খাওয়া তার কাছে দারুণ ব্যাপার। পরিবারের এবং দূরসম্পর্কে বোন ভাইঝি ভাগ্নিদের সাহায্যে তার গয়নাগাটি শাড়ি পরা — অ্যান ইন্ডিয়ান ব্রাইড। যদিও তার মনে হয়েছিল যেন ফ্যান্সি ড্রেসে ভূমিকা। সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে সিম্পলি মা-ভ্লাস। সত্যি চমৎকার। খালি একটু কাঁটা খচখচ করে, এত দরিদ্রদেশে এমন বিলাসিতা, ঐশ্বর্য প্রদর্শন। সুকান্ত ব্যাখ্যা করে, তাদের পরিবার কটকে প্রতিষ্ঠিত বাঙালি, বংশ মর্যাদা অনুযায়ী অনুষ্ঠান এক ধরনের অলিখিত বাধ্যতা। ইভলিন তার পরিকল্পিত প্রবন্ধে প্রাচীন স্তরবিন্যস্ত সমাজে আচার ব্যবহার প্রথা ও ক্রিয়াকর্মের ওপর বেশ কিছু লেখার কথা ভেবে রাখে। তবে তার অবিমিশ্র আনন্দ 'সেরিমনি'তে, অর্থাৎ সুকান্তর খুড়তুতো জ্যাঠতুতো মামাতো পিসতুতো চ্যাংড়া ভাইপো ভাইঝিদের আয়োজিত মালাবদল ও শুভদৃষ্টি অনুষ্ঠান। 'নইলে বিয়ে বিয়ে মনে হয় নাকি।'

প্রতি পদেই অবশ্য সুকান্ত বুঝিয়েছে এ সবই নেহাৎ তাৎক্ষণিক, ক'সপ্তাহ বাদেই তারা ফিরে যাবে আমেরিকার উত্তর আধুনিক বাস্তবে, নিজেদের সংসারে, সদা ব্যস্ত অভ্যস্ত জীবনযাত্রায়। দেশের স্মৃতি শুধু ভিডিও ক্যাসেট আর ছবির অ্যালবাম হয়ে থাকবে। এক কপি বাবা মা-র কাছে কটকে, আরেকটি তাদের কাছে মিনিয়াপোলিস বা মিনসিনাটি বা ওকলাহোমায়। যখন যেখানে। কটকে স্থায়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

সুকান্তর বাবা উচ্চপদস্থ আমলা, বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন বদ্ধ জলাশয়ের মতো বিগতকালের আচারবিচারে সংস্কারে বন্দী প্রবাসী বাঙালিদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর মেমসাহেব পুত্রবধূর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা কাম্য বোধ করেন নি। ইতিমধ্যেই তাঁর কানে

এসেছে "রায়বাড়ির ঠাকুরঘরে তাহলে মেমবৌ ঢুকল।" অতএব তাঁর পুত্রবধূর ক'সপ্তাহ শ্বশুরবাড়ির দেশে বাস একেবারে প্রোগ্রামে ঠাসা। ভুবনেশ্বরে নন্দনকানন সাদা বাঘ লায়নসফরি, একাম্র কাননে ফুলের সমারোহ, বটানিকালে কত শত ক্যাকটাস, পুরীর জগৎ বিখ্যাত কোণারকের সূর্যমন্দির, চিল্কার বিরাট হ্রদ, গোপালপুরের নির্জন সমুদ্র,গুপ্তপানির উষ্ণ প্রস্রবণ — সব সারা হয়ে গেছে। ভাগ্যে ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ ও পুরীর জগন্নাথ মন্দির ইভলিন বাইরে থেকে দেখেই খুশি। অ-হিন্দুর বিগ্রহদর্শনের চেষ্টায় সম্ভাব্য ঝামেলা কৌশলে এড়ানো গেছে — 'ঠাকুর এখন ঘুমোচ্ছেন'। ওড়িশার সর্বত্র তার বাবার অধস্তন কর্মচারীদের অকুণ্ঠ এবং সাগ্রহ সহযোগিতায় ভ্রমণসূচীটি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবে রূপায়িত। সবই ধরা আছে বিরামহীন ক্যামেরার শাটারে। কখনো সুকান্ত বা ইভলিনের হাতে, কখনো উৎসাহী সরকারী কর্মীদের কারো।

ইভলিনের উচ্ছ্বাস আর খুশির অন্ত নেই। যদিও অধিকাংশ জায়গায় তেলমশলার রান্না তার জিভে রোচেনি, যদিও শুধু মিনারেল ওয়াটার পান এবং সেই জলেই মুখধোয়া সত্ত্বেও পেটখারাপ, চিবুকে গালে বিজিবিজি ঘামাচির মতো র‍্যাশ, তবুও সে মোহিত। বারবার বলে

— রিয়েলি সুকান্ত কী যে ভাল লাগছে। তোমার বাবা মা সত্যি খুব নাইস। এত এলাহি বন্দোবস্ত। সো ওয়েল অর্গানাইজড। আর দেখ প্রত্যেকটি লোক কেমন ভদ্র অমায়িক বিনীত। আর আমাদের ওখানে। সব বর্বরের দল। প্রাচীন সভ্যতার ধরনই আলাদা। তোমাদের টেমপল আর্কিটেকচারের তো তুলনাই হয় না। সিমপলি মা-ভ্‌লাস।

ইভলিন যতই ভাবে ততই ইংরেজদের ওপর ক্রুদ্ধ হয় — এমন একটা দেশ যাদের, এমন মহান কীর্তি যাদের, এত চমৎকার যাদের আচার আচরণ স্বভাব শুধু কালা আদমি বলে তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। অর্থনৈতিক শোষণের সাফাই কতদূর যে যেতে পারে। মনে মনে ঠিক করে তার প্রবন্ধে ইংরেজদের পেজোমির বিরুদ্ধে একেবারে হাত খুলে লিখবে। অসুবিধা তো কিছু নেই, বিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলেছে, সব ঔপনিবেশিক শক্তির বিষদাঁত ভাঙা, বৃটিশ সিংহ নখদন্তহীন। নিজেদের দেশের লোকেরাই টিট করে দিয়েছে। ইভলিনের মতো।

অতঃপর সুকান্ত-ইভলিনের পর্যটন সূচীর অন্তিম পর্যায়—ওয়াইল্ড লাইফ দর্শন। পোষা বাঘিনী খয়েরির মৃত্যুর পর সিমলিপালের জঙ্গলে তেমন দেখার আর কিছুই নেই। বনের মধ্যে চাষআবাদ গাঁগঞ্জ, জানোয়ারের থাকার কি উপায় আছে। তাই সাধারণ ট্যুরিস্টের নাগালের বাইরে ভিতরকণিকার কুমির-প্রকল্প দেখার পরিকল্পনা। বলাবাহুল্য বিচক্ষণ পিতৃদেবেরই সব আয়োজন।

ইভলিনের সহ্যশক্তি তার উদার মননের সঙ্গে পাল্লা দেয়। দুই অপরিমেয়। গতকাল বিকেলে তারা কটক থেকে চাঁদকলি পৌঁছেছে। ইন্‌স্পেকশন বাংলোয় রাতে থাকা। সন্ধ্যের পর থেকে ইলেকট্রিক নেই। সহযাত্রী ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার দুর্গাদাস মিশ্র — যিনি তাদের যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের ট্যুর প্রোগ্রাম করেছেন — সবিনয়ে জানালেন যে এখানে এবং বেশির ভাগ ছোট শহরে দৈনিক লোডশেডিং বারো থেকে ষোল ঘন্টা। হারিকেন হ্যাজাকের আলোয় খাওয়াদাওয়া সারা হলে যে যার ঘরে শুতে চলে গেল। সব অন্ধকার, সম্বল একটি টর্চ ও

আঙুলের মত মোমবাতি। তারই সাহায্যে সুকান্ত আর ইভলিন সিংগলবেড কাম ফোমের গদি দুটো ধরাধরি করে বাংলোর সামনে বারান্দায় পাতে। সারারাত মশায় গরমে ছটফট করে ভোরের দিকে সুকান্ত ঘন্টাদুয়েক বোধহয় চোখ বুজেছে। ইভলিন সেই যে রাত দশটায় শুল, চোখ মেলল ভোর পাঁচটায়। অনিদ্রাক্লান্ত সুকান্ত আড়মোড়া ভেঙে বেড টি খেতে খেতে দেখে ইভলিন স্নান সেরে জিনসস্পোর্টস গেঞ্জি পরে একেবারে তৈরি। সুকান্ত ঠাট্টা করে,

— তোমাকে দেখে বুঝতে পারি কী করে সাদা চামড়ারা আমাদের জয় করেছিল। এই গরমে আমি নেটিভ হয়ে কাৎ আর তুমি দিব্যি ফুলের মত টাটকা। তোমরা সত্যি অপরাজেয়। ইন্‌ভিন্‌সিবল।

— সাদাকালো ব্যাপারই নয়। ওই তো পাশের ঘরে ডিএফও ভদ্রলোক দিব্যি ঘুমোলেন। দেশসুদ্ধ লোক ঘুমোল। তুমি হচ্ছ বেশি খুঁতখুতে। নিশ্চয় বাবা মা আদর দিয়ে স্পয়েল করেছেন। নাউ, গেট আপ, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

এখন দুজনে রিভার কুইন-এ নদীর দিকে মুখ করে বসে। হাওয়াটা এখনো ঠাণ্ডা, খুব আরাম। 'বস'-এর পুত্র এবং নববিবাহিত বধূকে উপযুক্ত দূরত্বে রেখে বসে আছেন ডিএফও রেঞ্জার অন্যান্য আরো তলার কর্মচারীরা। প্রয়োজনে উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। ইভলিন হঠাৎ বলে ওঠে, — লুক সুকান্ত, নদীটা কী রকম চওড়া হয়ে যাচ্ছে। ঐ দেখ সামনের দিকে তো পাড় দেখাই যাচ্ছেনা। কী বিশাল।

—হ্যাঁ মাডাম, সামনে মোহনা আসছে। ডিএফও সবিনয়ে জানান।

— রিয়েলি! হাউ ইন্ট্রেস্টিং! আমরা কি তাহলে সমুদ্রে গিয়ে পড়ব?

— না না মাডাম সমুদ্রে যাব কেন। সমুদ্র এখনো বেশ দূর। এর পর সব খাঁড়ি শুরু হবে। তার একটাতে ঢুকব।

হাতের পাঁচ আঙুলের মতো ভিন্ন ভিন্ন ধারায় জলস্রোত বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। ইভলিন টেরই পায় না কখন তার মধ্যে একটি খাঁড়ির মুখে এগিয়ে গেছে রিভার কুইন।

— মাডাম, এইটা ললিতাপট্টি। এবারে, বোট চেঞ্জ করতে হবে। ঐ যে ছোট নৌকো আছে আমাদের জন্য। ডিএফও-র কথা শেষ হতে না হতে সরু খালের মুখে দাঁড়িয়ে যায় রিভার কুইন, পাশে একটা দিশি নৌকো এসে ভিড়েছে। একটা থেকে আরেকটায় নামা। এবারে দাঁড় টেনে যাওয়া, গতিও মন্থর। ক্রমে ঘন বনের মধ্যে ঢোকে। জলের তলায় গুল্মের বন, নৌকো ঠেকে গেলে ঘন্টি বাজে, লগি ঠেলে এগুনো। ইভলিন এক মনে সব খুঁটিনাটি দেখে যায়। যন্ত্র সভ্যতার ওপর নির্ভর না করেও এরা দিব্যি সচল। জলপথে যাতায়াত নিশ্চয় খুবই প্রচলিত ছিল। মনে মনে নিবন্ধের ছকটা করে। কোথায় ঠিক এই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করবে। চেয়ে দেখে দুপারে ঘন জঙ্গল। জল থেকে প্রায় খাড়া উঠে গেছে ডাঙা। পাড়ের মাটি জলের রঙ সব গাঢ় গেরুয়া। ডাঙা ভেদ করে বেরিয়ে রয়েছে বিশাল বিশাল গাছের গোছা শিকড়। ফলে কাঁটাবনের মত দুর্ভেদ্য খালের দুপাড়।

— লুক সুকান্ত লুক। এত শিকড় সব বেড়িয়ে আছে। ডেঞ্জারাস না?

ঝড়ে বৃষ্টিতে গাছগুলো তো পড়ে যেতে পারে।

— না মাডাম মোটেই পড়বে না, ডিএফও ব্যাখ্যা জোগান, এ গাছের প্রকৃতিই ওরকম। ঐ যে শিকড়গুলো বেরিয়ে আছে ওগুলোকে বলা হয় 'দস্তসুলো'। বেংগলের সুন্দরবন পর্যন্ত চলে গেছে এই এক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য।

অ্যাডভেঞ্চারার শাসক ইংরেজও নিশ্চয় দেখে গেছে এই বন নদী মোহনা দন্তসুলো। সব উপনিবেশেই নবাগতর সর্বাগ্রে চোখে পড়ে অচেনা প্রকৃতি। তাই কি কিপলিং-এর জাংগল বুক এত সফল। ইভলিন ঠিক করে ইংরেজদের চোখে ভারতীয় প্রকৃতি রূপ নির্মাণটা একটু খতিয়ে দেখবে। নিবন্ধের বেশ খানিকটা জুড়ে থাকবে তার এ বিষয়ে অনুসন্ধান। সুকান্তকে জিজ্ঞাসা করে

— আচ্ছা এগুলো সব কি গাছ?

তার ধারণা ইণ্ডিয়ান মাত্রেই প্রকৃতির শিশু। সেহেতু যন্ত্র সভ্যতা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নেই। এদিকে সুকান্তর গাছপালা সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি সীমিত — কলা আম, কাঠাল বড় জোর সে পেয়ারা অবধি চেনে। নগরের শোভা বর্ধক কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া-র সঙ্গে তার পরিচয় আছে। সমুদ্রের ধারে ঝাউবন দেখেছে। তবে বট অশ্বত্থের তফাৎ করতে পারে না। অতএব বলে,

— ইংরেজি নাম তো সব জানি না। সব গ্রীষ্মমণ্ডলের গাছপালা আর কি। ট্রপিকাল ভেজিটেশান, পুরো সমুদ্রকুল ধরে ধরে চলে গেছে বাংলাদেশ পর্যন্ত।

— ভাগ্যিস এসেছিলাম। নর্থ আমেরিকায় কোথায় পেতাম এসব। ।

মনে মনে ভাবে ক'জন প্রবন্ধকারের এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়।

অদূরে একটু ঢালু হয়ে আসা পাড়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে পায়ে চলা পথ। ডাঙায় উঠে বনের মধ্যে চলে গেছে।

— স্যার এবার নামতে হবে। জংমাল এসে গেল। মাডামের একটু অসুবিধা হবে। ঘাটটাই তো নেই, তারওপর খুব কাদা।

ডিএফও অত্যন্ত কুণ্ঠিত যেন তাঁরই গাফিলতির ফলে মাডামের অসুবিধা।

— না, না মিঃ মিশ্র! কিচ্ছু অসুবিধা হবে না, ডোণ্ট ওয়ারি ফর মি, প্লিজ। সোৎসাহে ইভলিন জিন্‌সের পা গোটাতে সুরু করে।

— জুতোটা খুলে নিলে ভাল, কাদায় নইলে নষ্ট হয়ে যাবে, সুকান্ত নিজে জুতো খুলতে খুলতে উপদেশ দেয়। ইভলিন জুতো খোলা মাত্র পেছন থেকে একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল, মাডামের জুতো জোড়া সে বয়ে নিয়ে যাবে। ইভলিন অপ্রস্তুত,

— না, না কোনো দরকার নেই, আমিই ম্যানেজ করতে পারব।

নৌকো ডাঙায় ভেড়ে। জল আর মাটির সামান্য ব্যবধানের ওপর একটা কাঠের পাটা ফেলে দেওয়া হল। তাতে পা দিয়ে নামে ডিএফও এবং সুকান্ত। তাদের বাড়ানো হাতকে অগ্রাহ্য করে ইভলিন জুতো ও স্লিংব্যাগ সামলে এক লাফে নেমে পড়ে এবং সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাদার মধ্যে থপাস থপাস করে চলতে থাকে। পিছল মাটিতে সাবধানে পা

ফেলার বারংবার উপদেশ তার কোনো কাজে লাগে না। বরং মোটা সোটা মিঃ মিশ্র — যিনি সমানে সাবধান করে আসছিলেন — তিনি নিজে দুবার প্রায় আছাড় খাচ্ছিলেন, দুপাশে লোক ধরে ফেলায় পড়েননি। বনের মধ্যে মাটি এবারে শুকনো। দূরে খানিকটা খোলা জায়গা, ইতস্তত ছোটো ছোটো একতলা ঘরবাড়ি, নির্মাণের একঘেয়ে কুশ্রীতায় সরকারি ছাপ সুস্পষ্ট।

— ঐ খানে আমাদের কুমীর প্রকল্প। মিঃ মিশ্র খবর দেন।

— এতসব বাড়ি কেন? ইভলিনের প্রশ্ন।

— বাড়ি মানে একটা রেস্ট সেড, বাইরে থেকে কেউ এলে একটা রাত যাতে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা। বাকি ষ্টাফেদের কোয়ার্টার, একটা বাড়িতে কুমির সম্বন্ধে তথ্যাদি রাখা, আরেকটিতে কুমিরের ডিম।

— কুমিরের ডিম! হাউ ইন্ট্রেস্টিং। চলুন চলুন দেখা যাক।

— দেখবেন বৈকি, এতটা পথ এলেন একটু বিশ্রাম দরকার।

সূর্যমাথার ওপরে। চারিদিকে ঘন বলেই বোধহয় এই দুপুরবেলাও কাল রাতের চাঁদবালির মতো গরম নয়। রেস্ট সেডে বালতিতে রাখা জলে দুজনে পায়ের কাদা ধোয়, হাতমুখে ছিটে দেয়। এবারে খাওয়া। স্বাস্থ্যবিধির নবতম পশ্চিমি খেয়াল অনুসারে ইভলিন নিরামিষাশী, অবশ্য মাছটা তার চলে — মাছ তো সমুদ্রের সব্জি — কিন্তু কাঁটাওয়ালা ছোট মাঝারি সাইজের পোনা যেটা ওড়িশায় সর্বত্র পরিবেশিত , সেটি তার বেছে খাওয়া সম্ভব নয়। অতএব প্রতিটি আহারে মুরগি বা খাসির মাংস এবং পোনার কালিয়া তার অস্পৃশ্য রয়ে যায় এবং প্রত্যেক জায়গায় তাদের সেবায় নিয়োজিত কর্মীরা অপ্রতিভ, 'ম্যাডাম কিছুই খেলেন না।' সুকান্ত এক আধ বার ইভলিনের জন্য নিরামিষের বন্দোবস্ত করতে বলে তাকে আরো বিপদে ফেলেছে কারণ নিরামিষ মানে প্রচুর তেলমশলা ঝাল দেওয়া উত্তর ভারতীয় পদের অক্ষম অনুকরণ। ইভলিনের সঙ্গে শাণ্ডড়ি প্রদত্ত মর্তমান কলা আর গলাকাটা দাম অসময়ের আপেল। ফলসহ ভাত ডাল টকদই। ব্যস ইভলিনের মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ। চেয়ে চেয়ে দেখে সুকান্তর সাইড প্লেটে রুইয়ের মুড়ো মুরগির ঠ্যাং ইত্যাদির স্তূপীকৃত হাড়কাঁটা ছিবড়ে।

— বড্ড বেশি খাচ্ছ । এ ক'সপ্তাহে ক'কেজি ওয়েট গেইন করেছ বল তো?

— আরে ভেব না। দেশে তো আর এমন খাওয়া জুটবে না। আবার ক'সপ্তাহে ঝরে যাব।

ভরপেট খেয়ে সুকান্তর ইচ্ছে একটু গড়িয়ে নেয়। সে জানে সহযাত্রীরা সকলেই তাই চায়। এদিকে ইভলিন বেরুবার জন্যে তৈরি। অতএব সুকান্ত গম্ভীর মুখে বলে,

— একটু পা মেলে দিয়ে বিশ্রাম কর। তুমি তো ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটে অভ্যস্ত নও। এখানে গরমের দিনে দুপুরে কেউ বেরোয় না, সবাই ঘুমিয়ে নেয়।

যুক্তিটা ইভলিনকে মানতেই হয়। সুতরাং সাড়ে তিনটে নাগাদ যাত্রা। তাদের জলেস্থলে দীর্ঘ অভিযানের লক্ষ্যে কুমির প্রকল্প। এবারে সাথী প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ মহাপাত্র। প্রথমেই কুমিরের ডিম সংরক্ষণ ঘরটি দেখায়। ইভলিনের কুমিরের ডিম সংক্রান্ত সব কৌতূহলের নিরসন মিঃ মহাপাত্রের সাহায্যে। এর পরে একটি ছোটো জলাশয়, সেখানে সদ্য ডিম ফোটা কুমিরের বাচ্চা। অসংখ্য টিকটিকির মতো কিলবিল করছে।

— আঁতুড়পুকুর নাকি? চেষ্টাকৃত পরিহাস সুকান্তের। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী সে সহ্য করতে পারে না।

— হ্যাঁ সার। হ্যাচিং থেকে ম্যাচিওরিটি, ডিম ফুটে বেরুনো থেকে পূর্ণ আকৃতি পাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেজের কুমির এখানে। আলাদা আলাদা পুকুরে। মহাপাত্র জানান। এবারে দেখা হল কয়েকটি জলাশয়ে বিভক্ত কুমিরের দল। একটু বড়, কুমির বলে চেনা যায়।

— এগুলো কি পাঠশালা পকুর? সুকান্ত প্রশ্ন করে।

— প্রায় তাই সার। ডিএফও মিশ্র হেসে জবাব দেন। আমরা প্রায় শান্তমতে চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

— তাহলে গার্হস্থ্যও আছে নিশ্চয়, নইলে এত ডিম পাচ্ছেন কোথা থেকে? কথা বলতে বলতে তারা বনের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত বড় পুকুরের সামনে গিয়ে পড়ে।

— এটা তো সবচেয়ে বড় পন্ড্ মনে হচ্ছে। ইভলিনের কাছে আকার ওজন সব পরিষ্কার।

— হাঁ মাডাম। এখানে আমাদের প্রজেক্টের স্টার অ্যাট্রাকশন, সাদা কুমির শঙ্খুয়া, মহাপাত্র খবর দিলেন।

— হোয়াইট ক্রোকডাইল! হয় নাকি? আমার তো ধারণা ছিল ক্রোকডাইল সব একই রঙের কালচে মতো। এত ক্রোকডাইল লেদারের ব্যাগট্যাগ দেখি, সাদা তো কই কখনো নয়।

— ওগুলো বোধহয় রংটং করা। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন কুমির বেশিরভাগই কালো মতো। সাদা কুমির হয়তো অ্যালবিনো, পিগমেন্ট ডিজঅর্ডার। প্রকৃতির খামখেয়ালে উৎপত্তি।

— সাদাটে রঙ ছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে? মানে স্বাভাবিক কালো কুমিরের থেকে তাকে ভিন্ন করা যায় কি?

— হাঁ মাডাম। সাদা কুমির আকারে কালোর চেয়ে অনেক বড়, স্বভাবে অনেক বেশি হিংস্র আর আগ্রাসী। অনেক চেষ্টা করেও আমরা একটা প্রমাণ সাইজের সাদা পুরুষ কুমির পাইনি। এটা মাদি, তাও বাচ্চা অবস্থায় বাইচান্স ধরা পড়েছিল, আমরা যত্ন করে পালন পোষণ করছি। আরে এই মক্রা দেখ না শঙ্খুয়াকে যদি বের করতে পারিস। মাডাম দেখবেন। অধীনস্থ কর্মচারীর প্রতি নির্দেশ।

— শঙ্খুয়া -য়া- য়া -য়া। দুহাতে মুখে চোঙা করে ডাক ছাড়ে মক্রা।

— কুমির ডাক শুনতে পায় নাকি? অবাক ইভলিন।

— মক্রা তো খাবার টাবার দেয়। জীব মাত্রই যে খাদ্য জোগায় তার উপস্থিতি টের পেতে শেখে।

অন্যান্য জলাশয়ের তুলনায় এই পুকুরটা বনের ধারে। ঝোপঝাড়ে ঢাকা পাড়ের অধিকাংশ। জলজ গুল্ম লম্বা লম্বা ঘাসে সীমানা অস্পষ্ট। সাবধানে এগোয় মক্রা।

— শঙ্খুয়া - য়া য়া-য়া, শঙ্খুয়া -য়া -য়া রে -এ -এ -এ।

হাতের লাঠিটা দিয়ে জলে খোঁচা মারে। একটু যেন বুদবুদ উঠল। সবাই টানটান, দৃষ্টি জলের দিকে। না, কিছুই না। আবার নিস্তরঙ্গ। মহাপাত্র একটু বিরক্ত।

— ভাল করে চেষ্টা কর। মাডাম এত দূর থেকে এসেছেন আর শঙ্খুয়াকেই না দেখে চলে

যাবেন।

অতএব মক্রা জলাশয়ের পাড়ঘেঁসা বনের দিকে এগোয়। নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঝোপঝাড়ে লাঠি মেরে আওয়াজ করে। হাঁক মারে ক'বার। কয়েক মিনিট সকলের অধীর প্রতিক্ষা কিন্তু জলে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই, তেমনি নিথর মসৃণ। শেষে মহাপাত্র বলে,

—না মাডাম আজ আর শঙ্খুয়া দেখা দেবে না।

— আমাদের ব্যাড লাক। আপনার লোকটি খুব সিন্সিয়ারলি চেষ্টা করছিল। ইভলিনের ভদ্রতার ত্রুটি নেই।

— চলুন, বাকিগুলো দেখা যাক। কুমিরের অভাব কি। অগুনতি কুমির এখানে। ডিএফও মিশ্র অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। সকলে আবার বিভিন্ন জলাশয় পরিদর্শন শুরু করে।

নানা বয়সের ছোটোবড় মাঝারি কুমিরের গুণাগুণ খাদ্যাভ্যাস জীবনচর্যা শুনতে শুনতে সুকান্তর কান ঝালাপালা। সত্যি কথা বলতে কি কুমির সম্বন্ধে তার লেশমাত্র কৌতূহল নেই। একটা কুৎসিত প্রাণী। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো অচেনা ভয়ঙ্কর জীবঅধ্যুষিত সময়ের ঝড়তিপড়তি অবশিষ্ট। তার মতে বর্তমান যুগে কুমিরের একমাত্র উপযোগিতা ধনী স্ত্রীপুরুষের হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ব্রিফকেস হয়ে শোভা পাওয়া। ব্যবসার খাতিরে ক্রোকডাইল ফার্মে কুমির পালন ঠিক আছে। বলাবাহুল্য তার মনের কথা মনেই থাকে। প্রকাশ করে না। ইভলিনের কাছে কুমিরের মূল্য কুমির হিসাবে। সে ডিসকভারি চ্যানেলের একাগ্র দর্শক। আজকে আশ মিটিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে ভাবে ইন্ডিয়ার বিচিত্র প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে একটা বড় অনুচ্ছেদ লিখবে তার নিবন্ধে। ইংরেজরা কত জীবজন্তু সখে এবং লোভে নিধন করেছিল তারও সংখ্যাতত্ত্ব লাগবে। সব জলাশয় সেরে ফেরবার মুখে ইভলিন দেখে দূরে একটা রেলিংঘেরা ছোট জায়গা অদেখা রয়ে গেল।

— ওটা কী?

— ওখানে মাডাম ডিসপেনসারি। অসুস্থ কুমিরের চিকিৎসা করা হয়। সুস্থ কুমিরের থেকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা।

— হাসপাতাল পুকুর, সুকান্তর মন্তব্য।

— চলুন না দেখি। ওটাই বা বাদ যাবে কেন। গবেষণাকারীর সদা জাগ্রত জ্ঞান পিপাসু কৌতূহল।

সবাই মিলে রেলিংঘেরা চতুষ্কোণ সুরক্ষিত স্থানে আসে। ভেতরে একটি ছোট জলাশয়। মানুষ যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে। একটি মাত্র রোগী হাসপাতালে, বড় সাইজের কুমির। ডাঙার কাছে পড়ে আছে, এত ম্রিয়মান এত স্থানু যে জীবিত কি মৃত বোঝা দায়।

— বেচারা। ওর অসুখটা কী? ইভলিনের সমবেদনা।

— অসুখ নয় মাডাম জখম। ওটার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, মহাপাত্র জানান।

— আহা! কি করে এমন হ'ল? আপনাদের প্রজেক্ট তো প্রোটেক্টেড এরিয়া। অন্যান্য হিংস্র জানোয়ার এসে এভাবে জখম করে দিতে পারে?

— না, না মাডাম বনের অন্য জন্তু করে নি। ঐ যে শঙ্খুয়া, সাদা কুমির, তারই কীর্তি।

— সে কি! কেন? নিজের প্রজাতিকে কেউ এমন সাংঘাতিক মার মারে নাকি? ওরকম স্বভাব তো শুধু মানুষের।

— আসলে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। শঙ্খুয়ার খুব দোষ নেই।

ওর এখন বিয়ের ফুল ফুটেছে, বর দরকার। ভারী আনচান করছে। তাই আমরা বেশ বড় সড় স্বাস্থ্যবান এই পাত্রকে শঙ্খুয়ার পুকুরে ছেড়েছিলাম। দুজনে জোড় বাঁধবে। কিন্তু শঙ্খুয়ার পছন্দ হল না।

— কুমিরের আবার পছন্দ অপছন্দ আছে নাকি? সুকান্ত প্রশ্ন করে।

— বংশ রক্ষা প্রকৃতির তাগিদ। প্রজাতির বৃদ্ধি চাই। ইভলিন যোগ দেয়।

— সবই ঠিক কথা। মুশকিল হল রঙে — পাত্রী সাদা,পাত্র কালো। ওখানেই প্রকৃতির পরাজয়। মহাপাত্র ব্যাখ্যা করেন।

— রঙে তো কিছু আসে যায় না। ওরা তো এক প্রজাতি অর্থাৎ ওদের মধ্যে যে কোনো স্ত্রী পুরুষের মিলনে সন্তান জন্মাবে এবং সে সন্তানও বন্ধ্যা হবে না। প্রকৃতির তাই নিয়ম। সব কুমির এক, ছোটো বড় সাদা কালো কোনো কিছু ম্যাটার করে না। ইভলিন গম্ভীর ভাবে বলে।

— সে তো একশ বার মাডাম। তবে কি না এক প্রজাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শাখা হয়। কখনো কখনো শাখাগুলোর এমন নিজস্বতা গড়ে ওঠে যে প্রকৃতিও তা বিসর্জন দিতে চায় না। বরং ধরে রাখতে চায়। নইলে দেখুন না এই একটা প্রাণী, যার মগজ মোটেই উন্নত নয়, অর্থাৎ মোটামুটি আদিম স্তরের জীব। এ সময়টা তার প্রজননের জন্য প্রকৃত নির্দিষ্ট, ভয়ংকর তার তাগিদ। কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সাদা রংটি ছাড়তে রাজী নয়, সে চায় তার সন্তানও সাদা হোক। রাগে হতাশায় ক্ষিপ্ত হয়ে কালো অযোগ্য পুরুষকে আক্রমণ। একেবারে প্রচন্ড জখম করে দিয়েছে। বেচারা বাঁচবে কি না সন্দেহ।

— রাগটা যে পাত্রের কালো রঙের জন্যই সেটা কি করে নিশ্চিত জানলেন?

হয়ত শঙ্খুয়ার স্বভাবই বেয়াড়া, সাদা হলেও এমনি করত। চাপা উত্তেজনা ইভলিনের।

— দেখুন বিজ্ঞানী হিসেবে তো নিশ্চিত নই। তবে কালো কুমিরদের মধ্যে একটিও এরকম হিংস্র প্রত্যাখ্যান দেখি না। আর সাদারাও তো বুনো অবস্থায় দিব্যি বংশ বৃদ্ধি করে চলেছে।

— সাদা কালো ভেদ তো সর্বত্র মাডাম। রেঞ্জার পানিগ্রাহী হঠাৎ মুখ খোলে, এই আমাদের হিন্দু সমাজই দেখুন না। এত দিনের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে বর্ণভেদের ওপরে। বর্ণ কথাটির আদি অর্থ রঙ, কালার। আপনি নিশ্চয় জানেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন আর্য, আরিয়ান? ইভলিনের সচকিত পাংশু মুখ অগ্রাহ্য করে পাণিগ্রাহী বলে চলে,

— আমরা উচ্চ বর্ণের লোকেরা তাঁদেরই বংশধর। অনার্য মানে নন্‌আরিয়ান। এদেশের ওরিজিনাল বাসিন্দা। তারা সব অন্ত্যজ। নীচ জাত, আদিবাসী। সব কালো, বর্বর। তাদের সঙ্গে উচ্চ বর্ণের মানে আমাদের সামাজিক আদান প্রদান মেলামেশা নেই, বিয়ে তো কল্পনাতীত। হাজার হাজার বছর ধরে এই বর্ণভেদ চলে আসছে।

সুকান্ত বড় অস্বস্তি বোধ করে, কোথাথেকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ মার্কা বামুন এসে জুটেছে। আর্য বর্ণভেদ এসব কথা কি বাইরে বলে নাকি। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে ইভলিনের মুখের

আলো নিভে গেছে। দুই ভুরুর মাঝে উচিয়ে থাকা কাঁটার মতো রেখাটা আরো স্পষ্ট, ঠোঁট দুটো চাপা।

— আরে রাখুন আপনার বর্ণভেদ। আজকের ইন্ডিয়ায় আমরা সবাই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কি বামুন কি আদিবাসী।

— কী যে বলেন সার। পানিগ্রাহীর ঘোর আপত্তি, মিশ্ররও সায়। উচ্চ বর্ণ এখনো উচ্চ বর্ণ। আপনার গায়ের রঙ দেখুন আর একটা গুঁড়ি কি মুণ্ডা বা কোল-এর রঙ দেখুন।

— শুধু তো রঙ নয়, তার সঙ্গে আছে মগজের তফাৎ। মিশ্র যোগ করে। এই যে পঞ্চাশ বছর ধরে সরকার এদের এত মাথায় করছে, পড়াশুনা শেখাবার কত চেষ্টা করছে, পারছে কই? অত সোজা নয় সার। আমাদের মুনি ঋষিরা রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখার বিধান কি এমনি এমনি দিয়ে গিয়েছিলেন—

সুকান্ত এবারে বাধা দেয়, ইভলিনের মুখ দেখে মনে হচ্ছে এবারে বোধহয় কেঁদেই ফেলবে?

— বেলা তো পড়ে এল। আর দেখার কি কিছু আছে।? চলুন মি: মিশ্র এবার ফেরা যাক।

সারাটা পথ ইভলিন একেবারে চুপ। মিশ্র মহাপাত্র পানিগ্রাহী সুকান্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলেন — জঙ্গল সংরক্ষণের সমস্যা, আদিবাসীদের গাছকাটার, জ্বালাবার প্রবণতা শিকারের অভ্যাস, মূর্খামি, পড়াশুনা করবার অক্ষমতা, আলস্য, কুমির প্রকল্পের খরচ, বিদেশী সংস্থার ওপর নির্ভরতা। রেষ্ট শেডে পৌঁছে ডিএফও আলোচনার ইতি টানলেন শেষ কথাটি বলে,

— বুঝলেন সার, যখন একটা গাছ কাটলে একটা বণ্যপ্রাণী অকারণে মারলে ক্লিন্টন ঠেঙা নিয়ে তাড়া করবে তখন আমাদের দেশের মানুষ বনজঙ্গল জীবজন্তুর মূল্য বুঝবে। সাহেবের হাতে পিটুনি না খেলে এ জাতের উন্নতি নেই।

আজকের রাত এখানে কাটানোর কথা। রেস্ট শেডের সামনে খোলা জায়গায় তাদের দুজনের জন্য বেতের চেয়ার পাতা। বিচক্ষণ সরকারি কর্মচারীরা এখন দৃষ্টির আড়ালে। স্নান টান সেরে সুকান্ত আরাম করে বসে গা এলিয়ে দেয়। ইভলিনকে ডাকে,— ইভ, দেখবে এস। হাউ বিউটিফুল। নাইট ইন আ ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। তোমার স্নান হয়ে গেছে তো?

ইভলিন নি:শব্দে এসে বসে। সেই হাসপাতাল পুকুর দেখার পর থেকেই সে নীরব। তাদের আলাপ আলোচনার শ্রোতামাত্র। এখনো চুপ। সুকান্ত বলে,

— জাস্ট ওয়েট। ধীরে ধীরে জঙ্গল সজীব হয়ে উঠবে। ওপরে আকাশটা দেখ।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। নীলাভ কালো শূন্যে ঝিকমিক করছে অজস্র গ্রহ তারা নক্ষত্র।

— তোমাকে মা যে নীলাম্বরি ঢাকাই মসলিনটা দিলেন সোনালি রং, বুটি দেওয়া, ঠিক সে রকম লাগছে আকাশটা, তাই না?

এবারে ইভলিন আস্তে আস্তে মুখ খোলে।

— বিকেলের ঘটনাটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমার সব বিশ্বাসই তো এখানে হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে।

— ডোন্ট রিয়েলি বি সিলি, ইভ। কোন্ বনের জন্তু কী করল, বেড়াতে এসে এ দেশ

সম্বন্ধে কী শুনলাম, তার সঙ্গে আমাদের দুজনের জীবনের কী সম্পর্ক? আমাদের জগৎ তো অন্য।

চারিদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে হাতটা ঘুরিয়ে এনে বলে,

— লেট্‌স এনজয় অল দিস। ইভলিনের হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয়। দুজনে চুপচাপ বসে। কোথায় একটা রাতের পাখি ডেকে ওঠে। নানারকম অস্ফুট শব্দ এখানে ওখানে। ঝোপেঝাড়ে, ঘাসে, গাছে। রাতের জঙ্গল। দূরে অন্ধকারে মিটমিট করবে লাল সবুজ সব আলোর বিন্দু। দেখতে দেখতে এক সময় ইভলিনের যেন কৌতূহল ফিরে আসে।

— ওগুলো কী?

— বুনো জন্তু, অন্ধকারে চোখগুলো জ্বলছে।

— দূরকম রঙ কেন?

— জানোয়ার যে দু রকম, তৃণভোজী মাংসভোজী। তাই দু রঙের চোখের আলো।

— স্ট্রেঞ্জ! এই অন্ধকারেও ভিন্নতা বজায় থাকে সকলের। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় আমরা সবাই শুধু বায়োলজি, শরীরতত্ত্ব দ্বারাই চালিত? প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্যই আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য যার থেকে কোনো নিস্তার নেই?

— বেচারি শঙ্খুয়া যদি জানত তার বর পছন্দ না হওয়ার কত সুদূর প্রসারী ফলাফল!

— আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না।

— এখন এসব তত্ত্ব কথা থাক না। কী সুন্দর এই রাত। এমন খোলা আকাশের তলায় আমরা তো বড় একটা বসতেই পাই না। মাঝে মাঝে ইণ্ডিয়ায় এলে হয়, কী বল? তবে কটকের বাড়ি তো আর চিরকাল থাকবে না। বাবা মা যতদিন আছেন ততদিন। জানো অনাবাসীদের জন্য অনেক হাউসিং প্রজেক্ট হচ্ছে। ভবিষ্যতে কটকের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে দিল্লি বা ব্যাঙ্গালোরে একটা ফ্ল্যাট নিলে হয়। কী বল? বুড়ো বয়সে এদেশে থাকা সুবিধে, লোকজন পাওয়া যায়, তাছাড়া আমরা মার্কিন মাপে পেনশান পাব...সুকান্ত বলে চলে।

শুনতে শুনতে একসময় অন্যমনস্ক ইভলিন মন্তব্য করে,

— তোমাদের খুব বিষয়বুদ্ধি, পা সর্বদা মাটিতে। এখন থেকে বুড়ো বয়সের সংস্থানের কথা ভাবছ।

সে ভাবছে না। অতদিন তার এ বিয়ে টিকবে কিনা তাই তার অজানা। তবে পরিকল্পিত নিবন্ধটি যে লিখবে না সেটা ঠিক করে ফেলেছে।

মৃত্যু-বাক্স

বিজনকুমার ঘোষ

রবিবার। দুপুরে খাওয়ার পাট চুকতে বেশ দেরি হয়ে যায়। দিনে ঘুম আসে না আমার। খবরের কাগজ পড়ি। খবরের কাগজ শেষ হয়ে গেলে আছে সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পত্রিকা। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ চা আসে এক তলা থেকে। দুপুরে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টির পরেই আকাশের নীল বেরিয়ে পড়ল। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পথঘাট সুনসান। রবিবারের বিকেলে লোকজনের চলাচল দ্বিগুণ। আমি চায়ের জন্য অপেক্ষা করি।

স্ত্রী চা করে কাজের মেয়েকে দিয়ে পাঠিয়ে দেন। ঘড়িতে তখন চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ। এখনও কেন রেখা আসছে না, আমি ঘনঘন দরজার দিকে তাকাই। দরজায় রেখার বদলে সুখেনদা। আমার বড় ভায়রা। হাতে একটা বাজারের থলে। থলেতে ভারী কিছু মনে হল। চেখে মুখে উদ্বেগ। এসেই সুখেনদা বললেন, যাক, বাড়িতে আছো। তোমাকে না পেলে খুব মুশকিলে পড়তাম।

আমি কিছু না বলে চোখের দিকে তাকাই। সুখেনদা ইশারায় জল খেতে চান। রেখা দু কাপ চা নিয়ে এল। জল আনতে বলে আমি জিজ্ঞাসা করি, কী ব্যাপার?

— বলছি। বলতেই তো এসেছি।

সুখেনদা পুরো গেলাসটা শেষ করলেন। চায়ের কাপও শেষ করে রেখার হাতে দিলেন। কিন্তু কিছুই বলছেন না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। আমি উশখুশ করি।

— তুমি কুমুদবাবুকে চিনতে?

— আপনাদের, কুমুদদা? নিশ্চয়ই। এই তো পরশু দিনই রাস্তার কলে চান করতে দেখেছি।

— আর দেখবে না। কাল বিকেলে মারা গেলেন।

কেউ মারা গেছে শুনলে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকাই রেওয়াজ। যেন আমিও শোকগ্রস্ত। একটু পরেই নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি ওই লোকটার জন্য সত্যিই দুঃখিত? পৃথিবীতে মরার জন্যই তো সবাই জন্মায়। দূরে দেখা যায় রিকশয় চড়ে যাচ্ছে নতুন বর ও বৌ। বাস স্টপ থেকে মিনি ধরে ভবানীপুরে কোনও হলের সামনে নামবে। রবিবার উপভোগ করবে সিনেমা দেখে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, ওরা দুজনেই একদিন মরবে। একটি দামাল শিশু পেরাম্বুলেটারে চলেছে পার্কের দিকে। মরবে সেও। সুতরাং কুমুদদার মৃত্যুতে আমি সুখি কিনা এই প্রশ্ন অবান্তর। আবার কারও মৃত্যুর সংবাদে হি-হি করে হাসাটাও অবান্তর। চেপে রাখতে হয়। যেমন এই মুহূর্তে আমার একটু হাসার ইচ্ছে হল। ইচ্ছেটা চেপে রেখে প্রশ্ন করি, বয়েস হয়েছিল কত?

— ছিয়াত্তর। আমার দাদা বেঁচে থাকলে ওই বয়সই হত। দাদার বন্ধু। সেই হিসেবে আমারও দাদা।

— ভাবা যায় না, পরশু দিনও বেলা বারোটায় মগে করে গায়ে জল ঢালতে দেখেছি। ফর্সা রং। রোদের মধ্যে শরীরটা ঝিকমিক করছিল।

— লোকটা খুবই দুঃখ কষ্ট পেয়েছে।

আবার হাসি পেল। দুঃখ কে না পায়? পৃথিবীটা কি খুব আরামের জায়গা?

— তোমাকে একটা অনুরোধ করব। আশা করি রাখবে। বড় বিপদে পড়েছি।

আমি মুখের দিকে তাকাই। সুখেনদা শুরু করেন, লোকটা কিন্তু খারাপ নয়। দোষে গুণেই তো মানুষ!

— কিছু কিছু ব্যাপারে মুদ্রাদোষ ছিল।

— তুমি যখন ওই বয়সে পৌঁছুবে তখন তোমারও অনেক মুদ্রাদোষই দেখা যাবে।

কুমুদদাকে আমি ভাল মতোনই চিনি। সুখেনদার বাড়িতেই আলাপ। অত্যন্ত ভোজন রসিক। এটা অবশ্য মুদ্রাদোষের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু যে ভাবে পরের ঘাড় ভেঙে খাওয়া আদায় করতেন সেটাই কুরুচিকর।

আমি কয়েকটি ঘটনা জানি।

বাড়ির কাছেই এক রুমের একটি ফ্ল্যাট সুখেনদার ভাড়া নেওয়া আছে। মাঝে মাঝে আমরা সেখানে মিলিত হই। চাঁদা তুলে খাওয়া দাওয়া চলে। সুখেনদা ভাল রাঁধতে পারেন। খেয়ে দেয়ে সারা দুপুর আমাদের গল্পগুজব হয়। যাকে বলে প্রাইভেট কথা। বরাবর দেখেছি, কুমুদদা কী করে যেন টের পেয়ে যান। দিব্যি চানটান করে এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করেন, কী আইটেম হচ্ছে? ওঃ, তোফা জমবে। আমি বামুন মানুষ, চেয়ে চিন্তে খেতে একটুও লজ্জা নেই — হেঁ - হেঁ - হেঁ —

পরে আমরা সুখেনদাকে চেপে ধরি, আপনার দেশের লোক, আপনিই খবরটা দিয়েছেন।

সুখেনদা বিব্রত হতেন। পরে আমরা টের পেয়েছি এদিকেই কোথাও ছাত্র পড়াতে যান কুমুদদা। তাঁর আছে ডায়বিটিশ। পেচ্ছাব পেলেই সুখেনদার ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েন। এভাবেই জেনে যান ফিস্টের কথা।

এক প্রাইভেট ফার্মে কেরানি ছিলেন কুমুদবাবু। পেনশন নেই। রিটায়ার করে যা কিছু পেয়েছিলেন, বেশি সুদের লোভে এক চারশো বিশ কোম্পানিতে রেখে এক গাল মাছি। শুনেছি, এর জন্য কারও কাছেই বিলাপ করেননি। নিজের ভিতরেই সহ্য করেছেন। সংসার চলত টিউশনির টাকায়। সুখেনদাও অনেক ছাত্র জোগাড় করে দিয়েছেন। সব নিচু ক্লাসের। উনি অঙ্ক ভাল পারতেন না, এমনও দেখেছি, সুখেনদা খেতে বসেছেন, চেয়ারটা টেনে নিয়ে পাশে বসে কুমুদদা অঙ্ক বুঝে নিচ্ছেন। পর দিন ছাত্রকে বোঝাবেন। সুখেনদার মুখে বিরক্তির চিহ্ন নেই। দাদার বন্ধু। বর্ধমানের রায়নায় পাশাপাশি বাড়ি। একেই বলে দেশের টান।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল সুখেনদা চুপচাপ বসে আছেন। আমি গলা খাঁকারি করে দিই।

— শোন, তোমাকে একটা দায়িত্ব দেব। তুমিই পারবে।

— ব্যাপারটা কী বলবেন তো।

সুখেনদা থলে থেকে একটা কাঠের বাক্স বার করলেন। অনেকটা বাচ্চাদের স্কুল বক্সের সাইজ। একটি ছোট্ট টিপতালা।

— জিনিসটা তোমার বাড়িতে রেখে দিতে চাই।

আমি জিজ্ঞাসা করি, কী আছে ওতে, জিনিসটা কার, রাখতেই বা যাব কেন?

— জিনিসটা কুমুদদার, কী আছে আমিও জানি না। তোমার সামনেই খুলব।

কমজোরি টিপতালাটা এক টান দিতেই খুলে গেল। সুখেনদা মেঝেতে বাক্সটা উবুড় করলেন। অনেক কাগজপত্র। কাঁচা টাকা। মরচে পড়া চাবি। খামের মধ্যে একশো টাকার নোট। সুখেনদা গুনতে বসলেন। নোটের সংখ্যা এগারো। কাঁচা টাকা তিরিশটা। পাঁচ হাজার টাকার দুটো ইন্দিরা বিকাশ পত্র। ম্যাচিওর হতে এখনও তিন বছর বাকি। দশ হাজার টাকার

ইউনিট ট্রাস্ট। দেশে দু বিঘে জমি আছে। তার দাগ নম্বর, পরচা, খতিয়ান ইত্যাদি। কয়েকটি পুরনো চিঠিপত্র। তারিখ মিলিয়ে দেখা গেল বিয়ের পরই বৌদি লিখেছেন, প্রাণাধিকেষু—। পড়তে গিয়েও সুখেনদা রেখে দিলেন। যেন নিজের বৌদি। খাপের মধ্যে ভাঙা চশমা। কাঁচের পেপার ওয়েট। সুতো পরানো একটা সুচ। ছোট্ট খামের মধ্যে একজোড়া রূপোর দুল। সুখেনদা অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, সোনা কী করে থাকবে? সব শেষ। তা এই হল সম্পত্তি।

আমি এবার অন্য রকম গন্ধ পেয়ে গেছি। বেশ কর্কশ স্বরেই বললাম, এই সম্পত্তি আমি রাখতে যাব কেন? আমার কি দায়?

— সে কথাই তোমাকে বলছি — সুখেনদা ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসেন : আমিও রাখতে পারতাম, কিন্তু তাতে বিপদ আছে।

— বিপদটা আমার ঘরে চালান করে দিলেন।

— তোমার কোনও বিপদ নেই। কুমুদদার তিন ছেলে এক মেয়ে। বৌদি আছেন। এক পাড়ায় বাড়ি হলেও তারা কেউই তোমাকে চেনে না। কী কৌশলে বাক্সটা বাড়ির বাইরে বার করতে পেরেছি তা আমিই জানি!

আমি নরম গলায় বলি, সুখেনদা, এটুকু শুনেই আমার মনে ভয় ঢুকেছে। কী দরকার, যাদের জিনিস তাদেরই দিয়ে দিন—

— তা পারি না।

—কেন পারেন না? আপনি কি ওদের স্বঘোষিত গার্জেন?

— তা-তা- এক একম বলতে পারো-ও —সুখেনদা তোতলাতে থাকেন : আমার বাড়িতে থাকলে এরা টের পাবেই। তিন ভাই এসে হামলা করবে। বোনও এসে যেতে পারে। আর বাক্স দখল হলেই মাকে রাস্তায় বের করে দেবে।

— এ রকম ছেলে মেয়ের জন্ম দিলেন কেন?

— সেটাই তো প্রশ্ন। হেসো না ব্রাদার, আমাদের অবস্থাও এরকম হতে পারে!

— সবে কুমুদদা মারা গেলেন, এর মধ্যেই খেয়োখেয়ি?

— পুরো হয়নি। সবে শুরু।

আমার কৌতূহল হয়, কী ভাবে এতগুলি নজর এড়িয়ে বাক্সটা নিয়ে এলেন, ম্যাজিক জানেন নাকি?

— সে এক দিগদারি — সুখেনদা বলতে থাকেন, পরশু বিকেল তিনটে নাগাদ ফোন পেলাম। এসে দেখি সব শেষ। বৌদি কাঁদছেন। দুই ছেলে বসে আছে। বড় ছেলের রায়নায় কাপড়ের দোকান। সে আসেনি। এক ছেলে তো এখানেই, বাপের অফিসে। আর এক ছেলে রেলে, কাঁচড়াপাড়ায়। দেখি দুই ছেলেই চুপচাপ। কোনও হেলদোল নেই। ধমক দি, কিরে বসে থাকলেই চলবে? একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। দুজনেই আড়মোড়া ভাঙে। কিন্তু খরচের ভয়ে কেউ ওঠে না। কুমুদদাই একদিন বলেছিলেন, ভায়া, আমার মতো সন্তান ভাগ্য যেন শত্রুরও না হয়। মেজ ছেলের সঙ্গে রিকশায় উঠেছি, ভাড়া পাঁচ টাকা, নেমে বলে কিনা আমি আড়াই টাকা দিচ্ছি তুমি আড়াই টাকা দাও। এটা জানা ছিল, তাই বললাম, এক ভাই যাও খাটিয়া আর নতুন কাপড় কিনতে, অন্য ভাই সেন্ট ফুল ধূপ, সেই সঙ্গে রায়নায় দাদাকে আর উলুবেড়েয় ছোট বোনকে এস টি ডি করে এসো। চটপট। দেরি করলে ওদিকেও দেরি হয়ে যাবে।

দেখি তবুও ওঠে না। কারও যেন গরজ নেই। চট করে মনে পড়ে গেল কে কোন দিকে গেলে লাভ না ক্ষতি, ওই নিয়ে দুজনের মধ্যে নীরব ঝগড়া। সুতরাং আমাকে কড়া হতেই হল। বললাম, তোমরা কি ভেবেছ তোমার বাবার শেষ কাজের খরচ আমিই দেব? কুমুদদা প্রায়ই আমার কাছে ধার চাইতেন। বৌদি সাক্ষী। এখনো পাঁচশো টাকা পাই। যাকগে, ও টাকা আর চাইনে। মনে রেখো আমিও রিটায়ার করেছি তিন বছর। পেনশন পাচ্ছি না, আমারও সংসার আছে—

এ কথায় কাজ হল। দুই ভাই উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম শ্রাদ্ধ করবে কি করবে না সে তোমাদের ব্যাপার। শ্মশানের খরচটাও মনে রেখো। আমি লোকজন ডেকে আনছি।

ওরা চলে যেতেই চোখের জল মুছে বৌদি আমার হাত ধরলেন, বাবা মারা গেল তা নিয়ে এক ফোঁটা হুঁশ নেই। কেবল কী আছে বের করো, কী আছে বের করো। দুজনে তুমুল ঝগড়া। এই বুঝি হাতাহাতি —

— যাকগে বৌদি, ওসব শুনতে চাই না। এখন লোকজন ডাকতে হবে।

বৌদি বলল, ওর একটি যখের ধনের বাক্স আছে, তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। এখন কেউ নেই। তুমি যা হয় করো। ওটা ঘরে থাকলে আমারও বিপদ —

আমি এক সেকেণ্ড চিন্তা করলাম। কুমুদদার যা কিছু সম্বল এই বাক্সে আছে। এটি বেহাত হলে বৌদিকে ভিক্ষে করতে হবে। যা সব গুণধর ছেলে দেখেছি। বললাম, একটা বাজারের থলেতে ওই বাক্সটা দিয়ে দিন। তারপর বাক্স ঘরে রেখে এসে লোকজন নিয়ে শ্মশানে যাই। ওরা সবাই এখন রায়নায়। শুনেছি শ্রাদ্ধ ওখানেই হবে—

আমি বললাম, বেশ তো, বাক্সটা রেখে যান। কিন্তু কবে নিয়ে যাবেন?

— সে এখন বলা যায় না।

— তার মানে? অনন্তকাল থাকবে নাকি?

— সেটা পরিস্থিতি বুঝে। তবে খুব বেশি দিন নয়। ছেলেরা তোমাকে চেনে না। এই একটা সুবিধে।

—বৌদি যদি জানিয়ে দেন?

—বৌদি নিজের স্বার্থেই জানাবেন না।

আমি যুক্তি অনুভব করে চুপ করে থাকি। অনেক কাজ আছে বলে সুখেনদা উঠে দাঁড়ান।

— একটা ভাল তালা চাই তো। এই টিপ তালা থাকা না থাকা সমান।

— কিচ্ছু দরকার নেই

— আমি যদি কিছু টাকা সরিয়ে ফেলি?

— সে বিশ্বাস আমার আছে। এক বিধবা মহিলার টাকা তুমি মরে গেলেও ছোঁবে না।

জিজ্ঞাসা করি, মেজ ছেলে কি বাবার সঙ্গেই ছিল?

— উহুঁ। বিয়ের পরেই আলাদা করে দিয়েছেন একটা ঘরে। সে ঘরখানার জন্যেও ভাড়া দিতে হত । ছেলে বলে খাতির নেই । সাব লেট বেআইনি, কুমুদদা তাও বসিয়েছেন একটা ঘরে। নিজের ভাড়া প্রায় দিতেই হত না। এদিক দিয়ে খুব শাহেনশা—

— তা হলে ছেলে রিকশা ভাড়ার অর্ধেক দিতে বলে কি খুব অন্যায় করেছে?

সুখেনদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। বলেন, বাবা ছেলের এমন সম্পর্ক আমরা চাই না। তবে কী জানো, সম্পর্ক তো কারও জন্যে বসে থাকে না, এগিয়েই চলে। আরও কত কী

দেখতে হবে!

আমি শেষ কথা বলি, বলছেন বাক্সটা আমার কাছে বেশি দিন থাকবে না?

— ঠিক তাই। বৌদির যখন যা দরকার হবে আমি এখান থেকে নিয়ে দেব। বৌদি আর কাউকে বিশ্বাস করেন না। চলি—

— দাঁড়ান, আপনার সামনেই রেখে দিচ্ছি— এই বলে বাক্সটা আমার খাটের ডালা তুলে এক কোণে রেখে দিলাম।

অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম এল না। মন উচাটন। বালিশের ঘসা লেগে কান দুটো গরম। বাথরুমে গিয়ে বেশ করে জলটল দিয়ে নতুন করে ঘুমোবার চেষ্টা করি। কুমুদদার কথা মনে পড়ে। এক বার বিয়ে বাড়িতে পাশাপাশি নেমন্তন্ন খেতে বসেছি। কেটারারের লোকজন পরিবেশন করছে। জিনিসপত্র সর্ট পড়লে ওরা সাধারণত খাবার সময় না দিয়ে পরপর দ্রুত আইটেম নিয়ে আসে। এটা কারও নজরেও পড়ে না। কিন্তু কুমুদদা থাকতে সেটি হবার উপায় নেই। হঠাৎ বাজখাই গলায় আওয়াজ, কী পেয়েছ তোমরা? মাছ মাংস চাটনি পাঁপড় ভাজা খেতেও টাইম দেবে না? খেতে বসিয়ে অপমান! আমি এক্ষুনি উঠে যাব—

মেয়ের বাবা ছুটে এসে জোড় হাত করে দাঁড়ান। অল্প বয়েসীরা কেটারারের লোকজনকে ধমক দিতে থাকে। নিমন্ত্রিতরা অবাক। একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড।

সুখেনদা বলেন, এরকম কাণ্ড তার অনেক আছে। পাল বাড়ি-র বৃদ্ধ মারা গেছেন। বারোজন ব্রাহ্মণ খাওয়াবেন স্পেশাল ভাবে। আমিও আছি। এটা শুনেই পাল বাড়িতে গিয়ে হাজির। আমিই বুড়োর নাতনীর টিউটর ঠিক করে দিই কুমুদদাকে। সেও প্রায় বছর পাঁচেক আগে। সেই সুবাদে হম্বিতম্বি, আমি কি সৎ ব্রাহ্মণ নই? আমাকে বাদ দিয়ে তোমার বাবার আত্মা তৃপ্তি পাবে ভেবেছ? পাল বুড়োর বড় ছেলে খুবই ভাল মানুষ, বার বার বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আপনি আসবেন, আমাদের-ই ভুল—। এভাবেই উনি নেমন্তন্ন জোগাড় করতেন। যাকে বলে টিপিক্যাল গ্রাম্য মানসিকতা! পড়াতে বসে চা জলখাবার না দিলে তিনি রেগে কাঁই, এ কী রকম অভদ্র বাড়ি! মন্তব্য করতে তাঁর এক মিনিটও দেরি হত না।

ঠিক এইসব কারণেই লোকটাকে আমার ঘোর অপছন্দ। ভায়রার দেশের লোক, তাই কথা না বলে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁর চোখের পাওয়ার দারুণ, রাস্তায় ভিড়ের মধ্যেও আমাকে ঠিক দেখে ফেলেন। এগিয়ে এসে বলবেন, চলুন বাড়ি ফেরা যাক। তারপর শুরু হয় বকবক, গভর্নমেন্ট কি টিকবে ভেবেছেন, ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট ফের কমালো। ঝিঙের দর কোথায় উঠেছে জানেন? আজ বাজারে খোকা ইলিশ উঠেছে, তিরিশ টাকা—

আমি এসব কথার কোনও জবাব দিই না। সৌভাগ্য যে, একবারই উনি আমার বাড়ি এসেছিলেন। চা পরোটা বেগুন ভাজা দেওয়া হয়। উনি খুশি হয়ে বলেছিলেন, পরোটার সাইজ বড়ো, গিন্নিকে আরেকখানা বেগুন ভাজা দিতে বলুন।

শেষ রাতে ভাঙা ভাঙা একটা স্বপ্ন দেখি। ভিড়ের মধ্যে লুকোচুরি খেলা । আমি যত বার নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করি, কী করে যেন কুমুদদা দেখে ফেলেন। তাঁর প্রশ্নেরও শেষ নেই, দেশের হালচাল কী বুঝছেন?

ছাত্রকে রচনা লিখতে দিয়ে উনি খবরের কাগজখানা শেষ করে ফেলেন। টিভিতে সাতটার বাংলা খবর কখনও মিস করেন না। রাস্তায় চলতে চলতে দোকানের টিভির সামনে দাঁড়িয়ে

পড়েন। ওই সময়ই একবার তাঁকে ফাঁকি দিয়েছিলাম।

বেশ বেলাতে ঘুম ভাঙল। প্রায় নটা। রেখা নাকি এরমধ্যে তিন বার চা নিয়ে এসেছিল। যত রাতেই শুতে যাই, আমার বরাবর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভাঙে। বুঝতে পারি সব এলোমেলো করে দিয়েছে এই বাক্সটা, কুমুদদা, সুখেনদা! খাটের ডালা তুলে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে শরীরটা যেন কেমন করে উঠল। মনে হল ওটা বাক্স নয়। একটা কঙ্কালকে দুরমুশ করে ভেঙেচুরে চৌকোণা সাইজ দিয়ে রাখা হয়েছে। যেঁন খটখট শব্দ তুলে এক্ষুনি বলে উঠবে, এই গভর্নমেন্ট কি টিকবে ?

মুসলমানদের পরব উপলক্ষে আজ ছুটি। চা-টা খেয়ে বাজারে যাই। তিনুর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। সবজি বেচে। বলল বাবু, ঝিঙে সস্তা, ছ'টাকা কেজি। হিসেব কষে দেখি দিন কুড়ি আগে কুমুদদা হুশিয়ারি দিয়েছিলেন, ঝিঙের দর কোথায় উঠেছে জানেন? তা যে কোনও সবজির দরই এখন চড়া। ছ'টাকা সেখানে সস্তাই।

ছুটির দিনে দুপুর বেলায় অন্তত বার কয়েক আমি ছাদে যাই। পায়চারি করি। খোলা হাওয়ায় কার্নিশে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে ভাল লাগে। আজ সোমবার। সোম বুধ শুক্র, তিনটে বাজলেই কুমুদদাকে দেখা যেত ডান দিকে একটু হেলে ছাতা হাতে চলেছেন ছাত্রীর বাড়িতে। ভালই মাইনে দেয়। জলখাবারটিও ভাল। এক এক দিন এক এক রকম। বুঝলেন না, একটু বেশি সময় নিয়ে পড়াই। আমার কাছে কেউ ফেল করে না। জীবনে আমিই গোল্লা পেয়ে গেলাম। ডাঁহা ফেল। কুমুদদার রসিকতা এখনও কানে বাজে। হাটলে তাঁর গোড়ালি থেকে একটা শব্দ ওঠে। খুবই মৃদু শব্দ, কটকট। কান পাতলে এখনও যেন শোনা যায়। বলেন, আগে আগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়েছি। ব্যথা বিষ নেই। থাকুক ওটা। আমার চিহ্ন। লোকে বুঝবে আমি চলেছি। দক্ষিণ আমেরিকার তীব্র বিষধর র‍্যাটেল সাপের নাম শুনেছেন ?

রাত্রে শুয়ে শুয়ে র‍্যাটেল সাপের কথা ভাবি। এই সাপের লেজের দিকে রক্ত মাংস বা চামড়া নেই। খান কয়েক হাড় জোড়া দেওয়া। চলতে গেলে আওয়াজ হয়। বনের হিংস্র জন্তুরাও শব্দ শুনে সরে যায়। একবার এক ভদ্রলোক বনের ধার দিয়ে যাবার সময় র‍্যাটেল সাপ ছোবল মারে। যথারীতি তিনি মারা যান। পরে তার জুতো পায়ে দিয়ে আরও দুজনের মৃত্যু ঘটে। তখন পরীক্ষা করে দেখা যায় জুতোয় একটা ফুটো ছিল। সেই ফুটো দিয়ে এক ফোঁটা বিষ জুতোর ভেতরে ঢোকে। বিষ কিন্তু রক্তে মেশেনি। শুধু স্পর্শেই তিনজনের মৃত্যু। এমনই ভয়ঙ্কর সাপ! কিন্তু আমার প্রশ্ন, কুমুদদা নিজেকে র‍্যাটেল সাপের সঙ্গে তুলনা দিলেন কেন?

আবার গত কালের মতো অবস্থা। ঘুম আসছে না। এই নির্ঘুমকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বাথরুমে ঘাড়ে মাথায় প্রচুর জল দিয়ে দরজা খুলে ছাদে গেলাম। সারা কলকাতা এখন ঘুমোচ্ছে। তারা ভরা আকাশের তলায় হু হু বাতাসের মধ্যে পায়চারি করি। প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল। ভেবেছিলাম এর পর বিছানায় শোওয়া মাত্র দুচোখ ঘুমে ভেসে যাবে। হা কপাল!

পাঁচটি রাত ঠিক একই ভাবে পর পর কেটে গেল।

প্রথম দিকে শেষ রাতে ঘুম আসত। এখন পুরো রাত জেগে বসে থাকি। সে দিন রাত আড়াইটে নাগাদ হঠাৎ মৃদু কটকট আওয়াজ। আমার শরীর হিম হয়ে যায়। একটা অচেনা আতঙ্ক কুরে-কুরে খায়। আবার। আবার সেই শব্দ। সারা রাত ঠায় জেগে বসে থাকি।

সত্যি বলতে কী, রাতে খাটের ডালাটা তুলতে ভয় করছিল। সকালে জানালা দিয়ে তাজা রোদ ঢুকলে ডালা তুলে দেখি বাক্সটা ঠিকই আছে। ওজনও একই রকম। টিপ তালা খুলে দেখতে ইচ্ছে করল। থাক। আমার কোনও অধিকার নেই। অফিস কামাই করব। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম সুখেনদার বাড়ি। গিয়ে শুনি সুখেনদা রায়না গেছে বিশেষ দরকারে। বিশেষ দরকারটা কী কেউ জানে না। ঢাকুরিয়া লেক দিয়ে ফেরার পথে খালি বেঞ্চ দেখে বসে পড়ি। কত লোক তো এখানে বসেই ঝিমোয়। ঘাসে গড়াগড়ি খায়। হিসেব করে দেখলাম সুখেনদা যেদিন বাক্সটা রেখে গেলেন, ঠিক সেই দিন থেকে আমার ঘুম নেই। রায়না থেকে আসা মাত্র আমি বাক্সটা ফেরত নিতে বলব।

সেই রাতেও ঘুম এল না। র‍্যাটেল সাপের মতো ভয়াবহ কট কট আওয়াজ। চমকে উঠি। যেন কুমুদদা সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন, কেমন বলিনি, জীবনে আমিই ডাঁহা ফেল— মস্ত বড় গোল্লা—হা- হা-হা—

আমি শিউরে উঠলাম। দরদর করে শরীর জুড়ে ঘাম নামে। ফুল স্পিডের পাখার বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা খুবই কম। মুখ বড় বড় করে শ্বাস টানি। কটকট আওয়াজটা যেন এঘর থেকে ও ঘরে গেল। তারপর আর এক ঘরে। অশরীরী কোনও ভৌতিক ব্যাপার নাকি? বুড়ো বয়সে কলকাতার মতো শহরে শেষে কি ভূতের ভয়ে মারা পড়ব?

এরপর রাস্তার আলো জ্বলে উঠলেই আমার ভিতর একটা চাপা অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। হুঁ হুঁ করে রাত্রি নামে। স্ত্রী যাতে বুঝতে না পারেন রাতের খাবারটা আমি কোনও রকমে শেষ করি। দোতলায় চারখানা ঘর। আমি থাকি দক্ষিণ দিকের ঘরে। অন্য গুলি ফাঁকা। সেই রাতে পাশের ঘরে ঝিন ঝিন শব্দ। শুনে মনে হল এই শব্দটা আমার খুব পরিচিত। কোথায় যেন শুনেছি। আমি মনে করার চেষ্টা করি।

হ্যা, মনে পড়ছে। এক দিন রাস্তার কলের পারে কুমুদদা বাঁ দিকে ঘাড় কাত করে ঝিন ঝিন শব্দ করে নাচছেন। চোখে চোখ পড়ায় বললেন, কানে জল ঢুকেছে। মনে পড়তেই আমি ভয়ে কাঠ হয়ে যাই। এ তো কম পক্ষে বছর দুয়েক আগেকার ঘটনা। সুখেনদা, আপনি কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না? কুমুদদা, আমি তো আপনার কোনও ক্ষতি করিনি। একটা পয়সাও সরাব না। যখনই সুখেনদা চাইবেন তক্ষুনি দিয়ে দেব। আমাকে বাঁচান— আমাকে — আমাকে রক্ষা করুন—

দিন কয়েক বাদে হঠাৎ স্ত্রীর নজরে পড়ে যাই।

— কী হয়েছে বল তো? চোখের কোণে কালি। কী চেহারা হয়েছে তোমার!

— ও কিছু না, অফিসে কাজের চাপ।

— প্রেসার চেক করাও। রাতে ঘুম হয় তো?

এক মাসের ছুটি নিয়েছি। অফিসে ভুল ভাল হচ্ছিল ক্রমাগত। বসের বকা খেতে খেতে অস্থির। সকাল দশটায় রোজকার মতো খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় রাস্তায় অকারণে ঘুরে বেড়াই। লক্ষ করি কোথাও মৃদু কটকট শব্দ হচ্ছে কিনা। প্রত্যেকটি গোড়ালি জরিপ করি। ঝিন ঝিন শব্দে চমকে ফিরে তাকাই। ছোট মেয়েকে ঘুঙুর পরিয়ে মা নাচের ইস্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় দুপুর বেলায় লেকে চলে যাই। গাছের ছায়ায় বসি। ঘাসে গড়াগড়ি খাই। এক দিন এক বৃদ্ধ বলছিলেন, মশাই, আপনার কোম্পানিতে লক আউট নাকি? ফলে

লেকের ওপারে যেতে শুরু করেছি আজকাল।

একদিন তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল সুখেনদার সঙ্গে। চিৎকার করে বলি, বাক্সটা আমি রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেব—

— ও কাজটি কোরো না ভাই — সুখেনদার মুখে অমায়িক হাসি : সময় হলে আমিই নিয়ে আসব।

— কবে আপনার সময় হবে? তিন মাস তো হয়ে গেল।

— তোমাকে বলা হয়নি, আমি আবার রায়না গিয়েছিলাম বৌদির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। আমি হতাশ হয়ে পড়ি, কী বলছেন! বাক্সটার কী হবে?

— হবে ব্রাদার হবে। সত্যি, বৌদির জন্যে দুঃখ হয়। কী সব রত্ন পেটে ধারণ করেছেন!

সেবার চিঠি পেয়ে গিয়ে দেখি গুণধর বড় ছেলে বৌদিকে রাস্তায় বার করে দিয়েছে। কী ব্যাপার, না দলিলপত্র লিখিয়ে এনে মাকে বলে সই করো। বৌদি ঠিক কথাই বলেছেন, আমার আরও ছেলে মেয়ে আছে, তারা কেউ কিছু জানলো না, তুই জমি বাড়ি নিজের নামে লিখিয়ে নিলি? ছেলের বৌ আর এক কাঠি সরেস। বলে, আমি শ্বাশুড়ির জন্যে রান্না করতে পারব না। ছেলে বলে, আমিই তো খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, অন্য কেউ ফিরেও তাকাল না, আর ভাগের বেলায় সবাই ? দলিল করাতে খরচ হয়নি? ওসব চলবে না। তুমি বাড়ি থেকে বেরোও। চিন্তা করে দ্যাখো, মায়ের কথা ছাড়ো, তুই বাড়ির মালিককেই বের করে দিলি? আমি পাড়ার লোকজন ডেকে বৌদিকে ঘরে ঢুকিয়ে দি। ছেলেকে বলেছি, খেতে দিতে হবে না, কিন্তু ঘর ভাড়া বাবদ মাকে প্রতি মাসে তিনশো টাকা দিতে হবে। ভাগ্যটা খুবই ভাল, এ মাসের দশ তারিখে পথের কাঁটা সরে গেল।

আমি আর কী করব! তোরা সাবালক, যা ইচ্ছে তাই কর। আমার ডিউটি শেষ।

— কিন্তু বাক্সটা ?

— হ্যা, একটু মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমার সামনেই ছেলেরা বারবার বাবার অ্যাসেটের কথা জিজ্ঞেস করছিল। বৌদি স্রেফ চেপে যান। এখন আমিই বা কী করে বলি? যাকগে, আপাতত ওটা তোমার কাছেই থাকুক। কোনো ক্ষতি তো হচ্ছে না—

চিৎকার করে উঠতে চাইলাম, আর কত ক্ষতি চান আপনি? কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজই বের হয় না। ওদিকে রাস্তার আলো জ্বলে গেল। আমি সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে ছুটতে থাকি। কিছুক্ষণ বাদে রাত ঘন হবে। তারপর সেই সব ঘটনা! ঠিক করেছি বাক্সটাকে চিলেকোঠায় রেখে আসব।

রাতে চান করার অভ্যেস নেই। করলাম বাথরুমে শাওয়ার খুলে। তার আগে বাক্সটাকে আজ স্থানান্তরিত করেছি। জানালা দিয়ে দেখি চমৎকার চাঁদ। বোধহয় পূর্ণিমা। ঝিরঝিরে বাতাস। সব দিক দিয়েই শুভযোগ। স্ত্রীকে খুশি করার জন্যই এক হাতা ভাত চেয়ে নিলাম। রেখা দোতলায় বিছানা পেতে রেখেছে। শোবার আগে বারান্দায় চেয়ার পেতে একটু বসে থাকি। সুখেনদার কাছে শোনা হল না বৌদি কিসে মারা গেলেন। বোধহয় অপুষ্টিতে। ভাল যা কিছু খাবার কুমুদদাকে দিয়ে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকত না। কিংবা সন্তানদের স্বার্থপরতা দেখেও তিনি হয়ত মরে যেতে চাইতেন। কিন্তু কুমুদদার ছিল পুরোমাত্রায় আসক্তি। যে করে হোক ভালমন্দ খেয়ে বহু দিন বেঁচে থাকব।

বহু দিন বাদে আজ বোধহয় একটু ঘুম এসেছিল। না হলে চটকা লেগে ভেঙে যাবে কেন? জ্যোৎস্না নেই। অন্ধকার। মেঘে ঢাকা আকাশ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনি উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে একটা শব্দ ধীরে ধীরে উঠে আসছে। হ্যা, আমার দিকেই আসছে। চিনতে ভুল হয় না, গোড়ালির সেই কটকট শব্দ। কিন্তু শব্দটা কোথায়?

ঘরে নয়। ছাদে। শব্দটা হেঁটে হেঁটে আমার বুকের ওপর দাঁড়াল। মনে হল ছাদ ফুটো করে র‍্যাটেল সাপটা আমার বুকে ঝুপ করে পড়বে। তারপর হঠাৎ ঝিনঝিন— ঝিনঝিন—

আমি চিৎকার করে মশারি ছিড়ে দৌড়তে গিয়ে দরজায় ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়লাম। আমার চোখ এমন নিকষ কালো রং কখনও দেখেনি। আমি কি মরে যাচ্ছি?

পিপলিপাড়া পোলিং স্টেশন থেকে

সুনীল দাশ

বেলা পড়ে আসছে তখন। গ্রামের একমাত্র পাকা রাস্তার ওপর বাসটা এসে খেলার মাঠের ধার ঘেঁষে দাঁড়াতেই মাঠের মধ্যে ক্রিকেট খেলছিল যারা— সেই এক দঙ্গল ছেলে, খেলা বন্ধ করে বাসটার কাছে ছুটে এলো।

বাসের গায়ে, ড্রাইভারের সামনের কাঁচটিতে বড় করে লেবেল সাঁটা— অন ইলেকশন ডিউটি। পরের দিন পঞ্চায়েৎ ইলেকশন্। মাঠের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ কয়েকজন এবার প্রথম ভোটার লিস্টে নাম তুলেছে। বাকিদের সাহস হয়নি।

বাসের মধ্যে তিনটি পোলিং পার্টির — এক এক পার্টির ন'জন ক'রে—মোট সাতাশ জন তাদের সামান পত্তর নিয়ে বসেছিল। বাস থামতেই পিপলিপাড়া পোলিং স্টেশনের সবাই তিনটে ব্যালট বক্স এবং তাদের আর যা কিছু মালপত্তর নিয়ে নেমে এলো। অপরাহ্নের প্রলম্বিত ছায়ায় তাকিয়ে দেখল— মাঠে অপর প্রান্তে নিশ্চল ও পরিত্যক্ত রেল কামরার মত তাদের নির্দিষ্ট পোলিং স্টেশনটিকে।

বিদ্যাসাগর আদর্শ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার সত্যসুন্দর মজুমদারের বয়স চুয়ান্নবছর চারদিন, এই পোলিং স্টেশনের প্রিসাইডিং অফিসার। তেত্রিশ বছরের শিক্ষকতার জীবনে পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার এই প্রথম। বয়স এবং উচ্চমাধ্যমিকের অন্যতম প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব দেখিয়ে প্রিসাইডিং থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ নিতে গিয়েও নেননি, শেষপর্যন্ত চলে এসেছেন বনগাঁ বিডিও অফিসে। কাউকে না কাউকে তো ঝক্কিটা নিতেই হবে। শুনেছেন বাংলাদেশ সীমানার কাছে কোনো না কোনো পোলিং সেন্টারে যেতে হবে। ভেবেছেন, দেখিই না একটা অজগাঁয়ের ভেতরের চেহারাটা। হলোই বা অল্প সময়, এটাও তো দেশের নাড়ির শব্দ শোনার একটা রাস্তা।

সত্যসুন্দরের পুরোনো ছাত্র সোমনাথ আজ তাকে বিডিও অফিস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছে। সোমনাথ কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার, নিজে বড় একটা কমপিউটার সেন্টার চালায়, এছাড়াও বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে সফট ওয়ারের আরো কি সব ব্যবসা আছে ওর। ঢাকুরিয়ায় সত্যসুন্দরের দুটো বাড়ির পরেই সোমনাথদের বাড়ি। হাজারো কাজের মধ্যেও ছেলেটা দিনরাতের ভেতর একবার না একবার সত্যসুন্দরের বাড়ি ঘুরে যায়। আজকাল এ ধরনের মানসিকতা বড় একটা দেখা যায় না, অন্তত সত্যসুন্দর তাঁর জীবনে দ্বিতীয় আর দেখেছেন বলে মনে করতে পারেন না। তেত্রিশ বছরের শিক্ষকের জীবনে কম ছাত্রছাত্রী তো দেখলেন না।

পাকা রাস্তা আর প্রাইমারি স্কুল বাড়িটার মাঝখানে খেলার মাঠটা ছোটো নয়। ডানদিকে গাছপালা সমেত মাটির চালাঘরের বাড়ি একটা, তার সামনেই একটি টিউবয়েল। বাঁদিকে সারি সারি লম্বা গাছ। নিজের কিডস ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে এগোতে সত্যসুন্দর তাঁর সেকেণ্ড পোলিং অফিসার হালদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের সব জিনিষপত্তর ঠিকঠাক নেমেছে তো ?'

সেকেণ্ড পোলিং অফিসারক তার লম্বা ঘাড় হেলিয়ে সত্যসুন্দরকে নিশ্চিত থাকার আশ্বাস

দিয়ে এগিয়ে যান। সত্যসুন্দরের পোলিং টিমে এই হালদারই সবচেয়ে অভিজ্ঞ। বনগাঁর শ্রীমা সিনেমা হলের ট্রেনিং মিটিংয়ে সত্যসুন্দর যখন রীতিমত দুশ্চিন্তায় বিষণ্ণ, এই সেকেণ্ড পোলিং হালদার, লম্বা ছিপছিপে, বুশসার্ট আর ট্রাউজার্স পরা রাজ্যসরকারের কর্মী— রীতিমত ভরসা যুগিয়েছেন 'স্যার সাত সাতটা ইলেকশন ডিউটি দেওয়া মানুষ আমি। ঘাবড়াবেন না। সব গুছিয়ে দোবো আপনাকে।'

সত্যসুন্দর ঘাবড়ে গেছিলেন তাঁর আর এক পুরোনো ছাত্র— কৃষ্ণনগর কলেজের নতুন অধ্যাপক সুকান্তর অবস্থা দেখে। আঠাশ তারিখের নির্বাচন, কুড়ি তারিখে কলেজে সুকান্তকে ইলেকশন ডিউটির চিঠি ধরাতে চাইলে সুকান্ত এড়িয়ে গেছিল। একুশ তারিখে 'ভোর রাতে' তার বালিগঞ্জের ফ্লাটে পুলিশ এসে সেই চিঠি ধরিয়ে গেল। বেচারা সুকান্ত বাইশ তারিখ সকালে ট্রেনিংয়ে ছুটছে যখন, শিয়ালদা স্টেশনে সত্যসুন্দরের সঙ্গে দেখা।

আজ বনগাঁ বিডিও অফিসে পৌঁছে দিয়ে পোলিং টিমের পাঁচজন পোলিং অফিসার এবং দুজন হোমগার্ডের যোগাযোগ করিয়ে সোমনাথ কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগে বলেছিল, 'আগামীকাল ভোট দেওয়া তো শেষ হবে পাঁচটায়। ভোট গুনে আপনার এই বিডিও অফিসে ফিরতে ফিরতে নিশ্চয় দশটা এগারোটা হবে। জমা দিয়ে ফিরতে তো আরো ঝামেলা। আমি বরং স্যার কাল রাতে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।'

' না না সোমনাথ, এতো ধকল নিয়ো না। ছাত্র পুত্রবৎ কিন্তু তুমি তো সেই স্কুল লাইফ থেকেই আমার পুত্রের চেয়েও বেশি। ব্যালট গোনা শেষ হতে হতে মাঝরাত হতে পারে। শুনলে তো আমার পোলিং স্টেশনে এক হাজার সাতজন ভোটার। তিনটে করে ভোট দেবে এক একজন। তারপর তো কাউন্টিং। তুমি বরং কাল বিকেলে আমার বাড়ি এসো কেমন? আজ তোমার সারা দিনের কাজ মাটি করে দিলাম।'

সোমনাথ কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগে ফার্স্ট পোলিং এবং সেকেণ্ড পোলিংকে আলাদা আলাদা করে বলে যায় ' আপনাদের ভরসাতেই ওকে রেখে যাচ্ছি — দেখবেন দাদা।'

হালদার উত্তর করেছিল সঙ্গে সঙ্গে, 'কোনো ভয় নেই ভাই। দেখছেন না দুটো লাঠি হাতে হোমগার্ড দিয়েছে — তার মানে পিসফুল এরিয়া।'

পরে ওই একই কথা বলেছে সাইকেল ম্যাসেঞ্জার কর্ণ। 'দেখবেন শান্তিতে ভোট হয়ে যাবে। আপনাদের কোনোরকম কোনো অসুবিধে হবে না। হলে এই কর্ণ মুণ্ডল আছে স্যার।'

পিপলিপাড়া প্রাইমারী স্কুলে এক ফালি আয়তাকার একতলা বাড়িটা কিছুদিন আগেই হয়েছে বোঝা যায়। ছাদ এবং দেওয়াল প্লাস্টার হয়েছে মেঝে হয়নি। মেঝেতে এবড়ো খেবড়ো শক্ত মাটি। দরজা জানলার ফাঁকগুলো রয়েছে কিন্তু ফ্রেমই বসেনি, পাল্লা তো দুরের কথা। ইলেকট্রিসিটি নেই। এমন বাড়িতে তিন হাজারের উপর ভোটারের ন' হাজারের ওপর ব্যালট পেপার নিয়ে রাত কাটাতে হবে। একটা বোমা পড়লেই লাঠিধারী হোমগার্ড দু'জন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে দৌড় মারবে।

চার ঘরের মাপের বারান্দা সমেত একতলা স্কুল বাড়ির পেছনের একফালি জমিতে লম্বু গাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরেই দিগন্তস্পর্শী পাট ক্ষেত। কাছেই বাংলাদেশ সীমান্ত। যে ভারতবর্ষে নির্বাচন এখন আর বার্ষিক উৎসব নেই, বারোমাসে তেরোপার্বণের হিসেবনামায় চলে এসেছে। সেই ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ গ্রামে পিপলিপাড়া প্রাইমারীর মত

দরজা জানালাহীন, টয়লেট ছাড়া স্কুল বাড়ি তো দূরের কথা — চালা ঘরের ঠিক মত ব্যবস্থা নেই। এই দেশই এখন নিউক্লিয়র পাওয়ার হওয়ার জন্য মরণ ঝাঁপ দিতে মরিয়া। হায় করুণাঘন ' অনন্তপূর্ণ '!

স্কুলবাড়ির ক্লাসঘর গুলোকে তখনো দেওয়াল তুলে আলাদা করা যায়নি। সেই লম্বা হল ঘরে দুটি টেবিল, দুটি বেঞ্চ এবং একটি চেয়ারই আসবাব বলতে যা কিছু। তার ওপর সামানপত্তর রেখে সত্যসুন্দর কর্ণ আর সেকেণ্ড পোলিং হালদারকে নিয়ে মাঠের পাশের টিউবওয়েলে হাত পা ধুতে আসেন। বাঁদিকের চালাবাড়িটা দেখিয়ে কর্ণ বলে, 'এইটে আমার কাকার বাড়ি'। সেকেণ্ড পোলিং কল টেপেন। সত্যসুন্দর চোখে মুখে জল দিয়ে, আঁচলা করে জল খেয়ে বলেন, 'পা বাড়িয়েই জল — এটা তো রীতিমত বড় সম্পদ।'

কর্ণ কান এঁটো করে হাসে নিঃশব্দে, বলে, স্যার এ গ্রামে জলের হাহাকার নেই।

সত্যসুন্দর তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বলেন, 'ভারতবর্ষে এক লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশ পঁচাত্তরটি গ্রামে জলের জন্য কম পক্ষে দেড় কিলোমিটার পথ পার হতে হয়।'

এই সময়ে থার্ড পোলিং মানিক গোস্বামী এসে কর্ণকে জিজ্ঞাসা করে, ' বাজার কতদুর?'

'কাছেই মাস্টারমশাই ; হাঁটাপথে দশ মিনিট। '

'চলুন স্যার, আমরা কজনে চা খেয়ে আসি। আমরা ফিরলে বাকিরা যাবে।' ঠাকুরনগরের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মানিক গোস্বামীর কণ্ঠস্বরটিতে সব সময় বেশ বিনয় বাজে। হেসে কথা বলতে ভালবাসে অল্পটাক পড়া যুবকটি। তিনজন পোলিং অফিসারকে নিয়ে কর্ণ মণ্ডলের সঙ্গে বাজার এলাকার দিকে এগোন সত্যসুন্দর। সাইকেল ম্যাসেঞ্জারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গ্রামের নানান খোঁজখবর নিতে নিতে কয়েক পা সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন ফার্স্ট পোলিং এবং সেকেণ্ড পোলিং অফিসার। থার্ড পোলিং মানিক গোস্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সত্যসুন্দর হাঁটছেন পাকা রাস্তার দুপাশের গ্রামের চেহারা দেখতে দেখতে।

এখন আকাশ থেকে আলো অপসৃয়মান। ডানায় আরো একটি দিন ঝেড়ে ফেলে পাখিদের কণ্ঠস্বর ভাসছে হাওয়ায়। সত্যসুন্দরের এই পঞ্চান্নে অবশ্যই নিসর্গমুগ্ধতা আছে, তবু দাঙ্গা দেশভাগের শৈশব, এক পয়সার ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আর খাদ্য আন্দোলনের কৈশোর যুবকাল পেরিয়ে, উত্তর যৌবনের গ্রাম দিয়ে শহর ফেরার আবর্তে শিক্ষাপ্রাঙ্গণের নিরন্তর তারুণ্যসঙ্গী সত্যসুন্দরের কাছে মানুষই সব চেয়ে বেশি কৌতূহলের। 'মানিকভাই, আপনি স্কুলে চাকরি করছেন কত বছর? তাঁর প্রশ্নধ্বনিতে স্বতস্ফূর্ত আন্তরিকতায় স্বর গাঢ় হয়।

হাঁটতে হাঁটতে থার্ড পোলিং বলতে থাকেন, 'বি,এ পাশ করেই গ্রামের প্রাইমারিতে চাকরি পেয়েছিলাম স্যার। তারপর জুটে গেল এ.জি. বেঙ্গলে ক্লার্কের চাকরি। তিন বছর সে চাকরি করলাম। বড় ফ্যামিলি আমাদের। ষাট বিঘে চাষের জমি। এর ওপর বাবার ছিল চালু টেলারিং শপ। বাবা মারা গেল। মা বেঁচে। এর মধ্যে আর তিনভাই চাকরি পেয়ে বিয়ে করে দমদম, হুগলিঘাট আর বাঁশদ্রোণীতে চলে গেছে। এই অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রীকে ধরে সেই আমার গ্রামের প্রাইমারিতেই আবার মাস্টারিটা পাওয়া গেল। অন্য কোথাও নয়, এই সুন্দর স্কুলের চাকরিটা টার্গেট করে ইলেকশনে অমানুষিক খেটে ছিলাম স্যার। আমার স্কুলের ঠিক উল্টোদিকেই তো আমার গোস্বামী টেলারিং। ক্লাস করতে করতেও দেখা যায় কাস্টমার এলো কিনা। তেমন দরকার পড়লে বোর্ড ওয়ার্ক করতে করতেও — চট করে চলে গিয়ে দু চারটে কথা বলে আবার ক্লাসে ফিরে আসতে পারি, — আপনাদের আশীর্বাদে এই সুবিধেটা পাই স্যার।' বলা

শেষ করে তৃপ্তির হাসিতে নিশ্চুপ হলেন থার্ড পোলিং।

বাজার এলাকাটুকুতে ইলেকট্রিসিটি আছে। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে কাচের গ্লাসে লিকার চায়ে চুমুক দিতে দিতে সেকেন্ড পোলিং তার পাশে বসা লুঙ্গিপরা খালিগা গ্রামের মানুষটিকে বলেন, ' আপনাদের গাঁয়ে এলাম তো ভোটের কাজ করতে। শুনছি খুব পিসফুল এরিয়া। তো দাদা , ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া জুটবে — কি বলেন?

'জুটবে না মানে? আমাদের গ্রামে থেকে আপনাদের একজনকেও না খেয়ে যেতে দোবো নাকি? গাঁয়ে পয়সা নেই ঠিকই, তা বলে কি মানুষ নেই? আন্তরিকতায় গলার স্বর স্বভাবত নামে, এক্ষেত্রে শেষ বাক্যে 'বেশ খানিকটা চড়ে' গেল শুনে সত্যসুন্দর মজা পেলেন।

সেকেণ্ড পোলিং নিখরচায় তার খ্যাক খ্যাক হাসিটি উদ্ধার করে বলেন, 'এই যে বললেন এই যথেষ্ট দাদা।' বলতে বলতে সত্যসুন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্বর সংবরণ করেন, 'স্যার চায়ের দামটা মিটিয়ে দেন।'

বাজার এলাকায় দরমার বেড়া দেওয়া ভিডিও হ'লের সামনে ছেলে ছোকরাদের বেশ ভিড়। কর্ণ এসে বলে, 'স্যার, কেরাসিন তেলের জন্যে এই পারমিটেতে সই করে দ্যান।'

ফেরার পথে সাইকেল ম্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞাসা করেন সত্যসুন্দর, 'কর্ণ, তোমার ফ্যামিলিতে কে কে আছেন? '

'সবাই আছে স্যার — বাবা মা, বউ, ছেলে মেয়ে।'

'তাই নাকি? বিয়ে হয়ে গেছে তোমার? ছেলে মেয়ে রয়েছে? এমনিতে কি কাজ কর তুমি?'

'আজ্ঞে স্যার — লোক ঠকিয়ে খাই আমি। বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই আমি উড়িষ্যায় থাকি — আমার লোক ঠকানোর কারবার স্যার ওখানেই চলে।'

'লোক ঠকিয়ে খাওয়া মানে?' ফার্স্ট পোলিং এগিয়ে এসে জানতে চান। সমীর চক্রবর্তী বাজার থেকে একটা বড় ফুটি কিনেছেন। দাম কত নিয়েছে, জানার পর কর্ণ বলল, 'আপনাকে শহরের লোক দেখে ডবল দাম তুলেছে।'

এখন সমীর চক্রবর্তীর প্রশ্ন শুনে কর্ণ মণ্ডল একটি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি বিস্তার করে বলে, 'আমার হল ধাতুর আংটি বেচার কারবার। ভুজুং ভাজুং দিয়ে লোকেদের গছিয়ে দিই। তবে যত দিন যাচ্ছে লোকে ঠকছে কম।'

ভিডিও ঘরটা ছাড়িয়ে কয়েক পা ফিরে আসতেই অন্ধকার ঘন। পুরোনো একটা একতলা বাড়ির ছাদে ধানের গোলার পাশে একটা হ্যারিকেনের আলোয় চারপাঁচটি ছেলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছে।

'বাজারে কয়েকশ গজ দূরেই কারেন্ট এসে গেছে কিন্তু এই সব ঘরবাড়িতে তা এলো না কেন?' সত্যদুন্দর জানতে চান।

'গরীব। বড্ড গরীব স্যার গাঁয়ের লোকেরা কারেন্ট নেওয়ার পয়সা নেই।' ফার্স্ট পোলিং মনে করিয়ে দেয় কর্ণকে, 'কাল কাউন্টিংয়ের আগে দুটো হ্যাজাক রেডি রাখবে কর্ণ।'

'তখন রথের চাকা গাড্ডায় বসে গেছে, বলে ডুবিও না কিন্তু।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খ্যাক খ্যাক করে হাসতে থাকেন সেকেণ্ড পোলিং অফিসার।

কর্ণ আশ্বাস দেয়, 'ও সব ব্যাপারে আমার কোনো গল্‌তি পাবেন না স্যার। সব রেডি দেখবেন'। রাত আটটার নাগাদ সেক্টর থেকে পুলিশ এলো পিপলিপানা পোলিং স্টেশনের খোঁজখবর করতে। ফার্স্ট পোলিং রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'স্যার সেক্টর অফিসকে পরিষ্কার

লিখে দিন — আমাদের গোটা টিম এখানে সেফলি পৌঁছলেও সকলেই আনসেফ, আনপ্রোটেকটেড্ অবস্থায় তিন হাজারের ওপর ব্যালট নিয়ে রাত কাটাতে যাচ্ছি। দু কপি লিখে একটা কপি ওকে দিয়ে সই করিয়ে রেখে দিন, অঘটন কিছু ঘটে গেলে ওই লেখাটাই হবে আমাদের একমাত্র রক্ষা কবচ।'

সেক্টর অফিসের পুলিশ চলে যাওয়ার পর থার্ড পোলিং গল্প করে, 'এখানে তবু দু একটা টেবিল বেঞ্চ চেয়ার রয়েছে, স্কুল বাড়িতে। আগের বার পঞ্চায়েৎ ফেরৎ এক প্রিসাইডিং অফিসারের মুখে শুনেছি, পোলিং টিম পৌঁছনোর আগে গ্রামের বিভিন্ন লোক ইস্কুল বাড়ি থেকে টেবিল চেয়ার বেঞ্চ সব সরিয়ে নিয়ে গেছিল। পরে খোঁজ পড়লে বলেছে, এগুলো আমরা যোগাড় করে দিতে পারি স্যার। তবে অনেক দূর থেকে আনতে হবে তো প্রতিক্ষেপে কম পক্ষে দশ টাকা মুটে ভাড়া দিতে হবে।' সেই অবস্থায় প্রিসাইডিং অফিসার, ষাট টাকা গুণে দিয়ে তবে ইলেকশন শুরু করতে পেরেছিলেন। এখন আর গ্রামের লোকের মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই স্যার।' 'যেন শহরের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব গিজগিজ করছে' সমীর চক্রবর্তী ব্যঙ্গের স্বরে বলে।

পরের দিন বিকেল পাঁচটায় ভোটদান পর্ব মিটে যাওয়ার পর, সত্যসুন্দর, সাইকেল ম্যাসেঞ্জারকে দিয়ে ভোট দেওয়া শেষ হওয়ার খবর লিখে সেক্টর অফিসে পাঠাচ্ছেন যখন, সেকেণ্ড পোলিং আগের রাতের কথার জের টেনে বলেন, 'কাল রাতে থার্ড পোলিং কিছু ভুল বলেনি স্যার। দেখলেন তো সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গ্রামের ছ'জন পোলিং এজেন্ট বসে থাকল — পোলিং টিমকে খাবারের প্যাকেট দেওয়া দূরের কথা — এই দশ ঘণ্টার মধ্যে এক কাপ চা'ও সাধেনি — উল্টে আমাদের চা'গুলো দিব্য মেরে গেছে।'

শেষ রিপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে সত্যসুন্দর বলেন, 'গরীব মানুষ। ওদের পার্টি থেকে তো ওদের জন্যে কোনো টিফিন প্যাকেট পাঠায়নি।'

হালদারের খ্যাক খ্যাক হাসিটা আর একবার উচ্চকিত হ'ল। হাসি উগ্‌রে দিয়ে হালদার বললেন, 'এরা স্যার প্যাকেটের বদলে পয়সা ধরে দিলে বেশি খুশি হয়। গাঁয়ের লোক এখন পুরোপুরি নগদ নারায়ণের পূজারী। ওরা জানে, ডিউটি করার জন্যে সরকার থেকে আমরা টাকা পাচ্ছি। ওরা যে সে টাকায় ভাগ বসাতে চায়নি — এই ঢের।'

সন্ধের মুখে কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে স্কুলের সামনের মাঠ ভরে গেল। আজ গরমটাও অসহ্য। সমীর চক্রবর্তী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার! হ্যাজাক আনতে কর্ণ এতো দেরি করছে কেন?'

ঠিক সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে কর্ণ ঢুকে বলল, 'হ্যাজাক পাওয়া যাচ্ছে না। যে দোকানে বলে রেখেছিলুম — সে দোকানদার আজ ঝাপই খোলে নি। নির্ঘাৎ ব্যাটা বেশি টাকা পেয়ে অন্য জায়গায় ভাড়া দিয়ে দিয়েছে।'

'এইরে! কর্ণের রথের চাকা মাটিতে গেঁথে গ্যাছে।' বলে সেকেণ্ড পোলিং স্বরযন্ত্র থেকে মজুত হাসির আওয়াজ বার করার আগেই সমীর চক্রবর্তী চেচিয়ে ওঠেন, 'আমরা কোনো অজুহাত শুনতে চাই না। যেখান থেকে পারো দুটো হ্যাজাক যোগাড় কর। হ্যারিকেনের আলোয় শুনবো না। যাও এক্ষুণি গ্রাম পঞ্চায়েৎ প্রধানকে বলে ব্যবস্থা কর।

দ্বিরুক্তি না করে কর্ণ আবার সাইকেল ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ে। থার্ড পোলিং চাপা গলায় সত্যসুন্দরকে বলেন, 'দুপুরে কর্ণ যে তার কাকার বাড়িতে বিচ্ছিরি রকমের ঝাল মুরগির

মাংস আর ভাত খাওয়ালো টিমকে — দেখুন এবার তার বিলটা কত হয়। খুব সেয়ানা ছেলে স্যার।' কিছুক্ষণ পরে কর্ণ মণ্ডল দুটো নয়, একটা হ্যাজাক নিয়ে এলো পঞ্চায়েৎ প্রধানের কাছ থেকে। ওই একটার আলোতেই শুরু হল কাউন্টিং।

মাঠের মধ্যে বস্তা, মাদুর, চাটাই পেতে গোছা গোছা লোক বসে গেছে। মাঝে মধ্যে সমুদ্র সৈকতে ঢেউ আছড়ে পড়ার মতো জনস্রোত বারান্দায় উঠে পড়ে স্কুল ঘরের ভেতরে ঠেলে আসতে চাইছে। হোমগার্ডদের পক্ষে ওদের থামানো মুশকিল। মাঝে একবার জিপে করে সেক্টরের পুলিশ এসে জনতাকে ডাণ্ডা দেখিয়ে মাঠের মধ্যে হটিয়ে দিয়ে গেল। পুলিশ চলে যাওয়ার পর আবার যে কে সেই। ওরই মধ্যে গণনা চলতে থাকে।

পৌনে ন'টায় গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা হ'ল। এরপর পঞ্চায়েৎ সমিতি আর জেলা পরিষদের গোনা শেষ হল যখন ঘড়িতে তখন রাত দু'টো বেজে গেছে। মাঠের লোকজন চলে গেছে প্রথম ঘোষণার পরই। চারপাশ ফাঁকা এখন। এর মধ্যে সাড়ে দশটার সময় টর্চ নিয়ে কর্ণের সঙ্গে সত্যসুন্দর একবারটি বেরিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে এস.টি.ডি করার জন্যে। বাড়ির সকলের সঙ্গে সোমনাথটাও দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। একটা খবর দিতে পারলে ভাল হয়। চারপাশ যেন বড় বেশি চুপচাপ। জয়ের আনন্দ এত তাড়াতাড়ি ঘুমে ডুবে গেল? খানিকটা অবাক হলেন সত্যসুন্দর। কর্ণের সঙ্গে মিনিট পাঁচেক হেঁটে গিয়ে নতুন একটি দোতালা বাড়ির একতলায় ফোন আছে। প্রাইভেট ফোন। টাকা দিয়ে এস.টি.ডি করা যাবে। পুস বাটনে ডায়াল করতে করতে সত্যসুন্দরের মনে হ'ল — গ্রামের সব মানুষ তো গরীব নয়। অনেকবার তিনি ডায়াল করলেন। রিং হয়ে যাচ্ছে। গতকালও তো বাড়ির ফোনটা ঠিক আছে দেখে এসেছেন।

একমাস ধরে ইলেকশনের টেনশন চড়তে চড়তে আজ চূড়ান্ত হয়ে যেভাবে গ্রামে ভেঙে পড়ার কথা তেমন পড়ল না দেখে সত্যসুন্দরের হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছিল। গতকাল পিপলিপাড়ায় পা দেওয়ার পর থেকে আজ এতোটা সময় পর্যন্ত ভোটকেন্দ্র ছাড়া আর অন্য কোনো কথা ভাবার ফুরসৎ পাননি বলেই হঠাৎ গ্রামে নির্ব্বাচনী সংবাদে কৌতূহল কমে যাওয়ার কারণটা ধরতে পারেননি। গ্রাম তো আর এখন শুধু গ্রামের খবরেই গিঁথে যায় না। দুনিয়ার নানান খবর তাকেও কাঁপায়। আজ সন্ধেবেলা আরো একটা খবর যে ফেটে পড়েছে ভারতবর্ষে, ভোট দেওয়ানো এবং গোনা নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ত সত্যসুন্দরের টিমে সে খবর চুঁইয়ে আসারও ফাঁক পায়নি। পোলিং স্টেশনের গণ্ডীতে ওরা টেরই পাননি — চাঘাইয়ে পাঁচটি বোমা ফাটানোর সংবাদ, ভারত পাকিস্তান উপমহাদেশের উত্তেজনার পারদ কতখানি উঁচু করেছে। ভোটের উত্তেজনার চেয়ে পড়শি দেশের পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণে প্রতিক্রিয়া কি কম?' গ্রাম ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশেও পোখরান চাঘাইয়ের চাপান উতোর প্রগাঢ় ছায়া ফেলে। বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু নিষ্যন্দ! শান্ত হে, রুদ্র হে, হে অনন্তপূর্ণ!

ভোট গোনা শেষ হওয়ার পরই সত্যসুন্দর ফিফ্‌থ পোলিংকে দিয়ে একটার পর একটা খাম ধরে ধরে ফর্মগুলো ঢুকিয়ে মুখ আঁটিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন। আঠেরোর এ, উনিশ, কুড়ি কুড়ির এ, কুড়ির বি, বাইশ, চব্বিশ — এইসব নম্বরের খাম গুলোকে দুরকম করে মুখ আঁটতে হবে। একটা শুধু আটা দিয়ে অন্যটা গালা দিয়ে সিলড করে। প্রিসাইডিং অফিসারের ডাইরিটাও ফিল আপ করে একই ভাবে ভরতে হবে। সত্যসুন্দর বুঝতে পারলেন পুরো কাজটা তাকে একা সেরে উঠতে হলে রাত তো কাবার হবেই!

দুদিন ট্রেনিংএ এবং আগের দিন সকাল থেকে সেকেন্ড এবং থার্ড পোলিং তাকে যে ক্রমাগত ভরসা জুগিয়ে এসেছে, তারা তাদের দেদার অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজগুলো ঝটপট তুলে দেবে— এই মুহূর্তে দুজনের দিক থেকেই কোনো রকমের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তদের ক্লান্তিতে আইটাই অবস্থায় বেজায় জেরবার হয়ে হাত পা ছেড়ে যাচ্ছে। তবু ফার্স্ট পোলিং তিনটে সাদা কাগজে — আলাদা আলাদা করে গ্রাম পঞ্চায়েৎ , পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং জেলা পরিষদের ফলাফলের হিসেবটা পুরো ছকে দিয়েছেন। সেই কাগজ গুলো থেকেই এক এক করে ফর্মগুলো লিখে সুনির্দিষ্ট খামে ফিফ্‌থ পোলিংকে দিচ্ছিলেন সত্যসুন্দর। সেই সময় অন্যদুটো পোলিং পার্টিকে তুলে নিয়ে বাসটা এসে পিপলিপাড়া পোলিং স্টেশনের টিম তোলার জন্য এসে দাঁড়াল। হর্ণ মারছে।

বাস এসে পড়ায় থার্ডপোলিং এসে সত্যসুন্দরকে বলেন, ' স্যার, চলেন সব গুটিয়ে নিয়ে বাসে উঠে পড়ি। এই হ্যাজাকের আলোর গরমে এভাবে কষ্ট না করে চলুন বিডিও অফিসের লাইট ফ্যানের নিচে বসে — সবাই মিলে চটপট কাজ সেরে নিয়ে জমা দিয়ে দেবো। আমরা তো তবু কাছাকাছি থাকি — আপনার আর ফিফ্‌থ পোলিংকে তো ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরতে হবে। চলুন স্যার।'

সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ড পোলিং হালদারও মানিক গোস্বামীর কথায় সায় দিয়ে বলেন, ' ঠিক বলেছেন ভাই, এভাবে কাজ করলে হাজারো ভুল হয়ে যাবে।' আসুন স্যার, বিডিও অফিসে গিয়ে নেওয়া যাবে।

সত্যসুন্দরকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে বাকিরা সব মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে এগোল বাসের দিকে। কর্ণ মন্ডল আগেই দুদিনের হিসেব দিয়ে তার খরচের বিল পেশ করেছিল। সত্যসুন্দর কনটিনজেন্সির জন্যে নেওয়া পুরো টাকাটা দিয়ে দিলেন কর্ণ মন্ডলকে। তারপর প্রিসাইডিং এবং পাঁচজন পোলিংকে আঠাশ টাকা করে দিতে হল। দুপুর বেলায় হোমগার্ড দুজন কর্ণ মন্ডলের কাকার বাড়িতে খাবে না বলেছিল। পয়সা খরচ করে তারা খাবে না। সেকেন্ড পোলিং তখন গজগজ করতে করতে সত্যসুন্দরকে বলেছিলেন, 'এ গুলো যে কী মারাত্মক হারামজাদা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না স্যার। খাই খরচটা পুরো আমাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে ম্যানেজ করার ধান্দায় এই সব নক্‌সা মারছে। ব্যাটারা ভালো রকমই জানে আমরা খাবো আর চোখের সামনে ওরা না খেয়ে থাকবে — তা তো আমরা হতে দিতে পারবো না। আরে বাবা তোদের মতো মনুষ্যত্বটা তো আমরা ছেঁটে ফেলে দিতে পারিনি।'

কর্ণ মন্ডল বিলের টাকা গুনে নিয়েছে। হিসেব গুনেই হালদারের সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামীও বেজায় চটে গেছিলেন। ওরা দুজনে, বিশেষ করে এই মনুষত্বের খরাপীড়িত এলাকাটি পরিত্যাগ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং বাস এসে পড়ার পর আর এখানে পড়ে থাকা নয়। বাসে উঠেও হালদার গজগজ করতে থাকেন কর্ণ মন্ডলয়ের ওপর ক্ষেপে গিয়ে, 'ব্যাটা অন্য জায়গায় মানুষ ঠকিয়ে খাস বলে তোর গ্রামে চব্বিশঘন্টার জন্য যারা এসেছে তাদেরও টুপি পরাবি? ওই মুরগির টকটকে লাল ঝোল ঝালের চোটে বাপের নাম ভুলে যাওয়ার অবস্থা, আর কি গুটলি গুটলি পিস্ — একবেলা খাওয়ার খরচ মাথাপিছু তিরিশ টাকা'! বোঝা যাচ্ছে অনেকগুলি টাকা গর্চা যাওয়ায় মুরগির মাংসের ঝালটা ওর আরো বেশি মনে হচ্ছে। সত্যসুন্দর নিঃশব্দে বাসে উঠে যান। ওঠার আগে বলেন, ' চলি কর্ণ, ভালো থেকো। '

বাতাস বইছে না। লম্বগাছের আকাশমুখী মাথা, গাছের প্রতিটি পাতা স্থির। একা চাঁদ চুপচাপ

ভেসে আছে মেঘের গায়ে। ফাঁকা রেল কামরার মত স্কুল বাড়িটা এ মুহূর্তে নির্জনতার হাতে সঁপে দিয়ে তিনপ্রহর পার করা অন্ধকারে পিপলিপাড়া থেকে বনগাঁ বিডিও অফিসের দিকে ছুটে চলল বাসটা।

আম জাম হেলেঞ্চা আর শিরিষের ডালে দোলা দিয়ে খুব জোরে ছুটতে থাকে বাস। বাসে উঠে বসেই ঘুমে ঢুলতে শুরু করেছে বেশির ভাগ। ঘুম নেই সত্যসুন্দরের। সমীর চক্রবর্তীর লেখা তিনটে কাগজের দুটো রয়েছে সত্যসুন্দরের পাঞ্জাবীর পকেটে, বাকিটা গেল কোথায়? ওটা না পেলে কোনো রিপোর্টই জমা পড়বে না।

বিডিও অফিসের সামনে বাস থামার পর ড্রাইভারের খাতায় সই করে দিয়ে সত্যসুন্দর যখন সামনের দরজা দিয়ে নেমে এলেন নিজের কিডস ব্যাগটা কাঁধে ফেলে, সেই সময় পেছনের দরজা দিয়ে নেমে ফোর্থ পোলিং এসে সত্যসুন্দরকে জানান, 'স্যার, সেকেন্ড চলে গেছেন। খুব শরীর খারাপ করেছে ওর।'

'থার্ড পোলিং কোথায় ? আমাদের তো অনেক কাজ বাকি ! কেমন যেন দিশেহারা হয়ে বলে ওঠেন সত্যসুন্দর।

বেসুরো গলায় ফিফ্‌থ পোলিং বলেন,'সেকেন্ড তবু জানিয়ে গেছেন শরীর খারাপ, থার্ড তো সেটাও জানাননি, তিনি আগের মোড়েই বাস থেকে টুক করে নেমে গেছেন। ওখান থেকে ওর বাড়ি যাওয়া সুবিধে।'

সত্যসুন্দরের মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে, শক্ত হয়ে এগোতে থাকনেও বিডিও অফিসের গেটটার দিকে।

সত্যসুন্দরের কানে তখনো পৌঁছয়নি পাকিস্থানের বোমা ফাটানোর খবর। চাঘাইয়ের বোমা গুলো কত শক্তির?

পোখরানের কাছাকাছি গ্রামের মানুষেরা, শিশুরা কি জানে — তেজস্ক্রিয় পদার্থ কি?

সত্যসুন্দরের মনে হল কাঁধের বোঁঝাটা আর বইতে পারছেন না। হাতটা টনটন করছে তার। রাত কত হ'ল?

গেটের দিকে এগোতে এগোতে , বিডিও অফিস চত্বরে খাটানো বড় প্যান্ডেলের মাইক থেকে ঘোষণা শুনলেন, ' মেডিকেল টিম হাসপাতালে পাঠানোর জন্যে গাড়ি রেডি করুন— একজন প্রিসাইডিং অফিসার গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এক্ষুনি অ্যাম্বুলেন্স চাই।'

সত্যসুন্দরের বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে উঠল। আর ঠিক সেই সময়েই পেছন দিক থেকে কেউ যেন হাত বাড়িয়ে তার কিডস ব্যাগটায় টান দিল। তিনি চমকে উঠে দুহাতে চেপে ধরলেন ব্যাগটা আর একই সঙ্গে শুনলেন , ' স্যার, ব্যাগটি আমাকে দিন।'

সত্যসুন্দর ঘাড় ফিরিয়ে দেখার আগে কণ্ঠস্বর শুনেই স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। দেখেছেন — সোমনাথ হাসছে।

'এ কী । সোমনাথ। এই শেষরাত্রে তুমি এখানে কি করে?'

'আমি তো ভেবেছি, আপনারা দশটা এগারোটা নাগাদ চলে আসবেন। আপনার বাড়ির ফোন খারাপ হয়ে আছে। টেনশনে বাড়ির সকলেই —

' তা বলে এরকম কান্ড করতে হবে। সারারাত এইভাবে.....আমি তো ভাবতেই পারছি না। চলো চলো, দেখি আমার কাগজপত্তর গুলো জমা করতে পারি কিনা ।'

সমীর চক্রবর্তী এই সময় কাছে এসে সোমনাথকে বলে, 'আরে আপনি চলে এসেছেন। এদিকে

তো আমাদের টিমের সেকেন্ড,থার্ড, ফোর্থ তিনজন পোলিং কেটে পড়েছে ।' তারপর সত্যসুন্দরের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনি সব গুছিয়ে নিয়েছেন তো স্যার? চলুন জমা দিয়ে আসি।'

'কোথাও একটু বসতে হবে ভাই। আপনার লিখে রাখা তিনটে কাগজের জায়গায় দুটো তো আছে দেখছি। ' উদ্বেগ জড়িয়ে থাকে সত্যসুন্দরের কথায়।

'নার্ভাস হবেন না, স্যার। সোমনাথ আশ্বাসের গলায় বলে,' একটা চেয়ার এনে দিচ্ছি। বসে একটা একটা করে কাগজগুলো বার করে দেখুন, পেয়ে যাবেন। আর কিছু কপি করার থাকলে দিন আমাকে, আপনি সই করে দেবেন।'

সমীর চক্রবর্তীর স্বরে অস্বস্তি চাপা থাকে না, ' আমি কিন্তু স্যার আর সত্যিই দাঁড়াতে পারছি না।'

' আমি কি পারছি? কথাটা বলতে গিয়েই বললেন না সত্যসুন্দর। কেননা তাঁর পোলিং টিমে এই ভদ্রলোকটিই সবচেয়ে পরিশ্রমী এবং এখনো পর্যন্ত জমা দেওয়ার জন্যে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, মনুষ্যত্বের জয় পতাকা টাঙিয়ে দিয়ে কেটে পড়েননি।

ওদের পাশ দিয়ে মেডিকেল টিম অসুস্থ প্রিসাইডিং অফিসারকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হল। মাইকে এখন ঘোষণা হচ্ছে কোনো একজন প্রিসাইডিং অফিসার নাকি জমা না দিয়েই টিমের হেপাজতে সব ফেলে রেখে চলে গেছেন। এই অবস্থায় ..... সত্যসুন্দরের পুরোটা শোনা হ'ল না।

এই সুপার স্পেশাল ডটপেন সাপ্লাই দিয়েছে যে তার সত্যি কোনো জবাব নেই। এতো খেলো মানের কোনো কিছু কেউ তৈরী করতে পারে ভাবা যায় না। ইলেকশন মেটিরিয়ালের সঙ্গে দেওয়া পাঁচটি ডটের অন্তিম উদাহরণটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ফার্স্ট পোলিং। আগের দিন এই ডটপেনগুলোর প্রথমটা নিয়ে লিখতে গিয়েই হালদার গজগজ করেছিলেন, 'সাধে কি বলি, এদেশ থেকে মনুষ্যত্ব ব্যাপারটাই উধাও হয়ে গেছে? ভাবুন, বছর বছর এই ইলেকশন উৎসবে সাপ্লায়াররা কত টাকা কামায়।

বিডিও অফিস চত্বরে ঢুকলেই বিরাট প্যান্ডেল, ঘনঘন মাইকের ঘোষণা, হাজারো মানুষের ব্যস্ততা সবকিছু মিলিয়ে নির্বাচনী মোচ্ছবের বড়সড় ব্যাপারখানা বোঝা যায়। তিন প্রহর পেরিয়ে ফিরে, ফর্ম লিখে নির্দিষ্ট খামে ভরতে ভরতে কখন যে অন্ধকার গালিয়ে আলোর আভাস ঢেলে দিয়েছে আকাশ মুখ তুলে দেখার অবকাশ হয়নি সত্যসুন্দরের। দুব্যাগ কাগজের মধ্য থেকে একটা একটা করে, হিসেব লেখা তিন নম্বর কাগজটি খুজে পাওয়ার পর, তিনজনেই এক নাগাড়ে লিখে গেছেন শুধু।

সেগুলো নিয়ে নির্দিষ্ট কাউন্টারে জমা দিতে গিয়ে ফার্স্ট পোলিং-এর সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে গেল কাউন্টারে বসা বয়স্ক কেরানি ভদ্রলোকের। খয়েরি ফ্রেমের চশমা, রোগা, ধুতিপাঞ্জাবি পরা সিনিয়র এই ক্লার্কটির সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে কেটে পড়া হালদারের সঙ্গে। গলার আওয়াজ?

কাঠের তক্তার টেবিলের ওপর ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারে বসে বলে যাচ্ছেন বয়স্ক ক্লার্কটি, এটার আরো দুকপি লাগবে, ওই ফর্মটা একটা গালা সিল খামে ঢোকান আর একটা এমনি আটা দিয়ে মুখ আটা খামে দিন। এই ফর্মের লেখাটা ঠিক মত নতুন করে লিখে আনুন। সব কিছু একটার মধ্যে লিখে দিলে হবে কেন? এ চলবে না। আলাদা আলাদা করে সিলড্ আনসিলড্

কভারে পুরে প্রত্যেকটি কভারে প্রিসাইডিংয়ের পুরো সিগনেচার লাগবে। পোলিং স্টেশনের নাম্বার দেওয়া স্ট্যাম্প মারতে হবে প্রতিটি ফর্মে এবং খামের ওপর, নইলে, রিসিভ করতে পারবো না।'

কালো, মাঝারি উচ্চতার, দোহারা গড়ন সমীর চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর ভারি না হলেও বেশ পরিশীলিত। অনুরোধের গলায় বলেন ফার্স্ট পোলিং 'দাদা, নিয়ে নিন। দুরাত ঘুম নেই আমাদের। হিসেবে কোন ভুল নেই — আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

রিসিভিং ক্লার্ক আবার গলা তুলে বলেন, ' আরে মশাই অতগুলো খাম আর ফর্ম দেওয়া হয়েছিল কি এমনি এমনি? চিবনোর জন্য?'

শোনা মাত্র রাগে ফেটে পড়ার অবস্থা ফার্স্ট পোলিংয়ের।

'এই মশাই, ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখুন।' সমীর চক্রবর্তী চিৎকার করে ওঠেন।

' আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো না। প্রিসাইডিংয়ের সঙ্গে কথা বলবো।' খ্যাক খ্যাক গলায় উষ্মা প্রকাশ করেন বয়স্ক লোকটি। সত্যসুন্দর বলেন, 'উনি তো আমার কথাটাই বলেছেন। আমার টিমের ফার্স্ট পোলিং উনি।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সমীর চক্রবর্তী বলে চলেছেন বয়স্ক কেরানিকে, 'নিজে তো খাসা মুখটি মেরে এসে এখানে ডিউটি দেখাচ্ছেন, যারা আটচল্লিশটা ঘন্টা এই জগদ্দল পাথর ঘাড়ে বয়েছে তাদের শারীরিক, মানসিক অবস্থা কোথায় এসে পৌঁছেছে তা ভাবার মতো হিউম্যানিটিটুকু থাকবে না আপনাদের! আবার যদি ওইভাবে চিবোবার জন্যে উচ্চারণ করেন—'

'তো করবেনটা কি? মারবেন নাকি?'

এরমধ্যে ফার্স্ট পোলিংয়ের পরিচিত একজন বিডিও অফিসার ছুটে এসে ক্ষুব্ধ সমীর চক্রবর্তীকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেন 'আপনি শান্ত হোন। আপনাদেরটা নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

দূর থেকে গন্ডগোল দেখে সোমনাথও ছুটে আসে। সমীর চক্রবর্তী তখনো রাগে কাঁপতে, কাঁপতে পাশের কাউন্টারে বসা মাঝবয়সী মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করছে, 'ওই অমানুষটি থাকে কোথায়? কোন এলাকা থেকে আসে।'

'ছেড়ে দিন দাদা ছেড়ে দিন', ফার্স্ট পোলিংকে শান্ত করার চেষ্টা করে বিডিও অফিসের আরো কয়েকজন কর্মী এসে। প্যান্ডেলের বাইরে গিয়ে তারা কথা বলে সমীর চক্রবর্তীর সঙ্গে। ততক্ষণে চারিপাশ ফর্সা হয়ে গেছে।

অল্পপরেই সত্যসুন্দরের কাছে এসে সমীর চক্রবর্তী জানান, 'আমি স্যার আর ওই অভদ্রলোকটির কাছে যাবো না। ওই একই টেবিলে অল্পবয়েস একজন বিডিও কর্মী আছেন আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। উনি বলেছেন সব জমা করে নেবেন। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আমি চলে গেলাম।'

ফার্স্ট পোলিং চলে যাচ্ছেন দেখে ফিফথ পোলিং ছুটে এলেন। কোঁকিয়ে প্রায় কেঁদে ওঠার মতো করে বললেন, আর আমাদের ধরে রাখবেন না স্যার। যাদবপুর যেতে হবে তো।' সমীর চক্রবর্তী চলে গেলেন।

ফিফথ পোলিং বলে যাচ্ছেন, 'আমাকেও মাফ করুন স্যার। আপনার তো স্যার ছোট ভাই

এসেছেন।'

সত্যসুন্দর ফিফ্‌থ পোলিংয়ের হাই পাওয়ারের চশমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমার ছোটো ভাই তো আমাদের টিমের হিসাবের মধ্যে পড়ছে না।' একটু থেমে আবার বলেন, 'থাক আপনাকে আর আটকাবো না। কিন্তু হোমগার্ডদুজন আমাদের মালপত্তর সমেত গেল কোথায়? এনাউন্স করান পিপলিপাড়া পোলিং স্টেশনের হোমগার্ডদের খুজছেন প্রিসাইডিং অফিসার।'

আশ্চর্য। ফাঁকা তিনটে ব্যালট বক্স, তিনটে হ্যারিকেন, ছালা তিনটে, মোম, গালা, প্যাড এ সমস্ত নিয়ে লোকগুলো গেল কোথায়?

'হোমগার্ড দুজন আপনার থেকে রিলিজ লিখিয়ে না নিলে তো যেতে পারবে না'। ফিফ্‌থ পোলিং বলে।

সত্যসুন্দর মনে মনে বলেন, আমি তো জানতাম নিয়মটা বাকিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কিন্তু মুখে কিছু বলেন না। হোমগার্ডদের খুঁজতে খুঁজতে বুঝতে পারেন, তার দেহ আর দিচ্ছে না। সোমনাথ তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়। অসহায় সত্যসুন্দর ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে প্যান্ডেলের যতটুকু দেখা যায় দেখতে থাকেন।

বিশাল প্যান্ডেলটার নিচে জায়গায় জায়গায় চট বিছিয়ে নিয়ে বসে পড়েছে বিভিন্ন পোলিং টিম। হিসেব মেলাচ্ছে। মোমবাতি জ্বালিয়ে গালা সিল করছে। কাছেই এক টিমের প্রবীণ এক ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোককে বলতে শোনা গেল, 'তিরিশ বছর হেডমাস্টারি করার পর আজ বিডিও ক্লার্কদের কাছে আমার statutory কথার মানে শিখতে হবে? দিস্তে দিস্তে কভারে ফর্ম পুরে গালা সিল মেরে আমায় দেশের কাজ করতে হবে, কেন তিরিশ বছর ধরে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে পড়িয়ে কি শুধু বিদেশীদের কাজ করেছি? কম্প্যুটার এই মিডিয়াভেল সিস্টেমের কোনো মানে হয়? ফালতু কিছু জটিলতা পাকিয়ে সহজ ব্যাপারটাকে কঠিন করার মানে কি? কোনো সিভিলাইজড দেশের কোনো ওয়েল এডুকেটেড সিটিজেনকে এই ধরনের একটা অবনক্‌াস সিস্টেমে পেঁচিয়ে ফেলা তো একধরনের ক্রাইম।'

দাঁড়িয়ে সত্যসুন্দর চুপচাপ শুনে গেলেন। তাঁর মাথা ঘুরতে শুরু করছে। বুকের এক দিকটা ব্যথা ব্যথা করছে। তার জন্যেও কি একটু পরে মেডিকেল টিমকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটতে হবে? কিন্তু ভেতরে ভেতরে শরীর যতই খারাপ হোক, এই মুহূর্তে তিনি সোমনাথকে কিছুই বলতে চান না। এ ছেলেকে একবারটি বললে আর রক্ষে আছে?

আজ ষোল সতের বছর ধরে দেখে আসছেন সত্যসুন্দর, সোমনাথ ছেলেটা সত্যিই অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। একই পাড়ার বাসিন্দা। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছিল ওরা। সত্যসুন্দর অবসর সময়ে কয়েকবার সোমনাথকে পড়িয়ে ছিলেন। এ রকম বিনা পারিশ্রমিকে আরো কত ছাত্র ছাত্রীকেই তো তিনি দেখিয়ে এসেছেন জীবনভর।

সত্যসুন্দরের গলা শুকিয়ে আসছে। পা দুটো কি টলছে? সোমনাথ এখন তরুণ বিডিও কর্মীটির কাছ থেকে আলাদা আলাদা ফর্ম চেয়ে নিয়ে, তার পরামর্শ মত লিখতে শুরু করেছে। আরো একবার এনাউন্স করার জন্য সত্যসুন্দর একটু এগিয়ে যেতে গেলেন। একটু এগোতেই দুদিন আগের বৃষ্টিতে কাদা হয়ে থাকা জায়গাটা পেরোতে গিয়ে তাঁর পা হড়কে গেল। কাদার মধ্যে পড়ে গেলেন সত্যসুন্দর। কাউন্টারের কাছ থেকে তা দেখতে পেয়ে সোমনাথ চেঁচিয়ে উঠল।

সোমনাথের সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশ থেকে আরো অনেকে ছুটে এলো। সোমনাথের সঙ্গে ধরাধরি করে তুললো সত্যসুন্দরকে।

'মাথা ঘুরে গেছিল। ?'

' অসুস্থতা বোধ করছেন?'

' মেডিকেল টিম ডাকুন। এ্যাম্বুলেন্স।'

' না না, ভাই আমি ঠিক আছি।' সত্যসুন্দর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ' আমার দুজন হোমগার্ডকে পাচ্ছি না। ব্যালট বক্সগুলো এবং বাকি সব জিনিষ পত্তর সমেত তারা দুজন নিখোঁজ। অনেকক্ষণ ধরে মাইকে তাদের ডাকা হচ্ছে।'

শুনে ভিড়ের ভেতর থেকে সামনে এগিয়ে এসে একজন বলল, 'ঘন্টাখানেক আগে প্যান্ডেলের ওই কোণার দিকটায়, ওই কাপড় দিয়ে ঘেরা ঘরটার মধ্যে দুজন হোমগার্ডকে বেঘোরে নাক ডাকতে দেখেছিলুম। সে দুটো আপনার হোমগার্ড কিনা বলতে পারবো না। দেখুন তো এখনও আছে কিনা।

শোনামাত্র সেই কাদামাখা অবস্থাতেই সোমনাথের সঙ্গে ছুটে গেলেন সত্যসুন্দর। কাপড় ঘেরা ঘরটার মধ্যে ঢুকে দেখলেন, হ্যাঁ, তারই হোমগার্ড দুটো ঘুমে কাদা হয়ে আছে। দেখে একই সঙ্গে খুশিতে, রাগে, বিরক্তিতে এবং অবসাদে জেরবার হয়ে সত্যসুন্দর ঘুমন্ত হোমগার্ড দুজনের মাথা ঝাঁকিয়ে দিলেন ঝুঁকে পড়ে।

এই দুজনের মধ্যে একজন সত্যসুন্দরের কাছে একটা হ্যারিকেন নেওয়ার জন্য ঘ্যানর ঘ্যানর করছে। অন্যজন বলছে, চট একখানা অন্তত তাকে দিতেই হবে। সত্যসুন্দর দুজনকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, 'আরে, আমি এসব দেওয়ার মালিক নাকি? যা যা ওরা দিয়েছে প্রত্যেকটি জিনিষ ফেরৎ নেওয়ার সময় গুনে গুনে নেবে।'

এখন ধড়মড়িয়ে উঠে দুজনেই খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ওদের জন্য ফিফ্‌থ পোলিং-এর ছাড়া পেতে দেরি হওয়ায় তিনি দুজনকে গায়ের ঝাল মিটিয়ে বকাঝকা করে চলে গেলেন। তক্ষুনি হোমগার্ডের দুজনের একজন বলল, ' স্যার আমরা কোথায় থাকি জানেন? ঘর আমাদের সুন্দরবনের বাদায়। আমাদের এখন ছেড়ে দিলেও ঘরে যেতে রাত হয়ে যাবে। আর আমাদের আটকাবেন না। যে জায়গায় এগুলো ফেরৎ নেবে বলে দ্যান, আমরা সেখানে ভালো মতো থুয়ে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে সবাই চলে গেল যখন, তোমাদের আর ধরে রাখি কেন?' বলে সত্যসুন্দর দুজনের রিলিজ লিখে দিলেন।'

চলে যাওয়ার আগে একজন হোমগার্ড জিজ্ঞাসা করে, ' হালদারবাবু আর গোস্বামীবাবু ঘুরে আর আসেনি?'

সত্যসুন্দরবাবু সাধারণত এ সব ক্ষেত্রে মন্তব্য করেন না, কিন্তু এই মুহূর্তে তার মুখে এসে গেল, ' এতো তাড়তাড়ি ফিরবেন কি করে ভাই। দুজনে মনুষ্যত্ব খুজে বেড়াচ্ছেন তো!'

এরপর সত্যসুন্দর টিউবওয়েলের জলে তার পাঞ্জাবিতে লাগা কাদা ধুয়ে ফেলেন। হাতে পায়ে ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট কাউন্টারে ফেরেন। হোমগার্ডেরা ব্যালট বাক্সের মধ্যে সব জিনিষ ঢুকিয়ে রেখে দিয়ে চলে গেছে।

সত্যসুন্দর এগিয়ে যেতে তরুণ বিডিও কর্মীটি বলে, 'স্যার আপনি বরং বিশ্রাম নিন। উনি সব লিখে নিচ্ছেন, আপনি শেষে সই করে দেবেন।'

সোমনাথ লিখে চলে। সত্যসুন্দর একটা ব্যালট বক্সের ওপর বসে থাকেন। এক ঘন্টা পর কয়েক ডজন সই করতে হয় তাঁকে। এরপর তরুণ বিডিও কর্মীটি যখন প্রাপ্তি স্বীকারের কাগজটি সই করে দিচ্ছে, সোমনাথ বলল, ' এখন একটা গঙ্গাস্নান হলে ভালো হয়।'
অল্পবয়েসী সরকারী কর্মীটি হেসে বলে,' এরপর শুধু ওই ব্যালটবক্স, হ্যারিকেন, চট এইসব জমা। ওগুলোর জন্যে একেবারে ওপাশে মানে ডানদিকে গিয়ে একেবারে শেষ কাউন্টারে জমা দেওয়া, ব্যস্। তাহলেই সব চুকে গেল।'
' আ্যাঁ'? চম্‌কে ওঠে সোমনাথ, তার মানে আর এক রাউন্ড লড়াই? আৎকে ওঠেন সত্যসুন্দরও।
'না না ভয়পাওয়ার কিছু নেই। গেলেই হয়ে যাবে।'
তিনটে বাক্স সোমনাথই টেনে নিয়ে যায়। হ্যারিকেন তিনটে নিতে গিয়ে সত্যসুন্দর দেখেন একটা কম। তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালা খুলে দেখেন বস্তাগুলো গুনতিতে তিনটে আছে কিনা। দেখেন একটি মাত্র আছে, দুটি কম।
বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে সত্যসুন্দর বলেন, 'রক্ষীরা নিজেরাই নিজেদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে।'

সোমনাথ হেসে বলে, 'হ্যাঁরিকেন ছাড়া ওদেরই বা চলবে কি করে বলুন। এরাও নিশ্চয়ই ঐ যে বললেন মনুষ্যত্ব খুঁজছে। বাদা অঞ্চলে হ্যারিকেনের আলো ছাড়া খুঁজবে কি করে?'
এবারে কাউন্টারের কর্মী ভদ্রলোককে সরাসরি কবুল করেন সত্যসুন্দর, 'মশাই, আমার দশজনের পোলিং টিমে এখন আমি হারাধনের একটি মাত্র ছেলে। সব কেটে পড়েছে। হোমগার্ডও দুজন রিলিজ নেওয়ার ফাঁকে একটি হ্যারিকেন এবং দুটি চট সরিয়ে নিয়েছে।'
'ঠিক আছে — যা আছে জমা দিন। আমি লিখে দিচ্ছি।'
এবার যেন বড্ড সহজে পার পাওয়া গেল বলে মনে হল সত্যসুন্দরের। হেসে ফেললেন।
বিডিও অফিস থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে খবরের কাগজের হেডিংগুলো চোখে পড়ল। চাঘাইএ পাকিস্থান পরমাণু বোমা ফাটিয়েছে পাঁচটা। অস্ত্র প্রতিযোগিতার খবরে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি।
স্টেশনের কাছে কোনো একটি তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণ বিরোধী সংস্থা মাইক নিয়ে পথসভা শুরু করে দিয়েছে। দাপটের গলায় একটি মেয়ে বলে যাচ্ছে, 'একটা পরমাণু বোমা তৈরী করতে খরচ এক হাজার কোটি টাকার বেশি। ভারতবর্ষ সেই পরমাণু বোমা ফাটিয়েছে কদিন আগে। কোন্ ভারতবর্ষ?
যে ভারতবর্ষ বিশ্বে তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়ে বসে আছে।
শিশুশ্রমিক, কুষ্ঠ রোগী আর যক্ষ্মারোগীর সংখ্যাধিক্যে ভারত তিন তিনখানা ওআর্ল্ডকাপ মাথায় নিয়ে নাচছে। চার কোটি চল্লিশ লক্ষ শিশু শ্রমিক, চৌদ্দ কোটি টিবি রুগী, চার কোটি কুষ্ঠ রোগী। এই ভারতবর্ষ এখন উরু চাপড়াচ্ছে। 'আও।'
ছিপছিপে গঠন মাঝারি উচ্চতার কালো রঙের মেয়েটির গলায় জোয়ারি বড় ভালো লাগে সত্যসুন্দরের।

কলকাতার গাড়ি ছাড়তে খুব বেশি দেরি নেই।
দুজনের বসার জায়গাও পাওয়া গেল। গাড়িতে উঠেই আরো একবার পিপলিপাড়া প্রাইমারি

স্কুল বাড়িটার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, ভোট দেওয়ার জন্য বিরাট লাইনটা। ' ভারতবর্ষ কোন দিকে যাচ্ছে?' বাতাসে ভাসছে জোয়াড়িদানার নারী কণ্ঠ। সত্যসুন্দর ভাবলেন, পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ওই শয়ে শয়ে ভোটারের ভূমিকা কতটুকু।
'দুদিনের কাজ নষ্ট হ'ল তো? কাল সন্ধ্যে থেকে খাওয়াও হয়নি? সোমনাথের দিকে মুখ ফেরালেন সত্যসুন্দর।
'আপনি তো পুরো না খেয়ে আছেন।'
'না চমক খেয়েছি বারবার।' বলে হাসলেন। অন্যদিকে চেয়ে।
'মনুষ্যত্বের হিসেব মেলাতে গিয়ে? ও হিসেব আর মিলবে না স্যার। মানুষের সম্পদ থেকে ওটা পুরোপুরি খোয়া গেছে এখন আর ছিটেফোঁটাও নেই।'
'কে বলল নেই'? প্রশ্ন করে সত্যসুন্দরপ্রাক্তন ছাত্রের দিকে তাকালেন।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

সুখবাসী

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

— ভগবান, ভগবান, হেই ভগবান —

— কোতগাঁওয়ের রুক্ষ, টাঁড় মাঠে ক্ষেতে তখন ভোরের কুসুম কুসুম আলো সবে ছুঁয়ে যাচ্ছে একটু করে। জগদীশ প্রধান তাঁর দশাসই চেহারা নিয়ে উঠে পড়েছেন অনেক আগেই। ইতিমধ্যে স্নান সারা। পরনের ধবধবে ধুতি থেকে কোঁচার একটা অংশ খুলে জড়িয়েছেন খালি গায়ে। তাঁর দৃষ্টি নাটমন্দিরের দিকে। তাঁর বিশাল অট্টালিকা-সংলগ্ন এই নাটমন্দিরে ভোরে পুজো করা তাঁর নৈমিত্তিক অভ্যাস। নাটমন্দিরের বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে পুনর্বার চেঁচালেন, হেই ভগবান, তোর কানেরে কি পোকা পড়িচি?

জগদীশ প্রধানের হাতে একটা কমণ্ডলু। তাতে পরিষ্কার জল কানায় কানায়। সেই জলে হাতের আঁজলা ভরে নিলেন আচমন করবেন বলে। পরক্ষণে কী মনে পড়তে এবার খিঁচিয়ে উঠলেন, হেই ভগবান —

দ্বিতীয় ডাকটাই কানে গিয়েছিল ভগবানের। খড় কাঁটার কাজ যেমন-কে-তেমন ফেলে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল নাটমন্দিরের সিঁড়ির কাছে, হুজুর —

— কেঁউটি থিলু এ পর্যন্ত? ডাকি ডাকি গলার নলি যে ছিন্তি গলানি।

— হুজুর, ছন কাটুথিলি গোয়ালরে সামনারে।

— কাল রাতিরে যে কহিথিলি সকালে নাটমন্দিরে সামনারে গোবরপানি দিলি। দেইচু?

ভোরে উঠেই যে নাটমন্দিরের সামনে গোবরের ছড়া ছিটিয়ে উঠোনটা লেপা পোঁছার কথা ছিল, তা খড় কাটতে বসে মনে মনে ভাবছিল ভগবান, কিন্তু খড়ের পরিমাণ এত যে, ভোররাত থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত শেষ করে উঠতে পারেনি। মুখ আমসি করে বলল, নাই হুজুর, ছন কাটি গরুকু খাইবাকু দেই এইলে আসিবি।

— ওগোনারে ঝাড়ু দেইচু?

উঠোনে ঝাঁট দেওয়াও হয়নি মনে পড়তে ভয়ে কাঁপতে লাগল ভগবান।

— নাই হুজুর। এইলে পরিষ্কারঅ করিবি।

— পাঁচিরি বাহারে বড় বড় ঘাস হইছি। সাপ পোকর বাসা বাঁধিব। তরে যে কেতে দিন বারবার কহুচি পরিষ্কার করিবাকু। করিছু?

পাঁচিলের বাইরে বড় বড় ঘাসগুলো পরিষ্কার করার কথাও মনে আছে ভগবানের। কিন্তু সারাদিন এত এত কাজ থাকে তার, সেগুলো সেরে ও-কাজটাও করা হয়নি এ ক'দিনে।

— নাই হুজুর। আমি পরিষ্কার করি দেবি।

— শড়া, তাহল সারাদিবস কঅন করিছু?

— হুজুর, সারাদিবস তো কাম করে।

— তোর স্ত্রী কোঁয়ারে গলা?

— জঙ্গলা, গোহাড় পরিষ্কার করুচি, হুজুর।

— বেলা সাতটা বাজিলা। এইলে গোহাড় ধোয়া হেলানি?

— হুজুর, তিনিটা গোহাড়। যণ্ড গাই মিলি তেইশটা। কাম বহুৎ হুজুর।

—শড়া, মোর তেইশটা গরু। তাতে তোর আঁখিত হিংসা হউচি?

— না হুজুর, কহুছি কাম বহুৎ।

— তোর স্ত্রীকে কহিবু, সব গরুকু আজি যেমিতি ভাল করে চান করি দেবু।

— কহিবি, হুজুর।

— তোর পুঅ কোয়াড়ে গলা? বড় লোকের পুঅ বিছনারে শোয়ি শোয়ি রহিছু নাকি এতে বেলা পর্যন্ত?

ভগবানের ছেলে যে বিছানায় শুয়ে নেই তা জানিয়ে বলল, কেলে গাই এবং তার বাছুর নিয়ে মাঠে বান্ধি বাকু যাইছে।

ভগবানের বউ জঙ্গলা যে তিনটে গোয়ালের তেইশটা বলদ আর গাই নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, তার ছেলে কেলে গরু আর তার বাছুর নিয়ে মাঠে বাঁধতে গেছে, ভগবান নিজে যে পাহাড় প্রমাণ খড় কাটতে ব্যস্ত, তা জেনেও জগদীশ প্রধানের আঁখিতে রক্তবর্ণের তেজ এক বিন্দু কমল না। তেমনই কর্কশ কণ্ঠে বললেন, ঘরকাম শেষ হেলে কেঁদুপাতি গাঁয়ের জমিরে যিবু। বড় বড় ঘাস হইছি জমিরে। একটা একটা করে বঞ্জিবু যেমিতি ঘাস না রহিব জমিরে।

— বঞ্জিব, হুজুর।

— সন্ধের সময় যায়ি যেমিতি দেখিলি জমিরে গোটে ঘাস নাহি। বুঝিলু?

জগদীশ প্রধান যেন সন্ধের সময় গিয়ে দেখেন জমিতে একটাও ঘাস নেই এই প্রস্তাবে ভগবানও কেঁপে উঠল। তিনবিঘে জমিতে ঘাস বাছা কি তার কয়েক ঘন্টার কাজ! সে কথা বলতেই —

— ছেলেটারে নিয়ে যিবু সঙ্গে। রেণ্ডির বেটা বসি বসি খায়ি কুমড়ো ভড়িয়া মোটা হেই যাউছু। জমির কাম শিখ।

— নিয়ে যিবি, হুজুর।

— কোর্ট থিরু ফেরিবা রাত হেই পারে। মু না ফেরিবা পর্যন্ত জমিরে রহিবু।

— হুজুর, রাতিরে তো জমিরে আলো নাহি। ঘাস কেমিতি বঞ্জিবি?

— কাঁহিকি, এইটা তো শুক্লপক্ষ। সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিবি আকাশে।

ভগবান তখন হাঁ করে তাকিয়ে আছে মালিকের দিকে। মালিকের চোখ তখন ন্যস্ত হয়েছে নাটমন্দিরের চাতালের দিকে। না কি তাঁর দৃষ্টি নাটমন্দিরের ভেতর বিগ্রহের দিকে!

কেমন একধরনের তন্দ্রা নেমে আসছে ধীরে, তন্দ্রা, না কি ভক্তি, তা ভগবানের বোঝার অগম্য। হাতের কমণ্ডলু হয়তো খসে পড়বে এমন মনে হয় ভগবানের। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে আবার ফিরে যাচ্ছিল গোয়ালের দিকে। তার খড় কাটার কাজ এখনও অনেক বাকি। রোজ সকালে এই পাহাড় প্রমাণ খড় তাকে কাটতে হয়।

সেভাবেই আবার বসেছে বঁটি নিয়ে। সেসময় মালিকের গলা, ভগবান, হেই ভগবান, শড়া আবার কোহারে গলু—

ভগবান বঁটি ফেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে দাঁড়ায় নাটমন্দিরের সামনে। মালিকের চোখে তখন ভক্তির রং মুছে আবার রক্তবর্ণ, তোরে না কহুছি নাটমন্দিরের চাতাল ধুয়ি দবাকু, মু পুজারে বসিবি।

— এইলে দউছি, হুজুর।

— শড়া দেরি কাঁহিকি ? কোর্টে যাবি মু। এইলে সব চাতাল ধুয়ি দবু। মু পুজারে বসিবি। মামলার রায় বেরুবি আজি। তোর ত জমিজমা নাহি। তু কী বুঝিবু ? তোর ঘরবাড়ি নাহি, জমিজমা নাহি, কোর্টে দৌড়ো দৌড়ি নাহি। শড়া, তু কী যে আরামে রহু মোর বাড়িরে। তোর যা সুখ, তা মোর নাহি।

খড়-কাটার কাজ মুলতবি রেখে ভগবান তখনই পড়ি কি মরি করে দুটো বড় বড় বালতি নিয়ে এল কুয়োর কাছে। কপিকলে বালতি টাঙিয়ে হুড়হুড় করে নামিয়ে দিল বহু নীচে, যেখানে উঁকি মারছে জলস্তর। জগদীশ্ প্রধান এই কোতগাঁও গ্রামের নামী ও মানী লোক। তাঁর বিশাল অট্টালিকার দৈত্যসম চেহারা যেমন দূর থেকে চোখে পড়ে সাতটা গাঁয়ের মানুষের, তেমনই তাঁর নাটমন্দিরের চূড়াও। নাটমন্দিরের চাতালটাও অতিপ্রশস্ত। কমণ্ডলু- হাতে অপেক্ষমান মালিকের রক্তচক্ষুর সামনে অত বড় চাতাল ধুয়ে মুছে তককে করতে রোদ অনেকখানি খর হয়ে ওঠে। সেই রোদের তাতে, মালিকের কর্কশ কণ্ঠের ঝাঁঝে ভাজা-ভাজা হতে হতে সুখবাসী ভগবান তখন সুখের মহিমা উপলব্ধি করছে প্রতিমুহূর্তে।

২

'বিকল্প' নামে বেসরকারি সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মাল্যবান যখন নুয়াপাড়া জেলার ভোদেন ব্লকে কাজ করতে এসেছিল আজ থেকে একমাস আগে, সে সময় ভাবতেও পারেনি দারিদ্র্য কতখানি সর্বগ্রাসী হতে পারে। জায়গাটা আগে কালাহাণ্ডির অন্তর্গত ছিল, কিছুকাল আগে কালাহাণ্ডি তার অতিদারিদ্র্যের কল্যাণে বিশ্বখ্যাত হওয়ায় জেলার একটা অংশ ভেঙে নুয়াপাড়ার উৎপত্তি। নুয়াপাড়ার দরিদ্রতম বাসিন্দাদের ওপর যাতে আলাদাভাবে নজর দেওয়া যায় সে কারণেই এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাতে ফলের ফল কিছু হয়নি, দরিদ্র মানুষকে কতভাবে হেনস্থা হতে হয় তা প্রতিদিনই উপলব্ধি করতে পারছে এখানে কাজ করতে এসে।

এইতো গতকালই গিয়েছিল কেঁদুপাতি গাঁয়ের কয়েকটি গরীব পরিবারকে নিয়ে সমীক্ষা করতে। সারাদিনে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল তাদের। কাছাকাছি কোনোও ভাল দোকানপাট নেই যে মুড়ি কিনেও দুপুরের লাঞ্চ সেরে নেবে। খুব ভাগ্য যে, মাল্যবান সকালে তাদের আস্তানা থেকে বেরুবার সময় কাছের দোকান থেকে একপাউন্ড রুটি কিনে ভরে নিয়েছিল কাঁধের ঝোলা ব্যাগটায়। সে ছাড়াও সঙ্গে ছিল দিশারী, বিদ্যুৎ, পিয়ালি আর সোমক। পাঁচজনে সেই রুটির টুকরো খেয়ে কোনওরকমে রেহাই পেয়েছে উপবাসের হাত থেকে। 'বিকল্প'-এর ফিল্ড - ডিরেকটর অর্জুন পট্টনায়ক অবশ্য সারাক্ষণই ওদের কানে মন্ত্রের মতো আউড়ে চলেছেন সতর্কবাণী, শোনো, সবসময় জল ক্যারি করবে সঙ্গে। তা ছাড়া ব্রেড অ্যান্ড বাটার ব্যাগে রাখতে ভুলবে না। মুড়িও রেখে দিতে পারো দরকার মতো।

বিদ্যুৎ তো মাঝেমধ্যে বিদ্রোহ করছে, ধুর, ধুর পাউরুটি খেয়ে খেয়ে তো পেটে চড়া পড়ে গেল, মাল্যবানদা।

প্রথমে কিছুদিন নুয়াপাড়া টাউনে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কাটিয়েছে ওরা— ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার থেকে গেজেটিয়ার ঘেঁটে তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করতে। তখন হোটেলে খেত, দু'বেলাই মাড়োয়ারিদের হোটেলটায় মোটামুটি চলনসই খাওয়া দাওয়া। কিন্তু তারপর অর্জুন পট্টনায়ক ওদের তিনটে গ্রুপ করে পাঠিয়ে দিলেন তিনটে ব্লক এরিয়ায়, যথাক্রমে সিনাপালি, খড়িয়ার ও ভোদেন-এ। তার মধ্যে ভোদেন হল জেলা কর্তৃপক্ষের হিসেবে দরিদ্রতম এলাকা। গেজেটিয়ার

দেখে মাল্যবান বলল, বি.পি. এল-এর সংখ্যাতত্ত্ব যা অ্যালার্মিং ভাবা যায় না।

বি.পি. এল অর্থাৎ বিলো পভার্টি লাইন। দরিদ্ররেখা নামক সেই অদৃশ্য সুতোটির নীচে যাদের অবস্থান তাদের দেখেশুনে দিশারীদের আঁতকে ওঠার মতো অবস্থা। তারা কি পারবে এই অনগ্রসর, অচ্ছুত, দরিদ্র মানুষগুলোর দিকে কোনওভাবে বাড়িয়ে দিতে সাহায্যের হাত!

কাল বিকেলে এরকমই কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে কথোপকথন সেরে তাদের ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছিল। আকাশে একফালি চাঁদ কাস্তের মতো শোভা পাচ্ছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত শানের অভাবে আলো বিচ্ছুরণ করতে ব্যর্থই হচ্ছিল বলা যায়। অচেনা পথঘাট, কোথাও শক্ত পাথুরে রাস্তা, কোথাও মোরাম। হোঁচট খাওয়ার খুবই চান্স। সে সব বাধাবন্ধ এড়িয়ে কোনওক্রমে পৌঁছতে চাইল বড় রাস্তায়, হঠাৎ আটকে পড়ল কেঁদুপাতি গাঁয়ের লোকালয় পেরিয়ে ক্ষেতিজমির কাছে আসতেই। এক বালকের পরিত্রাহি চিৎকার শুনে গোটা টিম দাঁড়িয়ে পড়ে পথের ওপর। যে দৃশ্য দেখল সামনের ক্ষেতিজমির আলে তা অতি ভয়াবহ। আলের ওপর বালকটি পড়ে আছে উপুড় হয়ে, আর একজন বিপুলচেহারার ধবধবে ধুতি-শার্ট পরা ভদ্রলোক হাতের ছাতার বাঁট দিয়ে পিটোচ্ছেন যথেচ্ছভাবে। পাশে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে একটি মাঝবয়সী গরীবগুর্বো মানুষ। সে এতই ভীত সন্ত্রস্ত যে, বাচ্চাটাকে মারের হাত থেকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই।

মাল্যবান প্রায় ছুঁটে গিয়ে দাঁড়াল দৃশ্যটির কাছে, রুখে উঠে বলল, এভাবে মারছেন কেন ছেলেটাকে!

ধুতি-শার্ট পরা লোকটির চেহারা দেখেই বোঝা যায় বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের। বহুজমির মালিকদের চেহারা যেরকম হয় আর কি। হাতের সুখ মিটিয়ে প্রহারের এহেন আরামদায়ক কর্মটিকে এভাবে বাধা দিতে পারে কেউ, তা লোকটির ভাবনার বাইরে। কর্কশকণ্ঠে জমিদার স্টাইলে বললেন, কঅন তুমঅ?

মাল্যবান গত একমাসে ওড়িয়াভাষার সঙ্গে কিছুটা রপ্ত হয়েছে। ওড়িয়ায় কথা বলতে তেমন না পারলেও শুনে বুঝতে পারে আজকাল। বাংলার সঙ্গে ওড়িয়ার সাদৃশ্যও যথেষ্ট। বলল, যেই হই না কেন, এভাবে আর কিছুক্ষণ মারলে ছেলেটা মারা যাবে নিশ্চিত।

আলের ওপর শুয়ে বালকটি তখনও গোঙাচ্ছে অসহায় হয়ে। পিঠের দু-তিন জায়গায় ছিঁড়ে-কেটে ছড়ে রক্তাক্ত। সেদিকে দৃষ্টি ফেলেও লোকটি দু'চোখ কঠিনতর করে বললেন, তুমঅ যাও। মোরঅ চাকরঅ আছে। মু মারিবে।

মাল্যবান আশ্চর্য হয়ে দেখছিল লোকটির ভীষণদর্শন মূর্তি। তার প্রহারে বাধা পড়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে হয়তো মাল্যবানকেই দু-চার ঘা দেবেন ছাতার বাঁট দিয়ে। মাল্যবানও চোখ লাল করার চেষ্টা করে। না আপনার চাকর বলে আপনি তাকে মেরে ফেলতে পারেন না। দরকার হলে আমরা পুলিশে খবর দেব।

লোকটি তাতে নরম হল না, তেমনই ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, পুলুশঅ মোরঅ চাকরঅ আছে।

বলে কী হল কে জানে, ছাতা কাঁধে তুলে হন হন করে রওনা দিল যেদিকে, সেদিকেই কোতগাঁও গ্রাম। মাল্যবানরাও ওদিকে একটা আধভাঙা পাকা বাড়ি ভাড়া করে আছে। লোকটাকে তারা এর আগে দেখেনি। কোতগাঁওয়ে কয়েকঘর জমিদার গোছের লোক আছে, তাদের প্রতাপ ও দৌরাত্ম অনুভব করতে পারছে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা চালানোর সময়।

এখন তাদেরই একজন প্রতিভূকে দেখে দাঁতে দাঁত ঘষটালো মাল্যবান।

ততক্ষণে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দিশারী, বিদ্যুৎ , পিয়ালি আর সোমক। লোকটি চলে যেতেই বালকটিকে মাটি থেকে তুলে বসাল কোনওক্রমে। ভয়ে আতঙ্কে, আঘাতে প্রায় সংজ্ঞাহীন ছেলেটাকে কিছুক্ষণের শুশ্রূষায় চাঙ্গা করে তুলল।

মাঝবয়সী গরীব লোকটা তখনও তার মালিকের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বিড় বিড় করছে, মার্জনা চাইছু, হুজুর। আর কভু হইব না।

মাল্যবান তার সম্বিত ফিরিয়ে বলল, ও তোমার ছেলে? ও কী অপরাধ করেছে যে তোমার মালিক এত মারল!

— মালিক ঘাস বঞ্ছিবাকু কহিথিলা। ত মোর পুঅ —

এগারবছরের একটি বালক সারাদিন মাঠে ঘাস বাছার পর সন্ধে হতেই ক্ষেতিজমি থেকে উঠে উবু হয়ে বসেছিল আলের ওপর। তখনও তার বাবা অন্ধকারে হাঁচড় পাঁচড় করে খুঁজে চলেছে ছোট ছোট ঘাসের শিকড়। সে-দৃশ্য দেখতে দেখতে হয়তো একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল ক্লান্ত বালকটির চোখে। প্রথমে মালিকের তর্জনগর্জন শুনে তার ঘুম ভাঙে। কিছু ভাল করে বোঝার আগেই অনুভব করল মালিকের ছাতার বাঁট তার পিঠে উৎসব শুরু করেছে, শড়া, বড়লোকের পুঅ বসি বসি খালি মোটা হেই যাইছু —

কিন্তু এ-গল্পের চেয়েও যা মাল্যবান- দিশারীদের চমকে দিল তা মাঝবয়সী লোকটার চাকর হওয়ার কাহিনী।

৩

— কী নাম তোমার?

— ভগবান, ভগবান সুমানী। মু হরিজন আছু।

— যিনি মারছিলেন ছাতার বাঁট দিয়ে তিনি কে?

— মোর মালিক অছে বাবু।

— তুমি ওঁর বাড়িতে কাজ করো?

— মুরা সুখবাসী অছি।

—সুখবাসী! সুখবাসী আবার কী! এই তো বললে, তুমি হরিজন।

হরিজন আর সুখবাসীর পার্থক্য বুঝতে কিছুটা সময় লাগল মাল্যবানদের। 'বন্ডেড লেবার' এই টার্মিনোলজির সঙ্গে তারা বহুকাল যাবৎ পরিচিত। গত একমাসে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেশ অনেকগুলো 'বন্ডেড-লেবার' পরিবারকে সনাক্ত করেছে ওরা। কিন্তু সুখবাসী শব্দটা তাদের অভিধানে এই প্রথম। কালাহাণ্ডি এলাকায় বন্ডেড লেবারদের দেশজ নাম সুখবাসী। নামটা দিয়েছে অবশ্য মালিক শ্রেণীই। মালিকের বাড়িতে জন্মজন্মান্তরের মতো সুখে কালাতিপাত করে তারা তাই সুখবাসী। জমিজমা নেই, ঘরবাড়ি নেই, ফলে চাষবাসের টেনশন নেই, ঘর মেরামতের ভাবনা নেই, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চনচন করে ঘুরে বেড়াতে হয় না এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে, মালিকের বাড়িতেই সপরিবারে জন্মজন্মান্তরের জন্য নিশ্চিন্তে অন্ন বরাদ্দ। এর চেয়ে সুখ গাঁয়ের একজন ভূমিহীন মানুষ আর কোথায় পাবে!

মাল্যবানরা তখন হিমচোখে তাকিয়ে দেখছে, ভগবান সুমানীর অপর্যাপ্ত সুখ তার এগার বছরের বালকের শরীর বেয়ে রক্ত হয়ে নামছে ক্রমাগত। দিশারীর হাতব্যাগে ফার্স্ট এইডের

কিছু সরঞ্জাম থাকে সবসময়, তা দিয়ে ভগবানের ছেলে পবনের ক্ষত বেঁধে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল, তুমি, তোমার বউ, ছেলে— সবাই মালিকের বাড়িতে থাক?

ভগবান ঘাড় নাড়ে, হাঁ।

— কিন্তু জন্মজন্মান্তরের জন্য এভাবে তোমরা সুখবাসী হলেই বা কীভাবে?

সে-কাহিনীও আর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা মাল্যবানদের কাছে। ভগবান সুমানীর বাবা বিয়ে করার সময় কন্যাপণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে হাত পেতেছিল জগদীশ প্রধানের বাবার কাছে। জগদীশ প্রধানরা ভোদেন এলাকায় সাতপুরুষের জমিদার। তাদের কাছ থেকে দুটো গরু আর সাতশো টাকা ধার নিয়ে কন্যাপণ মেটান ভগবান সুমানীর বাবা, কিন্তু শোধ করতে পারেনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। গরীব ও বৌ মানুষদের সুখবাসী করে তোলার এটাই জমিদারী প্রক্রিয়া। ভগবান সুমানী তার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই জেনে গিয়েছিল তার ভবিতব্য, ঠিক যেমন তার ছেলে পবন সুমানীও জেনে যাচ্ছে তার ভবিষ্যত-জীবনের রূপরেখা। ভগবান সুমানী আজও জানেনা, তার বাবার কর্জ নেওয়া দুটো গরুর দাম আর সাতশো টাকা এই দীর্ঘকালে সুদে-আসলে বেড়ে কত লক্ষ বা কত কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এখন। যত টাকাই হোক, সেটা ভগবান সুমানীর ভেবে কোনও লাভ নেই, কারণ জন্মাবধি সে কখনও একটি সিকি কিংবা আধুলিও ছুঁয়ে দেখেনি। জন্ম থেকেই তারা জেনে গেছে, মালিকের বাড়ির গোয়াল-ঘরের পাশে একটা ঝুপড়িই তাদের বাসস্থান, মালিকের হুকুমমতো সপরিবারে উদয়াস্ত খাটাখাটুনিই তাদের বরাতে বরাদ্দ। খাটুনির বিনিময়ে তারা মালিকের বাড়িতে দুটো খেতে পায়। যা আহার্য পায়, তার কয়েকগুণ বেশি খায় পিটুনি। কখনও বাক্যের পিটুনি, কখনও যষ্ঠির।

কালাহাণ্ডি এলাকার দারিদ্র্যের চেহারা এ ভাবেই এক একদিন এক একভাবে উন্মোচিত হচ্ছে 'বিকল্প'-এর তরুণ কর্মীদের সামনে। তাদের সংস্থা থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এতদঞ্চলের গরীব মানুষদের দারিদ্র্যের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করে তাদের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে সাহায্যের হাত, বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের সহায়তা দিয়ে যদি কিছু গরীব মানুষের জীবনেও বইয়ে দিতে পারে সুখের বাতাস, তাহলেও বর্তে যাবে তাদের সংস্থা। তবে দারিদ্র্য যে-এলাকায় সমুদ্রের মতো বিশাল ও অতলান্ত, সেখানে মাল্যবান-দিশারীরা তো দিশাহীন বোধ করবেই। ক'টা পরিবারকেই বা আর তারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলতে পারবে!

ভগবান সুমানীর এহেন কাহিনী তাদের মন আর্দ্র করে তোলে। আলপথের ওপর তখন রাত নেমে এসেছে আস্তে আস্তে। ঘরে ফেরার পথে মাল্যবান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় তাদের জীর্ণ, থ্যাঁতলানো জীবনচরিতের কিছু কিছু অংশ। সবশেষে বলল, কাল বিকেলে একবার আমাদের অফিসে এসো তো ভগবান। দেখি তোমাদের বেঁচে থাকার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় কি না।

৩

— তোর পুঅর লাগি ডাক্তার লাগিবাকু ?

জগদীশ প্রধানের দশাসই চেহারাটার সামনে দাঁড়ালে ভগবান সুমানীর শরীরে একটা কাঁপ লাগে। কাল সারাদিন বিছানায় শুয়ে থেকেছে পবন, কয়েকবার চেষ্টা করেও তাকে উঠে বসানো যায়নি। শুনে জগদীশ প্রধান তাদের ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ছেলের

খবরাখবর নিতে। ভগবান কাঁপতে কাঁপতে ঘাড় নাড়ে, নাহি, মালিক।

— শড়া, বড়লোকের পুঅ শোয়ি অছে কাঁহিকা?

কাল সারাদিন কাজে যায়নি পবন, এ কথা বোধহয় মালিকের কানে গেছে কোনওক্রমে। ভোরবেলায় খালি গায়ে একটা কাপড়ের খুঁট জড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ভগবানের ছেলে পবনের খোঁজ নিতে এসে ঝুপড়ির পাশে ঘন ঘন থুতু ছিটোচ্ছেন আর বলছেন, পুঅরে কহি দে উঠিবাকু। বিছানারে শোয়ি রহিছু কাঁহিকা?

অত:পর জগদীশ প্রধান কিছুক্ষণ একনাগাড় বক্তৃতা দিয়ে ভগবান সুমানী ও তার বউ-ছেলে সারাদিন কী কী কাজ করবে তার ফিরিস্তি বর্ণনা করলেন একে একে। চোখ রক্তবর্ণ করে এও বললেন, এখন ভগবান পুত্র পবনের জন্য নুয়াপাড়া থেকে ডাক্তার ডেকে আনতে হবে, না কি আর একবার ছাতা পেটা করলে সে উঠে বসবে বিছানায়। সে-কথা শুনেই ভগবান পবনকে বিছানা থেকে হড় হড় করে টেনে নামিয়ে হাত জোড় করে মালিককে বলল, এইলে কামে যিবি মোরঅ পুঅ।

যে-ছেলে বিছানায় উঠে বসতে পারছে না , সে কী করে কাজে যাবে তা ভগবান জানে না। কিন্তু পাছে আবার জগদীশ প্রধান তার পিঠে ছাতার বাঁট ভাঙেন, তাই পবনকে নিজেই ধমক দিয়ে বলল মাঠে কাজ করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে, পবন ঝুপড়ির বাইরে বেরুতেই তার পিঠে , হাতে, ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে জগদীশ প্রধান চমকে উঠে বলেন, ডাক্তার দেখাইছু?

— নাই , মালিক।

ডাক্তার দেখায়নি অথচ তার শরীরে ব্যান্ডেজ কোত্থেকে এল তা জানাতেই ভগবান বলল, বাবুরা ওষুধ দেইছি।

জগদীশ প্রধান প্রথমে বুঝতে পারলেন না কোন বাবুদের কথা বলছে ভগবান। একটু পরে অনুমান করতেই তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত খেলে গেল বিজলির আলো, কী কইথু!

শুধু ব্যান্ডেজই বেঁধে দেয়নি বাবুরা। গতকাল সন্ধোবেলা যখন তার মালিক গাঁয়ের বাইরে গিয়েছিলেন, ভগবান খানিকটা ভয়ে-ভয়ে গিয়েছিল ' বিকল্প'-এর অফিসে। সেখানে তাকে বা তার পরিবারকে নিয়ে যে একটা জবরদস্ত সভা হয়েছে, তা চেপে গিয়ে হঠাৎ বলল, বাবুরা কইছি, মোর পুঅরে পড়ালিখা শিখিবাকু।

জগদীশ প্রধান চোখ বিস্ফারিত করে দ্বিতীয় বার ' কী কইথু' বলতেই বেশ ঘাবড়ে গেল ভগবান। ততক্ষণে তার মালিক নিজেকে সামলে নিয়ে হা হা করে বেশ জবরদস্ত একচোট হেসে বললেন, এ ত জবরঅ খবরঅ অছি। তোর পুঅ পড়া লিখা শিখিবাকু চাকরি করিবাকু, বাহ্, বাহ্,—

বলে আবার একচোট হাসি।

ভগবান তাতেও না থেমে আবার বলল, বাবুরা কইথি, মোর নামে খাসজমি দেবে।

— খাসজমি! শুনে কিছুক্ষণ বাকরহিত হয়ে গেলেন জগদীশ প্রধান। গত পরশু একটা বড় মামলায় ডাহা হেরে যত না স্তম্ভিত হয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময় ভগবানের কথায়। কিছুক্ষণ পরে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, তাহলে, তু বড়লোক হইবু? মোর বাড়ি কাম করিবুনি? হ্যাঁ?

ভগবান তখনও বুঝে উঠতে পারছে না এহেন ভয়ঙ্কর খবরে তার মালিকের কী প্রতিক্রিয়া

হতে পারে। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে মালিকের চোখের ঘূর্ণির দিকে।

মালিক রাগে ঝাঁঝরা হতে হতে বললেন, তোর বাবুরা কি তোরঅ বাবা অছি? তাহলে তোরঅ যে ঋণ অছি তা তোরঅ বাবাকে দিবাকু কহি দে?

৪

কালাহাণ্ডির এই মাইল-মাইল হত দরিদ্র এলাকায় সমাজসেবার কাজ করতে এসেও যে পায়ে পায়ে ধাক্কা খেতে হবে তা ধারণায় ছিল না মাল্যবান বা দিশারীর। সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছে পঁয়ষট্টির খরায় মাত্র পঞ্চাশটাকা ধার নিয়েছিল গোবর্ধন সুমানীর বাবা। সেই ধার সুদে আসলে বেড়ে এমন আকাশচুম্বী হয়ে দাঁড়াল যে, গোবর্ধন তার শেষ সম্বল তিনবিঘে জমি বিক্রি করেও শুধতে পারেনি আজও। কারও আবার জমি নেই, তারা ধানরোয়ার সিজনে দু'মণ ধান কর্জ নিল তো ধান ওঠার পর তার সম্বচ্ছরের মজুরি হিসেব করে ছ'মণ ধানের দাম আদায় করে নেয় দাদনদার। তাতে বাকি বছর তার পরিবারকে আবার নির্ভর করতে হয় দাদনদারের মর্জির ওপর। সমীক্ষা করতে গিয়ে তারা আরও দেখেছে, এ সব এলাকার বহু লোক এলাকায় কাজ না পেয়ে চলে যাচ্ছে অন্য এলাকায়। এমন কী কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে চলে যাচ্ছে তিনশো - চারশো কিলোমিটার দূরে —কখনও বিশাখাপত্তনম কিংবা রায়পুর বা দুর্গের দিকেও।

ভগবান সুমানীকে নিয়ে মাল্যবান তার দলের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করছে কয়েকদিন ধরে। এখানকার দাদনদার কিংবা জমিদারদের ঋণের সুদ খুব চড়া। ভগবান সুমানীর বাবা যে ঋণ নিয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর আগে, তা এই দীর্ঘসময়ে সুদে-আসলে কত হতে পারে তা সরকারি আইন মোতাবেক যা হওয়া উচিত, তার একটা হিসেব বহু অঙ্ক কষে বার করেছে বিদ্যুৎ। দিশারী কষেছে আর একটা অঙ্ক। ভগবান সুমানীর বাবার আমল থেকে সপরিবারে বেগার খেটে আজ পর্যন্ত যত টাকা তাদের মজুরি পাওয়া উচিত, তার থেকে তাদের ভরণপোষণের খরচ বিয়োগ করলে যে টাকা হয়, তা ভগবান সুমানীর প্রাপ্য। হিসেব করে দেখা গেল সেই প্রাপ্য টাকায় জগদীশ প্রধানের ঋণ শোধ হয়েও হাজার সাতেক টাকা থাকবে ভগবান সুমানীর। তার সঙ্গে দু-চার বিঘে খাসজমি যদি তার নামে পাট্টা করে দেওয়া যায়, তাহলে তার পরিবারকে অনাহারে পড়তে হয় না।

কাজটা কঠিন, খুবই কঠিন — তা মাল্যবানরা বুঝতে পারছে প্রতিদিন, এলাকার বি.ডি. ও.-র সঙ্গে এ ব্যাপারে তারা কথা বলতে গেলে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, জমির ব্যাপারে সরপঞ্চের মতামত নিতে হবে। সরপঞ্চ মানে এলাকার পঞ্চায়েত। সেখানে যারা কর্মকর্তা তাদের একজন বিদ্যা তেওয়ারি। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, চোখদুটো অসম্ভব ধূর্ত, মুখে বসন্তের কয়েকটা দাগ, নাকের নীচে পুরু গোঁফ। ' বিকল্প' নামে যে -সংস্থাটি তাদের এলাকায় দারিদ্র্যদূরীকরণের ইচ্ছে নিয়ে এসেছে, সেই যুবক-যুবতীদের যে সরপঞ্চের লোকেরা মোটেই ভাল চোখে দেখছে না তা উপলব্ধি করা যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। বিদ্যা তেওয়ারির সঙ্গে মাল্যবানের যে দীর্ঘ কথোপকথন হয় তা এরকম:

মাল্যবান: আপনারা নিশ্চয়ই চান না যে, এখানকার সাধারণ মানুষ ঋণে জর্জরিত হয়ে থাকুক বা বেগার খাটুক লোকের বাড়িতে।

বিদ্যা: না, একদম না।

মাল্যবান: তাহলে যে সব বন্ডেড লেবার এই এলাকায় আছে, তারা ঋণ মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করুক, সে-ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনারা একমত হবেন।

বিদ্যা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই।

মাল্যবান : (উৎসাহিত হয়ে) সেক্ষেত্রে এদের বাঁচার একমাত্র উপায় হল যারা এ-ধরনের পরিবার, তাদের নামে কিছু কিছু খাসজমির পাট্টা দেওয়া।

বিদ্যা: (হেসে) সে তো আমরা প্রতিবছরই দিচ্ছি।

মাল্যবান : (আরও উৎসাহিত হয়ে) তাহলে আমরা একটা তালিকা করেছি, সেই তালিকাভুক্ত পরিবারগুলোর নামে কিছু খাসজমি দিতে হবে সরপঞ্চকে।

বিদ্যা :(তালিকাটা দেখতে দেখতে) ভগবান সুমানী! এই নামে কোনও লোক কোঁতগাঁওয়ে বাস করে নাকি!

মাল্যবান: হ্যাঁ। জগদীশ প্রধানের বাড়িতে থাকে।

বিদ্যা (ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করে) ও ওতো সুখবাসী আছে।

মাল্যবান: তাহলে আপনি ওকে জানেন দেখছি। আমাদের তালিকায় ওর নামই সবচেয়ে ওপরে। ওর নামে খাসজমি দেওয়ার জন্য আমরা সরপঞ্চের কাছে আরজি জানাচ্ছি।

বিদ্যা: কিন্তু সুখবাসীদের তো জমি দেওয়া যায় না। মালিকের কাছে ওদের যা ঋণ আছে তা শোধ না দেওয়া পর্যন্ত মালিক ওদের ছাড়বেই না।

মাল্যবান: সে ব্যবস্থাও আমরা করেছি।

বিদ্যা: (অবাক হয়ে) সব ঋণ আপনারা শোধ করে দেবেন নাকি ?

মাল্যবান উৎসাহিত হয়ে তাদের খাতায় হিসেব করা দীর্ঘ অঙ্কটি দেখায় সরপঞ্চকে। সে হিসেব কিছুক্ষণ অপলক পরীক্ষা করে একরাশ ধূর্ত হাসি ঢেউ খেলে যায় বিদ্যা তেওয়ারির চোখে মুখে। তারপর বলে, এই এলাকার জমি কি ভগবান সুমানী চাষ করতে পারবে! এখানকার জমিতে মাটি নেই, শুধু পাথর। সে পাথর খুঁড়ে চাষ করতে গেলে ভগবান সুমানীকে আরও তিনবার বিক্রি হতে হবে।

৫

— ভগবান, হেই ভগবান, শড়া কি এইলে দেওতা হোয়ি গইছু?

ভগবান ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয় মালিকের সামনে, হুজুর।

— শড়া , তোরঅ বাবুরা কি জমি দেইছি?

— নাহি হুজুর।

— শড়া, তোরঅ ঋণঅ কি শোধ হউছি?

— নাহি, হুজুর।

— শড়া, তোর পুঅ কি পড়ালিখা শিখি অফ্সার হোয়ি যাউছি ?

— নাহি, হুজুর ।

— তাহালে মোর ঘরে কাম করি বু?

— হাঁ হুজুর।

— তাহালে সারা দিবস রোদে দাঁড়িয়ে থাক। বুঝিছু?

ভগবান হাঁ করে তাকিয়ে থাকে জগদীশ প্রধানের হাসি হাসি মুখখানার দিকে। সে বুঝে

উঠতে পারে না সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে কী কাজ করবে!

৬

সরপঞ্চের অফিসে ডাক পড়েছে জগদীশ প্রধানের। ' বিকল্প'-এর যুবক-যুবতীরা ক'দিন ধরে খুব খেটে খুটে যে-অঙ্ক কষেছে তা নিয়ে আজ জোর আলোচনা হবে সরপঞ্চের সঙ্গে। সরপঞ্চ জানিয়েছে, ভগবান সুমানীর পরিবারকে যদি জগদীশ প্রধানের কাছ থেকে ঋণমুক্ত করতে পারে, তাহলে তারা আড়াই বিঘে জমির ব্যবস্থা করবে। সরপঞ্চকে রাজি করাতে অবশ্য ঘাম বেরিয়ে গিয়েছে ' বিকল্প'-এর। বি.ডি. ও থেকে শুরু করে জেলা কালেক্টর পর্যন্ত ছোটাছুটি করেছে কয়েকদিন। এলাকার এম. এল.এ-র সঙ্গে মিটিং করেছে। এম.এল.এ-ও সরপঞ্চকে লিখেছেন যাতে ভগবান সুমানীর বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে সরপঞ্চ।

জগদীশ প্রধানের প্রভাব এমনই যে তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বেশ সাড়া পড়ে গেল সরপঞ্চের অফিসে। বিদ্যা তেওয়ারি দু'কদম এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন, প্রধান বাবু।

প্রাথমিক পরিচয় পর্ব সারা হলে মাল্যবানই কথা শুরু করে, দেখুন জগদীশবাবু, আমরা শুনেছি যে, ভগবান সুমানীর বাবা আপনাদের কাছ থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন, সে-ঋণ আজও শোধ করতে পারেনি তারা।

জগদীশ প্রধান আগেই জেনে গেছেন কী কারণে তাঁকে ডাকা হয়েছে সরপঞ্চের অফিসে। তাঁর দুই চোখে একধরনের ক্রোধের বিচ্ছুরণ যে উঁকিঝুঁকি মারছে তা তার ঠোঁটের কোণে ঝোলানো এক চিলতে হাসি দিয়েও ঢাকা যাচ্ছেনা। কোনও কথা না বলে, 'নো কমেন্টস' ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন একমুহূর্ত।

— কিন্তু ভগবান সুমানী সপরিবারে বহুবছর ধরে আপনার বাড়িতে বেগার খাটছে সেটাও সত্যি।

— বেগার! জগদীশ প্রধানের গলা থেকে ধমক-মেশানো বিস্ময়।

— হ্যাঁ। তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে কোনও মজুরি নিশ্চয় আপনারা তাদের দেননি?

জগদীশ প্রধান চোখে ঘূর্ণি তুলে বললেন, নেমকহারামটা সেরকমই বলেছে বুঝি আপনাদের?

— সে বলেনি, কিন্তু ঘটনাটা এ-তল্লাটের সবাই জানে।

— কিন্তু রেণ্ডির বেটাকে যে ঘর বানিয়ে দিয়েছি, তাদের সারাদিনের থালাভর ভাত-তরকারি দিয়েছি এত বছর ধরে, বছরকার জামাকাপড় কিনে দিয়েছি, অসুখ হলে ডাক্তার দেখিয়েছি, সেগুলো কি সব মাগনা আসে নাকি, হ্যাঁ?

মাল্যবান তার পকেট থেকে অঙ্কের হিসেবটা বার করে জগদীশ প্রধানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি হিসেবটা একবার দেখুন, যদি আমাদের কোথাও ভুল হয়ে থাকেতাহলে আপনি দেখিয়ে দিলে আমরা শুধরে নেব।

জগদীশ প্রধান বোধহয় একমুহূর্ত তাকালেন লম্বা হিসেব কষা কাগজটার দিকে, তারপর অট্টহাসি হেসে বললেন, রেণ্ডির বেটা কি বলেছে তার বাপ শুধুমাত্র সাতশো টাকা আর দুটো গরু ধার নিয়েছিল!

মাল্যবান আশ্চর্য হয়ে বলল, হ্যাঁ।

এবার তাদের আশ্চর্য চোখের সামনে জগদীশ প্রধান তাঁর পকেট থেকে বার করলেন একটা এক্সাইজ খাতা। সেটা মাল্যবানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এতে সব হিসেব লেখা আছে ভগবানের বাপ ঠিক কত টাকা ধার হিসেবে নিয়েছিল। এই টাকা সুদে আসলে যা হয়েছে সেটা দিয়ে দিলেই ভগবানকে এক লাথি মেরে পাঁচিলের বাইরে বার করে দেব।

মাল্যবান সেই এক্সাইজ খাতাটার পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে তখন দেখছে, প্রতিপৃষ্ঠায় টিপছাপে টিপছাপে ভরা। টিপছাপের ওপর হাজার হাজার টাকার অঙ্ক লেখা যে টাকা কিস্তিতে কিস্তিতে বুঝে নিয়েছে ভগবান সুমানীর বাবা বনোয়ারী প্রধান। সত্যিই নিয়েছিল কি না তা জানার কোনও উপায়ই নেই এখন। সে হিসেব নতুন করে কষতে গেলে ভগবান সুমানীর ঋণ কতটা আকাশচুম্বী হবে তা আর ভাবতে পারলনা 'বিকল্প'-এর যুবক-যুবতীরা।

বুধন ম্যান্ডেলা

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বুধু মানুষ ভাল। তার বৌ মরে গিয়েছে সেই কোন কালে, কত বছর আগে। কিন্তু তখন বয়েস কম থাকা সত্ত্বেও সে চরিত্র খারাপ করেনি। সমবয়সী বন্ধুরা লোভ দেখিয়েছে, শিবনাথের দোকানে রাতের বেলা ঝাঁপ ফেলে মাছ ভাজা আর বেসনের ফুলুরি নিয়ে মালঝালের আড্ডায় বসবার নেমন্তন্ন করেছে, বুধু যায়নি। সেই সময়টা তার নিজের বাড়ির মাটির দাওয়ায় চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে। বাড়িতে ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই, সে একদম একা লোক। একবেলা রান্না করে রাখে, দু বেলা খায়। রান্নাই বা কী, মোটা আউশ চালের লাল ভাত, ডাল আর শাক-লতাপাতার একটা যা হোক তরকারি। তাই ভেসে যায়। মাসে দু একদিন মাছ। একটু বেলা করে সুটরার বাজারতলায় গেলে কমদামে ট্যাংরা খলসে বা পুঁটি পাওয়া যায়। সেদিন কড়া ঝাল দিয়ে রান্না মাছের ঝোল মেখে মহাভোজ!

আজ সকাল থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি। গ্রামের রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা। বেশ ঠান্ডা জোলো বাতাস দিচ্ছে। এমন দিনে বেশিক্ষণ খাটতে ভাল লাগে না। দুপুরের পর রিক্সা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে বুধু, ওই যে উঠোনের গাবতলায় ভেড়ানো রয়েছে রিক্সাখানা। বেশি খাটলে বেশি পয়সা। বেশি পয়সা দিয়ে কী করবে সে? তিনকুলে পুড়িয়ে খেতে কেউ নেই। তার চেয়ে দাওয়ায় বসে মৌজ করা ভাল। বর্তমানে সে তাই করছে।

বড্ড ভাল রিক্সাখানা তার। হোক সিটের ঢাকনা ছেঁড়া, না হয় পেছনের দুটো চাকাই গ্যাটিস্ মারা, চলতে গেলে ল্যাগব্যাগ করে, হর্নটা ফুটো, বাজাতে গেলে কাশির মত ফ্যাসফেসে আওয়াজ বের হয়। তবু গাড়িটা তাকে 'ভাতে জলে' রেখেছে। সোনা গাড়ি, লক্ষ্মী গাড়ি।

নদীর ওপার থেকে ঘন কালো আর একখানা মেঘ এসে আকাশে যেটুকু আলো ছিল মুছে নিল। ঘরের পেছনে বর্ষার জমা জলে জাঁওকো জাঁওকো করে কোলাব্যাঙের দল ডাকছে। বৃষ্টিটা সামান্য বাড়ল মনে হচ্ছে, খড়ের চালে জলের ফোঁটা পড়ার সুন্দর শব্দ। ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যেই জোনাকি জ্বলছে গাবতলায়, শশার মাচার নিচে। এমন আকাশ অন্ধকার করা বর্ষার দিনে বেশ লাগে বুধুর। মনের মধ্যে কী একটা কথা যেন কেমন ওপরের দিকে ভেসে উঠতে চায়, কিন্তু পুরোটা ওঠেনা, কারণ বুধু জানেনা কী করে ভাবতে হয়, কী করে মনের ভাবকে রূপ দিতে হয়। তাই ভরা বর্ষায় বুধু একা বসে গাবতলায় জোনাকি দেখে আর ক্রমশ আরো একা হয়ে যায়।

ট্যাংরার বিলের ওপার দিয়ে সাতটার গাড়ি যাবার আওয়াজ পাওয়া গেল। খুব ক্ষীণ, তবু শোনা যায়। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। দাওয়ার একপাশেই রান্না করে বুধু। দুটো মেটে হাঁড়ি, একখানা কড়া, একটা পেতলের ঘটি, লোহার খুন্তি — এইসব হচ্ছে রান্নার সরঞ্জাম। কিছু শুকনো কাঠ জড়ো করা আছে উনুনের পাশে। দিনের কাজ সেরে ফেরবার সময় রাস্তার পাশে, ঝোপের মধ্যে যেখানে যা কাঠ লতাপাতা চোখে পড়ে তা সব বুধু কুড়িয়ে রিক্সায় তুলে নেয়। কয়লা কেনার সামর্থ তার নেই। যা দাম! রান্নার জায়গা থেকে কলাই করা থালা আর এলুমিনিয়ামের গ্লাসখানা নিয়ে এসে দাওয়ায় রাখল বুধু। ঘরের মধ্যে এককোণে ভাতের হাঁড়ি আর দুটো বাটিতে ডাল আর তরকারি ঢাকা দেওয়া। খাট নেই বুধুর, মাটিতে

কয়েক আঁটি খড় বিছিয়ে তার ওপর চট পেতে তোফা বিছানা বানিয়েছে সে। দড়ি দিয়ে ঝোলানো একখানা আড়বাঁশে ছেঁড়া লুঙ্গি, ফুটো গেঞ্জি, শতছিন্ন গামছা ইত্যাদি ঝুলছে। বাঁশের বেড়ার দেয়ালে মজুমদার বিল্ডার্স কোম্পানীর লক্ষ্মী ঠাকুরের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার। বাজারে রায়চৌধুরীদের দোকানঘর বানানোর সময় প্রায় একমাস ধরে মজুমদার বিল্ডার্স থেকে সিমেন্টের বস্তা বয়ে দিয়েছিল বুধু। ফলে নববর্ষের সময় বুধুকে ডেকে মালিক রবি মজুমদার ক্যালেন্ডারখানা তার হাতে দিয়ে বলেছিল — 'নে বুধু, দেয়ালে টাঙিয়ে রাখিস।' বুধু লেখাপড়া জানেনা, কাজেই তারিখও দেখতে পারে না, কিন্তু রোজ কাজে বেরোবার সময় সে ছবিটাকে প্রণাম করে। ছবিটা ভারি সুন্দর। মা লক্ষ্মীর চেয়ে তাঁর বাহনটি বুধুর বেশি পছন্দ। একেবারে যেন জ্যান্ত, হাততালি দিলে উড়ে পালাবে। তার ঘরে চোরের নেবার মত কিছুই নেই , তবু কাজে যাওয়ার সময় বুধু দরজায় শেকল তুলে তাতে একটা সস্তা তালা লাগিয়ে যায়। নইলে কুকুর-মেকুরে ঢুকে রান্না করে রাখা রাতের খাওয়া লন্ডভন্ড করে ফেলবে।

দাওয়ায় বসে কেরোসিনের লম্ফ জ্বালিয়ে হাঁড়ি থেকে এনামেলের থালায় ভাত বেড়ে নিল বুধু, কলসি থেকে গ্লাসে গড়িয়ে আনল জল। ও বেলার রান্না করা কাঁঠালবিচি দিয়ে অড়রের ডাল আছে, আর আছে তনতনে কাটোয়ার ডাঁটার তরকারি। বড়বড় কয়েকটা গ্রাস খেয়ে উঠোনের দিকে তাকায় বুধু। বৃষ্টি একটু ধরে যাওয়ায় গাবতলায় জোনাকিরা আবার ফিরে এসেছে। তার বৌও যদি এমন ফিরে আসত! এখনো চোখের সামনে বৌয়ের চেহারা স্পষ্ট ভেসে ওঠে। রোগা, কালোকালো মানুষ, সামনের দাঁত একটু উঁচু, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবার মত মেয়েমানুষ নয়। কিন্তু বড্ড হাসিমুখ বৌ ছিল তার। কত অভাব-অনটনে কেটেছে, ভাল কোনো জিনিস হাতে করে কিনে দিতে পারেনি, কিন্তু বৌ কখনো মুখ ভার করেনি, সবসময় হেসেছে। এমনি বর্ষার রাতে দুজনে দাওয়ায় বসে খেতে খেতে হাসিগল্প করত, আজকের মতই লম্ফর আলো কাঁপত জোলো বাতাসে, মল্লিকদের বাঁশঝাড় থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসত। মাঝেমাঝে একটু যে মন কেমন করেনা এমন নয়, কতদিন আর একা একা বাঁচতে ভাল লাগে মানুষের?

খাওয়া হয়ে যায়। থালা-গ্লাস ধুয়ে ঘরের ভেতরে রেখে আবার বারান্দায় এসে বসে বুধু। একটা বিড়ি ধরিয়ে প্রথম আরামের টানটা দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বলে — আঃ!

বাড়ির সামনের আলপথ দিয়ে যাচ্ছে পূবপাড়ার হারাধন, ঘরামির কাজ করে। বুধু হেঁকে বলল — কে রে? হারু নাকি?

— হ্যাঁ বুধুদা। অন্ধকারে বসে যে?

— এই খেয়ে উঠলাম। আলোয় আর কী হবে? আয়, বোস। একটা বিড়ি খেয়ে যা। কোথায় গিয়েছিলি?

— উঠোন পেরিয়ে এসে দাওয়ায় উঠে বসল হারাধন, বুধুর কাছ থেকে বিড়ি নিয়ে নিজের লাইটার দিয়ে ধরাল, বলল — কলকাতা গিয়েছিলাম গো। এই তো সন্ধের টেরেনে ফিরলাম —

— হঠাৎ কলকাতা? সেখানে কী?

বিড়িতে জমাট টান দিয়ে হারাধন বলল — ও বাব্বাঃ! তুমি তো দেখছি কিছু খবরই রাখোনা। কলকাতায় আজ বিরাট কান্ড হল। গ্রামের আদ্ধেক লোক তো আজ কলকাতায় গিয়েছিল, লরীতে, টেরেনে। তুমি সাতে-পাঁচে থাকো না বলে তোমাকে ডাকে নি —

বুধুর মনে হল এরকম আবছা কী যেন সে শুনেছিল। বিলেত থেকে কে একজন বড় মানুষ আসবে, তার জন্য সভা। সে বলল — হ্যাঁ, শুনেছি বলে মনে হচ্ছে, সেই কে একজন সাহেব আসবে তো?

— আসবে কী গো? এসে চলেও গেল। সাহেব নয়, আমাদেরই মত কালো — আরো বেশি কালো। নামজাদা মানুষ, জেল খেটেছে।

বুধু একটু অবাক হল। সাহেব নয়? কালো মানুষ? বিলেতে কি কালো মানুষ থাকে নাকি? কালো মানুষের জন্য সভা হয়? গ্রাম-গঞ্জ থেকে বাস আর লরী বোঝাই করে লোক যায়? সে বলল — কে লোক রে হারু? কী করেছে সে?

— জেল খেটেছে।

— কেন?

— সাহেবদের হাত থেকে দেশ স্বাধীন করবার জন্য। কত কাজ করেছে।

বুধু এসব খবর কিছুই জানে না। কলকাতা যাবার কথা তাকে কেউ বলেও নি, জানালেও হয়ত সে যেতে পারত না। গ্রামে একটাই রিক্সা, তার এই ভাঙাচোরা নড়বড়ে গাড়িখানা। একদিন সে না থাকলে কত লোকের কত কাজ আটকে যাবে। আর সে-ই বা খাবে কী? দিনের রোজগার, দিনের খাওয়া।

হারাধন আজ এক চমৎকার দেখে এসেছে কলকাতায়, জমিয়ে তার বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছে গ্রামে পড়ে থাকা প্রতিবেশীকে।

— সে যা দেখলাম বুধুদা! উঃ রে লোক! লোকের সুমুদ্দুর। পথঘাট সব আটকে গেল, গাড়িঘোড়া বন্ধ। আরে, মানুষই গলবার জায়গা নেই তা গাড়ি চলবে কোথা দিয়ে? খুব কাছে যেতে পারিনি অবিশ্যি, তবে বেশ ভাল করেই দেখতে পেয়েছি। লম্বা চেহারা, কালো রঙ, কোঁকড়া চুল আর হাসি-হাসি মুখ। বড় বড় সব নেতারা কত ভাল কথা বললেন। দেশের লোকের জন্য অনেক করেছে লোকটা। মার খেয়েছে, জেল খেটেছে। এখন দেশ স্বাধীন।

— কী নাম রে হারু মানুষটার?

হারাধন বিপদে পড়ে। নামটা সে আজ বহুবার উচ্চারিত হতে শুনেছে, কিন্তু জিভে ঠিকঠাক আসে না। সে বলল — ম্যানেলা — ম্যালেন্ডা। না, না, মনে পড়েছে, দাঁড়াও — ম্যান্ডেলা। ঠিক, ম্যান্ডেলা।

আবার বলে — কী খাতির দেখলাম বুধুদা! গাড়ি থেকে নেমে যেখান দিয়ে হেঁটে গিয়ে মাচায় উঠল, সেটুকু রাস্তা লাল কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। কত লোক কত কী দেচ্ছে, ফুল ছুঁড়ছে। বড্ড ভারি লোক —

তারপর বলে — এঃ, বিষ্টি আবার চেপে আসছে। বাড়ি যাই বুধুদা। দাও, আর একটা বিড়ি দাও, খেতে খেতে যাই। যত বিষ্টি আমাদের গাঁয়ে, কলকাতা আজ খটখটে শুকনো। গেলে না বুধুদা, একটা দারুণ জিনিস ফসকালে—

বিড়ি ধরিয়ে হারাধন রওনা দেয় বাড়ির দিকে।

হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বিমর্ষ হয়ে বুধু বসে থাকে। আহা, এত বড় একজন লোককে সে দেখতে পেল না। সে সাতে-পাঁচে থাকে না বলে কেউ তাকে কোথাও ডাকে না। তবে খবর পেলেও যাওয়া হত না ঠিকই। আজ সারাদিন তার খুব খাটনি গিয়েছে। সকালে ইস্টিশনের স্ট্যান্ডে টাকা দশেকের ভাড়া খাটবার পরেই রতন পরামাণিক এসে হাজির। মুখচোখের কাঁদো

কাঁদো ভাব। সে বলল — এই যে বুধুদা, তোমাকে পেয়ে গিয়েছি। এক্ষুণি চল আমার সঙ্গে, আমার বড় বিপদ —

'— কেন, কী হয়েছে রে?

— আমার বৌটা মরে যাবে বুধুদা। শেষরাত থেকে বাচ্চা হবার ব্যথা উঠেছে। আন্নাকালী দাইকে ডেকে এনেছিলাম। সে বলল অবস্থা ভাল নয়, মাথার আগে পা আসছে, বাচ্চা ঘোরেনি পেটের মধ্যে। তার কম্ম নয়। শুনে দৌড়োলাম হেলথ সেন্টারে। সেখানকার ডাক্তারবাবু ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছে, ফিরবে পরশু। ততদিন কি আমার বৌ বাচ্চা পেটে নিয়ে বসে থাকবে নাকি? তুমি চল, তোমার গাড়ি করে বৌকে আমি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাব —

বুধু অবাক হয়ে বলল — তুই কি পাগল? এই আট কিলোমিটার রাস্তা, তাই নিয়ে যাওয়া যায় কখনো? খানা ডোবা গর্ত কাদা, পথেই কিছু একটা হয়ে যাবে —

— হয় হোক। তুমি চল তো। ভ্যানে শুইয়ে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু আজ চুয়াডাঙার হাট, সব ভ্যান মাল নিয়ে সেখানে গিয়েছে। যা হয় হবে, চল —

কীভাবে যে রতনের বৌকে সে পৌঁছে দিয়েছে শহরের হাসপাতালে তা সে-ই জানে। পাড়ার কেউ আসেনি সঙ্গে, মানুষের দুঃখ-কষ্টে আজকাল আর কেউ এগিয়ে আসে না। রতনই বৌকে জাপটে ধরে ছিল। বৌটা ছটফট করছে, একটু বাদে বাদে চেঁচিয়ে উঠছে পাগলের মত। পোয়াতি রুগী নিয়ে যাওয়া, রাস্তা বেহাল, হ্যান্ডেল আর সিট ধরে সাবধানে হেঁটে গিয়েছে বুধু। যাক, শহরের হাসপাতালে বাচ্চাটা ভালয় ভালয় হয়ে গিয়েছে। রতন তাকে পঁচিশটা টাকা দিতে চেয়েছিল, সে নেয়নি। বলেছিল — এখন রেখে দে, এখন তোর টাকা দরকার হবে। পরে দিস্।

আরো কত কী করেছে। নিবারণের মেয়ের বিয়েতে জামাই এনে দিয়েছে, লোকের ধান-চাল বয়ে দিয়েছে — এমনি সব। আর দেখ লোকে কত বড় বড় কাজ করে, দেশের জন্য লড়াই করে, জেল খাটে। তাদের জন্য সভা হয়। লাল কার্পেট পেতে দেয়।

কিন্তু মুশকিল হল, যতবারই বুধু ভাববার চেষ্টা করল সে একজন অতি অকিঞ্চিৎকর মানুষ, জীবনে তার কিছুই করা হল না, ততবারই তার মনের ভেতর থেকে কে যেন বলতে লাগল — কিছুই কি না? কিছুই কি না?

গাবতলায় ফিরেছে জোনাকিরা। খড়ের চালে অবিশ্রাম বৃষ্টিপাতের শব্দ। তারই মধ্যে দাওয়ায় বসে নিজের জীবনের সার্থকতা বিষয়ে বিষম গোলযোগপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগল বোকা বুধু।

নক্ষত্র

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূতনাথ চৌকি ডায়মন্ডহারবারে সূর্যগ্রহণ দেখতে যাচ্ছে।

দেখার মানুষ নয় ভূতনাথ, সে কর্মের লোক, তার জীবিকা প্যান্ডেল করা। তার লোকজন কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে সারা বছরই বাঁশ পুঁতে চলে। ভূতনাথের 'বি' আর চৌকির 'সি' নিয়ে 'বি-সি' চিহ্নিত বাঁশের পর তিরপল নামে। বাঁশের সঙ্গে বাঁশ জুড়তে জুড়তে এক সময় প্যান্ডেলের কঙ্কাল তৈরি হয়ে যায়। তখন হাড় ঢাকতে তিরপল নামে। তারপর রঙের কাপড় — শ্রাদ্ধের সাদা, বিয়ের হলুদ, জন্মদিনের মেরুন, বামপন্থীদের লাল, জাতীয়তাবাদীদের সবুজ, অবতারদের গেরুয়া। সবশেষে তারা নামে — মাতৃহীন ভাগ্যহীন অজয়-অমর-অনিতা, ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী, বিপুল-পিউ, সুকুমার-সুলেখা, সুজয়-সোমা। শ্রাদ্ধ-বিয়ের মাঝে কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং রাজ্যে নারী-লাঞ্ছনা প্রসঙ্গ ওঠে। তখন মাইক্রোফোনের স্বরে প্রতিবাদের উষ্ণতা। তারা চলে গেলে ভূতনাথের চৌকির ওপর ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথিরা — সৌরভ রায়, অমল ব্যানার্জী, শৈলেন গোস্বামী। কত হিরো - হিরোইনও উঠেছে ভূতনাথের চৌকিতে। বাকি বলতে দু-জনা — মিঠুন ভট্টাচার্য আর হেমা ঠাকুর। কিন্তু তাদের আসার আশা নাই।

ভূতনাথ চৌকির পার্টিগুলো একটু উইক। দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে পঁচিশ হাজার দিতে কেঁদে ফেলে। বাঁশ ফেলার দিন পঁচিশ পার্সেন্ট, ষষ্ঠীতে আরো পঁচিশ, সপ্তমীতে বিশ। অষ্টমীর দিন, সন্ধিক্ষণের আগে, বাকি তিরিশ পার্সেন্ট মায়ের সামনে মিটিয়ে দেবার কথা। অনেক টানাপোড়েনের পর হয়ত আরো বিশ পার্সেন্ট মিটল। কোনোদিনই পুরোটা মেটে না। এক-দেড় বাদ থেকে যায়। ডেকরেটার্স এ্যাসোসিয়েশনের নতুন নিয়মে পরের বছর প্যান্ডেল করার আগে পুরনো ডেকরেটার্সের ক্লিয়ারেন্স লাগে। তাতে কাজ হয়েছে। আগের মতো বড় টাকা আর মার যায় না। তবে দেড় - দুহাজারের গেরোটা পেরনো যায় না কোনমতেই। হয় 'বাবা', নয় 'শালা' বলে ক্লাবের ছেলেরা 'ডিউ' করে দেয়। ঐ-সব বাঁশের কাজে বেশি নিয়ম দেখালে চলে না। রাগের মাথায় কে কোথায় বসিয়ে কিংবা ঢুকিয়ে দেয় কে জানে!

মিঠুন-হেমার মতো স্টাররা ভূতনাথ চৌকির অধরা থেকে যায়। তার পরিবর্তে আকাশের তারা দেখে সে। টেম্পো চেতলা ছেড়ে বেহালার চৌ-রাস্তায় এসে গেছে। এখান থেকে আকাশখানা বেশ চওড়া। আঁধারের বিস্তার আছে বেশ অনেকখানি। আকাশের আঁধার বেশি বলে তারার সাক্ষাৎও বেশি। সে-সব তারার ইতিহাস শোনায় সানরাইজ ক্লাবের কালচারাল সেক্রেটারী, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী গাবলু। ভূতনাথ চৌকির উৎসাহে এবং সানরাইজ ক্লাবের উদ্যোগেই ন'জন ক্লাব-সদস্য এবং ক্লাবের ডেকরেটার্স ভূতনাথের এই ডায়মন্ডহারবার যাত্রা। গাবলু টেম্পোর মাথায় চড়ে মহাকাশের ধারা বিবরণী দেয়:

> আমরা সব স্টারের কথা জানি না। যে-সব স্টারের কথা জানি বা চোখে দেখি তা মোটামুটি দশ হাজার। এদের মধ্যে হাজার পাঁচেক স্টারকে খালি চোখে দেখা যায়, বাকিদের দূরবীন বা টেলিস্কোপ দিয়ে।

ক্লাবের সেক্রেটারী-জেনারেল বিজয় রায়কে ভূতনাথ বলে, 'দাও দিকি একবার তোমার টেলিকোপটা, তারাগুলোকে গুনি। গাবলুটা ইধার কা মাল উধার করছে কিনা দেখি।'

বিজয় দূরবীনটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'সরু দিকটা চোখে দিও। না-হলে কিছু দেখা যাবে না।'

দূরবীনের ফিতে গলায় ঝুলিয়ে ভূতনাথ বলে, তাতে কী? টেলিকোপটা দেখতে গেলে তো উল্টো দিকেই তাকাতে হবে। যে দিকেও দেখ, ক্ষতি নাই। হয় যন্ত্রটি দেখলে, না হলে আকাশটি।

যন্ত্রের অনভ্যস্ততায় প্রথমে দূরবীনটিকেই দেখে ভূতনাথ। তারপর দিক বদলিয়ে বস্তু থেকে মাধ্যমে যায়। তারারা চোখে ধরা দেয় এবার। পিছলও খায় ষাটের ঘোলাটে চোখে। দূরবীনটাকে শক্ত হাতে ধরে ভূতনাথ। চুনোপুঁটি তারাগুলোকে ছেড়ে রুই-কাৎলায় চোখের জাল পাতে।

গাবলু উচ্চ-মাধ্যমিকের তারকা-চিহ্নিত এক নম্বর সাজেসনে ফিরে যায়। এবারের বাংলা প্রবন্ধে গ্রহণ লাগবেই — হয় সূর্যে, না হয় চাঁদে। গাবলু পঞ্চাশ ভাগ মহাকাশ আর পঁচিশ - পঁচিশ সূর্য-চাঁদ করে রেখেছে। মহাকাশ জানলে বাকি কাজ সহজ। কোয়েশ্চেন সেটার সূর্য চাইলে সূর্য দেবে গাবলু; চাঁদ চাইলে চাঁদ। সে প্রেক্ষিতে ফেরে :

> দিনের আলোয় আমরা শুধু একটি তারাকে দেখতে পাই — সূর্য। রাতের আকাশে সে তুলনায় অনেক স্টার। মনে হয় সংখ্যাতীত। তা অবশ্যই নয়। পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে যে-সব নক্ষত্রকে আমরা দেখি তাদের সংখ্যা দু থেকে আড়াই হাজার। ওরা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে বলে মনে হয় ওরা সংখ্যাতীত। এটি বিভ্রম।

ভূতনাথ চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে বলে, 'তারাগুলোর কোনোটি তোমার মা, কোনোটি আমার বাপ। একটি করে মানুষ মরছে আর একটি করে তারা গজাচ্ছে আকাশে।'

ক্লাবের গেম-সেক্রেটারী পল্টু বলে, 'তোমার বাবাকে চিনতে পারলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভূতনাথ। আকাশের কৃত্তিকা নক্ষত্রে চোখ রেখে বলে, 'কেউ চিনল না তাকে। আট ভাইবোনের কেউ না। সবাই বললে বাপ জন্ম দিয়েই খালাস। আমি চিনতে ভুল করিনি।'

গাবলু গ্রহণের ভূমিকায় ফেরে আপন স্বরে :

> মানুষকে দিক চিনতে শিখিয়েছে আকাশ। ধ্রুবতারা বা পোলস্টার জাতীয় কোনও কোনও তারা সব সময়ে উত্তর আকাশে স্থির বা প্রায়-স্থির থাকে। দিনের আকাশের সূর্য এবং রাতের আকাশের নানা জ্যোতিষ্ক আকাশের পূর্ব দিকে উদিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে সরে গিয়ে অস্ত যায় পশ্চিমাকাশে। পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে, সাধারণভাবে সত্য এইসব তথ্য থেকে, মানুষ দিকগুলিকে চিহ্নিত করতে শিখেছে। আকাশ হয়েছে আদিম মানুষের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বা কম্পাস।

ভূতনাথ বলে, 'আমরা তখন চেতলার এক কুটুরির চালায়। অতটুকু ঘরে মা-বাবা মিলে দশজনার কুলান হয় না। সকাল হতে না হতে আমরা পঞ্চ-পাণ্ডবে চরতে যাই। হঠাৎ খবর গেল বাবার শ্বাস উঠেছে। ছুটতে ছুটতে গেলুম। বুক চাপড়ে কাঁদি। আমাদের চোখে জলের ধারা, বাবার মুখে হাসির ফোয়ারা। বাবাকে বললুম — আমাদের জন্য কী রেখে গেলে বাবা?'

গাবলু ঘোষণা দেয় :

> মানুষের চিন্তা বা প্রচেষ্টা তার প্রয়োজন ঘিরেই নিঃশেষ নয়। মানুষ অত্যন্ত কৌতূহলী। ঠিক এক কারণেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয় এমন আকাশ-চর্চাও মানুষ করে আসছে। মানুষের আকাশ-চর্চার ইতিহাস শুরু হয়েছিল দু'হাজার বছরেরও আগে।

ভূতনাথ বলে, 'সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে কগাছি চুল তুলল বাবা। সবার হাতে দিল একখানি করে। এক-এক গাছি চুল নিয়ে সাত ভাই-বোন কাঁদে। আমি দাঁড়িয়ে আছি চুলের গাছিটি নিয়ে। ভাবলুম বাবাকে সারা জীবনে কোনো সুখ দিতে পারিনি। এখন অন্তত গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করি। বাবার দেওয়া চুল বাবার দাড়িতে আটকে দিতে চৌকিতে গিয়ে বসলুম।

ভূতনাথ পিতৃ-বিয়োগের শোকে কাতর। গলা ভেঙে আসে। ক্লাবের ছেলেরা সান্ত্বনা দেয়। মাত্র মাস দুয়েক আগে একটা স্ট্রোক হয়েছে। পি জি হাসপাতাল থেকে দিন পনের আগে ছুটি হয়েছে। নিঃসন্তান মানুষটি বোয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ডায়মন্ডহারবারে সূর্যগ্রহণ দেখতে যাচ্ছে। এত বড় অসুখের পরে কেউ ছাড়তে চায়? ভূতনাথ গ্রহণ দেখবেই।

ভূতনাথ কথায় ফেরে, 'বাবার শরীরটি নিয়ে ভাই-দাদারা চলে গেল। আমি বাবার শূন্য স্থানটিতে বসে রইলুম। চৌকিটি বাবার স্মৃতি হয়ে থাকল আমার কাছে। সেই একটি চৌকিতে বাবার পর লক্ষ্মী চড়লেন, সরস্বতী চড়লেন। আজকের রাজ্য-নেতারা সেদিন পাড়ার দাদা। তারাও চড়তো। দেব-দেবী বাড়ল, নেতা-নেত্রী বাড়ল — বাবার স্মৃতির চৌকিও বাড়ল। ভূতনাথ রায় হল ভূতনাথ চৌকি। তারপর বি.সি.ডেকরেটার্স। বাবার স্মৃতিতে 'বাদল ভবন' করলুম। দোতলা তুললুম মায়ের আশীর্বাদে। সেখানে মাদার ডেয়ারী আফিস খুলল। মায়ের দুধের দাম কেউ কোনোদিন মেটাতে পারবেনি।'

গাবলুর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারাবিবরণী আর ভূতনাথের কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাবাকে সন্ধানের ভেতর টেম্পোয় রাত কাটে। ভোরের রঙ ফোটার আগেই গাড়ি পৌঁছে যায় ডায়মন্ডহারবারে। সাদা ব্রিজের মুখ থেকে থৈ থৈ করছে মানুষ। সূর্য উঠতে এখনো খানিক দেরী, লালের আভা নাই পুবে। কিন্তু তাতে ভাটা নাই আনন্দে। কত কিছুই দেখার মতো আছে চারপাশে — নদী, নৌকো, ভাঙা কেল্লা। নদীর পাড়ে উঠলে ও-পাড়ের গাঁয়ে চোখ পড়ে। আর খানিক দূরে গেলে হলদিয়া। একখানি নদী দুখানি জেলার মাঝে ভাগের বেড়া বেঁধে দিয়েছে। রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধতে এসেছিলেন মা কালী, দু-জেলার মাঝের জল-বেড়া বেঁধেছেন মা গঙ্গা।

এসব দেখার চোখ নেই ছোকরা ছুকরিদের। নিজেদের দেখতেই তারা ব্যস্ত। একবার নিজের চোখে নিজেকে দেখা, একবার অন্যের চোখে। দেখবেই তো। দেখার বয়েস। আর না দেখলে সব সাজ নদীতে ভেসে যাবে, গড়িয়ে যাবে সাগরে। ভূতনাথ দু-চোখ ভরে রঙের বাহার দেখে। পরের বছর অলিভ গ্রিন রঙের চটটা সে নামাবেই। শুধু একটাই ভাবনা — বুকের যন্ত্রটা না থেমে গেলে হয়।

সান্‌রাইজ ক্লাবের এক্সিকিউটিভ মেম্বাররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। এখন টেম্পোর কাছাকাছি বলতে দুজন — ড্রাইভার আর ভূতনাথ। ড্রাইভারকে বলে টেম্পোর ওপর থেকে তোলা উনোনটা নামায় ভূতনাথ। তারপর কাঠ-কয়লা চাপিয়ে উনোন ধরায়। গুঁড়িগুঁড়ি ধোঁয়া ওঠে। সে ধোঁয়ার কণা জুড়তে জুড়তে তুলোর শরীর পায়। তুলো উড়তে উড়তে কুণ্ডলী পাকায়।

সেদিকে তাকিয়ে দেখে ভূতনাথ। ঐ ধোঁয়ারই ভেতর হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে তার ভবিষ্যত।

স্ট্রোকটা বড় ঘা দিয়েছে ভূতনাথকে। ওষুধপত্রে তিন হাজার টাকা হাওয়া। তার ওপর মনটাও ভেঙে গেছে। নার্স-ম্যাডাম বুকে হাত রেখে বলেছে কলকব্জার অবস্থা ভাল না। সূর্যমুখীর তেলে রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে, চিন্তা ভাবনা চলবে না। মাঝে মাঝে চেঞ্জে যেতে হবে। কাজের টেনশন নেওয়া চলবে না। বিড়ি খাওয়া বারণ।

একদিনে বুকের একটুখানি নড়াচড়ায় কি কাণ্ডটাই ঘটে গেল! জিবের স্বাদ চলবে না, ফুসফুসে ধোঁয়া যাওয়া বন্ধ, মনের ভারে বারণ। সব যন্ত্রের সব ইচ্ছে পূরণ করতে হবে, শুধু মানুষটার ইচ্ছে থাকবে নি।

উনোনের আঁচ উঠেছে। কড়া চাপায় ভূতনাথ। মানুষজনের মাথা গুণতে চেষ্টা করে। আকাশের তারার মতো অগুন্তি। গাবলুর হিসেবে দশ হাজার কোটি।

হাজার পিস পাঁপড় আছে। সবগুলো মুখে মুখে চলে গেল টাকায় সত্তর পয়সা লাভ। সাতশ টাকা মন্দ না। ভূতনাথ তেল ছাঁকে ফুটো ছাত্তা দিয়ে। তেলের উষ্ণতা মাপে। সর্ষের তেলের সুবাসই আলাদা। সূর্যমুখীর তেলে মাঠা নাই। ঘোলের মতো পাতলা। কড়ার ওপর পাঁপড় ছেড়ে নাকে সর্ষের তেলের সুবাস নেয় ভূতনাথ। তারপর গলা তুলে ঘোষণা দেয় — 'গ্রহণ লাগছে সূর্যে। আপনার মুখে মিলিয়ে যাচ্ছে টুকরো টুকরো পাঁপড়। মুচমুচে তরতাজা। কামড় দিন। এক কামড়। সিকি গ্রাস। আবার ছোট লাগান, দাঁত লাগান। অর্ধ গ্রাস। মুখের ভেতর পাঁপড় ঢোকে। ছোট হয়। আর চোখে পড়ে না। পূর্ণগ্রাস। আবার বেরিয়ে আসছে তরতাজা সূর্য। তাকান। দেখুন। তেলের কড়ায় সূর্য ভাসছে।'

রাহুর গ্রাসের কালে রন্ধন করতে নেই। ওটুকু সময়েই দিনের বেলা আলো ডুবে যায় হীরা বন্দরে। গঙ্গা মুখ লুকোয় আঁধারের কোলে। গাছের পাতা হঠাৎই শিকল তোলে রন্ধনশালায়। সূর্যের আলো নেই তার খাদ্য তৈরি বন্ধ থাকে। পাখি ঘরে ফিরতে ডানা মেলে। গরু গোয়ালের পথ খোঁজে। রাস্তার কুকুর চোর-তাড়ানো হাঁক মারে। চোখের পাতা জোড়ে। ঘুমের দানা জমে চোখের পাতায়। স্বপ্ন উঁকি দেয় কয়েক মুহূর্তের জন্য বুকের ভেতর।

ক্লাবের ছেলেরা ফিরে যায় চেতলায়, ভূতনাথ বসে থাকে। সে টেম্পোর ভাড়া ক্লাবের সঙ্গে কাটান করে দেয় প্যাণ্ডেলের 'ডিউ' সাতশ টাকার সঙ্গে। দেনা-পাওনা মিটে যায়। পাঁপড় বেচা বাবদ তার হাতে এখন নগদ ছশ পঁচাত্তর টাকা।

গ্রহণের আঁধার এখনো ভূতনাথের চোখে, আঁধারের স্বপ্নও। তার চারপাশে এক বন সুঁদরি গাছ, অজস্র চৌকি বানাবে সে। তার বুকের সামনে এক নদী হাওয়া মাথার ওপর দশ হাজার কোটি নক্ষত্র, আকাশের কোলে থেকে মা-বাবার স্নেহ-দৃষ্টি — মিঠুন আর হেমাকে সে তার চৌকিতে নামাবেই।

ও-দুই স্টারকে না নামিয়ে ভূতনাথ চৌকি মরছে না, মরতে পারে না।

ক্রীতকন্যা

গোপাল কৃষ্ণ রায়

টেবিলের উপর পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দেওয়া একটা বিয়ের চিঠি। হলুদ রংয়ের লম্বা ধরনের খাম। বাঁদিকের কোণে ছাপা শুভবিবাহ। মাঝখানে একটি প্রজাপতিকে ঘিরে মালা। লাল কালি দিয়ে লেখা সুনীল বসু, শিলং।

চিঠিঠা হাতে নিয়ে কয়েকবার উল্টে-পাল্টে দেখে সুনীল।

এখানে কে তোকে বিয়ের নেমন্তন্ন করল! মাস ছয়েক আগে সে সংবাদসংস্থার শিলং অফিসের দায়িত্ব নিয়েছে। দু'চারজন ছাড়া এখনও বিশেষ কারও সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সংবাদের কারবারি সে। রাজনৈতিক দল, মন্ত্রী, বিধান সভার সঙ্গে তার যোগাযোগ। দু'চারজন অন্য কাগজের সহকর্মীদের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচয় আছে। কিন্তু তাদের বাড়িতে বিয়ে দেওয়া বা করার মত কেউ আছে বলে সুনীল জানে না।

কোন খাসি, জয়ন্তিয়া বা গারোর বিয়ে নয়। হলুদ রংয়ের কার্ডই প্রমাণ করে দিচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে কোন বাঙ্গালী পরিবারে। কিন্তু এখন তো পৌষ মাস চলছে, পৌষ মাসে কি বিয়ে হয়!

টেবিলে আরও অনেকগুলো চিঠি চাপা দেওয়া রয়েছে। কোনটার গায়ে আর্জেন্ট সীল মারা। দিন চারেক বাইরে ছিল সুনীল। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে তুরা গিয়েছিল। বালফাকরামকে জীব পরিমণ্ডল হিসাবে সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হল। দেশের চৌদ্দটি জীব পরিমণ্ডলের মধ্যে বালফাকরাস অন্যতম। বালফাকরামের বায়ো ডাইভারসিটি অনন্য এবং অসাধারণ। গারোদের কাছে বালফাকরাস পবিত্র স্থান। মৃত্যুর পরে আত্মা এই বালফাকরামেই স্থান পায়। তার পর পাপ পুণ্যের বিচারের পর, কর্মফল অনুযায়ী কেউ যায় স্বর্গে আর কাউকে যেতে হয় নরকে। এই বালফাকরামের সঙ্গে গারো কিম্বদন্তী জড়িয়ে আছে।

চিঠিটা আবার হাতে নেয় সুনীল। খাম বন্ধ। বিয়ের চিঠি সাধারণত: বন্ধ থাকে না। অন্তত: সুনীলের চোখে পড়েনি। চিঠিটা বারকয়েক নাড়াচাড়া করে সুনীল ডাকে, কাশীরাম! কিছুক্ষণ কাচের সার্সি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। মেঘে ঢাকা সূর্য। শিলং-এর আকাশে নানা রংয়ের মেঘ। দূরের পাহাড় রেখে ধোঁয়াটে কুয়াশা হামাগুড়ি দিয়ে নামছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সচিবালয় ভিজিয়ে দিয়ে নেন্দু বিল্ডিং-এ আছড়ে পড়বে। তারই কিছু অংশ এসে লাগবে তার ঘরের কাচের সার্সিতে। কিছুক্ষণের জন্য সার্সিগুলো ঘোলাটে হয়ে যাবে। সার্সির গায়ে আঁকাবাঁকা রেখা টেনে শিশিরগুলো ঝরতে থাকবে।

সুনীল আবার ডাকে, দুলাল!

ডাক শুনে ঘরে ঢোকে বোধরাম। টেলিপ্রিন্টার অপারেটর।

বোধরাম বলে, কাশীরাম কাগজ নিয়ে নংথুমাই গেছে, স্যার। দুলাল পোষ্টাফিসে। সুনীলের হাতে চিঠিটা দেখে বোধরাম বলে, গতকাল নন্দীবাবু এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে।

— নন্দীবাবু! মানে আমাদের সুকুমার নন্দী!

— হ্যাঁ স্যার। কাল বিকালে হঠাৎ এসে হাজির। এসেই বললেন, তোমাদের সায়েব আছেন?

নন্দীবাবুকে দেখে দুলাল আর কাশীরাম হৈ হৈ করে ওঠে।

কাশীরাম বলে, এতদিন কোথায় ছিলেন, নন্দীবাবু ?

দুলাল বলে, নন্দীবাবু আপনি ভাল আছেন তো?

বোধরাম একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ধীরে ধীরে কথা বলে। সেও অনেক দিন পর নন্দীবাবুকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তাঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলে, আপনি ভাল আছেন নন্দীবাবু ?

দুলাল একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনি বসুন, নন্দীবাবু।

নন্দীবাবু মাঙ্কিক্যাপটা খুলে টেবিলের উপর রাখেন। আঙুল চালিয়ে মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলো বিন্যস্ত করেন। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচুস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের সায়েব আছেন?

কাশীরাম একটু চিবিয়ে কথা বলে। এটা তার অভ্যাস নয়। সে মুখে সর্বদা এক রকম বন্য গোলমরিচ রাখে। গোলমরিচ খেলে শীত কম লাগে। শিলং-এর জানুয়ারির শীতেও তাই সম্ভবত কাশীরাম একটা সার্ট গায় দিয়ে কাটিয়ে দেয়।

নন্দীবাবু আবার জিজ্ঞাসরবা করেন, তোমাদের সায়েব ঘরে আছেন?

দুলাল বলে, না সায়েব তো তুরা গেছেন।

— কবে আসবেন?

কাশীরাম বলে, আপনি দেখা করবেন নাকি?

নন্দীবাবু বলেন, ইচ্ছা তো আছে।

দুলাল বলে, আপনার ইচ্ছা আর পূরণ হবে না।

— কেন কেন? নন্দীবাবু হাউমাউ করে ওঠেন। বলেন, আমি কি এর আগে দেখা করিনি? অরুণাচল নিয়ে কত গল্প করেছি। বোধরাম মুচকি মুচকি হাসে। নন্দীবাবু আগে প্রায় প্রতিদিন আসতেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবরের কাগজগুলো পড়তেন। তাতেও তাঁর মন ভরতো না। কৌতূহলী হয়ে টেলিপ্রিন্টারের উপর ঝুঁকে পড়ে টাটকা খবর পড়তেন। অরুণাচলের কোন খবর দেখলেই লাফিয়ে উঠতেন।

সুনীল ঘরে ঢুকলেই তাঁর সব উচ্ছ্বাস একমুহূর্তের মধ্যে নিভে যেত। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে কোন রকমে বলতেন, গুড ইভনিং স্যার।

সুনীল মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে নিজের ঘরে চলে যেত।

কাশীরাম বলতো, সায়েবের সঙ্গে দেখা করবেন নাকি, নন্দীবাবু?

নন্দীবাবু আমতা আমতা করে বলতেন, আজ থাক, পরে দেখা হবে।

বোধরাম আবার বলে, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে অনেকক্ষণ বসেও ছিলেন।

— আবার কবে আসবেন?

— বলে তো গেছেন, কাল বিকেলে।

বোধরাম চলে যায়। সুনীল এবার চিঠিটা খোলে। আগেই নিমন্ত্রণ-কর্তার নাম পড়ে। সুকুমার নন্দী।

চিঠিটার প্রথম লাইন পড়েই চমকে ওঠে সুনীল। বিয়ের চিঠিতে কেউ এমন ভাষা ব্যবহার করে? এটা তো চিঠি নয়, তার কাছে একটা ইন্টারেস্টিং খবর।

এবার চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করে সুনীল। "সবিনয় নিবেদন, আগামী

২৫শে জানুয়ারি আমার ক্রীত কুমারীকন্যা দিওয়ারীর পুত্রী সিয়ারার শুভ পরিণয় সেলা নিবাসী মিলটন মারাকের সঙ্গে সুসম্পন্ন হইবে।"

এই পর্যন্ত পড়েই সুনীল থামে। " ক্রীত কুমারী কন্যার পুত্রী" শব্দগুলি তার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। নন্দীবাবু তাঁর জীবনের দু চারটে গল্প এর আগে শুনিয়েছেন। লিসাদের কাহিনী বলেই তিনি যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, ছ'মাসের মধ্যে তাঁর পাত্তা মেলেনি।

সুনীল এবার চিঠির শেষ লাইনগুলি পড়ে।

"আপনি, সবান্ধবে মদীয় রিল বং-এর বাড়িতে উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য সুসম্পন্ন করাইবেন।"

সুনীল ভাবে তাহলে বিয়েটা নন্দীবাবুর শিলং এর বাড়িতেই হচ্ছে।

অবিবাহিত নন্দীবাবু তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন। অরুণাচল প্রদেশের সরকারী কর্মচারি ছিলেন নন্দীবাবু। নেফা তখন অরুণাচল হয়নি। সেই সময়ে চাকরিতে ঢুকেছিলেন নন্দীবাবু। চিন-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি নাকি দুর্দান্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছিলেন। নাহার লণ্ডন তখন প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। নূতন ইটানগরের কাজ বন্ধ। বমডিলা পতনের পরও নন্দীবাবু কর্মস্থল ত্যাগ করেননি। পাহাড় ভেঙ্গে গহন-অগহন বন পাড়ি দিয়ে তিনি উপজাতি বস্তির মধ্যে চলে যেতেন। পলায়মান উপজাতিদের সাহস দিতেন।

বলতেন, এ দুর্দিন কেটে যাবে, তোমরা ভয় পেও না। তারপর মাসখানেক, লোহিত দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে যায়। চীনা সৈন্যরা বমডিলা থেকে সরে যায়। চৈনিক সেনারা সরে যাবার পর, সিভিলিয়ান কর্মীদের প্রথম যে দলটি বমডিলায় গিয়েছিল, নন্দীবাবু ছিলেন তাদের অন্যতম। ধীরে ধীরে মোন-পারা ফিরে এসেছিল। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে পতাকা ওড়ানো হয়েছিল। সকাল সন্ধ্যায় বুদ্ধস্তুতিতে বিহারগুলি মুখরিত হয়ে উঠেছিল। তারও প্রায় বছর দশেক পর নেফা অরুণাচল হল। নূতন নামকরণের আনন্দ উৎসবে তিনিও ছিলেন অংশীদার।

লোয়ারলাসুমিয়ারে সুনীলের অফিস বাড়িটি খুবই ভাল। জয়ন্তিয়ার সুচিয়ংসাহের বাড়ি। দোতলায় সুনীলের অফিস। প্রশস্ত ব্যালকনি। এই ব্যালকনিতে বসলেই শিলং-এর নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করা যায়। উপত্যকা জুড়ে সারিসারি অফিস বাড়ি। সবই কাঠের। প্রতিটি বাড়ির চিমনী দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। নেদুর বাঁ পাশ দিয়ে খাড়াই উঠে গেছে যে রাস্তাটা, সেই রাস্তা দিয়ে এগুলে মালকী পয়েন্ট। সামনের রাস্তাটা একটা 'ইউ' শেপ নিয়ে মিশেছে বারিক পয়েন্ট-এ। ব্যালকনিতে বসে রাজভবন দেখা যায়। অফিসের নিচেই একটি চায়ের দোকান। কং আর বী-রা দোকানটি চালায়। বাঁকে জিম্বাস আর ডান হাতে কেটলি নিয়ে বী-রা অফিসে অফিসে চা বিক্রি করে। সুনীলের অফিসেও এখান থেকেই চা আসে।

বারান্দায় বসে নন্দীবাবুর কথাই ভাবছিল সুনীল। মানুষটি শিলং-এও খুব জনপ্রিয়। শিলং-এর প্রতিটি বাঙ্গালীর সঙ্গে তার পরিচয়। তাদের পূজাপার্বণ অনুষ্ঠানে নন্দীবাবু উপস্থিত থাকবেনই। খাসিদের কাছেও তিনি সমান জনপ্রিয়। সব খাসির কাছেই তিনি মামা।

লোকে নন্দীবাবুকে বলে অরুণাচলের জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। আশি হাজার স্কোয়ার কিলো মিটার গোটা অরুণাচল তিনি ঘুরেছেন। তিরাপ থেকে তাওয়াং সব জায়গাগুলি তাঁর চেনা। সব উপজাতির সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব। তাদের ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণের সঙ্গে তিনি খুবই পরিচিত। যেখানেই যেতেন, কখনই সরকারি বাংলোতে থাকতেন না। গাঁও-বুঢ়োর

অতিথি হয়ে 'থুমোন' এ থাকতেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য যুবকদের সঙ্গে মোরাং-এ রাত কাটাতেন। অনুমতি নিয়ে কেবাং-এ বিচার দেখতেন।

চাকরি করতেন উপজাতি কল্যাণ বিভাগে। সরল ব্যবহারের জন্য সব দপ্তরের সঙ্গেও তাঁর ভাব ছিল। তাঁর মত বিনয়ী ও দায়িত্বশীল কর্মীর কথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং জানতেন। অনেকবার নিজে ডেকেই তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। লিসাদের পুনর্বাসনের মত কঠিন কাজ করে তিনি সরকারি পুরস্কার পেয়েছিলেন। নন্দীবাবুর মুখেই এসব কথা শুনেছে সুনীল। তিনি যে এগুলো বানিয়ে বলেননি বার কয়েক অরুণাচলে তাও শুনেছে।

টেলিপ্রিন্টারে কাগজ লাগিয়ে কাশীরাম ফিরে এসেছে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ব্যালকনিতে এসে কাশীরাম বলে, স্যার কাল নন্দীবাবু এসেছিলেন। আপনাকে একটা বিয়ের চিঠি দিয়ে গেছেন।

— হ্যাঁ পেয়েছি।

কাশীরাম বলে, কার বিয়ে স্যার?

সুনীল কাশীরামের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। বলেন, তোমাদের বলেননি?

কাশীরাম বলে, হ্যাঁ স্যার, আমাদেরও যেতে বলেছেন। কিন্তু বিয়েটা কার স্যার?

এবারও সুনীল মৃদু হাসে।

কাশীরাম বলে, নন্দীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন, চিঠিতে সব লেখা আছে। সুনীলও বলে, চিঠিতে সব লেখা আছে। কাশীরামের সববিষয়ে কৌতূহল একটুবেশি। তার কৌতূহল নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত, সে প্রশ্ন করতেই থাকে।

সরাসরি জবাব না দিয়ে তার কৌতূহলকে আরও উস্কে দেয় সুনীল।

বোধরামও হাসতে হাসতে ব্যালকনিতে চলে আসে। বলে, আমিও ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে স্যার নন্দীবাবু কার বিয়ের চিঠি দিয়ে গেলেন। সুনীল বুঝতে পারে, এদের সকলের কৌতূহল তুঙ্গে পৌঁছে গেছে। তবুও খানিকটা কালক্ষেপ করার জন্য সুনীল বলে, কাশীরাম বী-কে চা দিতে বল। তোমরা খাবে কি?

বোধরাম বলে, না স্যার আমি খাব না।

কাশীরাম বলে, আমিও না।

সুনীল বলে, নেন্দুর টেলিপ্রিন্টার চেক করে এসেছ? কাল তথ্যদপ্তরের মেসিন বন্ধ ছিল। আজ চলছে তো?

কাশীরাম বলে, হ্যাঁ স্যার, আজ খারসাতীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আজ সব মেসিন চলছে।

বী চা নিয়ে আসে। বড় উজ্জ্বল সে। কাশীরামের সঙ্গে একদম বনে না। তাকে দেখলেই ভেংচি কাটে। কাশীরাম রেগে যায়। আর রেগে গেলে, তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তার হাব-ভাব দেখে বী খুব মজা পায়।

সুনীল বলে, নন্দীবাবুর আজ আসবার কথা নয়?

বোধরাম বলে, হ্যাঁ স্যার কাল তো তাই বলে গেলেন।

কাশীরাম বলে, কার বিয়ে, সে কথা তো বললেন না স্যার।

এবার বলতেই হয়। আর ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া যায় না। সুনীল বলে, নন্দীবাবুর নাতনির বিয়ে?

— নাতনি! বোধরাম আর কাশীরাম একসঙ্গে কথাটি বলে ওঠে। দুজনের চোখেমুখে অবিশ্বাস, আর বিস্ময়। কাশীরাম বলে, নাতনি! নন্দীবাবু নাতনি পাবেন কোথায়?

বোধরাম বলে, নন্দী বাবু তো ব্যাচেলর। আর তাঁর ভাইয়েরও কোন নাতি-নাতনি নেই, স্যার।

সুনীল মৃদু হেসে কাশীরামকে বলে, ড্রয়ার থেকে চিঠিটা নিয়ে এস।

কাশীরাম দ্রুত ঘরে ঢুকে যায়। ততোধিক দ্রুততায় চিঠি নিয়ে বেরিয়ে আসে। হলুদ রংয়ের একটি বিয়ের চিঠি। খামের বাঁকোণে লেখা "শুভবিবাহ"। ডানদিকে একটি প্রজাপতি ও মালা।

সুনীল ধীরে ধীরে খামের মধ্য থেকে চিঠিটা বার করে। কাশীরাম উদ্‌গ্রীব হয়ে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বোধরাম বলে, নন্দীবাবুর কেমন নাতনির বিয়ে?

সুনীল বলে, চিঠিটা শুনলেই বুঝতে পারবে। আগামী ২৫শে জানুয়ারি আমার . ক্রীত কুমারীকন্যা দিওয়ারীর পুত্রী সিয়ারার

— কাশীরাম বলে, ক্রীতকন্যা কি স্যার? বোধরাম বলে, ক্রীতকুমারী কন্যা— তাই পড়লেন না স্যার?

সুনীল বলে, হ্যাঁ , যা পড়লাম, ঠিক তাই লেখা আছে।

কাশীরাম বলে, নন্দীবাবু কি কাউকে পোষ্য নিয়েছিলেন?

বোধরাম বলে, চিঠিতে তো তা লেখেননি।

সুনীল বলে, উনি লিখেছেন, ক্রীতকুমারীকন্যা অর্থাৎ তিনি একটি কন্যা ক্রয় করেছিলেন।

কাশীরাম বলে, উনি একটি মেয়ে কিনেছিলেন?

সুনীল বলে 'হ্যাঁ।

বোধরাম বলে, সেই মেয়ের বিয়ে?

সুনীল বলে, ঠিক তাই।

কাশীরাম বলে, কুমারী না কি একটা লিখেছেন।

সুনীল বলে 'হ্যাঁ, তাই লিখেছেন।

কাশীরাম বলে, অবিবাহিতাকে তো কুমারী বলে।

অবিবাহিতা মেয়ের সন্তান! যা বাব্‌বা!

বোধরাম কেমন যেন থমকে যায়। বলে, মেয়ে কিনতে পাওয়া যায়, স্যার?

সুনীল বলে, বহুযুগ আগে এই ধরনের প্রথা ছিল। একবিংশ শতাব্দীর দোর গোড়ায় এই প্রথা কোথাও চালু আছে বলে আমার জানা নেই। সব ঘটনা জানতে হলে, নন্দীবাবুর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

(২)

কেবাং থেকে চিঠি পেয়ে অরুণাচল স্বরাষ্ট্রদপ্তর খুবই বিব্রত। কৃষি দপ্তরের কর্মী কুশল দত্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে। উপজাতি সমাজে এটি একটি গুরুতর অপরাধ। দত্তকে আটকে রাখা হয়েছে। হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে নয়। কেবাংয়ের নির্দেশে বিষয়টি ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তাকে মোরাংএ থাকতে হবে। কেউ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। দৈহিক নির্যাতনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কৃষি দপ্তর থেকে জানা গেছে, কুশল দত্ত নামক একজন জুনিয়র অফিসারকে আপাতানি উপত্যকায় পাঠানো হয়েছে। ধানে একধরনের পোকা লেগেছে। সেই পোকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যেই দত্ত সেখানে গেছে।

সুবর্ণসিড়ি জেলায় আপাতানি প্লেটো অরুণাচলের নন্দন কানন। অজস্র পাইন বুকে নিয়ে উপত্যকাকে ঘিরে রেখেছে সবুজ পাহাড়। উপত্যকার বুক চিরে বয়ে চলেছে কালি নদী। কালি গিয়ে মিশেছে দুনদ্রীর সঙ্গে। চওড়া বেশি না হলেও কালি খুবই খরস্রোতা। এই কালি নদীই হচ্ছে আপাতানি উপত্যকার জীবনরেখা।

মানুষ হিসাবে আপাতানিরা অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র। তাদের প্রতিবেশি নিশি ও সিরিদের মত যুদ্ধং দেহি নয়। দেখতেও তারা খুবই সুন্দর। নিজেরাও সৌন্দর্যপ্রিয়। পুরুষদের দৈহিক গঠন শক্ত সমর্থ। নারীরা সুন্দরী হাস্যোজ্জ্বল। টানা টানা চোখ, ঘন আঁখি পল্লব। ঝুঁটি খুলে দিলেই চুল এসে পড়ে মুখের উপর। অচেনা বহিরাগতদের সামনে চুল দিয়েই তারা মুখ ঢাকে।

মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সৌন্দর্যের হানি ঘটায়। বাইরের লোক তাই মনে করলেও আপাতানি কন্যারা তা ভাবে না। তারা কাঠের তৈরি একটা 'বড় নাকছবি নাসারন্ধে ঢুকিয়ে দেয়। কানেও প্রায় তিন ইঞ্চি ব্যাসার্ধে কাঠের রিং ঝোলায়। এই অলংকার তাদের সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি ।

নিজেদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে তারা যতখানি উদার, গোষ্ঠিবিরোধী বিয়েতে তারা ততখানি কঠোর। বিয়েকে তারা ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করে। ছেলে-মেয়ে রাজি থাকলে, বিয়েতে অভিভাবকেরা কখনই অন্তরায় হয় না।

আপাতানিরা অত্যন্ত অতিথি বৎসল। মেয়েরাই অতিথিদের সেবা যত্ন করে। বহিরাগত কোন ব্যক্তি মেয়েদের প্রতি অসভ্রমোচিত আচরণ করলে তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়।

কৃষি দপ্তর কুশল দত্তকে পাঠিয়েছিল। অরুণাচল শস্য ভাণ্ডার আপাতানি উপত্যকায় ধানে পোকা লেগেছিল। সেই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কুশলকে পাঠানো হয়েছিল । নন্দীবাবু বলেন, কুশল খানিকটা বেয়াদপি করে ফেলেছিল, স্যার।

সুনীল বলে, আপনি পুরো ঘটনাটাই বলুন। আপাতানিদের মধ্যে দানপ্রথা ছিল। এখন অবশ্য সেই প্রথা লোপ পেয়ে গেছে। তবে প্রভু ও দাস এই দুইয়ের মধ্যে এখনও একটা ভেদ রেখা রয়েছে। প্রভু সমাজকে বলা হয় " মাইত" — আর দাস সমাজের নাম হল "মুড়া"।

নন্দীবাবু বলেন, হ্যাঁ স্যার, মুড়াই বলা হয়।

— সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মায়ের নাম তো ছিল 'মুড়া'। চন্দ্রগুপ্ত হলেন দাসীপুত্র। মুড়া থেকেই মৌর্য । এখানে তেমন কিছু আছে নাকি?

নন্দীবাবু মৃদু হেসে বলেন, না স্যার, এত কিছু আমার জানা নেই। কে মুড়া আর কে মাইত, দেখে কেউ বুঝতে পারে না। মুড়ারা প্রভুদের পদবী ব্যবহার করে। বয়স অনুসারে বাবা দাদাও সম্বোধন করে। এক সঙ্গে খাওয়া - দাওয়ায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

— তা হলে মুড়া আর মাইতের মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

নন্দীবাবু বলেন, একটা সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। কোন মুড়া কন্যা মাইতের ছেলেকে বিয়ে করতে পারে না। কোন মাইত মুড়া রমণীকে উপপত্নী হিসাবেও গ্রহণ করতে পারে না। এটা উভয়ের কাছে গর্হিত কাজ।

সুনীল বলে, কুশল কার সঙ্গে বেয়াদপি করেছিল?

— মুড়াকন্যা দিওয়ারার সঙ্গে। তারজন্যই তো ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে গেছে।

সুনীল বলে, আপনি বলুন।

স্বরাষ্ট্র সচিব একদিন নন্দীবাবুকে ডেকে পাঠালেন। নন্দীবাবু চাকেরি করেন আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরে। স্বরাষ্ট সচিব বললেন, নন্দী, তোমাকে আজই জিরোতে যেতে হবে। নন্দীবাবু তখনও কেবাং-এর অভিযোগ শোনেননি। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কেন স্যার, হঠাৎ জিরোতে যেতে হবে কেন?

স্বরাষ্ট্রসচিব আপাতানি কেবাং-এর অভিযোগ খুলে বলেন। নন্দীবাবু কিছুটা অবাক হয়ে বলেন, কুশল দত্ত !

— হ্যাঁ। তাকে আপাতানিরা মোরাং-এ আটক রেখেছে।

নন্দীবাবু বলেন, মেয়েটি কোন সম্প্রদায়ের স্যার? মুড়া?

স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন, তুমি ঠিক ধরেছ। মেয়েটি অন্ত:সত্বা।

— অন্তসত্বা?

বলেই বার কয়েক নিজের মাথায় হাত বোলালেন নন্দীবাবু। তাঁর লিসাদের কাহিনী মনে পড়ে যায়। সে ঘটনার শেষ রক্ষা করতে পারেননি নন্দীবাবু। সে দুঃখের কথা তিনি এখনও ভুলতে পারেনি। আবার তেমনি একটি ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে হবে। তবে সুখের কথা, আপাতানিরা খুব ভদ্র ও বিনয়ী। স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, আজই তুমি চলে যাও। আমি কারপুলে বলে দিচ্ছি।

নন্দীবাবু বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই স্বরাষ্ট্রসচিব আবার বলেন, ঘটনাটা মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত গড়িয়েছে। তোমাকে পাঠাবার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন।

(৩)

নন্দী জিরোতে পৌছবার আগেই ঘটনাটি আরও জটিল-হয়ে ওঠে। প্রচন্ড বৃষ্টি ভেজা রাতে, সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কুশল পালিয়ে গেছে। আপাতানিরা আতিপাতি করে খুঁজেও তার হদিস পায়নি। সে কালি নদী পেরোলই বা কি করে? অন্য অরণ্য পথে সে আসামে নেমে যেতে পারে; বৃষ্টিভেজা রাতে গভীর অরণ্য সে অতিক্রম করতে পারেনি। হয় সে গভীর খাদে পড়ে মারা গেছে, নয় কালির দুরন্ত স্রোতে ভেসে গেছে।

কেবাং-এর সভাপতি অরনক-এর মুখে সব বৃত্তান্ত শোনেন নন্দীবাবু। অরনক বলে, দত্তকে দিয়েরাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। বলেছিলাম তোমাকে মুড়া সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকতে হবে।

নন্দী অরনকের কথার জবাব দেন না। কুশলের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। একটা সুষ্ঠ মীমাংসার কথা বলেছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব । কুশলের অনুপস্থিতিতে সেই মীমাংসাই বা কি করে করবেন তিনি? আর ছেলেটি যদি সত্যিই মরে যায় তাহলে ঝামেলা আরও বাড়বে।

অরনক বলে, নন্দী, আমরা সব উপত্যকার আনাচে-কানাচে খুঁজেছি। বনে-বাদাড়ে তল্লাসি করেছি, কিন্তু দত্তের সন্ধান আমরা পাইনি।

নন্দীবাবু বলেন, তোমার কি মনে হয়, দত্ত মারা গেছে ?

অরনক জোরে জোরে মাথা নাড়ে। সে বলে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, দত্ত অসমে নেমে

গেছে।

— কিন্তু তার চাকরি?

অরনক বলে, করবে না। কি ভুল করল ছেলেটি, অরনক স্বগতোক্তি করে।

নন্দী বলেন, এখন তোমরা দিয়েরাকে নিয়ে কি ভাবছ?

অরনক বলে, ওর পেটে এসেছে আমাদের গোষ্ঠী ও গোত্র বিরোধী একজনের সন্তান। গোষ্ঠীরক্তের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। কেবাং ওই সন্তানকে মেনে নেবে না।

নন্দী বাবু বলেন, তাহলে তোমরা কি চাও? মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং-এর কাছেই বা আমি কি বলব?

অরনক বলে, আমাদের আরও কিছুক্ষণ ভাবতে দাও নন্দী। তুমিও ভাব। একটা সুরাহার পথ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

আবার কেবাং-এর সভা বসে। নন্দীবাবুকেও সেখানে ডেকে নেওয়া হয়। অরনক বলে, দিয়েরাকে অন্য সম্প্রদায়ের কেউ বিয়ে করবে না। জিলমিরি, নিশি এমন কি তিরাপের শিংফোদের কাছে দিয়েরাকে বিক্রি করা যাবে না।

— বিক্রি! অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন নন্দী বাবু।

— হ্যাঁ, অরনক বলে, আমাদের মাঝে এই প্রথাটি মরেও মরেনি।

নন্দী কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবেন। বলেন, অরনক, তোমরা যদি ভরসা দাও, তাহলে একটা কথা বলতে পারি।

কেবাং-এর সব সদস্যরা এক সঙ্গে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তুমি নির্ভয়ে বল, নন্দী।

সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে নন্দী বলে, তোমরা দিয়েরাকে আমার কাছে বিক্রি কর, আমি কিনে নেব।

অবাক হয়ে অরনক বলে, তুমি কি করবে? নন্দী বলে, দিয়েরা আমার কাছে মেয়ের মত থাকবে। তার সন্তানকে আমি মানুষ করব।

সুনীল বলে, কত দিয়ে কিনলেন?

নন্দী বাবু মৃদু হেসে বলেন, আন্দাজ করুন।

সুনীল বলে, মানুষের দাম আন্দাজ করা যায় না নন্দী বাবু।

নন্দী বাবু হাসতে হাসতে বলেন, মাত্র এক টাকা।

— এক টাকা!

নন্দী বাবু আর কথা বলেন না। উঠে দাঁড়ান। বলেন, আপনারা সবাই কিন্তু সিয়ারার বিয়েতে যাবেন, স্যার।

বলেই পর্দা সরিয়ে নন্দীবাবু বেরিয়ে যান।

সুনীল আবার ডাকে, নন্দীবাবু এক মিনিট!

সুনীল বলে, পাত্র কি করে?

নন্দী বাবু বলেন, সে ডাউকীতে একটি স্কুলের শিক্ষক।

— বাবা মা?

নন্দীবাবু বলেন, মিলটন পিতৃপরিচয়হীন, একজন জবালা।

হুইশিল

মৃত্যুঞ্জয় সেন

শীতের পড়ন্তবেলা। ক'হাত দূরে সন্ধে। রঙচটা হলুদ চরাচরে। তার মধ্যে সারিবন্দি একতলা কয়েকশ' বাড়ি। বাড়িগুলো সাদা রঙের। ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে ভাগ করা। দূর থেকে দেখলে মনে হবে থার্মোকলের কতকগুলো বাক্স সাজানো। বাড়িগুলোর অন্যপাশ দিয়ে চলে গেছে চোখ ধাঁধানো পাকা রাস্তা। যেমন চকচকে তকতকে, তেমন চওড়া। রাস্তাটা ভৈরবদের এই পাড়াটাকে এক গোঁত্তায় এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে গেছে কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার দূরের মহকুমা শহরে।

ভৈরব শুয়ে আছে তার দোকানের এক কোণে। শুধু দোকান নয়, বাড়িও। বাড়ির বাইরের বারান্দাতে একটা তক্তপোশ পেতেই তৈরি হয়েছে ভৈরবের চায়ের দোকান। তক্তপোশের ওপরে বারান্দার দেয়ালে লাগানো হয়েছে দু তিনটে তাক। সেই তাকে নানান মাপের কৌটোতে সাজানো থাকে বিস্কুট-চানাচুর, আরও কয়েক রকম মনোহারী দ্রব্যসামগ্রী। তক্তপোশের পাশে কয়লার একটা উনুন। আর তক্তপোশের তলায় গোবর লাদি, কয়লার টুকরো। কয়লা আসে কিছুদূর থেকে। খাদ থেকে তুলে রাখা কয়লার চোরাগুপ্তি চালান। দুখীরামের মা দু দিন অন্তর দিয়ে যায়।

ভৈরব শুয়ে আছে সেই বিকেল থেকে। বিকেল থেকে শীতের টান সে বুঝতে পারছিল। তাই ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা গরম চাদর বের করে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল। সারা দিন বেশ খাটুনি হয়েছে তার। সারাদিন লোকজন। সে অবাক হয়ে ভাবছিল যে এতদিন পরে, এতকাল পরেও এত লোক সেই বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কথা মনে রেখেছে।এত লোক সেই টানেই এসেছে।

শুয়ে শুয়ে ভৈরব ওইসব তল-অতল ভাবছিল। হ্যাঁ, তা দেখতে দেখতে পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গেল। প্রথমদিকে বছর পঁচিশ তো কোন অনুষ্ঠান হত না তাদের পাড়ায়। লোকেরাও প্রতিদিনই কোন না কোন কথার পিঠে ভূমিকম্পের কথা টেনে আনে। অথচ তারা চায় ভূমিকম্পের কথা ভুলে থাকতে। কিন্তু বছর দশেক আগে থেকে শুরু হয়েছে এই কাণ্ডটা। একটা স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা ভয়ংকর সেই ভূমিকম্পের হতাহতদের স্মরণে সভাসমিতি করে। যারা সেই ভূমিকম্পের পরে চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে তাদের মধ্যে ফল-ওষুধ বিতরণ করে। ছোট ছোট শিশুদের জন্যে আনে অনেক বিস্কুট, মিষ্টি। একজন না একজন মন্ত্রী আসে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে বক্তৃতা-গান। 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' আকাশবাতাস মুখরিত করে।

সেই একইভাবে আজও অনুষ্ঠান হয়েছে। ভৈরবের দোকান পেরিয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে স্থায়ী একটা মঞ্চ। মঞ্চের পাশে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি একটা মূর্তি। একটা এটলাস ধরে আছে একটি শিশু। মূর্তিটা বসিয়ে কী লাভ হয়েছে তা ভৈরবের মত অনেকেই বোঝে না। তবে দেখতে ভালোলাগে তাদের। যে বছর ভূমিকম্প হল তার দু বছর পরে তৈরি করে মূর্তিটা বসানো হয়েছিল। আর সে সময়ই তৈরি হয়েছিল থার্মোকলের বাক্সের মত দেখতে বাড়িগুলো।

ভৈরব ভাবতে থাকে। আজকের অনুষ্ঠানে এত লোক এল, এত কথা হল — কিন্তু কই

কেউ তো তাকে যত্নআত্তির করল না। শুধু তাদের নতুন সরপঞ্চ একবার নিজের বাহবা পাবার জন্যে উন্নয়নমন্ত্রীকে বাড়িগুলো দেখাবার সময় সামনে ভৈরবকে দেখে কিছু বলেছিল। মন্ত্রীজী ভৈরবের দিকে তাকিয়ে দু হাত জড় করেই অন্য দিকে তাকিয়ে চলে গিয়েছিলেন। ভৈরব অবশ্য মন্ত্রী চলে যাওয়া পর্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে তার হাত দুটো জড় করেই রেখেছিল। তারপর মিটিং শেষ হল, যে যার মত চলে গেল। জায়গাটা শুনসান হয়ে গেল মুহূর্তে। বাইরের লোকজন সকাল থেকে স্রোতের মত এসেছিল, দুপুর পেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে গেল ভাঁটার মত। কত গাড়ি এল। কত রকমের গাড়ি সেসব। রাস্তা জুড়ে সেগুলো দাঁড়িয়েছিল। ভৈরবের মনে হচ্ছিল, পাড়ার সকলে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে। অবশ্য তারা চলে যাবার পর পাড়ার অনেকেই তার দোকানে এসেছিল। এমনিতে আনোয়ার গীতেশরা তার দোকানে প্রতিদিন সন্ধেতে আসে। তখন দোকানটা বেশ গমগম করে, তখন তার ভাল লাগে।

ভৈরবের দোকানের উনুনের পাশে দুটো ছোট ছোট বেঞ্চ। সেই বেঞ্চে কেউ কেউ বসে। ভৈরব কখনও কখনও বেঞ্চগুলোকে তার দোকানের সামনের এক চিলতে জমিতে বসিয়ে দেয়। শীতের দুপুরে দু একজন এসে সেখানে বসে। রোদে পিঠ দিয়ে। লোকজন বেশি হলে ঘর থেকে তার খাটিয়াটা বের করে নিতে বলে। খাটিয়া ঘিরে লোকজন বসে। সরপঞ্চদের আসরের মত দেখতে হয় তখন। ভৈরব অতি উৎসাহে চা তৈরি করে। তখন তার বয়সটাকে সে মান্য করে না। কে বলবে সে তখন ষাট বছরের বৃদ্ধ। একা একা থাকে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে সুদূর মেদিনীপুরের এক গ্রাম থেকে সে চলে এসেছিল এখানে। তবে নামেই দোকান। বিক্রিবাটা তো তেমন কিছু নয়। সে ভাবে কে-ই বা কিনবে! ভূমিকম্পে এখানকার সকলে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কজন আর বাঁচল! এই তো এতোগুলো দেশলাইয়ের বাক্সের মত বাড়ি তৈরি করে দিল সরকার, কই, কজন সেখানে বাস করে? এতটা জায়গা জুড়ে এত বাড়ি, অথচ লোকসংখ্যা দেখ, শ'দেড়েক থেকে দু'শ। তাও তার মধ্যে অনেকে অথর্ব। যাদের সামর্থ আছে তারা কাজ করতে যায় সেই সকালে — দশ কিলোমিটার দূরের এক সার কারখানায়। তাদের ফিরতে ফিরতে সন্ধে। কেউ কেউ আবার রাতের শিফটে কাজের জন্যে বেরিয়ে যায়। ভৈরব ভাবে, কতজন আর আছে এখানে। তবু ভরসা সকালের স্কুলটা।

রাস্তার উল্টোদিকে যেখানে সরকার সাঁওতালদের ঘর তৈরি করে দিয়েছে তার পাশেই একটা প্রাইমারি স্কুল। সকালে বসে স্কুল। সর্বসাকুল্যে সেখানে পনের-কুড়িজন ছাত্রছাত্রী। এই শীতে তাদের অর্ধেকই আসা বন্ধ করে দিয়েছে। সেইসব ছাত্রছাত্রীরা টিফিনে চানাচুর-আচার-লবঞ্জুস কিনতে আসে। ভৈরব তাদের কচি কচি হাতে তুলে দেয় দশ পয়সা বিশ পয়সার চানাচুরের ছোট ছোট প্যাকেট। লবঞ্জুস একটা দুটো করে হাতে হাতে দেয়। তখন কাগজে মুড়ে দেয় না।

শুয়ে শুয়েই ভৈরব দেখল শুনসান রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে রঙ্গস্বামী। রঙ্গস্বামী তারই মত বাইরে থেকে এখানে এসেছিল। কাজ করত এক সঙ্গে। সেও ভৈরবের মত সরকারী কুঠী পেয়েছে। এক চিলতে জমিও। একই মাপ বাড়ির এবং জমির। তবু রঙ্গস্বামী মনে করে ভৈরবের বাড়িটা বড়, জায়গাটাও বেশি। আর যত বয়স বাড়ছে রঙ্গস্বামী ততই ঐ একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভৈরবকে শোনায়। সে ভৈরবের মত অকৃতদার নয়। তার সংসারটা বেশ বড়সড়। তার বড় ছেলে মুম্বাইতে নাকি সোনার গহনায় পাথর সেটিংয়ের কাজ করে। ভাল পয়সা করেছে তারা। কিন্তু হঠাৎ এখন কেন রঙ্গস্বামী — ভৈরব একটু সন্দিহান হয়ে উঠে বসে।

এতক্ষণ সে ভূমিকম্প নিয়ে ভাবছিল। সেই ভূমিকম্পের কথা মনে পড়লে তার শরীর শিউরে ওঠে। মনে হয়, কারা যেন তাকে জোর করে এক পুকুর জলের মধ্যে চেপে ধরেছে। আর সেই ভূমিকম্পের কথাই সারাদিন ধরে চলল।

শহরের লোকজন, মন্ত্রী আর তার দলবল চলে যাবার পর পাড়াটা একেবারেই চুপ। মন্ত্রীরা চলে যাবার পর ভৈরবের দোকানে এসেছিল অনেকে। তাদের মধ্যে অনেকেই পঙ্গু। আনোয়াররা জানিয়ে গেল, তারা আজ আর সন্ধেতে আসবে না। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তো অনেক কথাবার্তা, গল্পগুজব হল। তাই ভৈরবও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, সন্ধেতে আর লোকজন হবে না। সন্ধের পরে খেয়েদেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে। কিন্তু এসময় রঙ্গস্বামী ফিরে এল কেন?

রঙ্গস্বামী ভৈরবের দোকানে এক চিলতে উঠোন পেরিয়ে এসে বলল, বুঝলে কিনা, খবর আছে।

কিসের খবর? উৎগ্রীব হয়ে ভৈরব প্রশ্ন করে। ভৈরব রঙ্গস্বামীর দিকে তাকায়।

উঠোনে রাখা বেঞ্চে বসে রঙ্গস্বামী তখন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভৈরবের উঠোনটা দেখছিল। কল্পনা করছিল, বাড়ির পুরো চৌহদ্দিটা। তার মনে হচ্ছিল, তার বাড়িটা সত্যিই ভৈরবের থেকে ছোট।

কিসের খবর, বললে নাতো? ভৈরব আবার প্রশ্ন করে।

চা'খাওয়াও। বলছি। রঙ্গস্বামী বলল।

ভৈরব বিছানা ছেড়ে উঠে কয়লার উনুনের নিভন্ত আঁচ আবার জাগাতে শুরু করল। হাতপাখা দিয়ে বাতাস দিল কিছুক্ষণ। তারপর শুকনো গোবর লাদি কয়েকটা গুঁজে দিল উনুনে। একটু পরে ধোঁয়া শুরু। ধোঁয়ার ওপরে ছোট ছোট কয়েক টুকরো কয়লা দিয়ে ভৈরব তার হাত দুটো পাশের পিলারে ঘসে দিয়ে বলল, কিসের খবর, সেটাই শুনি। আবার ভোট হবে নাকি?

হ্যাঁ, তা বলতে পারো। এও এক ধরনের ভোট। অনেকে এখন বলছে, আমরা তো বাইরের লোক। আমরা কেন এদেশে থাকব। আমাদের কেন জমি-জায়গা-বাড়ি দেয়া হয়েছে। আজকের মিটিং-এর পরে লোকেদের মধ্যে এসব ফিসফিসানি হচ্ছিল। রঙ্গস্বামী বলল।

অবাক হয়ে যায় ভৈরব। হঠাৎ এই এতদিন পরে, একথা তুলছে কারা? সেই ভূমিকম্পের দিনের কথা কি সকলে ভুলে গেল? তাহলে আজ সারাদিন ধরে এত কিসের কথা হল? সেদিন সে কি না করেছিল? অন্তত দশ বারোজনের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল সে। নিজেই হয়ে পড়েছিল অসুস্থ। অথচ নিজের অসুবিধা অবজ্ঞা করে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর্তের সাহায্যে। এখানকার লোকজন তো তার কেউ নয়। কই, তখনতো সে আপন-পর বলে ভাবেনি। এই আনোয়ার তো তখন চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছিল। সে-ই তো আনোয়ারের বৃদ্ধা মা-কে বড় বড় পাথর সরিয়ে বের করে এনেছিল।

মুখে এসব কথা বলল না ভৈরব। বলল, এখানে যখন এসেছিলাম তখন আমার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। এখন ষাট পেরিয়ে গেল। জীবনের অর্ধেকের বেশি সময়ই তো এখানে কাটল। এখানকার লোকজনই তো আমাদের আত্মীয় স্বজন। এদের নিয়ে, এদের সঙ্গে থেকে, এদের সঙ্গেই তো জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। এখন এরাই যদি চলে যেতে বলে, চলে যাবো।

রঙ্গস্বামী চুপ করে থাকে।

ভৈরব তার গায়ের চাদরটা খুলে নিয়ে একবার ঝাড়ল। তারপর আবার সেটা তার গায়ে জম্পেশ করে জড়াতে লাগল। জড়াতে জড়াতে তার কানে এল মোটর বাইকের আওয়াজ।

মোটর বাইকটা গুলশনের। ভৈরবদের গাঁয়ে ঐ একজনের আছে এমন একটা গাড়ি। গুলশন সাত-আট কিলোমিটার দূরে একটা সিমেন্ট কারখানায় কাজ করে। কাজ অবশ্য তাকে করতে হয় না। সে সেখানকার ইউনিয়নের নেতা। তবে ছেলেটাকে ভাললাগে ভৈরবের। গুলশন অনেককে তাদের কারখানায় মুটেমজুরের কাজ দিয়েছে। রাতবিরেতে কারুর কোন বিপদ হলেই গুলশনই তার বাইক নিয়ে ছোটাছুটি করে। প্রয়োজনে তার গাড়িতে রুগীকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাশের গ্রামের হেলথ সেন্টারে পৌঁছে দেয়।

মোটরের আওয়াজ শুনে ভৈরব একটু চিন্তা করে। এসময়ে গুলশনের ফেরার কথা নয়।

ভৈরবের চিন্তা গাঢ় হতে না হতেই গুলশনের গাড়ি এসে তার দোকানের সামনে থামল। বাড়ি ফেরার পথে প্রতিদিনই গুলশন ভৈরবের দোকানে আসে। তখন সন্ধে নামে। সেসময় অনেকেই ভৈরবের দোকানে চা খেতে আসে। চা খাওয়া উপলক্ষ মাত্র। আসলে তাদের বাড়ি আশেপাশে। তাদের অনেকেই আবার বৃদ্ধ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী। তারা চা খেতে খেতে ভৈরবের সঙ্গে গল্প করে। ভৈরবও এদের মত একজন প্রতিবন্ধী। লাঠিই তার সম্বল। তারা যখন কথা বলে তখন আশেপাশের বাড়িগুলো হয়ে যায় নিঝুমপুরী। কেবল কয়েকজন বৃদ্ধ ভৈরবের দোকানের টিমটিমে আলোয় তাদের অতীত দেখে। অতীতচারিদের আসরে যখন গুলশন এসে পড়ে তখন জোয়ার আসে। গুলশন শোনায় শহরের কথা। সেদিককার তাজা খবর। কোনদিন শহরের ম্যালেরিয়ার প্রকোপের কথা বলে। কোনদিন পোখরানের কথা বলে। বলে, পোখরানের বদলা নিয়েছে পাকিস্তান। তারাও নাকি অনেক বোমা ফেলেছে। উপস্থিত শ্রোতারা ঠিক বুঝতে পারে না। এসব বোমা কিসের এবং সেসব বোমার শক্তি কেমন তা নিয়ে ব্যাখ্যা করে গুলশন। এসব কথা শুনতে শুনতে আনোয়ার নামের বৃদ্ধটি তার লাঠিটা ধরে উঠে দাঁড়ায়। বলে, সর্বনাশ তো ঘনিয়ে এল। আচ্ছা, আবার আমরা সব হারাবো না তো?

এইসব বৃদ্ধরা হারিয়েছে অনেক। ভৈরব আনোয়ারের কথা শুনে অবাক প্রশ্ন করে, গুলশান ভাই, এত বোম পড়ছে, তাহলে আবার কি ভূমিকম্প হবে? পৃথিবী এত সহ্য করতে পারে?

গুলশন তাদের কোন জবাব দিতে পারে না। সে মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে। এসব প্রশ্নের উত্তর কি তার কাছে আছে? পরক্ষণে তার চোখে ভেসে ওঠে তাদের পোলট্রির মুরগির বাচ্চাদের ভীতসন্ত্রস্ত দৌড়াদৌড়ি। সেদিন হঠাৎ কোথায় একটা জোর শব্দ হয়েছিল, আর সেই শব্দে মুরগির বাচ্চাগুলো একসঙ্গে কী প্রচন্ড না কেঁপে উঠেছিল। খাঁচার মধ্যে সে কী তাদের দৌড়াদৌড়ি। যেন মুরগি বাচ্চাদের অভয় দিচ্ছে, সেভাবে গুলশন তার জিব বার কয়েক আলটাকরায় ঠেকিয়ে শব্দ করে বলে, না, না। এসব ভেবো না কিছু।

আনোয়ার তার লাঠিটা ধরে আবার বসে পড়ে সে সময়। স্বগতোক্তি করে। বলে, ভাববো না কেন? এক একটা ভূমিকম্প হচ্ছে আর দেশটা শ্মশান হয়ে যাচ্ছে।

গিরিধারী সাধারণত অ্যালোচনা শোনে। কথা বলে কম। সে সেদিন কিন্তু অনেক কথা বলল। সে বলে উঠেছিল, না না, ভূমিকম্প হল বলেই তো এই বাড়িগুলো সরকার তৈরি করে দিল। আমরা কোনদিন কল্পনা করেছিলাম, এমন পাকা কুঠীতে বাস করব?

এইভাবে নিত্যদিন নানান কথাবার্তার মধ্যে ভূমিকম্পের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আর ভূমিকম্পের কথা শুনে ভৈরবও কেমন সিঁটিয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষের জীবন থেকে

ভূমিকম্প ঘটে গেছে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর আগে। কিন্তু ভৈরবের মনে হয়, এই সেদিন।

গুলশন তার মোটর বাইক রাস্তার পাশে রেখে রঙ্গস্বামীর পাশে গিয়ে বসল। খুব জোরে জোরে বলল, আজ তো সকাল থেকে এখানে অনেক কাণ্ড হল। শুনেছো, রাজধানীর সংবাদে আমাদের গাঁয়ের কথা বলেছে।

ভৈরব গুলশনকে ইঙ্গিত করে চা খাবার।

গুলশন বলল, হ্যাঁ, খাবো তো নিশ্চয়। শীতটা যা পড়েছে। কিন্তু চটপট করো। আচ্ছা, তোমাদের আসর তো বসেনি, দেখছি। রঙ্গস্বামীজী, আপনি একা কেন?

ভৈরবের উনুনের আঁচ তখনও সম্পূর্ণভাবে জ্বলে ওঠেনি। আধো অন্ধকারে সে দেখল, আঁচ অনেক নিচে। সেখানে ক্ষীণ লাল আভা। সেই দেখে ভৈরব শুরু করে দিল পাখার বাতাস নাড়া।

আগুন লকলকিয়ে উঠল। পাখা নাড়া ছেড়ে দিয়ে ভৈরব চায়ের কেটলিটা বসিয়ে তক্তপোশের ওপরে উঠে বসল।

দুচার কথা বলতে বলতে চা তৈরি হয়ে গেল। সে সময় রঙ্গস্বামী গুলশনের কাছে গুজবের কথা তুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু গুলশনের দ্রুততা দেখে আর কিছু বলল না। গুলশনও দু চুমুকে চা খেয়ে নিয়ে তার বাইকে গিয়ে বসল। তারপর বাইক চেপে সারিবদ্ধ বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাঢ় সন্ধেতে ভৈরব দেখল, কেমন যেন নিষ্প্রাণ, নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই খুপড়ি খুপড়ি সাদা রঙের বাড়িগুলো। মনে হয় ভূতের বাড়ি, পরিত্যক্ত বাড়ি। সেই ভূতের বাড়িতে আলো আঁধার রাতের একজন পথ হারানো পথিক পথ হারাল বা জাদুকরের মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

গুলশন চলে যাবার পর রঙ্গস্বামী বলল, আমি কিন্তু এ জায়গা ছাড়ব না। সারাটা জীবন তো এখানে কাটালাম। কেন ছাড়ব এসব?

ভৈরব চুপ করে থাকে। সেও ভাবছে তার প্রথম জীবনের কথা। ছিল বেকার। তার বাবা করত মুনিষের কাজ। বাড়িতে খেতে সাত-আটজন। কোথাও কোন কাজ নেই। লেখাপড়া জানা ছেলেদের কাজ হয় না — সে তো কোন ছার! বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল সে। ঘুরতে ঘুরতে আলাপ হল শহরের এক ডাক্তারের সঙ্গে। তিনিই গিয়াসুদ্দিন নামের রোড-কন্ট্রাকটরের কাছে ওকে পাঠিয়ে দেন। তখন গিয়াসুদ্দিন এই পাড়ার রাস্তা তৈরি করছিল। মেসিনপত্র, আলকাতরা, বিটুমেন, কয়লা সব সামলে রাখার জন্যে একজন ভাল লোক খুঁজছিল। ভৈরব সেই কাজ পেয়ে গেল। তখন তার বয়স আর কত? পঁচিশ-ছাব্বিশ।

ভৈরব দূরের অন্ধকারের মিশে যাওয়া বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবে, তারা তখন একটা পুকুরপাড়ে টিন, পাথর দিয়ে ঘেরা অস্থায়ী ঘরে থাকত। তার সঙ্গে থাকত গোপী। আর একজন থাকত — তার বাড়ি ছিল চারপাঁচটা গাঁয়ের পিছনে। আর তাদের উল্টোদিকে, রাস্তার ওপরে থাকত ঠিকাদারের অন্যান্য লোকজন। সেখানে রঙ্গস্বামী থাকত। তারা পাথরকুচি বইত, আগুন জ্বালাত, সেই আগুনে পিচ গলাত। গলা পিচ বালতি বালতি করে নিয়ে গিয়ে পাথরকুচির সঙ্গে মেশাত। কাজ শুরু হত ভোরে, দিনের কাজ শেষ হতে হতে অন্ধকার নেমে আসত।

হঠাৎ ভৈরবের হাসি পেল। তার মনে পড়ে গেল শান্তির কথা। ভৈরবরা যে পুকুর পাড়ে অস্থায়ী আস্তানা ফেলেছিল তার পাশেই একটা বড় পুকুর। শান বাধানো। পুকুরের উল্টোদিকে

কয়েকটা বাড়ি। বেশির ভাগ বাড়ি বড় বড় পাথরের চাঁই সাজিয়ে তৈরি। ছাদ তৈরি বিচিত্র দর্শনের টালি দিয়ে। বাড়িগুলোর মাছে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা মন্দির। পুকুরপাড়ে রাস্তার ওপরে বিরাট মহুয়া গাছ। মহুয়ার গন্ধে মাতাল হত সেখানকার চরাচর। অলস দুপুরে আলকাতরা, পিচ আঁকড়ে নিজের ঝুপড়ি ঘরে বসে থাকত ভৈরব। সঙ্গীরা চলে যেত দূরে যেখানে রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সেখানে। দখিন দিকের বাতাস পাবার জন্যে পুকুরের দিকে ভৈরবদের অস্থায়ী ঘরটির দেয়াল একটু ফাঁকা রাখা হয়েছিল। অলস দুপুরে শান্তি যখন থালাবাসন মাজতে ঘাটে নামত, অস্থায়ী ঘরের ভিতরে বসে বসে গোপনে শান্তিকে দেখত ভৈরব। ভরা দেহ নিয়ে শান্তি তার বাঁ পা-টা জলে ডুবিয়ে যখন থালাবাসন মাজত তখন মনে হত এক জলদেবী বসে আছে।

ভৈরবের হাসি হাসি মুখটা দেখে রঙ্গস্বামী বলল, ভৈরব, আমি উঠি। আজ তো আর কেউ আসবে না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। তারপর রঙ্গস্বামী উঠে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, শীতটা আজ বেশি মনে হচ্ছে। উনুনের পাশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। ভৈরব বলল।

রঙ্গস্বামী সেসব না শুনে চলে যাচ্ছিল। পিছন থেকে ভৈরব রঙ্গস্বামীকে ডাকল। রঙ্গস্বামী মুখ ফেরাতে ভৈরব প্রশ্ন করে, রঙ্গস্বামী, তোমার সেই মেয়েটার কথা মনে আছে, ঐ ভূমিকম্পের আগে আমরা যে পুকুরপাড়ে থাকতাম। সেখানে যে মেয়েটিকে দেখা যেত, সেই মেয়েটি!

দূরে দাঁড়িয়েই রঙ্গস্বামী একটু ভেবে নিয়ে উঁচু গলায় বলল, ওঃ, সেই মেয়েটি, তুমি যার লাভ-এ পড়েছিলে? ওঃ, তাকে দেখে তুমি কী হুইশিল না দিতে! তারপর হেঁ হেঁ করে একটু হেসে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, আজকের তো অনেক কিছুই মনে হবার কথা। তুমি ওসব ভাবো, আমি চলি।

উনুনের পাশে বসে বসে দু হাতের আঙুল ছাড়িয়ে তাপ নিতে থাকে ভৈরব। তাপ নিতে নিতেই সে দূরের অন্ধ পুরির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলো দেখতে লাগল। বাড়িগুলো যত দেখছে, ততই তার সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা মনে পড়ছে।

সেদিনের সমস্ত কিছু এখনও যেন তার সামনে ঘটে যাচ্ছে। তার মনে পড়ছে, মাঝরাতে হঠাৎ হাজার বাজ পড়ার শব্দ। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল। ছিল সে পুকুরপাড়ে সেই অস্থায়ী ঘরে। বড় বড় পাথরের চাঁই, টিন দিয়ে ঘর। ওপরে ত্রিপল। মুহূর্তে সেই ঘর ভেঙে পাশের পুকুরে। দেয়াল ভেঙে ভৈরবের পায়ে একটা বড় পাথরের চাঁই ঝুপ করে এসে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা। তাদের ঘরের কুপিটা তখন জ্বলছিল। সে দেখল তার কাছেই শোয়া গোপীবল্লভের মাথার ওপরে একটা পাথরের চাঁই। সে অতিকষ্টে পা টেনে বের করে গোপীকে ঠেলাঠেলি করেও ঘুম ভাঙাতে পারল না। গোপীর মাথা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। তখন তাদের ঘরটার অর্ধেকই পুকুরে চলে গেছে। আর পুকুরের জল রাস্তার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। চারিদিকে চিৎকার। ক্রন্দন।

অসহায় দৃষ্টি দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে ভৈরব এখন ভয় পাচ্ছে। তার মনে আসছে, সেদিন সে অতি কষ্টে বাইরে এসে বিদ্যুৎ চমকের আলোতে দেখেছিল পুকুরপাড়ের বাড়িগুলোর কোনটাই দাঁড়িয়ে নেই। দু একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে। আর রঙ্গস্বামীদের তাঁবু — সেটা যে ছিল তা বোঝার কোন উপায় নেই। তখন বৃষ্টির প্রকোপ কমেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, মাটি তখনও কাঁপছে। দূর থেকে হাওয়ার টান বেজে যাচ্ছে। ভয়ংকর আবহ।

উনুনের তাপ তখন কমে এসেছে। কিন্তু সেই তাপেও হাত রাখতে ভৈরবের অসুবিধা হচ্ছে। হাত সরিয়ে নিয়ে সে মনে আনার চেষ্টা করছিল, তারপর সে কী করেছিল। তার মনে পড়ছে, তখন তার পায়ের যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে যন্ত্রণা সে উপেক্ষা করেছিল। পাশে শোয়া গোপী মারা গেছে বুঝেও কিছু করতে পারে নি। ছুটে গেছে শান্তিদের বাড়িতে। তাদের বাড়ি মাটিতে মিশে গেছে। বড় বড় পাথরের চাঁই সরাবার লোক নেই। মাঝরাতে চিৎকার, কান্নায় বজ্রের শব্দও হার মানছে। এক লহমায় ভৈরব দেখেছিল, দু একজন ভাঙা বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসছে। চোখেমুখে আতঙ্ক। তারা বিহ্বল হয়ে উঠেছে। দৌড়াদৌড়ি চারিদিকে। কেউ কেউ নিজে বেরিয়ে এসে পরিবার-পরিজনকে খুঁজতে আরম্ভ করেছে। এরই মধ্যে তীব্র বাজ আর একবার পড়ল। ভৈরবের মনে হয়েছিল, কাছে কোথাও বাজটা পড়ল। তারই মধ্যে ভৈরব খুঁজে পেয়েছিল শান্তিকে। ভৈরবের ধারণা মত যে বাড়িটা শান্তিদের সে বাড়িতে সে কিন্তু শান্তিকে পায় নি। দু তিনটে বাড়ি ছাড়িয়ে আরো একটা ভাঙা বাড়িসংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় শুয়েছিল শান্তি। তখনও জ্ঞান ছিল তার। ভৈরব সেদিন পাঁজাকোলা করে শান্তিকে যখন বড় রাস্তার দিকে নিয়ে আসছিল তখন শান্তি তাকে দেখে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করেছিল। শুধু বলেছিল — জল। সেদিন শান্তির সে-কথা শোনার মত অবস্থা ছিল না ভৈরবের। সে শান্তিকে রাস্তায় শুয়ে দিয়ে ছুটেছিল অন্যজনকে আনতে। শান্তিকে আনার সময় সে দেখেছিল, একজন বৃদ্ধ তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন যে যখন যেভাবে পেরেছে আহত লোকজনকে কোলে, বুকে করে বড় রাস্তার ওপরে নিয়ে রেখেছে। রাস্তায় কত মানুষ শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। ভয়াবহ সে রাতের দৃশ্য এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভৈরব।

পুনরায় আগুনের তাপে হাত মেলে ধরে ভৈরব হাতে হাত ঘসতে থাকে। ঘসতে ঘসতে সে ভাবে, এই হাত দিয়ে সে শান্তিকে তুলে এনেছিল। শান্তিকে সে ছুঁয়েছিল আরো একবার। সেবার রামলীলা দেখে বাড়ি ফিরতে একটু রাত করেছিল শান্তি। পথে গা ছমছমে অন্ধকার। শান্তি জানতো, এই রাস্তায় কোন অসুবিধা নেই। তবুও ভয়। ভৈরব নিয়েছিল শান্তির পিছু। পথে যেখানে পাহাড়ী ঝর্ণার গতিপথ বেঁকে গেছে সেখানে ভৈরব ধরে ফেলেছিল শান্তিকে। শান্তির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, ভয় নেই। চলো। তারপর শান্তির হাত ছুঁয়েছিল। অবশ্য শান্তি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা রাস্তা হেঁটেছিল। কোন কথা বলেনি। আর এর আগে শান্তি এই হুইশিল দেয়া ছেলেটাকে চিনে ফেলেছিল। সে পুকুরঘাটে এসে ভৈরবদের সেই অস্থায়ী আস্তানার দিকে তাকাত। ভৈরব গোপনে দেখত তাকে, বুঝতে দিত না। আর পুকুরঘাট থেকে বাড়ির পথ ধরতেই ভৈরব দিত তীব্র হুইশিল। নির্জন দুপুরে এই হুইশিল পেত স্বতন্ত্রমাত্রা।

বড় রাস্তা দিয়ে একটা পাঞ্জাব-বডি লরি তুফান তুলে চলে গেল। অন্ধকারে ডুবে থাকা পাড়াটা কেঁপে উঠল। ভৈরব রাস্তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তার রাতের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত হল।

সকালে তুলে রাখা আটার দলা হাত দিয়ে চেপে চেপে সে রুটি তৈরি করছে। নিভন্ত আঁচে তাওয়া-এর ওপরে রুটি রেখে পুনরায় চিন্তা মগ্ন হল ভৈরব। ভূমিকম্পের পরের দিনই শহর থেকে লোকজন ছুটে এসেছিল। ডাক্তার-বদ্যি। ওষুধ-পত্তর। কিন্তু সে সেই ভয়ংকর রাতে লোকজনদের কে রাস্তায় বয়ে নিয়ে আসার পর নিজেই সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পায়ের যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার মনে আছে যখন তার জ্ঞান

ফিরল তখন সে একটা মেডিক্যাল ক্যাম্পে শুয়ে। সাতদিন পরে শহরের হাসপাতালে পাঠানো হয় তাকে। তার কদিন পরে ডাক্তারবাবুরা অপারেশন করে তার বাঁ পায়ের পাতাটা বাদ দিয়ে দিয়েছিল। ভূমিকম্পের দাগ, ভূমিকম্পের দায় এখনও বয়ে চলেছে ভৈরব।

রাস্তার দিকটা এখন কালো, গভীর কালো। এসময়ে শীত যতটা না গভীর, তার থেকে আরো গভীরতর বলে মনে হয়। লাঠি না নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠোনে নেমে বেঞ্চগুলো তুলল ভৈরব। তার খাটিয়াটা তুলতে গিয়ে আবার রাস্তার দিকে তার নজর গেল। কারা যেন অন্ধকারের বুক চিরে হাঁটতে হাঁটতে তার দোকানের দিকে আসছে। সে তার খাটিয়াটা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাবে, এখন তো কারুর আসার কথা নয়। তবে কি কারুর বিপদ আপদ হল?

ভৈরবের সামনে এসে দাঁড়াল দুজন। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত এক যুবক আর এক পঞ্চাশ উত্তীর্ণা মহিলাকে ধরে ধরে এনে ভৈরবের সামনে দাঁড়াল। বিস্মিত ভৈরব। কারণ এরা তাদের পাড়ার কেউ নয়। সে তাদের দেখেনিও কোনদিন। সে ভাবল, হয়ত কারুর বাড়িতে এরা যাবে। পথের খোঁজ চায়, বাড়ির খোঁজ চায়। কিন্তু পরক্ষণে ভাবে এখন তো আসার কোন বাস নেই। সেই ভোর পাঁচটায় আপ আর আটটায় ডাউন। ফের বিকেলে দুটোয় আপ, চারটেয় ডাউন। আর সে বাস তো চলে গেছে। তবে? সুতরাং এরা হঠাৎ কীভাবে এখানে এসে পৌঁছাল? সে তাই আরো বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, কোথায় যাবেন আপনারা?

মহিলাটির সঙ্গে থাকা ছেলেটি বলল, আমরা শহরে যাবো। কিন্তু বিকেলের বাস ফেল করেছি। ইনি আমার মা। এখানে আমাদের কেউ চেনে না। আজ রাতটুকু আপনার বারান্দায় থাকতে দেবেন? সকালেই চলে যাব। এখানে তো কোন দোকানপাট নেই। রাস্তায় এখন লোকজনও নেই। আপনার দোকান দেখে চলে এলাম। আমার মা অন্ধ। আমাদের খুব অসুবিধা। শুধু রাতটুকু থাকার জন্যে এসেছি।

ছেলেটির কথায় জাদু আছে। তার কথাগুলো ভৈরবের ভাল লাগল। মিষ্টি মিষ্টি। মুখে ভৈরব কিছু বলল না।

ভৈরব কোন কিছু বলছে না শুনে মহিলাটি বলল, আপনার কোন অসুবিধা হবে না। রাতটুকু একটু থাকতে দিন।

ভৈরব খাটিয়া নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে ঢোকাচ্ছে দেখে ছেলেটি বলল, আমি তুলে দিচ্ছি। তারপর তার মাকে দাঁড় করিয়ে খাটিয়াটি এনে ভৈরবের ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

ভৈরব বলল, মাকে নিয়ে এসো। আমি চা করে দিই। তারপর নিভন্ত আঁচে পুনরায় গোবর লাদি গুঁজে দিতে লাগল ভৈরব।

এখন ওরা সকলে ঘরে বসে চা খাচ্ছে। চা খেতে খেতে ছেলেটি বলল, সারাদিনে এই প্রথম চা খেলাম।

তা আপনারা এদিকে কোথায় এসেছিলেন? ভৈরব প্রশ্ন করে।

এই যে মায়ের শখ। তাঁর গ্রাম দেখতে এসেছেন। মাকে বললাম, তোমার ফেলে আসা সে গ্রাম কি আর দেখতে পাবে, তা শুনল না। ছেলেটি বলল।

এবার কথা বলল সেই অন্ধমহিলা। তার হাতে ধরা চা তখন শীতল হয়ে গেছে। চুমুক দিতে দিতে থেমে গিয়ে ছেলের কথা শুনছিল। বলল, তা আমি কী করে জানব? সেসব তো সেই ভূমিকম্পের সময়কার কথা।

ভূমিকম্পের সময় আপনি এখানে থাকতেন? কোন্ পাড়ায়? অবশ্য এখন তো আর

পাড়াটাড়া নাম নেই। ভূমিকম্পের পরে সবটাই পাল্টে গেছে। সেবারের ভূমিকম্পে আমাদের পুরো গাঁ আর পাশের গাঁটা মুছেই গেছিল। সবই নতুন করে তৈরি হয়েছে। সেবার কমসে কম দু আড়াই হাজার লোক মারা গেছিল। আমি দেখেছি। শিয়ালকুকুর যে-সব মৃতদেহ ছোঁয়নি, শকুন সেসব ছিঁড়ে খাচ্ছে। লোকে সাতদিন ধরে টানা কেঁদেছে। যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের মত সে কষ্ট কেউ বুঝতে পারবে না। কত লোক নিখোঁজ হয়ে গেল। কতলোক পাগল হয়ে গেল। কতজনে পঙ্গু হয়ে গেল। আমার তো মাত্র একটুখানি পা গেছে। কতলোকের কত আপনজন, প্রিয়জন চিরদিনের জন্যে চলে গেল। অনেক ফ্যামিলির সকলেই মারা গেল। সে সমস্ত দিনের কথা মনে পড়লে এখনও শিউরে উঠি। তারপর একটু থেমে বলল, আচ্ছা, আপনি কোন পাড়ায় থাকতেন?

অন্ধমহিলা বিড়বিড় করে কিছু বলল। সে কথা ভৈরব বুঝতে পারল না। সে পুনরায় প্রশ্ন করে। কোন পাড়া বললেন?

এবার মহিলাটির ছেলে উত্তর দিল, পুরুষোত্তমপল্লীতে।

মনে মনে ভৈরব পুরুষোত্তমপল্লী জায়গাটা খুঁজতে আরম্ভ করে। কিন্তু সে খুঁজে পায় না। সে বলল, ভূমিকম্প সব শেষ করে দিয়েছে। মানুষও হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে গাঁ, পল্লী। ভূমিকম্পের পরে বছর দুয়েক তো এরকমই হাল ছিল। চারিদিকে ধ্বংসের স্তূপ। একজন পত্রকার বলেছিল, মনে হচ্ছে হিমালয় পাহাড়টাই ফেটে চৌচির হয়ে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এখন তো প্লট নম্বর দিয়ে নাম। আমরা অবশ্য সাঁওতাল ব্লক, মাইনস ব্লক বলে ডাকি। তা আপনাদের কোন আত্মীয়স্বজন, কেউ থাকে না এখানে?

ছেলেটি একটা বড় রকমের হাই তুলে বলল, না, না, কেউ নেই। কিছুদিন আগে শহরে অনেক পোস্টার পড়ে। তাতে লেখা ছিল, ভূমিকম্পের হতাহতদের জন্যে প্রার্থনাসভা হবে এখানে। এই গ্রামে। মা-ও বেশ কিছুদিন ধরে নিজের জন্মভূমি দেখবে দেখবে করছিল। তাই আজই নিয়ে এলাম। প্রার্থনাসভা তো হল। মন্ত্রীর বক্তৃতাও শুনলাম। কিন্তু মা তো কিছুতেই নিজের ভিটে খুঁজে পেল না। কেবল বলে একটা বড় পুকুর আর তার পাশে একটা বড় গাছ। তা কোথাও সেরকম বড় গাছ দেখতে পেলাম না। একজন একটা মহুয়া গাছের খবর দিল। সে এই রাস্তা থেকে অনেক—অনেক দূরে। সেখানকার লোকেরা মায়ের বাড়ির লোকজনের নামটাম শুনেও কিছু বলতে পারল না। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল বলে লাস্ট বাসটা মিস করলাম।

তোমাদের ঘুম পেয়েছে। সারাদিন ঘুরেছ তো। ঠিক আছে, এখানে থাকো। কোন অসুবিধা হবে না। রুটি আর পিঁয়াজ আছে, চলবে? ভাল দুধ আছে। ঐ দুধটুকুই এ তল্লাটের পুরনো অস্তিত্বটা বজায় রেখেছে। দুধ অবশ্য চালান হয়ে যাচ্ছে মিল্কে — ডেলি দুবার। কিন্তু এখনও খাঁটি আছে। কষ্ট করে চালিয়ে নাও রাতটুকু।

মহিলা বলল, না, না। আমাদের লাগবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা শুধু রাতটুকু থাকব। এই তো ভাল চা খেলাম।

চা খেয়েই রাত কাটানো যায়? প্রশ্ন করে ভৈরব। তারপর বলল, আমার কোন অসুবিধা হবে না। রুটি তো তৈরিই আছে। একা মানুষ তো, রাতে তরকারি করি না। ঐ দুধ দিয়েই হয়ে যায়।

ছেলেটি তার সঙ্গে রাখা ব্যাগ খুলে একটা চাদর বের করে তার মাকে দিয়ে বলল, এখানে

শীতটা বেশি। তুমি এটাও গায়ে দাও।

সেটা লক্ষ্য করে ভৈরব বলল, আপনার ছেলে কিন্তু খুব মা-ভক্ত।

মহিলাটি হাসল। বলল, এও ভাগ্য। ভাগ্যিস ফাদার যোশেপ ছিলেন। ভূমিকম্পে আমার মরে যাবার কথা ছিল। আমাদের বাড়ির সকলে মারা গেছিল। আমিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। হাসপাতালে ছিলাম প্রায় ছ'মাস। চোখটা হারিয়ে হাসপাতালেই বহুদিন ছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে নিতে যায় নি। হাসপাতালই ফাদারের সঙ্গে কথা বলে আমাকে তাঁর কাছে দিয়ে দিয়েছিল। তাঁর একটা হোম ছিল। সেখানেই ছিলাম ক'বছর। তারপর আমার বিয়ের ব্যবস্থা তাঁরাই করে। রজতের বাবা তখন বেকার। কিন্তু আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তিনিও ভূমিকম্পের পরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর আগ্রহে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। শহরে এখন ওর বাবার দু দুটো ওষুধের দোকান। রজত এবার পাশ করলে কলেজে ঢুকবে।

মহিলার কথা শুনতে শুনতে ভৈরব ওদের রাতের খাবার দিয়ে দিল। ওদের কথামত ভৈরবও ওদের সঙ্গে নিজের খাবার নিল। খেতে খেতে ভৈরব বলল, আচ্ছা, পুকুরটার কাছে যে বড় গাছটার কথা বলছেন, সেটা কি মহুয়া গাছ ছিল? গাছটার পাশ দিয়ে পাড়ায় ঢোকার পথ? সেই পথের ধারে একটা মন্দির?

যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছে সেই অন্ধমহিলা। তার খাওয়া গেছে থেমে। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন তো জায়গাটা এখান থেকে ঠিক কোন্‌দিকে? রজত, জেনে নে।

সে জায়গাটা আর নেই। ভূমিকম্প খেয়ে নিয়েছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল ভৈরব। বলল, ভূমিকম্পের বছর দুই পরে কী সব প্রজেক্ট ফ্রজেক্ট হল। এইসব বাড়িটাড়ি তৈরি হল। লম্বা-চওড়া রাস্তা হল। আর সেই সময় পুকুরটা ভরাট করে দিল। মহুয়া গাছটা তো ভূমিকম্পের দিনেই শুয়ে পড়েছিল। মন্দির ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। সেই জায়গায় ফার্টিলাইজার ব্লক হয়েছে।

ভৈরবের এই বর্ণনার পর সকলে চুপ হয়ে থাকল। কারুর মুখে কোন কথা নেই। ছেলেটি দুধের গ্লাস মুখে তুলে তার মায়ের দিকে তাকাল। মা খাওয়া বন্ধ করে বসে আছে। তার চোখে জল। তা দেখে ছেলেটি প্রশ্ন করল, কী হল মা, তোমার চোখে জল?

না, কিছু নয়। রাত হয়েছে তো। ঘুম আসছে। মহিলাটি বলল।

এতক্ষণ খেয়াল করেনি ভৈরব। অন্যদিনের রাতের মত আজও চারিদিক নিঃস্তব্ধ। এই নিঃস্তব্ধতায় রাতও নামে দ্রুত। রাতের রঙ হয় গভীর। রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক্টর চলে গেল দীর্ঘসূত্র শব্দ করতে করতে। হয়ত খুব ভোরে তারা মাটি তৈরির কাজ শুরু করে দেবে — তাই মাঠে পৌঁছে যেতে চাইছে। ভৈরব ভাবে নাতো এই রাতে ট্রাক্টর যাবে কোথায়? ভৈরব বলল, কষ্ট করে শুতে হবে কিন্তু। এই খাটিয়ায় একজনের বেশি হবে না। তারপর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বেঞ্চগুলো জুড়ে শুয়ে পড়।

আপনি? প্রশ্ন করে রজত।

দোকানে। দোকান কাপড় দিয়ে ঘিরে দিলেই ঘর। আমার এসব অভ্যেস আছে। রাত হয়ে গেছে। শুয়ে পড় তোমরা। ভৈরব বলল।

আচ্ছা দেখি, আপনি বাইরে শুতে পারবেন কিনা, বলে রজত বাইরে চলে গেল। সে সময় মহিলাটি ভৈরবকে প্রশ্ন করল, দেখছি আপনি ভূমিকম্পের সব খবর জানেন। তখন রাস্তা

মেরামতি করার জন্যে পুকুরপাড়ে ঘর তৈরি করে কতকগুলো কুলি কাজ করত। তাদের কী হল?

হাসে ভৈরব। বলল, না, কয়েকজন মারা গেছিল। খুব নিস্পৃহ তার কণ্ঠ।

মাঝরাতে উঠে পড়েছে রজত। চলে এসেছে ঘরের বাইরে। শহরমুখী রাস্তাটা দেখলে মনে হয়, এ রাস্তা স্বর্গের দিকে গিয়েছে। জায়গাটা এখন এক স্বপ্নপুরি মনে হচ্ছে। মনে হয়, জায়গাটা ধ্যানে বসেছে। সে ভাবছে, এই হল তার মায়ের জন্মভূমি। তার মায়ের ছেলেবেলা এখানে কেটেছে। যৌবনের অনেকটা সময়ও। অথচ তার মা কোন পরিচিত লোকজনকে দেখতে পেল না। সে মানে, তার মা অন্ধ। তবু সেই ফেলে আসা দিনের জন্যে, লোকজনের জন্যে এখানে চলে এসেছে তার মা। কিন্তু সময় কী নিষ্ঠুর! মায়ের সাধ তো পূরণ হল না। এই সব ভাবতে ভাবতে বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল রজত। রাস্তাটা এখন ঐন্দ্রজালিক আলোয় ভরে আছে।

একটু পরে তার মনে হল তাদের প্রথম বাসটা ধরার কথা। দোকানটায় ফিরে মাকে ঘুম থেকে তুলতে হবে। দীর্ঘযাত্রার প্রস্তুতিতে সময় একটু নেবে। তাই সে বেশি দূর না গিয়ে ফিরে এল। এসে দেখল, ভৈরব তখনই তার উনুনে আঁচ ধরিয়ে দিয়েছে।

রজত বলল, এখনও তো রাত আছে। এরকম সময়ে প্রতিদিন দোকান খুলে দেন? খদ্দের কোথায়?

নাহ্, আজ তোমরা যাবে, তাই। ভৈরব বলল।

তাতে কী হয়েছে? মা উঠলে আমরা গুছিয়ে নেব। ফার্স্ট বাসেরও তেমন দেরি নেই। রজত বলল।

না, তোমরা একটু চা খেয়ে যাবে। তার ব্যবস্থা করছি। ভৈরব বলল।

নিজেদের ব্যাগ ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে মহিলাটি তার ছেলের সঙ্গে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল। একটু এগিয়ে গেলেই বাস স্টপ।

ভৈরব ওদের সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়াল। রজতকে অযাচিতভাবে বলল, মায়ের কথা শুনো। পড়াশোনা ভালভাবে করে কলেজে ঢুকো। তোমার মা তো তাই চাইছেন। ওঁর আশা পূরণ কোরো।

রজত হাসল। তারপর বলল, চলি।

ওরা ক্রমশ অনেকটা দূরে চলে গেল। কুয়াশার স্তরে ওরা অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ভৈরব ওদের দেখছে খুব আবছা। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভৈরব হঠাৎ তার মুখটা হাঁ করে দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে শরীর বেঁকিয়ে এক তীব্র হুইশিল বাজিয়ে দিল। পুরো তল্লাটটাতে যেন এক সঙ্গে অনেকগুলো হুইশিল বেজে উঠল।

ছেলের হাত ধরে বাস স্টপের দিকে যেতে যেতে মহিলাটি দাঁড়িয়ে গেল।

রজত জিজ্ঞাসা করল, কী হল, দাঁড়ালে কেন?

কে এসময়ে হুইশিল দিল বল তো? যার দোকানে ছিলাম, সেই লোকটা, না? প্রশ্ন করে মহিলাটি।

হ্যাঁ, মা। সেই লোকটা।

বাষট্টি নম্বর কেবিন

বন্দনা সান্যাল

আমি অনিমেষকে বললাম দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিতে। বিকেল হয়ে গেছে, ঘরের কোণে একটু অন্ধকার এখনই জমে উঠেছে। আলো আসুক। অনিমেষ, আমার স্বামী, খবরের কাগজটা রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কাগজটা বেশ কিছুক্ষণ ওর হাতে ছিল বটে, কিন্তু আমি জানি ওটা ও পড়ছিল না। আমাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে ও জানলা খুলতে এগিয়ে গেল। নিশ্চয় দেখে নিল আমার গায়ের ঢাকাটা ঠিকঠাক আছে কি না। জানলা খুলতেই একটা ফুরফুরে হাওয়া ঘরে এসে ঢুকল। অন্ধকারটাও কমে গেল। কিন্তু অনিমেষ ফিরে এসে বসল না, জানলার ধারে দাঁড়িয়েই থাকল। ওখানে হয়তো কোনও কৃষ্ণচূড়ায় ফুল ফুটেছে, কিংবা জারুলের গভীর বেগুনী... । এখানে, এই বাষট্টি নম্বর কেবিনে দীর্ঘদিন শুয়ে শুয়ে আমি অনিমেষকে, শুধু অনিমেষ কেন আরও অনেককেই, একটু একটু করে আবিষ্কার করেছি। এটা একটা খেলার মত, সময় কাটে বেশ। আমার মনে হয়, ঐ যে ওখানে আমার নানা প্রত্যঙ্গের এক্সরে প্লেটগুলো অনিমেষ সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে, আমার মনের মধ্যেও ঐ রকম অনেক এক্সরে প্লেটে অনেক ছবি সাজান হয়ে চলেছে। এই ঘরে, এই স্থাবর সময়ে, সে সব নেড়ে চেড়ে দেখার অফুরন্ত অবসর।

ভিজিটিং আওয়ার বোধহয় শুরু হল। বাইরে মেলা লোকজনের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি যেন। ঐ তো পি.কে ঢুকছে!

"হ্যাল্লো শর্মিলা, কেমন আছো? এই তো আজ বেশ fresh দেখাচ্ছে!" বলতে বলতে হৈ হৈ করে পি.কে এসে বিছানার পাশে দাঁড়াল।

"তুমি বোস, আমি এই ফাঁকে ওষুধটা কিনে আনি," বলে অনিমেষ বেরিয়ে গেল।

পি.কে আমাদের দু'জনেরই খুব বন্ধু। অনিমেষের মফঃস্বলে পোস্টিংএর দিনগুলোতে বেশ দু'তিন জায়গায় আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তারপর ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে আবার কলকাতায় দেখা। বাইরে থাকতে আমরা তিনজন কত মজা করেই না ওর 'পুরাতন ভৃত্য' রঘুদার হাতের দুর্দান্ত রান্না খেয়ে ওরই গাড়িতে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি। শুধু সেবার কি জানি কি হ'ল? সেই দুর্যোগের রাতে সোনাখাঁড়ির বাংলোতে, এখন ভাবলে হাসিই পায়। অনিমেষ সে দিন ট্যুরে গিয়েছিল। বিকেলে একলা বারান্দায় বসে ভাবছি কি করা যায়, হঠাৎ পি.কে র আবির্ভাব। "একলা বসে যে? অনিমেষ কোথায় গেছে?"

"যেখানে সব সময় যায়। কাজে। শিলিগুড়ি গেছে, ফিরতে রাত হবে বলে গেছে, আজ নাও ফিরতে পারে।"

"ও, তাই রাগ করে গাল ফুলিয়ে বসে আছ? নাও, নাও, চটপট রেডি হয়ে নাও। না কি রেডি হয়েই আছ। দারুণ সাজ দিয়েছ তো!"

"কোথায় যাব?"

"আরে, আমি রতনপুর যাচ্ছি, একটা কাজ পড়ে গেছে। ফিরতে বেশি দেরী হবে না,

অনিমেষের আগেই এসে যাব। চল, চল, রঘুদা দারুণ চিকেন কাটলেট বানিয়ে দিয়েছে, ওখানে বসে জমিয়ে খাওয়া যাবে।" ব্যাচেলার মানুষ, কিন্তু পি.কে বেশ নিখুঁত সংসারী। বিশেষতঃ খাবার-দাবারের ব্যাপারে।

আমার মনে হ'ল, সত্যিই তো সেজেগুজে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। ইদানীং অনিমেষের এসব উট্‌কো কাজে ব্যস্ত থাকাটা বড্ড বেড়ে গেছে। বেশ শিক্ষা হবে। পি.কে-র সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার একটা নৈতিক সমর্থন আমি এভাবেই খাড়া করেছিলাম।

আজ এতদিন পরে, এই বাষট্টি নম্বর ঘরে আমার রোগশীর্ণ হাতটা ধরে পি.কে আবার সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিল কেন কে জানে।

"চট্‌পট ভাল হয়ে নাও। এই ডিসেম্বরে আমার রতনপুরে একটা কাজ পড়েছে। টানা গাড়িতে যাব, দু'রাত্তির থাকব। এবার অবশ্য অনিমেষ থাকবে সঙ্গে। মনে আছে তোমার, সেবার কি কাণ্ড! সোনাখাঁড়িতে আচমকা বান ডেকে ফেরার রাস্তা বন্ধ। আমরা ফরেস্ট বাংলোতে বন্দী। এদিকে রাতও বাড়ছে, আমার tensionও বাড়ছে। অনিমেষ বাড়ি ফিরে তোমাকে না দেখে তো ফায়ার হয়ে যাবে। পাহাড়ী নদীর বান, কখন জল নামবে কিছু ঠিক নেই।"

মনে নেই আবার। এখন tension এর কথা বলছে বটে কিন্তু সেদিন পি.কের চোখ অন্য কথা বলেছিল। আমার বুঝতে অসুবিধে হয় নি। তাই জোর দিয়েই বলেছিলাম, যত রাতেই জল নামুক, আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। ফিরেছিলাম রাত একটায়। অত রাতেও পাশের কোয়ার্টারের জানলা খুলে আমাদের দেখে নিতে মিসেস চক্রবর্তীর ভুল হয়নি। এ নিয়ে পরে পড়শীমহলে কিছু ফিসফাসও হয়েছিল। আর স্বভাবশান্ত আমার স্বামীটির রাগ দেখেছিলাম বটে পরের দিন। তারপর থেকে কতদিন দুই বন্ধুর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এখন সে সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

অনিমেষের চোখের সামনে, বুঝতে পারি, আমার অসুখটা একটা কালো পর্দার মত নেমে এসে আমাদের দু'জনকে আর সব কিছু থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এতদিনে এমন করে এত নিবিষ্ট হয়ে পরস্পরকে জানা বড় কষ্টকর, যখন জানি ক'দিন পরে এই পর্দা সরিয়ে, এই ঘর ছেড়ে আমাকে বেরিয়ে যেতেই হবে।

পি.কের দিকে তাকিয়ে ওর প্রস্তাব শুনে একটু হাসলাম। ইচ্ছে হ'ল উল্টো দিকে পাশ ফিরে শুই। কিন্তু গলা ফুটো করে খাবারের নল লাগান, খুলে গেলে সিস্টার এসে বকুনি লাগাবে। কিছুদিন থেকে এই নল দিয়েই খাওয়ার প্রহসন চলছে। অনিমেষ ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছে 'নলেশ্বরী'।

পি.কে এবার দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওষুধ হাতে অনিমেষের সঙ্গে দরকারি কথাগুলো সেরে নিচ্ছে। আমি না তাকিয়েও দেখতে পাচ্ছি ওদের দু'জনের মুখে একই চিন্তার ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ার নাম মৃত্যু, সেই ছায়ার নাম শর্মিলা। আবার, সেই ছায়ার নাম ফিরে পাওয়া বন্ধুত্ব। এই সব সঙ্কটের সময় ভালো আর মন্দের একটা পরিশুদ্ধিকরণ ঘটে যায় মানুষের চরিত্রে, ভালোটা ভেসে ওঠে, মন্দটা তলিয়ে যায়। আমার মনের এক্সরে প্লেটগুলো তো তাই বলে।

এবার বোধহয় রাসু এল। রাসবিহারী। কে যে ওকে এই সেকেলে নামটা দিয়েছিল! আমার এই খুড়তুতো দেওরটি শেষের এই দিনগুলোতে বড় কাছে এসে পড়েছে। নইলে আমরা

থাকতাম বাইরে বাইরে, ওরা থাকত কলকাতায়, কোন যোগাযোগই ছিল না। কসবায় একটা ছোট্ট একতলা ভাড়া বাড়িতে আমার বিধবা খুড় শাশুড়ী তাঁর একমাত্র ছেলে রাসুকে নিয়ে থাকতেন। এদিকে আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন দুঁদে উকিল। বাংলাদেশে রাজশাহীতে ওঁদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। হাঁকডাক করে, ব্যবস্থা করে প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিলেন। শরিক হিসেবে রাসুরও তাতে ভাগ পাওয়ার কথা, কিন্তু সে তখনও নাবালক, আর তার মা অসহায়। বারবার চিঠি লিখেও ভাসুরের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। একলাই লড়াই করে ছেলেকে মানুষ করলেন। সামান্য ব্যাঙ্কের কেরাণী এই ছেলেটার হৃদয়টা অনেক বড়। আমরা যখন নিউ আলিপুরের বাড়িতে জাঁকিয়ে বসলাম, অনিমেষ সরকারী চাকরি চেড়ে দিয়ে অনেক বেশি মাইনেতে প্রাইভেট ফার্মে কাজ পেল, আমাদের একমাত্র সন্তান অনির্বাণ — অনি — পি.এইচ.ডি করতে বিদেশে চলে গেল আর আমার এই অসুখটা ধরা পড়ল — ততদিনে আমাদের বাড়িতে রাসুর আসা যাওয়াটা নিছক লৌকিকতা থেকে নিখাদ ভালবাসার তাগিদে নিয়মিত হয়ে পড়েছে। হয়ত বা প্রয়োজনের তাগিদেও। অনি চলে যাওয়ার পর থেকে আমরা কিছুটা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। তার উপর এই অসুখ। প্রথম প্রথম অনিমেষ রাসুর ঘনঘন আসা যাওয়াটা বিশেষ পছন্দ করত না। বোধ হয় ওর বাবার সঙ্গে রাসুর মায়ের বিবাদের কথা মনে করে। পদমর্য্যাদার অহঙ্কারও কিছুটা কাজ করে থাকবে। কিন্তু অসুখটা যখন রেসের ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছল এই বাযট্টি নম্বরের গোল পোস্টে, তখন রাসু ছাড়া আমাদের আর গতি থাকল না। এই এক মাসে এমন একটা দিন যায়নি যখন ও খেটেখুটে বাড়ি ফেরার আগে একবার বৌদি বলে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি।

"আয়, ঐ চেয়ারটা টেনে বোস। অফিস থেকে সোজা এসেছিস মনে হচ্ছে। খাস নি কিছু?"

"আর বোল না, বৌদি, যা একখানা খাবার জায়গা খুঁজে বের করেছি না, একেবারে ফ্যান্টা!"

"কোথায়?"

"এই কিড স্ট্রীটের কাছে গলিঘুঁজির মধ্যে এক সর্দারজীর দোকান, বুঝলে, এক প্লেট পুরি আর মটর পনির খেয়ে যখন উঠলাম, মাইরি বৌদি —" খাবারের কথা মনে করে রাসু সশব্দে ঢেকুর তুলল।

"ফের মাইরি! আর কতবার বলেছি না অসভ্যের মত ঢেকুর তুলবি না!"

ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত সব জায়গায় আমার খাওয়াটা অনিমেষ মোটে বরদাস্ত করতে পারত না। ওর জিভ আলগা, কথাবার্তাও। "বৌদি চটপট ভাল হয়ে নাও। তোমাকে একদিন নিয়ে যাব ওখানে।"

ভাল হয়ে নাও! রাসু আর পি.কে একই ভাষায় কথা বলছে। যারা আমাকে দেখতে আসে, সবাই এখন এই ভাষায় কথা বলে। যেন একটা সাঙ্কেতিক ভাষা, যার দু'রকম মানে হয়। আমার মানেটা ওদের থেকে আলাদা। চট্‌পট্ ভাল হয়ে যাওয়ার মানে আমার আর ভাল হওয়া হ'ল না।

ইতিমধ্যে দরজা ঠেলে ডঃ মিত্র ঢুকেছেন। পিছনে আমার কেস রিপোর্ট নিয়ে নার্স। তার পেছনে অনিমেষ। সুপুরুষ মাঝবয়সী ডাক্তার, দেখলে মনটা ভাল হয়ে যায়।

"এই যে মিসেস চৌধুরী, আজ কেমন লাগছে? রিপোর্টে তো সব ও.কে" ডাক্তার তাঁর

নিয়ম মাফিক পরীক্ষাগুলো সেরে নিয়ে বললেন, "কাল সকালে তাহ'লে রেডিয়েশানের জন্যে তৈরী থাকবেন, জেকব ঠিক আটটায় এসে যাবে"

"এবার কোথায়? ব্রেন-এ?"

"হ্যাঁ, গোটা আস্টেক নিতে পারলে এখনকার মত নিশ্চিন্ত"

"ওটা তো শুনেছি অজেয় দুর্গ"

"কিসের?" ডাক্তার ঠিক বুঝতে পারলেন না।

"এই অসুখটার আর কি! ওখানে আশ্রয় নিতে পারলে তো শুনেছি আপনার রে ফে সব কুপোকাৎ?"

"দেখাই যাক না। আমরা ডাক্তার, রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করাই আমাদের কাজ।" সুন্দর করে হেসে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। পেছনে অনিমেষ আর রাসু। এবার ওরা অন্য ভাষায় কথা বলবে, আমাকে এড়িয়ে। কিন্তু আমি এখান থেকে সব বুঝতে পারব। এর আগে আমি বেশ কয়েকবার 'রে' নিয়েছি। এখানে এসেছি একমাস হয়ে গেল। এটা আমার আর একটা বাড়ির মত হয়ে গেছে। কাল আটটায় জেকব আসবে হুইল চেয়ার নিয়ে। আমার সঙ্গে বকর বকর করতে করতে নিয়ে যাবে কোবাল্ট চেম্বারে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে পথ। মানুষের যন্ত্রণার বিভাগীকরণ হয়েছে চিকিৎসার সুবিধার জন্যে। এ সব দেখে আমার যাতে মন খারাপ না হয় তাই জেকব চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে দ্রুত বলে যাবে ওর এনগেজমেণ্ট আর অদূরবর্তী বিয়ের কথা। এই আধাশহর আধাগ্রাম জায়গাটাতে মিশনারীরা বেশ জাঁকিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কাছেই একটা সুন্দর চার্চ আছে, আসার দিন দেখেছিলাম। ভালই করছে। বাংলাদেশের অন্য গাঁগঞ্জের চাইতে এ জায়গাটা অনেক পরিচ্ছন্ন। জেকবের সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হয়েছে এরা বেশ সৎ ও পরিশ্রমী। ওর ভাবী স্ত্রী মারিয়া, যার আগে নাম ছিল কমলা, এই হাসপাতালেই আয়ার কাজ করে। এখন ওর ডিউটি পড়েছে ক্যান্‌টিনে, মোটে সময় পায় না! নয় তো আমার কাছে প্রায়ই আসত গল্প করতে।

এবার আমরা রেডিয়েশান সেন্টারে ঢুকে পড়ব। এ জায়গাটার একটা অতি প্রাকৃত চেহারা আছে। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছিল প্রথম যখন ঢুকি। প্রথমেই একটা লম্বা সুড়ঙ্গ, যার ছাদটা কাঁচের। কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে যা ঠিক আলোর মত নয়, অন্ধকার হওয়ার আগের অবস্থার মত। ঐ সুড়ঙ্গে ঢোকার সময় এমুখ থেকে ওমুখে দেখা যাবে কিছু প্রতীক্ষারত মানুষ। রোগী এবং রোগীর আত্মীয়স্বজন। হঠাৎ দেখলে মনে হবে চিত্রগুপ্তের রোল কলের অপেক্ষায় বসে আছে। সবটা একটা স্যু রিয়ালিস্টিক পেন্টিংএর মত।

দরজায় আওয়াজ হ'ল। এবার রাসুর মা এসে ঢুকলেন।

"ও মা, একলা এলেন কাকীমা?"

"না, না। ঐ আমাদের পাড়ার একজনরা এল, ওদেরও এখান রুগী আছে কি না। তাই ওদের সঙ্গেই চলে এলাম। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। একলা আসতে তো সাহস পাই না, আর রাসুও অফিস থেকে সোজা আসে। তা, আজকে আছ কেমন?" আমার হাতটা সস্নেহে তুলে ধরে কাকীমা বলেই ফেল্‌লেন, "ইস্। কি রোগা হয়ে গেছ!" সহজ সরল মানুষ, এখনও সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলতে শেখেন নি, যা মনে হয় বলে ফেলেন। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে চাইলেন, যেমন মা মাসিদের ইচ্ছে করে এরকম সময়। আমারও মন

চাইছিল, কিন্তু হাঁ হাঁ করে উঠলাম,

"হাত দিলেই ফসফস করে সব চুল উঠে যাচ্ছে, কাকীমা, এবার একদম নেড়া হয়ে যাব"

"পাগল মেয়ে, উঠে গেলে শুনেছি আবার হয়?"

"শুনেছি তো। সেই ভরসা। বাড়ি গেলে আপনার কাকার বানান সেই কবিরাজী তেলটা লাগাব ভাবছি। তারপরেই আবার কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ কেশ!" এবার সাঙ্কেতিক ভাষাটা আমিই ব্যবহার করলাম, উনি ধরতে না পেরে একটু ম্লান হাসলেন।

ঠাট্টাটা করতে আমারও বেশ লাগল! বাষট্টি নম্বর ঘর, ব্রেণে রেডিয়েশন, গলা ফুটো করে ঢোকান খাওয়ার নল — এসবের বাইরে বাড়ি বলে একটা জায়গা আছে যার দরজায় পেতলের ফলকে কায়দা করে লেখা আছে অনিমেষ চৌধুরী, শর্মিলা চৌধুরী। গেটের উপরে মাধবীলতা দুলছে, হাওয়ায় তারই ঘ্রাণ নিতে নিতে অনিমেষের হাত ধরে আস্তে আস্তে উপরে উঠছি।

"অ্যাঃ! সিঁড়ির রেলিং এ এত ধূলো কেন? কাঞ্চন ঝাড়ে না?"

"ঝাড়বে, ঝাড়বে। এইবার ঝাড়ার লোক তো বাড়ি এসে গেছে!" দোতলায় উঠে দেখছি কে বুদ্ধি করে আমার সাধের রকিং চেয়ারটা দরজার কাছেই রেখে দিয়েছে। বসে একটু হাঁফ ছাড়তেই কাঞ্চন এক কাপ হট চকলেট নিয়ে হাজির। তাতে চুমুক দিতে দিতে বলছি, "এসব নয়, আজ তোমার সেই অনেক টোমেটো আর পেঁয়াজ দিয়ে করা করলার তরকারি খাব। আর কাল খাব বেশি করে কিসমিস দিয়ে নতুন গুড়ের পায়েস।" "কি ভাবছ মা? এত বাজে চিন্তা করো না, এতে শরীর আরও খারাপ হবে। মনটা হাল্কা রাখার চেষ্টা কর, জানি খুব কঠিন, তবু! ছেলের খবর কিছু পেলে? কবে আসছে?" বৃদ্ধা তাঁর সাধ্যমত আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করলেন। এবার সিস্টার ঢুকে টিউব দিয়ে কিছু তরল পুষ্টি ঢুকিয়ে দিয়ে গেল শরীরে। জানি পাকস্থলী কাজ করছে না, একটু পরে এর অনেকটাই বেরিয়ে আসবে সবুজ গরলের মত, সাক্শান টিউব দিয়ে। তবু এরা হাল ছাড়বে না। ছোটবেলায় একটা সিনেমা দেখেছিলাম না, 'বিজ্ঞান ও বিধাতা' না কি যেন!

"আমি এবার উঠি মা, ওরা বোধ হয় এসে পড়েছে" দরজার বাইরে সঙ্গীদের সাড়া পেয়ে কাকীমা উঠে দাঁড়ালেন. "রাসু এলে বোল আমি ওদের সঙ্গে চলে গেলাম, অনেক দূরের রাস্তা, একলা যেতে সাহস পাই না" "না- না, কাকীমা, আপনি আসুন। এই যে এসেছেন, কত ভাল লাগল"।

আমার কপালে ওঁর ঠাণ্ডা হাতটা দু'দণ্ড রেখে কাকীমা বেরিয়ে গেলেন। হয় তো মনে মনে ওঁর ঠাকুরের কাছে আমার জন্যে প্রার্থনা করলেন। আমার মনের এক্সরে চেম্বারে এঁর ছবিটাও যত্নে সাজান আছে। ভাণ ভণিতাহীন এক সরল রমণী, স্নেহই যাঁর একমাত্র সম্বল।

ঘর দু'মিনিট মত খালি থাকার পর রাসুকে নিয়ে অনিমেষ ঢুকল।

"কই, আজ এত ভীড় কম কেন? এসে এসে সব ক্লান্ত হয়ে পড়ল?"

"এসেছিলেন তোমার স্কুলের ক'জন, নিচ থেকেই খবর নিয়েই চলে গেলেন, বল্লেন কাল আসবেন"

"বৌদি, আমি এবার আসি?"

"এস ভাই, কাল আবার আসছ তো?"

"বলতে হবে?"

"না - না। কাকীমা এসেছিলেন —"

"দেখা হয়েছে। আচ্ছা, গুড নাইট, বৌদি" ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে রাসু বেরিয়ে গেল।

এবার আমরা দু'জন। বেশি টাকার কেবিনে আসা যাওয়ার কোন কড়াকড়ি নেই, অনিমেষ এখনও অনেকক্ষণ থাকতে পারবে। ও টেবিলের কাছে গিয়ে ব্যাগে সাজান এক্সরে প্লেটগুলো নাড়া চাড়া করতে লাগল। ঐ কাগজের ব্যাগটা ভর্তি করে সেবার আমরা বার্লিংটন থেকে বই এনেছিলাম, সেই যে বার অনির কাছে বেড়াতে যাই। আর অবাক হয়েছিলাম রিসাইক্ল্ করা কাগজের ব্যাগের ভার বইবার ক্ষমতা থেকে। অনিমেষ তো আমেরিকান টেকনোলজির গুণগান করে অস্থির। ফেলে দেওয়া পচাধচা জিনিসগুলোকে রিসাইক্ল্ করে এরা অত কি করছে। খালি মৃত্যুটাকে রিসাইক্ল্ করে জীবন বানাতে পারল না এখনও।

"কাল আবার রেডিয়েশান"

"তাতে কি, আগেও তো নিয়েছ, ভয় পাওয়ার কি আছে"

"কিছু না। অনির কোনও খবর এল?"

"এসেছে, Visa র গণ্ডগোলটা এখনও মেটে নি, একটু দেরী হতে পারে"

"ও" আমার আবার পাশ ফিরে শুতে ইচ্ছে করল কিন্তু নলেশ্বরীর ভয়ে পারলাম না। অনিমেষ চলে যাক্ না, নার্স যখন বেশি রাতে চেয়ারে বসে ঢুলবে আর আমার কিছুতে ঘুম আসবে না, খালি অনিমেষ—অনি—মাধবীলতা—কাঞ্চন—ধূলো—নতুনগুড়ের পায়েস এই সব মাথার মধ্যে চক্কর মারতে থাকবে, তখন খুলে ফেলব টিউব ফিউব সব। পা টিপে টিপে চলে যাব জানলার ধারে — দেখব — কি দেখব কে জানে! এখন কি জ্যোৎস্না রাত? চাঁদ কি দেখা যাবে? না কি দেখব রাস্তার ওপারে দোকান পাট সব ঝাঁপ বন্ধ, খাটিয়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে ক্লান্ত মানুষরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, রাস্তার আলো ঘিরে কিছু পোকা উড়ছে... ওরাই বোধহয় শুধু জেগে আছে, আর আমি।

* * *

"শর্মি, এত চুপচাপ কেন? কতক্ষণ থেকে দেখছি কিসের চিন্তায় একেবারে ডুবে গেছ। আমি কিন্তু ঘুমোই নি। তোমাকে দেখছিলাম।"

"আমরা কম বয়সে 'ইমাজিন' বলে একটা খেলা খেলতাম তোমার মনে আছে? যখন 'বোর' লাগত আমি হ'তাম তুমি, আর তুমি হতে আমি। সে যা মজা হ'ত! সেটাই খেলছিলাম মনে মনে - একা একা। এখন খালি খেলাটা আর মজার নেই।" যতই তোমার যন্ত্রণাকে নিজের করে ভাবছিলাম ততই বুঝছিলাম এ হয় না, এ পারা যায় না।

"অত ভাববার কি আছে? সাহস করে সব কিছুর মোকাবিলা করতে পারছ না?"

"তোমার মত সাহস আমার নেই, অনিমেষ; আমি ভীতু - কাওয়ার্ড!" আমার গলার স্বর কেঁপে গেল।

অনিমেষ আমার মাথায় হাতটা রাখতে চেষ্টা করল পারল না। আজ ডঃ মিত্র আমাকে বলে দিয়েছেন ওকে রেডিয়েশান আর বেশি দিন দেওয়া যাবে না। এমনি করতে করতে একদিন কোমা শুরু হয়ে যাবে। তার আগে সইটই যা করবার করিয়ে নিলে ভাল। বাস্তব। কোমা বাস্তব, সই করা বাস্তব, টাকা বাস্তব। বাস্তব দ্রুত বদলে যায়। দু'দিন আগে বাস্তব ছিল অনিমেষ চৌধুরীর সাহস, জিদ্, বাঁচবার শপথ। এরপর যখন চেকে সই করতে গিয়ে অক্ষর

বেঁকে বেঁকে যেতে লাগল তখন বাস্তব হল অনিমেষ চৌধুরীর চোখের জল। পরাজয় স্বীকার। 'Assisted suicide এখনও শুরু হয় নি, না?' অনিমেষের যন্ত্রণা কাতর এই উক্তির মধ্যে তখনও চ্যালেঞ্জের সুর ছিল। আমি শুধু অবাক হয়ে দেখছিলাম নিজের মৃত্যুর প্রতি একজনের মনোভাব কতখানি 'ক্লিনিকাল' হতে পারে। আর মনের মধ্যে এক্সরে প্লেটে আলো ফেলে দেখছিলাম এক নতুন অনিমেষ চৌধুরীকে এতদিনের যৌথ জীবনের খুঁটিনাটিতে যাকে চেনা যায় নি। পরিশুদ্ধিকরণ হয়ে চলেছিল। নিজের ভয়, স্বার্থপর অসহায়তা, আত্মসমর্পণের দুর্বলতা সব ফোঁটায় ফোঁটায় তলিয়ে যাচ্ছিল, আর ভেসে উঠছিল রোগক্লিষ্ট একটি মানুষের বাঁচবার দুর্জয় আকাঙ্খা, প্রবল সাহস। যা ক্রমশঃ আমাকেও সংক্রমিত করছিল।

সেই সাহসকে কি আমি আজ অসম্মান করলাম? হাঁটু গেড়ে বসলাম এক অমোঘ বিয়োজনের সামনে? অনিমেষ চলে গেল বাষট্টি নম্বর থেকে আই.সি.ইউ — সেখান থেকে 'ভেন্টিলেটারে'। আমি যন্ত্রের মত মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে গেলাম ওকে নিয়ে যাওয়ার। ভেন্টিলেটারে বেঁচে থাকা মানে কি সত্যি বেঁচে থাকা? লাইফ-ইন-ডেথ না ডেথ-ইন-লাইফ? জীবনের অসম্মান, পুরুষকারের অসম্মান। বাঁচাবার যন্ত্র আর বাঁচবার মন্ত্র দু'টোতো সম্পূর্ণ আলাদা। যে মন্ত্র এতদিন অনিমেষ জপ করে আসছিল, সঙ্গে, ভয়ে ভয়ে আমিও, সেই মন্ত্রোচ্চারণ আজ থেমে গেল। মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে তার প্রতিধ্বনিও মিলিয়ে গেল। যন্ত্রও থেমে যাবে। একদিন, দু'দিন তিনদিন পরে। জীবনকে রিসাইক্‌ল্ করা যাবে না। এখন শুধু আমার আর অনিমেষের মধ্যে, ভালবাসা আর যন্ত্রণার মধ্যে, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে অনেক, অনেক প্রশ্ন একটা অস্বচ্ছ পর্দার মত দুলতে থাকল। জীবনের অনেক মেদুর মুহূর্ত, অনেক সোনালী সকাল আর ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যা, মাধবীলতার গন্ধ, হাত ধরে ঘাসে ঘাসে পা ফেলে হাঁটা, ভুল বোঝা, হেসে ওঠা — ক্রমে এসব আমার কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে অন্যেরা নিয়ে যাবে। আমি অন্য এক জরতী রমণীর মত একা বসে, এই বাষট্টি নম্বর ঘরে, জীবনের এক শব্দহীন, বর্ণহীন দূরদর্শন দেখে যাব — সকলের ত্রস্ত আসাযাওয়া - অনুচ্চারিত প্রশ্ন, অব্যর্থ উত্তর।

রূপকথার শেষ রাজ্য

সুব্রত সেনগুপ্ত

রাজকন্যার মাথায় সোনার আর পায়ে রূপোর কাঠি ছোঁয়াতে হবে। ছোঁয়ালেই রাজকন্যা ঘুম থেকে জেগে উঠবে। কত বছরের ঘুম কে জানে?

বিদেশী রাজপুত্র রাজকন্যার মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার দু-হাতে দু'টো কাঠি। শুধু ছোঁয়ানোর অপেক্ষা। কিন্তু রাজপুত্র ইতস্তত করছে। রূপকথার গল্পে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে দেখামাত্র অন্য রাজ্য থেকে আসা রাজপুত্র কাঠি দু'টো ছুঁয়ে দিয়েছিল। রাজকন্যাও জেগে উঠেছিল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু রাজকন্যা একা জেগে ওঠেনি। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেছিল ঘরে আর যারা ছিল তারা। রাজবাড়ির সবাই শুধু নয় — রাজ্যের যে যেখানে ছিল সবাই জেগে উঠেছিল। সবাই জেগে উঠলে তো ভারি ঝামেলা। নিরিবিলিতে বসে রাজকন্যার সঙ্গে দু-টো কথা বলা যাবে না।

রাজপুত্রর একটা খটকা লাগছে অবশ্য। ব্যাপারটা কী ছিল, শুধু রাজকন্যার মাথায় আর পায়ে কাঠি ছোঁয়ালে সবাই জেগে উঠবে, না সবাইকে আলাদা-আলাদা জাগাতে হবে? পরেরটার সম্ভাবনাই বেশি। এক বার কাঠি ছোঁয়ালেই ঘুমন্ত সব প্রাণী — মানুষ, হাতি, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, পাখি সব জেগে উঠবে এমন হওয়ার সম্ভাবনা কম, হওয়া উচিতও নয়। কিন্তু হলে ভারি মুশকিল। এতদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে সব প্রাণী এক সঙ্গে প্রবল উৎসাহে গলার আওয়াজ বার করতে শুরু করলে পরিস্থিতি যা দাঁড়াবে তাকে বলা যায় অরাজকতা। এক কথায়— শব্দদূষণ—শব্দদূষণের প্রভাবে রাজকন্যা এমনকি বীর রাজপুত্রেরও হৃৎপিন্ডের ক্ষতি হতে পারে। এরকম সমস্যায় রাজপুত্রকে যে সাহায্য করতে পারত সেই শুকপাখি তার সঙ্গেই ছিল। কিন্তু লোভে পড়ে...

এই নগরে ঢোকার সময় রাজপুত্রকে এক শুঁড়িখানার পাশ দিয়ে আসতে হয়েছিল। শুঁড়িখানার মালিক, খদ্দেররা সবাই ঘুমিয়ে আছে। পাথরের পাত্রে সেই কবে ঢালা পানীয় যেমন ছিল বহু বছর ধরে তেমনি পড়ে আছে। পাত্রে-পাত্রে পানীয়, জালা ভর্তি পানীয় বছরের পর বছর পড়ে আছে। তার গন্ধ বাতাসে ভাসছে। সেই গন্ধভরা বাতাসে শ্বাস নিতে গেলেও নিজেকে মাতাল মাতাল মনে হয়।

শুক পাখিটা রাজপুত্রের কাঁধের ওপরই বসেছিল। কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে উড়ে গিয়ে সেই বহু বছরের পুরনো মদ আকণ্ঠ গিলেছে। গিলে জ্ঞানী শুক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সেই শুঁড়িখানাতেই। এখন রাজপুত্রকে জ্ঞান দেবে কে? এমনিতে জ্ঞান দেয়ার লোকের অভাব হয় না। এখন সবাই ঘুমিয়ে আছে তাই রক্ষে। ঘুম ভাঙিয়ে দিলে আর দেখতে হবে না। সবাই ধরে ধরে উপদেশ দিতে শুরু করবে। কিন্তু সে সমস্ত উপদেশের অধিকাংশই অসার। ভাল হতো রাজপুত্র যদি শুকপাখিটার ঘুম ভাঙাতে পারত। কিন্তু শুকপাখি তো নেশায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। সোনার কাঠি রূপোর কাঠির কারসাজিতে ওর ঘুম ভাঙার কথা নয়। পাখিটার এমনিতে অনেক গুণ আছে। কিন্তু একটা বড় দোষ। মদ দেখলে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। একবার তো মদ গিলে পাক্কা তিন দিন ঘুমিয়ে ছিল। জেগে ওঠার পর মহাবিরক্ত রাজপুত্র তাকে বলতে গিয়েছিল, তুমি যখন-তখন এত মদ খাও কেন? খাবে না।

তাতে পাখিটা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, দ্যাখ, তোমাকে উপদেশ দেয়া আমার কাজ, আমাকে উপদেশ দেয়া তোমার কর্তব্য বা অধিকারের মধ্যে পড়ে না।

— তুমি ভুল করলেও বলতে পারব না!

— আমি একজন পেশাদার জ্ঞানদাতা। পেশাদাররা কখনও ভুল বলে না।

— আচ্ছা, তুমি বুঝতে পারছ না কেন। তুমি অকেজো হয়ে পড়লে আমার কত অসুবিধে হয়।

— সব সময় সব কিছু তোমার সুবিধে মতো ঘটবে না কি?

— কিন্তু...

— কোনও কিন্তু নেই, সে তুমি রাজার ছেলেই হও আর যেই হও।

— আহা...

— আহা, উহু করে কোনও লাভ নেই। রাজা হোক, মন্ত্রী হোক আমার মতো পেশাদারদের ছাড়া কারও চলবে না।

— আমিও তো সে কথাই বলছি।

— বলছ কেন? বলা তোমার কাজ নয়। শোন, আমার মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ করারও কারণ আছে...

— কী কারণ?

— দু-টো কারণ।

— দু-টো কারণ!

— এক, মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ না করলে... বিশ্রাম না নিলে মাথা খেলাব কী করে? মাথা না খেলাতে পারলে তোমাকে ঠিক পথে চলার বুদ্ধি দেব কী করে?

— বেশ। দ্বিতীয় কারণটা কী, শুনি?

— দ্বিতীয় কারণ হল, এই যে তুমি বললে, আমি অকেজো হয়ে পড়লে তোমার অসুবিধে হয় —

— তার মানে?

— তার মানে, মাঝ মাঝে অসুবিধেয় না পড়লে তুমি আমার গুরুত্ব বুঝতে পারবে না। আমার পরামর্শ যে কতটা জরুরি সেটাও তো তোমাকে বোঝাতে হবে?

অন্য কেউ এরকম পাকাপাকা কথা বললে রাজপুত্র খাপ থেকে তলোয়ার বার করে তার গলা কেটে ফেলত। কিন্তু এই শুকপাখিকে কিছু করা যাবে না। ওকে কিছু করলে তার বাবা খুব ক্ষেপে যাবেন। কারণ পাখিটা তার ভারি প্রিয়।

চুলোয় যাক পাখি। এখন রাজকন্যাকে নিয়ে ভাবা যাক। সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি ছোঁয়ানো হবে কি হবে না? সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু রাজকন্যাকে কী করে জাগানো যায়? একটা কাজ করতে পারলে হতো। রাজকন্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গিয়ে তেপান্তরের মাঠে পৌঁছে ওর ঘুম ভাঙালে কেমন হয়? মাথায় সোনার আর পায়ে রূপোর কাঠি ছোঁয়াতে রাজকন্যা উঠে বসবে। সেই সঙ্গে এখানকার অন্য সবাই জেগে উঠলেও ক্ষতি নেই। কারণ তারা তখন রাজপুত্রের নাগাল পাবে না, তাকে বিরক্ত করতেও পারবে না। আর রাজপুত্র তো নতুন কেনা জাপানি প্রযুক্তির বাইক চেপে এত দূরে এত কষ্ট করে এসেছে শুধু রাজকন্যার

জন্যই। অন্যদের ঘুম ভাঙানোর কোনও দায়িত্ব তার নেই। ওরা বছরের পর বছর ঘুমিয়ে আছে। বছরের পর বছর ঘুমিয়েই থাকুক না রাজপুত্রের তাতে কী? কিন্তু... কিন্তু ঝামেলাও আছে। একটা দামড়া মেয়েছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। রাজকন্যার বয়েস কত হবে? অন্তত কুড়ি-পঁচিশ। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা শরীরের নানা জায়গায় বিশেষ করে বক্ষদেশ, নিতম্ব যথেষ্ট মাংসল, উরুও বেশ মোটা-মোটা, ফলে ওজনও বেশ ভালই হবে। একা-একা রাজপুত্র তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাইকে বসাতে পারবে? ঘুমে কাদা হয়ে আছে যে নারী, তাকে নিয়ে বাইক চালাতে পারবে? যাওয়ার পথে শূকটাকেও তুলতে হবে তো। — নাহ্ এত ঝামেলা করতে পারবে না রাজপুত্র। তাহলে, তাহলে রাজপুত্র কী করবে? শালা শূক। শূকের ওপর ভারি রাগ হল আবার। মদ গেলার সময় পেল না। তারা অচেনা জায়গায় এসেছে। তাও এমন জায়গা, যেখানে সবাই ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে বছরের পর বছর। এর মধ্যে কত জায়গায় কত কি ঘটে গেল। ওরা কিছুই জানতে পারল না। এখন হঠাৎ ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে ওরা কী করবে, কী বলবে, কে জানে? কত রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর মুশকিল হচ্ছে, ছেলেবেলা থেকে শূকের উপদেশ অনুযায়ী চলে-চলে রাজপুত্রের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, পাখি বলে না-দিলে সে নিজে থেকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, কখন তার কী করা উচিত। ব্যবহার না করে করে তার বুদ্ধিতে বোধ হয় মরচে পড়ে গেছে।

কিন্তু এখন তো কোনও উপায় নেই, বিশেষজ্ঞ মশাই চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন, যা করার রাজপুত্রকে নিজেকেই করতে হবে। সে তাকাল রাজকন্যার মুখের দিকে। মুখ থেকে নেমে তার দুই চোখ রাজকন্যার আক্রমণাত্মক শরীরের ওপর ঘোরাঘুরি করতে লাগল। এত সুন্দর এত আকর্ষক চেহারা কোনও মানুষের হয়। ঘুমোনোর ঠিক আগের মুহূর্তে রাজকন্যা যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ফলে তার শরীরের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়ে আছে। — রাজপুত্র যত জেগে থাকা মেয়েকে চলা ফেরা করতে দেখেছে তাদের কেউ দেখতে এত সুন্দর নয়। রাজকন্যার সৌন্দর্যের মধ্যে যেন অলৌকিক কিছু আছে, যেন কল্পনা মেশানো আছে। রাজপুত্রের ভারি ইচ্ছে করে রাজকন্যাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে। কিন্তু ঘুম না ভাঙ্গিয়ে রাজকন্যার সম্মতি আছে কি না না-জেনে তাকে ছোঁয়া কি উচিত হবে? কাজটা অনেকটা তস্করের কাজের পর্যায়ে পড়বে না? — কে রাজপুত্রের প্রশ্নের উত্তর দেবে? তার ভারি রাগ হয়। রাগ প্রথমে পাখিটার ওপরে তারপর তার নিজের বাবার ওপরে। বাবা কেন পাখিটার কথায় উঠতে বসতে শিখিয়েছিলেন? এদিকে দিনকাল সব বদলে যাচ্ছে। আগের মানে তার বাবা-ঠাকুর্দাদের আমল হলে রাজপুত্র তো পঙ্খীরাজে চেপে ঘুরে বেড়াতেন। তার বদলে তিনি মোটরবাইকে চাপেন। তাদের রাজ্যে এখন বলতে গেলে রূপকথার কালের কিছু নেই। এই যে শূকপাখি এটাও রূপকথার কোনও পাখি নয়। আসলে সুপার কম্পিউটার একটা। চেহারাটা পাখির মতো। একদিন পাখিটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ এই রাজ্যের খোঁজ পেয়েছিলেন। এটাই শেষ রূপকথার রাজ্য। সবাই ঘুমিয়ে আছে বলে এখানে রূপকথা এখনও নির্বাসনে যায়নি। কিন্তু...

কিন্তু রাজপুত্র যদি এদের ঘুম ভাঙিয়ে দেন — এদের ঘুম ভেঙে গেলে — এই রাজ্য এই রাজ্যের মানুষও পাল্টাতে শুরু করবে না। পরিবর্তনের ধাক্কায় রূপকথা ধ্বংস হয়ে যাবে। শূকপাখির বুদ্ধিতে এখানে এসে রাজপুত্র তাহলে কল্পনা রাজ্য — শেষ রাজ্যটাকে নষ্ট করে

ফেলার জন্য দায়ী হবেন। কী দরকার পাল্টানোর! পৃথিবীর এককোণে থাকুক না এরকম একটা জায়গা যেখানে যা খুশি তাই ঘটতে পারে, যেখানে নেমে আসে পরীরা, যেখানে পঙ্খীরাজ আকাশে ওড়ে, যেখানে যুক্তিটুক্তিকে আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কল্পনা অবাধে রাজত্ব করে। রাজপুত্র রাজকন্যার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। একবার রাজকন্যার প্রতি প্রবল আকর্ষণে ইচ্ছে হচ্ছে, ওকে জাগিয়ে তুলি। আবার তারপরই মনে হচ্ছে জাগালে, ওরা জেগে উঠলেই এতদিন ধরে যত্নে লালন করা স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যাবে।

রাজপুত্র ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠছে। হঠাৎ তার মনে একটা সন্দেহ ঢুকল, রূপকথার রাজ্যে ঢুকেই পাখিটা ভিরমি খেয়ে পড়ল কেন? — সত্যি মদের নেশায়, না কল্পনার আলোয়, কল্পনার বাতাসে যন্ত্রটা বিকল হয়ে পড়েছে? কে জানে? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শেষে ধৈর্য হারিয়ে দুই হাত ছুঁড়ে, রাজপুত্র বলে উঠল, দূর ছাই।

হাত ছুঁড়তে সোনার আর রূপোর কাঠি রাজপুত্রের হাত থেকে ছিটকে পড়ল। যেখানে কাঠি দু-টো পড়ল সেখানে জড়সড় হয়ে শুয়ে ঘুমিয়েছিল বার-তের বছরের এক বালিকা। পোশাক আশাকে মনে হয় রাজবাড়ির পরিচারিকাদের মধ্যে এক জন। কাঠি দু-টো তার মাথার কাছে আর পায়ের কাছে পড়তেই বালিকা চোখ খুলল। রাজপুত্রকে বিস্ময়ের চোখে দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তার শরীরে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটতে লাগল। রাজপুত্রের চোখের সামনে বার-তের বছরের বালিকা বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী হয়ে উঠল! সে দৌড়ে এসে রাজপুত্রের গলা জড়িয়ে বলে উঠল, প্রাণেশ্বর! রাজপুত্র মহা রেগে মেয়েটার হাত সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, দূর মাগী, আমি তোর প্রাণেশ্বর হতে যাব কোন দুঃখে! আমি তো রাজকন্যাকে বিয়ে করব।

সদ্য যুবতী খিল খিল করে হেসে উঠল। রাজকন্যাকে দেখিয়ে বলল, তুমি ওকে বে করবে কিগো! ও তো একটা বুড়ি।

— চোপ!

মেয়েটি চুপ করে না। আবার হাসে। হেসে জিজ্ঞেস করে, ওর বয়েস কত বল তো?

— কত আবার, এখন তোমার যেমন বয়েস ওরও তাই। আচ্ছা, একটা কথা বল তো, তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে তখন দেখলাম, একটা ছোট্ট মেয়ে। ঘুম ভাঙতেই তুমি যুবতীটি হয়ে উঠলে! ব্যাপারটা কী, তুমি ডাকিনী বিদ্যা-টিদ্যা জান না কি?

— দূর ছাই, তোমাকে তো সেই কথাই বলতে চাইছি; তুমি তো শুনছ না...

— শুনি কী কথা? কিন্তু খবদ্দার মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা কোর না। বললে, দেখেছ আমার খাপে ঢাকা তলোয়ার...

— রাখো তোমার তলোয়ার। ওসব সেকেলে হয়ে গেছে।

রাজপুত্র একটু ম্লান হয়ে গিয়ে বলল, আমার বাড়িতে দুটো অটোমেটিক রিভলভার আছে। আর বাইকে বাঁধা আছে এ কে ৪৭ রাইফেল। এই তলোয়ার ফলোয়ার আনার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু ওই যে যার পরামর্শে এখানে এসেছি, যে বলল এখানকার রাক্ষস খোক্কস কোনওদিন রিভলভার, রাইফেল এসব দেখেনি। জানেই না এতে কী হয়। সেজন্য ওদের ভয় পাওয়াতে হলে ওদের চেনা অস্ত্র তলোয়ারই আনতে হবে। সে তো আমাকে ঘোড়ায় চেপে আনতে বলেছিল, আমি নেহাৎ রাজি হইনি... যাকগে তোমার কথা বল, কী বলছিলে?

— আমি বলছি, আমি আর আমার বাবা বছর দশেক আগে এখানে এসেছিলাম। আমাদের থাকার জায়গা ছিল না, খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। পথে-পথে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়লাম। এসে দেখি, এখানে সবাই ঘুমিয়ে আছে। এখানকার বাতাসে ঘুম ভেসে বেড়াচ্ছে। আমরাও কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

— তাতে কী হল?

— আহা কী বুদ্ধি তোমার! দশ বছর আগে আমার বয়েস ছিল বারো। তা এই দশ বছরে আমার বয়েস বাড়বে না? বেড়ে বারো আর দশে বাইশ হবে না?

— দূর আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

— বলছি, তুমি আগে যাকে দেখেছ, মানে আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন আমি ছিলাম দশ বছর আগের আমি... এখন জেগে উঠতে এই দশ বছর বেড়ে গেল।

— তাই কখনও হয় না কি আবার!

— হয় যে সে তো নিজের চোখেই দেখলে। এখানে যারা ঘুমিয়ে আছে, তারা যে বয়েসে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই বয়েসেই তাদের দেখতে পাচ্ছ। ওদের বয়েস আটকে আছে। জাগিয়ে দিলেই হু হু করে বেড়ে যাবে। এমনি ঘুমে এরকম হয় না। কিন্তু এখানকার ঘুম তো জাদুঘুম। সোনার কাঠি রূপোর কাঠি না থাকলে তুমিও এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়তে।

— বুঝলাম। তা তোমার বাবা কোথা গেলেন, শুনি?

— ওই তো ওই যে বুড়ো মতো লোক ঘুমিয়ে আছে...

— ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেব?

রাজপুত্রের হাত চেপে ধরে মেয়েটি বলল, ও কাজ তুমি কোর না। দশ বছর আগেই বাবা বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। এখন দশ বছর বাড়লে বাবা হয়তো বাঁচবেই না...

— বাঁচবে না!

— শুধু বাবা কেন অনেকেই বাঁচবে না। রাজামশাই, রাণী, মন্ত্রী পাত্রমিত্র সবাই ঘুমিয়ে বেঁচে আছেন। জাগালেই বয়েস বেড়ে কোথায় পৌঁছবে কে জানে?

— আর রাজকন্যা?

— তারও একই হাল। যে সুন্দর চেহারা দেখে তুমি মজেছ সেটা তার কত বছর আগের চেহারা কে বলবে? পঞ্চাশ-ষাট-কি একশ বছর আগেরও হতে পারে। আমি আর আমার বাবা তো ঘুমিয়েছি মাত্র দশ বছর। ওরা কবে থেকে ঘুমোচ্ছে সে হিসেব কে রেখেছে?

— কিন্তু...

— কিন্তু কী?

— কিন্তু আমি তো এখানে এসেছিলাম ওদের ঘুম ভাঙাব বলে...

— ওরা যেমন আছে বেশ আছে। ওভাবেই থাকুক। জাগিয়ে দিলেই সব লণ্ড ভণ্ড হয়ে যাবে। ওরা হারিয়ে যাবে একেবারে...

রাজপুত্র ভাবল, সেই ভাল। কল্পনার — রূপকথার শেষ রাজ্য নষ্ট করে দেয়ার কোনও অধিকার তার নেই। সে মেয়েটিকে ডাকল, চল।

বাইরে এসে রাজপুত্র তার বাইকে বসল। মেয়েটিকে বসাল তার পেছনে। এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য রাজপুত্র যেই উদ্যত হয়েছে কোথা থেকে উড়ে এসে সেই পাখি তার ঘাড়ের ওপর বসল। বসে গম্ভীর গলায় বলতে লাগল, যা করেছ ঠিক করেছ। ঠিক ঠিক ঠিক।

দাঁতে দাঁত ঘষে রাজপুত্র বলল, শালা।

ক্রোড়পত্র-৪
উপন্যাস

দীপেশ্বরীর অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

প্রায় জনশূন্য স্টেশনটায় নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জন। সন্ধ্যা পুরো হয়নি। ফিকে আলো চারদিকে। শ্রাবন্তী থাকলে বলতো, এটাই হলো কমলা রঙের রোদ। শুধু কবিরাই দেখতে পায় না, আমরাও পাই। রঞ্জন হাসতে হাসতে বলতো, আমিতো জানি তোমার দেখার চোখ আছে।

রেল লাইনের ডান পাশে তখনও সিগন্যাল ডাউন হয়ে আছে। প্লাটফরমে দু'একজন লোক এসে দাঁড়ায়। হয়তো এ গাঁয়েরই। এমনি ঘুরছে। নয়তো গরু খুঁজতে এসেছে। একটু পর রেললাইন পেরিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। স্টেশনের চায়ের দোকানটা বন্ধ। ওরা চলে গেলে রঞ্জন ছোট ব্যাগটা কাঠের বেঞ্চের ওপর রেখে একটা সিগারেট ধরায়। দু'টো টান দেবার পর মনে হয় শ্রাবন্তী থাকলে বলতো, তুমি মোটেই এ সময়ের ছেলে নও! ধূমপানের বিরুদ্ধে এতো সতর্কবাণী সত্ত্বেও সিগারেট খাও কেন?

— সময়কে উপেক্ষা করবো বলে।

রঞ্জন দু'বার প্লাটফরমের এমাথা ওমাথা হেঁটে নেয়। সময়কে উপেক্ষা করার কথা মনে হলে ওর ভেতরে একটি দৃশ্য চিত্রায়িত হতে থাকে। এক অদৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করা এক অদৃশ্য ছবি। প্রথমে লঙ শট, তারপর ধীরে ধীরে ক্লোজআপ। ব্যাপারটি নিজেও অনেক ভেবেছে, কিন্তু যুক্তি খুঁজে পায় না। বুকের ভেতর তাকালে দেখতে পায় বিশাল পর্দাজুড়ে একটি রেললাইন। ও লাইনের ওপর বসে ড্রইং খাতায় প্রজাপতি আঁকছে। পাশে বসে আছে সাত বছরের একটি মেয়ে। ক্যামেরা ওকে ক্লোজআপে ধরলে দেখা যায় ওর চোখে পানি টলটল করছে। হয়তো এক ফোঁটা গড়ায়। দু'ফোঁটা, তিন ফোঁটা করে ওর গাল ভরে যায়। ঠোঁট ফুলে ওঠে। রঞ্জন ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। ম্যাজিকের ভঙ্গি করে। খাতার প্রজাপতি মেয়েটির হাতে রঙিন প্রজাপতি হয়ে যায়। আচমকা খুশিতে মেয়েটির চোখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। চোখে পানি, মুখে হাসি। ও লাফিয়ে উঠে প্রজাপতি ধরে। তারপর ছেঁড়ে। ক্যামেরা ওকে ক্লোজআপে ধরে। মেয়েটি এক অদ্ভুত বিষণ্ন দৃষ্টিতে প্রজাপতির দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা উড়তে উড়তে শূন্যে মিলিয়ে যায়। দূরে দেখা যায় মেয়েটির মা ওকে হাত তুলে ডাকছে। রঞ্জনের খাতায় সে মেয়েটির মুখ আঁকা হতে থাকে। ফ্রিজ। দৃশ্যটি এভাবে ফ্রিজ হয়ে যায়। সিগারেটে শেষ টান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকেও দৃশ্যটি বরাবরের মতো ফ্রিজ হয়ে গেলো। রঞ্জন ব্যাগটা আবার কাঁধে উঠিয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি কাজ করছেন।

ঘরে ছোট টেবিল। টেবিলের ওপর হারিকেন জ্বলছে। রঞ্জন দরজায় দাঁড়িয়ে মাস্টারকে দেখে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অবিন্যস্ত চুল। পরিষ্কার সাদা পাঞ্জাবি গায়ে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় লোকটি সুখী, হয়তো কিছু সমস্যা আছে, কিন্তু সেটা খুব বড় সমস্যা নয়। ও ঘরের ভেতর ঢুকে বলে, মাস্টার সাহেব?

স্টেশন মাস্টার মুখ না তুলেই বলে, বলুন।

রঞ্জন ইতস্তত করে বলে, ইয়ে মানে, জানতে চাইছিলাম এই স্টেশনে কি কোনো থাকার

জায়গা আছে?

এবারও মুখ না তুলে মাস্টার বলে, নেই।

— খাবার জায়গা?

— তাও নেই।

— তাহলে কি করি?

স্টেশন মাস্টার মুখ তুলে কঠিন চোখে তাকায়।

— দেখতে পাচ্ছেন না, এটা একটা অখ্যাত ভূতুড়ে স্টেশন। আপনার কেউ আছে এখানে?

রঞ্জন মাথা নাড়ে। আস্তে করে বলে,.নেই।

— তাহলে মতলব কি? কেন নেমে পড়েছেন এখানে ?

— ভূতুড়ে স্টেশন বলে ভালো লাগলো, তাই!

— ভালো লাগলো? নাকি খুনের আসামী? পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? এক মুহূর্ত ওকে দেখে মাস্টার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, পালিয়ে থাকার জন্য ভুতুড়ে জায়গা দরকার, না?

রঞ্জনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আসলে আকস্মিক কোনো পরিস্থিতিতে ও হঠাৎ করে স্মার্ট হতে পারে না। নিজের ভেতর গুটিয়ে যায়। মুখে কথা জোগায় না। আজও তাই হলো। ও দ্রুত মাস্টারের চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। মাস্টার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলে, থমকে গেলেন কেন? বলতে পারলেন না যে হ্যাঁ পালিয়ে বেড়াচ্ছি। নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো কখনো খুব দরকার হয়। নইলে মানুষ বাঁচতে পারে না।

স্টেশন মাস্টারের কথায় রঞ্জনের ভয় কেটে যায়। স্বস্তির সঙ্গে বলে, আচ্ছা এই প্লাটফরমে তো থাকা যাবে। ওই বেঞ্চের ওপর শুয়ে থাকতে পারি কি?

মাস্টার এবার হেসে ফেলে। এমন একটি নাছোড়বান্দা ছেলে সে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। বলে, বুঝেছি আপনার নেশা অনেক গভীর। রাতে এমন ফাঁকা জায়গায় থাকা যায় না। পাগলামি করে যখন নেমেই পড়েছেন তখন পাগলামি না করে গাঁয়ের দিকে চলে যান। অনেক গেরস্থ বাড়ি আছে। ওরা আপনাকে দুদিন মেহমানদারি করতে পারবে। তারপর চলে যাবেন।

রঞ্জন খুব মজা পায়। লোকটা এতক্ষণে ফর্মে এসেছে। ও কৌতুকের সঙ্গে বলে, মাস্টার সাহেব অন্যের ঘাড়ে আমাকে চাপাতে চাইছেন কেন? মেহমানদারিতো আপনিই করতে পারেন।

মাস্টার সাহেব ওর দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। হাতের কাজে মন দেয়। রঞ্জন যেন নিজেকে বলছে এমন ভঙ্গিতে বলে, চারদিকে যা ঘুটঘুটে অন্ধকার! এখন আর কোথায় গেরস্থ বাড়ি খুঁজবো? তাছাড়া কে না জানে যে স্টেশন মাস্টারের বাড়ি স্টেশনের সঙ্গেই হয়।

মাস্টার মুখ না তুলেই বলে, ও বুঝেছি। একটু বসুন। কাজ সেরে নেই।

ঠিক আছে, অন্ধকার দেখি বলে, রঞ্জন প্লাটফরমে ফিরে আসে। সিগারেট জ্বালায়। মনে হয় মোহনীয় রাত। ঢাকা শহরে এমন রাত হয়তো আছে, কিন্তু ওর দেখা হয়নি। দুঃখ নয়, ভয় নয়, স্মৃতির তাড়না নয়, শ্রাবন্তীর মৃত্যুর পর এই প্রথম একটি রাত ওকে আনন্দ দিচ্ছে। ও লম্বা করে সিগারেটে টান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ফুঁড়ে লোকটা সামনে এসে দাঁড়ায়।

ওর ফকফকে সাদা দাঁতগুলো অন্ধকারের গায়ে তারার ফুটকির মতো জ্বলে উঠলে রঞ্জন ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে যায়। ও কিছু বলার আগেই লোকটি বলে, ভাইজান আমারে একডা দিবেন? সিগারেট দেখলে বুকটা পোড়ে। বিড়ি টানতে টানতে কইলজা সাদা হইয়া গেলো।

— তুমি কে?

— কাজেম!

— এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?

— ঐতো ঐদিগে। আন্ধারে।

— আন্ধারে কেন?

— আন্ধারের জীব যে হের লাইগা?

— বাহ, বেশ কথা জানো তো। তুমি এখানে কি করো?

— ইস্টিশনে কাম করি। লাল-সবুজ ফেলাগ দেহাই। গাড়ি ভোঁ-ভোঁ কইরা ছুটে। কুউ-ঝিকঝিক - ঝিকঝিক -

কাজেম দুলে দুলে ভঙ্গি করে দেখায়। রঞ্জন বেশ উপভোগ করে। এই ভূতুড়ে নির্জন স্টেশনটা যেন খানিকটা প্রাণ পেয়েছে। ও কাজেমের সঙ্গে সুর করে বলতে থাকে।

— তুমি গান জানো কাজেম?

—এইডাতো আমার গান। কুউ - ঝিকঝিক -

— ঐ পুব দিকে। বিলের ধারে।

— কে আছে বাড়িতে?

— মা, বউ, মাইয়া, বলে ও হঠাৎ রেগে যায়। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, একডা সিগারেটের লাইগা এ্যাত্তো কথা কঅন লাগরো জানলে কে চাইতো সিগারেট। না দিলে না দিবেন। যাই গিয়া।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, রেগে গেলে কেন? আমি তো তোমার খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। তুমি খুব মজার মানুষ।

কাজেম বিগলিত হেসে পেছন ফিরে তাকায়। প্রশংসা ওকে যাদু করে। রঞ্জন সিগারেটের প্যাকেটটা ওকে দেয়। কাজেম বুঝতে পারে না কি করবে। ওর কি নেয়া উচিত? নাকি —

— নাও ধরো।

— পুরোডা?

— হ্যাঁ, পুরোটা। বেশি নাই। কয়েকটা মাত্র।

কাজেম সিগারেট দু' ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরতে ধরতে বলে, আগুন?

রঞ্জন দিয়াশলাই জ্বালায়। জ্বলে ওঠে সিগারেট। মুহূর্ত মাত্র। তারপর নিভে যায়। অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। জনশূন্য স্টেশন। এই পটভূমিতে ছোট্ট আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে রঞ্জনের মনে হয়েছিলো এ সৌন্দর্য তুলনাহীন। কেমন করে ভুলে যাবো নিজের অতীত? একটি জায়গা থেকে পালিয়ে আর একটি জায়গায় এলেই কি নিষ্কৃতি? আগুন তো পোড়াতে পারে না স্মৃতি। পোড়াতে পারে না গ্লানি। বরং অনুতাপ আগুন হয়। শিখাহীন আগুন। সঞ্চারিত হয় না একটি বস্তু থেকে অন্যটিতে। তবু সেই শিখাহীন আগুনই ভয়াবহ। আমার বুকের ভেতর এখন তার দহন।

।।২।।

স্টেশন মাস্টারের নাম জাকারিয়া আবদুল্লাহ্। বি.এ. পাশ। বর্তমান বয়স একান্ন। রেলেই চাকরি জীবনের শুরু। একত্রিশ বছর ধরে চাকরি করছে। বিপত্নীক। তিনটি ছেলে মারা গেছে। একটি মাত্র মেয়ে জীবিত। মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছিলো সাত বছর আগে। স্বামী যৌতুকের টাকা দাবি করেছিলো। জাকারিয়া দিতে অস্বীকার করায় ছয় বছর ধরে নিরুদ্দেশ। মেয়ের ঘরে একটি নাতনী আছে। ভীষণ চঞ্চল, বুদ্ধিমতী। এই সংসার নিয়ে জাকারিয়া স্টেশন থেকে স্টেশনে ঘুরে বেড়ায়। রেলের চাকরি তার ভালোলাগে। কারণ স্টেশনের আসাযাওয়ার গভীর অর্থ তার কাছে জীবনের এক চরম সত্য।

।।৩।।

ওরা তিনজনে বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সামনে হারিকেন হাতে কাজেম। ও ওর নিজস্ব সুরে কুউ - ঝিকঝিক করে গান গাইছে। গাছপালার ভেতর দিয়ে পথ। এই বুনো রাস্তা রঞ্জনের মন কেড়ে নেয়। ভাবে এখানে বসে ছবি এঁকেই ও দিনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিতে পারবে। তখন শুনতে পায় জাকারিয়া প্রশ্ন করছে, কোথা থেকে এসেছেন?

— ঢাকা।

— কি করেন?

— ছবি আঁকি।

— ছবি আকেন? ফুঃ।

রঞ্জন থমকে দাঁড়ায়। মানুষটি এভাবে তার শিল্পীসত্তাকে তাচ্ছিল্য করবে ও ভাবতেই পারেনি। লোকটিতো অদ্ভুত। এই অন্ধকার রাতের ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে রঞ্জন ফুঃ শব্দকে আকাশ-পাতাল ফুটো করে দিতে দেখে। ওর কষ্ট হয় না। একজন মানুষকে জানার আগ্রহে খুশি হয়। এমন কাউকেই তো চায় যে ওকে অন্য একটি জগতের গুহায় ঢুকিয়ে দেবে। হাঁটতে হাঁটতে ও দেখবে কতোটুকু যেতে পারে? গুহাটার শেষ প্রান্ত খোলা, সেখানে কোনো নদী আছে কি না? যে নদী পেরুলে একটি নতুন লোকালয়ে পৌঁছে যাবে ও। ও প্রশ্ন করে, ছবি আঁকা কি ভালো না?

— থামলেন কেন? হাঁটুন।

— আপনার মতো স্টেশন মাস্টার হতে পারলে কি জীবন সার্থক হয়?

— স্টেশন মাস্টার হবার আগে শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম, মানে স্কুল-কলেজে পড়ার সময়।

— স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেছে বলে ওই কাজটি এখন তুচ্ছ? তাই না?

জাকারিয়া একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, না, তুচ্ছ নয়। স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন বেঁচে আছে অথচ ছুঁতে পারি না বলেই রাগ হয়।

রঞ্জন হো-হো করে হেসে ওঠে। জাকারিয়া ওর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, শুনুন অন্ধকারে এমন আচমকা হাসতে হয় না। মানুষের পিলে চমকে ওঠে।

রঞ্জন স্বগতোক্তির কণ্ঠে বলে, আমি তো মানুষের পিলে চমকে দিতে চাই।

— যত্তসব বাথোয়াজ। বড় কথা আমি শুনতে পারি না। স্টেশন থেকে স্টেশনে ঘুরে বেড়ানো মানুষ আমি। প্রতিদিন কতোশতো লোক দেখি। ওই কাজেম আলোটা ভালো করে দেখা —

কাজেম হারিকেন উঁচু করে ধরে। একই ঢঙে গানটা গাইতে থাকে, বরং গলা উঁচু করে। যেন ওর আশেপাশে কেউ নেই। ও যা খুশি তা করতে পারে। বাধা দেবে কোন শালা? জাকারিয়া ধমক দেয়। থামতে বলে। ও আপত্তি জানায়, থামতে কন ক্যান? একটুতো গানই করলাম। জাকারিয়া রঞ্জনের দিকে ফিরে তাকায়। বলে, এই যে দেখছেন ও গান গাইতে চায়? ভাবতে পারবেন না, এক এক সময় ও কি ভীষণ নিষ্ঠুর হতে পারে।

কাজেম দাঁত বের করে হাসে। বলে, স্যারে ঠিকই কয়। তহন আমি মানুষ থাহি না।

— বুঝলেন, মানুষের মানুষ থাকাটাই খুব কঠিন কাজ।

জাকারিয়ার কথায় রঞ্জন অবাক হয়। ভাবে, আশ্চর্য! লোকটি গভীর মানুষ তো। এই ভূতুড়ে জায়গায় এমন মানুষের দেখা পাবো ভেবেছিলাম কি? কেমন দার্শনিকের মতো কথা বলে। আমি নিজেকে আড়াল করতে পারব তো এঁর দৃষ্টি থেকে? নাকি তিনি তাঁর তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখে ফেলবেন আমার ভেতরটা? য়েটার ভেতর গুহার মতো অন্ধকার আছে, মরা নদী আছে এবং পাথর হয়ে যাওয়া বৃষ্টির ধারা আছে? আমি তাহলে কতো শতাব্দীর আগের মানুষ?

— কি হলো আবার চুপ করে গেলেন যে? ওই যে সামনে আমার বাড়ি। বাড়িতে আমার মেয়ে আছে, সঙ্গে সাত বছরের মেয়ে। ওর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছে মেয়েটির জন্মের আগে। আর কোনো খোঁজ পাইনি।

শেষের দিকে জাকারিয়ার কণ্ঠ বিষণ্ন হয়ে যায়। এসব মুহূর্তে কাউকে সান্ত্বনার কথা বলতে রঞ্জনের লজ্জা করে। ও বিব্রত হয়। মানুষের আবেগকে তার নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী লালন করতে দেয়া উচিত। অন্য মানুষের সামান্য কয়টি কথায় তার কি তেমন কিছু এসে যায়? যায় না। ও খানিকটা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, আমার নাম রঞ্জন। আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকবেন। তুমি করে বলবেন। আমি আপনার ভালোবাসা চাই।

— ভালোবাসা? জাকারিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলে।

কাজেম আবার গলা উঁচিয়ে নিজের গানটা গায়, ভালোবাসা রেলগাড়ি — রেলগাড়ি— কুউ ... ঝিকঝিক...

— অ্যাই থাম। হারিকেনটা আমাকে দে। তুই চলে যা কাজেম।

কাজেম একই সুরে গাইতে গাইতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

— লোকটি বুঝি খানিকটা পাগলাটে?

— বুঝতে পারি না। মানুষ চিনতে ভুল করি। এ আমার এক বড় দোষ। জাকারিয়া হঠাৎ রঞ্জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, মানুষ চেনা কি খুব সহজ?

— হয়তো না। তবু তো আমরা চেনার চেষ্টা করি।

— ভীষণ ভুল চেষ্টা। মানুষ গভীর সাগরের তল। এই যে তুমি হঠাৎ করে এখানে এলে, আমার সঙ্গে জুটে গেলে — আমি কি তোমাকে চিনতে পারবো?

রঞ্জন ঢোক গিলে বলে, তাতো নিশ্চয়।

— এই যে কতো দেখেশুনে মেয়েটিকে বিয়ে দিলাম — ভেবেছিলাম টাকাকড়ি নেই তো কি হয়েছে, ছেলেটি তো ভালো। দেখলাম ভুল। চিনতে পারিনি। চেনা যায় না।

রঞ্জন অভিভূত হয়ে বলে, আপনার মতো মানুষ হয় না। আপনার মতো মানুষের সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি।

জাকারিয়া হো-হো করে হাসে। হাসতে হাসতে হেঁচকি ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমার মেয়েটিও বলে, বাবা তুমি জানি কেমন। তোমাকে বোঝা যায় না। আকস্মিকভাবে তার কণ্ঠস্বর বদলে যায়। আমি জানি আমার মেয়েটি তোমাকে দেখলে খুশি হবে। আই, এ পাশ করার পর বিয়ে দিয়েছিলাম। আর লেখাপড়া করেনি। কিন্তু বুদ্ধিমতী। অনেককিছু খুব সহজে বুঝতে পারে।

জাকারিয়ার কণ্ঠ খুব আন্তরিক মনে হয় রঞ্জনের। যেন মেয়েকে খুশি করার জন্য সারপ্রাইজ দেবে। রঞ্জনকে দেখলে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তার মেয়ের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি থেকে মুছে যাবে ধূসর অতীত।

— এসো রঞ্জন। আমরা এসে গেছি।

— এসে গেছি? সম্মোহিতের মতো বলে রঞ্জন। একটু আগে একটি বুদ্ধিমতী মেয়ের এক টুকরো গল্প শুনেছে ও। সেটুকু সব নয়। আরো আছে। ভবিষ্যতে আরো গল্প তৈরি হবে। ও দেখতে পায় দরজার কড়া নাড়ায় একজন বাবা। একটু পর দরজা খুলে যায়। সে বাবার হাতের হারিকেন উঁচুতে ওঠে। সে আলোয় দেখা যায় তার মুখ। তার সঙ্গে রঞ্জনের দৃষ্টি বিনিময় হয়।

জাকারিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, মেহমান এনেছি মা।

— আমি তো জানি কাউকে পছন্দ হলে তুমি তাকে বাড়িতে আনবে। তাই না বাবা?

— একি তোর অভিযোগ?

— না, না মোটেই নয়।

— জানিস মা ও একজন শিল্পী। অবন ঠাকুরের মতো ও ছবি লেখে না। ছবি আঁকে।

— আসুন।

রঞ্জনের কাছে তার আমন্ত্রণ।

।। ৪ ।।

তার নাম দীপ্তি। একহারা গড়ন। টানা চোখ। একরাশ চুলের এলো খোঁপা ভেঙে পড়েছে পিঠের ওপর। মেরুণ রঙের তাঁতের শাড়ি পরেছে। সোনালি পাড় ভারি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। নিরাভরণ হাত। কানে সোনার ফুল। হেসে কথা বললেও বিষণ্ণতা তাকে ছাড়ে না। বিষণ্ণতার ভেতরেও যে সৌন্দর্যের দ্যুতি থাকে এবং তা কারো কারো চোখে ধরা পড়ে তেমন সময় দুজন মানুষের মাঝে বয়ে যায়। তারা সবাই মিলে গৃহে প্রবেশ করে।

।। ৫ ।।

রাত্রিবেলা। কাজেমের বাড়ি। গরিবের সংসার। কাজেমের বউ মৌফুলি মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। ঘুম পাড়াচ্ছে। গুনগুনিয়ে গান গাইছে। খ্যাসখেসে কণ্ঠ। এতে কারো ঘুম আসার কথা নয়। কিন্তু শিশুটি কথা বলতে পারে না বলে প্রতিবাদ নেই। কাজেমের মা আতরজান বারান্দায় বসে আছে। ভালোবাসা রেলগাড়ি—গাড়ি ছোটে ঝিকঝিক —ঝিকঝিক করতে করতে কাজেম বাড়িতে ঢোকে। মাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে না মায়ের মন খারাপ, না শরীর খারাপ। ও দু'পা এগিয়ে মাকে বলে, মেলা খিদে লাগছে। ভাত দে মাগো।

— হাতমুখ ধুবি না?

— না। কাজেম পিঁড়ি টেনে বসে। মা জানে ও এমনই। বাইরের কাপড়ও খুলবে না।

খিদের সময় ও কোনোকিছু মানতে চায় না। মৌফুলি রেগে গেলে বলে, গরুর মতো খায়। ভুষির গামলা দেখলে হুঁশ থাকে না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কাজেমের একথা মনে হতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ঘরের ভেতর থেকে ওর গলা ভেসে এলে কাজেমের খিদে বেড়ে যায় এবং রাগ বাড়তে থাকে। আতরজান ভাতের সানকি, ডালের বাটি, পানি, লবণ, কাঁচামরিচ ইত্যাদি নিয়ে এসে ছেলের সামনে রাখে।

— কি রানছস মা আইজ?

— কি আর, পোড়া বাগুনের ভত্তা আর খেসারির ডাইল।

— খেতা পুড়ি বাগুনের ভত্তার। রোজ রোজ ক্যাবল ভত্তা আর ডাইল। খামু না।

ও ধাক্কা দিয়ে সবকিছু উল্টেপাল্টে ফেলে দেয়। ভাত-পানি একসঙ্গে গড়াতে থাকে বারান্দার ওপর। রাগে-দুঃখে আতরজান চেঁচিয়ে ওঠে, ভালো খাইতে অইলে কামাই করতে পারস না?

— কামাই তো করি, করি না?

ঘরের ভেতর থেকে প্রমাদ গোনে মৌফুলি। কান খাড়া করে মা-ছেলের কথা শোনে। তখনও আতরজান সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, কয় টাহা কামাই করছ? এ্যাতোগুলা মাইনষের অয়? কতা আছিল শ্বশুড়বাড়ি থাইকা কিছু টাহা-পয়সা পাবি, হেইডাও পাইলি না। সংসারে ক্যাবল খাআনের বোঝা বাড়ছে। কামাইয়ের মানুষ বাড়ে নাই।

কাজেম চেঁচিয়ে ওঠে, কই কোনহানে মৌফুলি? আছে না গেছে?

— যাইবো আর কোন চুলায়? ভাত লইয়া কেউ বইয়া নাই। বাপডাতো বিয়া দিয়া বাঁচছে।

— বাঁচা লাগবে না। দেইখা ছাড়ুম।

কাজেমকে দরজার সামনে দেখে মেয়েকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে মৌফুলি। এমনইতো ঘটছে প্রায় প্রতিদিনই। তবু কেন ও ভয় পায়? কেন ভেঙে দিতে পারে না এমন বালুর সংসার? শুনতে পায় এতোকিছুর পটভূমিতে আতরজানের তীক্ষ্ণ বাক্যবান, কচু দেখবি তুই। অরে তো একডা নবাবের বউ বানাইছছ।

— মৌফুলি? মৌফুলি? কাজেমের কর্কশ কণ্ঠ ঘরে ছড়িয়ে যায়।

— মাইয়াডার জ্বর অরে এটটু ঘুম পাড়াইতাছি।

— ঘুম পাড়াইতাছ? না নিজেও ঘুমাও নবাবের বিটি?

— নবাবের বিটি হমু ক্যান? আমার বাপে যুদ্ধ করছে। কও মুক্তিযোদ্ধার বিটি।

— ফির মুখে মুখে কথা!

— বেবাক কাম তো আমিই করি। এর মজুরি নাই? কাজেম ওকে মারতে গেলে মৌফুলি মেয়েকে বুকে নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে বলে, খবরদার গায়ে হাত তুলবা না। রোজ রোজ পাইছ কি? গায়ে হাত তোলার আগে হারাদিন যে সংসারের লাইগা খাটছি হেই মজুরি দেও।

থমকে যায় কাজেম। এই প্রথম মৌফুলি রুখে দাঁড়ালো। ওর মজুরি? অদ্ভুত তো! ওর আবার মজুরি হয়। ও দ্বিধায় পড়ে, কিন্তু একই সঙ্গে ওর রাগও পানি হয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আতরজানের মনে হয় স্বামীর সংসারে ও নিজেওতো ভূতের মতো খেটেছিলো। কখনও তো মজুরির কথা মনে হয় নি। মৌফুলি যেমন করে বললো? খুব কি মিথ্যা বলেছে? আতরজান নিজের ভেতরে তোলপাড় অনুভব করে। আশ্চর্য, মজুরি! নিজের সংসারে খাটলেও

কামাই হয়? মৌফুলি না খাটলে তো এই সংসারে একটা কামলা লাগে। তাহলে মজুরি হইব না কেন? প্রবল এক বিস্মিত বোধে আতরজানের ভেতরটা পাক খেতে থাকে। সে রাতে ভালো ঘুম হয় না ওর। মৌফুলি ঘুমুনোর আগে দেখে অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে কাজেম বিড়ি টানছে। ও একবারও ডাকে না। হাত ধরে না। বলে না, ভাত খাও। ঘুমাইতে আহ। রাত তো কতো অইছে। কাইল কামে যাইতে অইবো না? নিশির লাইগা ওষুদ লাগবো। থাক না বসে। দায় কি ওর একলার।

মেয়েটা কেঁদে ওঠে। কাঁদতে থাকে। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে মজুরির কথা ভুলে যায় মৌফুলি। ভাবে, এই কাজটুকু ওর আনন্দের। ওর একলার। এর সঙ্গে দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক নেই। নিশি ঘুমিয়ে পড়লে চমৎকার প্রশান্তির ঘুম হয় মৌফুলিরও।

।।৬।।

ভোর হয়েছে। রোদে ভরে গেছে রঞ্জনের ঘর। কিন্তু ওর ঘুম ভাঙেনি। এ ঘরে রিঙ্কু খেলা করে। ওর রাজ্যির জিনিসপত্র। কি নেই? কিন্তু দরজা ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনকে দেখে ওতো অবাক! সুর করে বলে, এই ঘরে কে রে? মনে হচ্ছে সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস।

কিন্তু সাড়া দেয় না রঞ্জন। কি আর করা, কিছু একটা তো করতে হবে। ও পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে রঞ্জনের গায়ে ধাক্কা দেয়।

— এই তুমি কে? রঞ্জন হাই তুলে পাশ ফেরে। বললে না তুমি কে?

— উঁহু বলবো না। কিন্তু আমি জানি তুমি কে।

— বলতো আমি কে?

রঞ্জন ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি সোনার চাঁদ সাত রাজার ধন। চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

রঞ্জন ওর কপালে একটা টিপ দিলে রিঙ্কুও রঞ্জনের কপালে আঙুল রাখে। রঞ্জনের ভারি ভালোলাগে। বুঝতে পারে মেয়েটির দারুণ ক্ষমতা। কেমন করে ছুঁয়ে ফেললো বুকের ভেতর। কপাটটা আটকে দিলে ওকে অনায়াসে ভেতরেই রাখা যাবে। রিঙ্কু রঞ্জনের দু'হাত জোড়া করে তালি দিতে দিতে ছড়া কাটে — চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা। ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো। ভালো গরুর দুধ দেবো।

— ও মা আমি কি হাঁস যে কুঁড়ো খাবো?

রিঙ্কু বিব্রত হয়ে যায়। জিভে কামড় দেয়। দ্রুত বলে, থুক্কি, না কুঁড়ো খাবে কেন? ছিঃ ছিঃ। ওর এই বিব্রত হওয়ার ভঙ্গি দেখে হো-হো করে হাসে রঞ্জন। হাসি শুনে এগিয়ে আসে জাকারিয়া। দীপ্তিও দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। জাকারিয়া রিঙ্কুকে কোলে নিতে নিতে বলে, কি হয়েছে নানুভাই?

— দেখো নানুভাই আমি ভুল করে এই লোকটাকে হাঁস বানিয়ে ফেলেছি।

— হাঁস বানিয়ে, খারাপ করোনি। ও সরোবরে রাজহাঁস।

— হ্যাঁ রাজহাঁসতো খুব সুন্দর। নানুভাই আমাকে কুৎসিত প্যাকপ্যাকের গল্প বলেছে। তুমি কি জানো গল্পটা? ওই যে কুৎসিত হাঁসের বাচ্চাটা বড় হয়ে রাজহাঁস হয়ে গেলো। উহ্ কি মজা। তুমি তাহলে রাজহাঁস, কি বলো?

— ঠিক আছে তাই। তোমার মতো সোনার মেয়ে আমাকে রাজহাঁস বানাতে চাইলে আমি রাজহাঁসই হবো।

— কিন্তু তুমি বললে না তো তুমি কে?

— তোমার কাকু।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দীপ্তির সঙ্গে চোখাচোখি হয়। দীপ্তির ঠোঁটে মৃদু হাসি। জাকারিয়া রিঙ্কুকে সায় দিয়ে বলে, তুমি ওকে কাকুই ডাকবে। সম্পর্কটি রিঙ্কুর কাছে গোলমেলে ঠেকে। ও মানতে পারে না। জাকারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, মা বলেছে কাকু মানে বাবার ভাই। আমার তো বাবাই নেই।

জাকারিয়া অন্যমনস্ক স্বরে হয়তো নিজেকে বোঝানোর জন্যই বলে, বাবা না থাকলেও কাকু থাকে নানুভাই।

— তাহলে তুমি আমার রাজহাঁস কাকু।

রঞ্জন ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ভাবে এই জায়গাটা ভূতুড়ে, কিন্তু পরিবারটা ভূতুড়ে নয়। এদের ভেতরে অন্ধকার নেই। সবটাই আলো। এই সকালের মতো। রিঙ্কু এখনো ওর বুকের ভেতর। সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন মানুষ। মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কি উষ্ণ, কি নরম সম্পর্ক তৈরি করার সময়টি। ট্রেনে উঠে পালিয়ে আসার সময় কি ভেবেছিলো এভাবে মগজের ভেতর ফিট করে রাখা ক্যামেরাটি যে ছবি ধরে সেটাই বাস্তব! কতোদূর যেতে পারবো এই বাস্তব নিয়ে? রঞ্জনের ভেতরটা কেঁপে উঠলে রিঙ্কু ছটফটিয়ে নেমে যায়।

নাস্তা খেতে বসে রঞ্জন রিঙ্কুকে বলে, আমার কিন্তু কালো গরুর দুধ চাই রিঙ্কু সোনা।

— কালো গরুর দুধ? নানুভাই কোথায় পাবো?

— উঁহু নানুভাই নয়, তুমি আমাকে দেবে বলেছো।

রিঙ্কু লজ্জা পায়। মায়ের আঁচলের নিচে মুখ লুকাতে লুকাতে বলে, মাইতো আমাকে রোজ রোজ ছড়াটা বলে।

— এখন থেকে তুমি আর আমি কালো গরুর দুধ খুঁজতে বেরুবো।

রিঙ্কু খুশিতে লাফিয়ে ওঠে, সত্যি? খুব মজা হবে।

দীপ্তি সামলে নেবার জন্য বলে, তাহলে কিন্তু বিপদে পড়বেন। কয়দিন পর আমার মেয়ে বলবে চাঁদ মামাকে নিয়ে এসো।

— তাই না হয় এনে দেবো।

— পারবেন?

— চেষ্টা করতে দোষ কি? সবকিছু বাস্তবে পেতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। মানুষের ভেতরে স্বপ্নে পাওয়ার একটি ব্যাপার থাকে। মানুষের ইচ্ছেগুলোতো কখনো আনন্দের বুদ্বুদ হয়ে উঠতে পারে। এভাবে আমরা আমাদের চারপাশের জগতটা রঙিন করতে পারি।

এটুকু বলে রঞ্জন মৃদু হাসে। জাকারিয়া মাথা নাড়ে। দীপ্তি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন সুন্দর করে গুছিয়ে কেমন করে কথা বলা যায়। কেউ যখন কিছু বলে না তখন রঞ্জন আবার বলে, আমি তো মনে করি নানাভাবে বেঁচে থাকা সুন্দর করে তুলতে পারাই স্বপ্ন। বাস্তব যখন খুব নির্মম হয়ে যায় তখন আমরা স্বপ্নই আঁকড়ে ধরি। নিজের একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখি, হয়তো সারাজীবন সেটা আর তৈরি করা হয় না। একটা কিছু হতে চেয়েছিলাম, হয়তো হতে পারলাম না, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে তা লালন করে সুখ পাই, নিবিড় আনন্দ যাকে বলে। কখনও দীর্ঘশ্বাস আসে, সেটাও আনন্দ।

বলতে বলতে বিষম খায় রঞ্জন। জাকারিয়া পানির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে, এক চুমুক

পানি খাও বাবা।

দীপ্তির বিষণ্ন দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বলে, কি সুন্দর করে বললেন কথাগুলো। মনে হলো এই মুহূর্তের জন্য বেঁচে থাকা সার্থক হয়ে উঠেছে। মনে হয় এমন কথা বলে আপনি অনেককে মুগ্ধ করেছেন। বিষম খেলেন যে? কেউ হয়তো আপনার কথা মনে করেছে।

রঞ্জন রুটি মুখে পুরতে পুরতে বলে, হবে হয়তো।

।।৭।।

রঞ্জনের পুরো নাম আসহাব নাসিরুদ্দীন। বাবা মুহম্মদ নাসিরুদ্দীন। মা সায়রা বাণু। ছোট ভাই অঞ্জন। ছোট বোন কঙ্কন। বাবা বড় ব্যবসায়ী। অঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। কঙ্কন কলেজে। গান শেখে। ভালো গায়। বড় ছেলে এই পরিবারে একটি সংকট সৃষ্টি করেছে। পরিবারের অন্য সদস্যরা মানসিকভাবে খুব বিধ্বস্ত। কঙ্কনের গান গাইতে ভালোলাগেনা। অঞ্জনের আড্ডা দিতে ইচ্ছে হয় না। সায়রা বাণু প্রায় অসুস্থ থাকে। নাসিরুদ্দীন একা একা সময় কাটায় পার্ক কিংবা অন্য কোথাও। পুলিশ এদেরকে মানসিক চাপের মুখে রেখেছে। ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলে সবাই শঙ্কিত হয়ে যায়। ফোন ধরে নাসিরুদ্দীন, হ্যালো, না ভাই না, ছেলের কোনো খবর জানি না। আমি তো বলেছি ওকে পেলে আমি সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যাবো। আমিও চাই আমার ছেলে আসহাব নাসিরুদ্দীন ধরা পড়ুক। ওর প্রাপ্য শাস্তি তো ওকে পেতেই হবে। আমি নিজেও আর এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

নাসিরুদ্দীন ফোন রেখে দিলে সায়রা বাণু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ও.সি.-র ফোন না?

— হ্যাঁ, লোকটা কেমন চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। মনে হয় সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে গলাটা চেপে ধরতে চাইছে।

অঞ্জন জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। মুখ ফিরিয়ে বলে, এটা ওদের এক ধরনের কৌশল বাবা।

সায়রা বাণু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমাদেরকে মানসিক পীড়ন করে ওরা রঞ্জনের খবর বের করতে চাইছে।

হঠাৎ করে নিস্তব্ধ হয়ে যায় ঘর। কঙ্কন চোখ মোছে। সবাই ওর দিকে তাকায়। এ পরিবারের শেষ সন্তানটির দিকে তাকিয়ে নাসিরুদ্দীন উদাস কণ্ঠে বলে, আমরা কেউই জানিনা রঞ্জন কোথায়।

কঙ্কন ভেজা চোখে সবার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি চাই ভাইয়া এভাবে নিজেকে লুকিয়ে রেখে একজন অন্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকুক।

অঞ্জনের চোখে এবং মুখেও সে কথার সমর্থন, আমিও তাই চাই। ভাইয়া খুন করতে চায়নি। ভাইয়া ভুল করেছে। প্রচণ্ড অপরাধবোধে ভুগছে।

— কিন্তু আইনের চোখে ও অপরাধী। ও খুনের আসামী। অঞ্জন কঠিন কণ্ঠে বলে, বাবা তুমি কি চাও যে ভাইয়ার শাস্তি হোক।

নাসিরুদ্দীন চুপ করে থাকে। বাকিরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কারো চোখে পলক পড়ে না। পলক পড়ার জন্য দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যায়। ওদের মনে হয় একটি পলক মানে একটি জীবন। সায়রা বাণু জলভরা চোখে পলক ফেলে একটু বেশি সময় ধরে বুঁজে রেখে আবার খোলে। বলে, তুমি কিছু বললে না যে? নাসিরুদ্দীন অন্যদিকে তাকায়। খোলা মাঠে এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হলে ও নিজের দৃষ্টিকে পাঠাতো দিগন্ত ছুঁয়ে আসার জন্য। এখন

তিন জোড়া চোখের সামনে ও ভীষণ অসহায় বোধ করে। কঙ্কন মৃদুস্বরে বলে, বাবা তুমি অঞ্জনের প্রশ্নের উত্তর দিলে না যে? নাসিরুদ্দীন চমকে মেয়ের দিকে তাকায়। তারপর দৃষ্টি আবার অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। ঘরের চারদেয়ালে আটকে যায় দৃষ্টি। প্রবলভাবে মনে হয় ওর কোথাও পালাবার জায়গা নেই। ও বন্দী। নিজের কারাগারে আটকে থাকা একজন কয়েদী। অঞ্জন আবার বলে, বাবা তুমি কিছু বলবে না? নাসিরুদ্দীন দৃষ্টির ভাষা হারিয়ে ফেলে। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। এদের কাঠগড়ায় ও একজন অপরাধী। তখন ধ্বনিত হয় সায়রা বাণুর আর্তনাদ, ছেলের জন্য তোমার কোনো মায়া নেই?

মুহূর্তে জ্বলে ওঠে দৃষ্টি। মনে হয় এটাই উঠে দাঁড়াবার সময়। এখনই বেরুতে হবে নিজের তৈরি কারাগার থেকে। কঠিন গলায় বলে, মায়া আর আইন এক নয় সায়রা বাণু।

— বাবা বিচারে ভাইয়ার ফাঁসি হতে পারে।

সবাই চমকে অঞ্জনের দিকে তাকায়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখোমুখি। সায়রা বাণু নরম কণ্ঠে আত্মমগ্ন হয়ে বলে, আমাদের প্রথম সন্তান। কতো আদরের, কতো আকাঙ্ক্ষার। নাসিরুদ্দীন আনমনা কণ্ঠে নিজেকে শোনায়, হ্যাঁ কতো আকাঙ্ক্ষার, কতো আদরের। মনে আছে, ওর জন্মের পর তুমি আর আমি নাম রাখার জন্য রোজ ঝগড়া করতাম। আমি একটা বললে তুমি অন্যটা।

— আসলে নাম রাখাটা তেমন ব্যাপার ছিলো না। আমরা ঐ ভাবে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করতাম। ওকে পেয়ে আমরা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

— খুশিতে মেতে উঠেছিলাম। আমাদের দিনগুলো অন্যরকম হয়ে উঠেছিলো।

— তোমাদের সেই সন্তান আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছে বাবা।

— অপরাধ করে ধরা না দিলে তো পালাতেই হবে।

— বাবা ভাইয়া ঠাণ্ডা মাথায় অপরাধ করেনি। সেটা মুহূর্তের উত্তেজনার ভুল।

— অপরাধের কোনো সচেতন-অচেতন অবস্থা থাকে না মা। অপরাধ, অপরাধই।

মুহূর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সায়রা বাণুর কণ্ঠ, বুঝেছি ছেলেটির ফাঁসি হলে তুমি খুশি হও।

— আহ, সায়রা বাণু এভাবে আঘাত করতে হয় না। তেত্রিশ বছর ঘর করেছি। তুমি তো জানো আমি কিসে খুশি হই। বিয়ের আগে এবং পরে তুমি বলেছো তুমি আমাকে সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারো। বলেছো তোমার আমার মধ্যে কোনো বোঝাবুঝির ফাঁক নেই।

সায়রা বাণু কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি আর কিছু বুঝতে চাই না। আমার রঞ্জন, রঞ্জন।

কঙ্কন দু'হাতে মুখ ঢাকে। অঞ্জন টেবিলে একটি ঘুষি দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে। নাসিরুদ্দীন সোফায় ঘাড় কাত করে দেয়। ওপরে সাদা ছাদ — শূন্য।

।।৮।।

কখনোই খুব ভোরে ঘুম ভাঙে না রঞ্জনের। তখন অন্যরা ঘুম থেকে ওঠে। প্রাত্যহিক কাজ করে। জাকারিয়া অফিসে চলে যায়। প্রায় প্রতি রাতেই স্বপ্ন দেখে ও। যেন কেউ ওকে তাড়া করে নিয়ে আসছে। কখনো স্বপ্ন দেখে গোঁ-গোঁ করে। নিজেও জানে না কেমন অদ্ভুত শব্দ ওকে ভৌতিক মানুষ করে তোলে। যেন বলতে ইচ্ছে করে, তুইতো মরে ভূত হয়ে গেছিস।

দীপ্তি বারান্দা দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ায়। শব্দ শুনে ভুরু কোঁচকায়। ওর ভয়ও

করে। একটুপর রঞ্জন পাশ ফিরে শুলে শব্দ থেমে যায়। ও দরজার সামনে দাঁড়ায়। ভাবে ধাক্কা দেবে কিনা। হাত বাড়ায়, হাত নামিয়ে নেয়। চলে যায়। আমার কি অস্থির লাগছে? নিজেকে প্রশ্ন করে। আমার অস্থির লাগলে আমি অন্য কাজ করতে পারি না। আবার এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। সেখানে দাঁড়িয়েই ভেতরে মুখ বাড়ায়। রঞ্জন উঠে বসে।

— আসুন।

— ইয়ে, মানে, মনে হচ্ছিলো আপনি ঘুমের মধ্যে —

— হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। ভীষণ বাজে স্বপ্ন দেখেছি।

দীপ্তি হাসি ছড়িয়ে বলে, তাই বলেন। কি স্বপ্ন দেখলেন?

— বলতে পারবো না। জানেন তো মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখে যার ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

— হ্যাঁ, তাতো ঠিকই। যাকগে। এখন পর্যন্ততো বললেনই না কে আপনি? কোথায় ঘরবাড়ি?

— খুব বুঝি কৌতূহল হচ্ছে?

— তাতো হচ্ছেই।

— আস্তে আস্তে জানুন না। একটা কিছু আবিষ্কার করার মতো।

— রক্ষে করুন, আমি কলম্বাস হতে চাই না।

রঞ্জন অন্তরঙ্গ স্বরে বলে, আমি চাই আপনি কলম্বাস হন।

দীপ্তি লজ্জা পায়। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলে, রান্নাঘরে যাচ্ছিলাম। কি খাবেন বলুন?

— যা খাওয়াবেন তাই।

— আপনার নিজের কোনো ইচ্ছে নেই?

— আছে। কিন্তু ইচ্ছের কথা বলতে ভয় করে।

— ঠিক আছে, মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে আসুন।

দীপ্তি চলে গেলে আবার নিজের ভেতর কুঁকড়ে যায় রঞ্জন। এখানে কতোদিন থাকা যাবে? কতোদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবো? আমার তো একটা অবলম্বন চাই। এই পরিবারটি কি আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন হতে পারে? ওরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? ভালোবাসবে? আমার কি ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা আছে?

— কাকু?

রঞ্জন দু'হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। পাগলের মতো আদর করে।

— কি হয়েছে তোমার? ছাড়, ছাড়।

— তুমি আমাকে ভালোবাসো রিঙ্কু?

— হ্যাঁ।

— কেমন ভালোবাসো? কতোটুকু ভালোবাসো?

— সেই যে রাজকন্যা ওর বাবাকে নুনের মতো ভালোবাসতো, আমিও তোমাকে তেমন নুনের মতো ভালোবাসি।

— তুমি একটি চমৎকার মেয়ে। বুঝতে পারছি তুমিই পারো আমাকে বাঁচিয়ে দিতে।

— মা আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে নিয়ে যেতে। চলো নাস্তা রেডি।

রিঙ্কুকে বুকে নিয়ে দীপ্তির সামনে যেতে যেন স্বস্তি লাগে রঞ্জনের। ও হয়তো আর জিজ্ঞেস করবে না কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন? রঞ্জন ধীর পায়ে রান্নাঘরে আসে। রিঙ্কুকে

কোল থেকে নামাতে নামাতে বলে, নাস্তাটা এখানে বসেই খাই। কি বলো রিঙ্কু সোনা? তুমিও বোস আমার কাছে।

— সে কি টেবিলে চলুন। এখানে বসে কি খাওয়া যাবে?

— আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার ইচ্ছে আছে নাকি? ধরুন এটা একটা ইচ্ছে।

— ঠিক আছে হার মানলাম। প্লেটে করে রুটি-ভাজি এগিয়ে দিতে দিতে বলে, আপনি এতো দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাবা তো সেই ভোরে খেয়ে বের হয়।

— আমার জন্য আপনার কষ্ট হয়?

— মোটেই না। আমার নিরানন্দের সংসারে আপনি তো আনন্দ। রঞ্জন আচমকা খুশিতে জোরে হেসে উঠে বলে, তাই? জানেন আপনার মেয়ে আমাকে নুনের মতো ভালোবাসে।

— নুনের মতো ভালোবাসাতো সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা, না মা?

— ঠিক মা।

— কাকু তুমি তো গল্পটা জানো না। শোনো গল্পটা তোমাকে বলেই ফেলি। রাজার ছিলো তিন মেয়ে। রাজা মেয়েদের জিজ্ঞেস করলো তোমরা আমাকে ভালোবাসো? বড় মেয়ে বললো, হ্যাঁ বাবা আমি তোমাকে মধুর মতো ভালোবাসি। মেজো মেয়ে বললো, আমি তোমাকে চিনির মতো ভালোবাসি। আর ছোট মেয়ে বললো, আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি। ছোট মেয়ের কথা শুনে রাজাতো রেগেমেগে খুন। ছোট মেয়েকে পাঠিয়ে দিলো বনবাসে।

— বাকিটুকু আমি জানি রিঙ্কু সোনা।

— বলো দেখি।

— একদিন রাজা বনে শিকার করতে গিয়ে ছোট মেয়ে যেখানে ছিলো সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির। ছোট মেয়ে বাবাকে দেখে নানারকম রান্না করলো। কিন্তু সব রান্না করলো মধু আর চিনি দিয়ে। দু'একটা রান্না অবশ্য লবণ দিয়ে করে লুকিয়ে রেখেছিলো। রাজাতো মধু আর চিনির রান্না খেতে পারে না। শেষে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। তখন ছোট মেয়ে লুকিয়ে রাখা রান্নাগুলো বাবাকে দিয়ে বলে, বাবা এবার নুন দিয়ে রান্নাগুলো খেয়ে দেখো। রাজা তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলো। ছোট মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলো। রিঙ্কু হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে, ঠিক বলেছো। তুমি আমার লক্ষ্মী কাকু।

— রিঙ্কু সোনা তোমার গল্প থামাও। এবার কাকুকে খেতে দাও।

— মেয়েটাকে দেশ-বিদেশের রূপকথা সব শিখিয়ে ফেলেছেন দেখছি।

— এই ভূতুড়ে স্টেশনে আর কিইবা শেখানোর আছে? আমি আর জানিইবা কি? আপনি ওকে ছবি আঁকা শেখাবেন?

— ছবি আঁকা? শিল্পী হবে রিঙ্কু?

— হ্যাঁ আমি শিল্পী হবো কাকু। আমাকে ছবি আঁকা শেখাও।

রঞ্জন উৎফুল্ল হয়ে বলে, গুড আইডিয়া। শুধু তোমাকে নয়, এ গাঁয়ের সব ছেলেমেয়েকে আমি ছবি আঁকা শেখাবো। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো —

— ধন্যবাদ? ধন্যবাদ আবার কেন?

— আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। কাজ দিলেন।

— বাহ্, মজাতো। তাহলে আমাকেও ছবি আঁকা শেখান। আমিও বেঁচে যাই। আর একটা

বাড়তি কাজের ঝামেলা নিন।

— ঝামেলা নয় আনন্দ। তবে আপনাকে ছবি আঁকা শেখাবো না। বাঁশি বাজানো শেখাবো।

— বাঁশি? উফ্ !

— যখন বাজাবেন দেখবেন সব দুঃখ ভুলে গেছেন।

— দুঃখ ভোলা কি সহজ?

— সহজ নয়, কঠিন। তবে নিজের মুহূর্তগুলো ভরিয়ে তুলতে জানলে দুঃখ কষ্ট দিতে পারে না। ওটা বুকের গভীরে মুখ লুকিয়ে থাকে।

দীপ্তি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। এমন কথা কেউ বলতে পারে, এ অভিজ্ঞতাই ওর ছিলো না। এ কেমন মানুষ ওর সামনে? কতোদিন থাকবে ওর জীবনে? রঞ্জন ওর মুগ্ধতা বুঝতে পেরে দ্রুত উঠে পড়ে। নিজেকে যে ওর ভীষণ ভয়।

বিকেলে রিঙ্কুকে নিয়ে গ্রাম দেখতে বের হয় রঞ্জন। কাঁধে ছবি-আঁকার সরঞ্জাম। এই একটি জিনিস ও সবসময় বয়ে বেড়ায়। রঙ-তুলি-কাগজ সঙ্গে থাকা চাই। শ্রাবণী বলতো, তোমার কাছে ওগুলো দেখলে আমার শরীর চড় চড় করে। মনে হয় ভালোবাসার ভেতরে ভালোবাসা। রঞ্জন হেসে বলতো, তুমি কি জেলাস হও? হইতো। রঙের সঙ্গে জেলাসি? রঙটা প্রেমিকার স্থান দখল করলে সেটা মানুষের বিহেভিয়ার লাভ করে। বাব্বা! রঞ্জন শ্রাবণীর মুখ দেখে বুঝতে পারতো বিষয়টি ও মিন করছে। এখন শ্রাবণী ওর সামনে নেই। আছে শ্রাবণীর তাড়না। অদৃশ্য জগতের সঙ্গে বাস্তবের মিশেলে মন এবং শরীরের পেষণ। হঠাৎ ওর মনে হয় এই গ্রামে থেকে গেলে কি হয়? ওর ভেতরে গভীর ইচ্ছে জন্মায়। এই প্রকৃতি আর মানুষের সঙ্গে মিশে গেলে হয়তো বেঁচে যেতে পারি। আর একটি জন্ম সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

ওদের দেখে দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়ায় কাজল। রিঙ্কু ওর হাত ধরে বলে, ও কাজল।

— বাহ্ লক্ষ্মী ছেলে। তুমি ছবি আঁকা শিখবে কাজল?

কাজল চুপ করে থাকে। একজন অপরিচিত লোকের সামনে ও লজ্জা পায়। রিঙ্কু বলে, ছবি আঁকা কি ও তো জানে না কাকু। ওতো স্কুলে যায় না।

— আমার স্কুলে যাইতে খুব মনে অয়। কিন্তু কেমুন কইরা যামু? আমি যে সিকদার বাড়ির গরু চরাই।

— তাতে কি হয়েছে? কাজ করেও অনেক কিছু করা যায়। এখন থেকে তোমাকে আমি লেখাপড়া শেখাবো। ছবি আঁকা শেখাবো।

কাজল খুশিতে মাথা নাড়ে। সবাই মিলে হাঁটতে থাকে। পথে একজন বুড়ির সঙ্গে দেখা। ভিক্ষা করে। রঞ্জনের দিকে মাটির সানকিটা বাড়িয়ে ধরে বলে, এই গাঁয়ে তো তোরে দেহি নাই বাবা। একটা টাহা দিবি? বুড়িকে নিয়ে মজা করার ইচ্ছে হয় রঞ্জনের। বলে, হ্যাঁ, একটা টাকা আপনাকে দিতে পারি। কি করবেন টাকা দিয়ে? বুড়ির ফোকলা মুখে সরল হাসি। বলে, ত্যাল কিনুম। কতোদিন চুলে ত্যাল দিনা। চুলগুলা শনের মতো পাকায়ে গেলো রে। দে না? দিবি? রঞ্জন যাদু করে বুড়ির থালা এক টাকা দিয়ে ভরিয়ে দেয়। বুড়ির তো মুখে কথা নেই। থাবা দিয়ে টাকাগুলো ধরতে গেলে দেখে থালা শূন্য। রেগে গিয়ে বলে, তুই কি ভেলকি দেহাস রে পোলা? রঞ্জন পকেট থেকে একটা টাকা বের করে বুড়িকে দেয়। বলে, বুড়ি মা বেশি চাইলেই কি পাওয়া যায়? যান, এক টাকার তেল কিনে ফেলুন। চলো রিঙ্কু। বুড়ি হাঁ

করে তাকিয়ে থাকে।

এর মধ্যে ওর সঙ্গে আরো চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে জুটে গেছে। একটি গাছের নিচে বসে রঞ্জন সবাইকে কাগজ আর রঙিন পেন্সিল দিয়েছে। ও প্রত্যেকের কাগজ দেখে। ভাবে, বেশ মজার খেলা। সময় দৌড়ে চলে যায়। তার টিকি ছোঁয়া ভার। ও কাজলের কাগজটা তুলে ধরে, দেখো সবাই , কাজল কি সুন্দর করে গরু আর রাখাল ছেলে এঁকেছে।

কাজল বিব্রত হয়। করুণ মুখে বলে, আমিতো আমারেই আঁকছি।

— তাইতো আঁকবে। নিজেকে আঁকবে, তোমার চারপাশে যা দেখতে পাও তা আঁকবে, এভাবেই তো আঁকা হবে। আঁকতে আঁকতে দেখবে তোমার গ্রামটা কতো সুন্দর। চারপাশের পৃথিবীটা কতো সুন্দর। দেখবে কতো কিছু তোমাদের দেখার আছে। ভালোলাগার আছে।

শিশুরা মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শোনে। যেন কেউ একজন ওদের সামনে যাদু দেখাচ্ছে। ওরা সেই টানে ছুটছে তার পেছনে। ওদেরকে এমন করে কেউ বলেনি। এমন করে জাগিয়ে দিতে চায়নি। শিশুরা অনায়াসে বুঝতে পারে এ মানুষটি ওদের আপন।

।। ৯ ।।

স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জন। দূর থেকে গাড়িটা আসছে। একটু একটু করে এগুচ্ছে। বিন্দু থেকে বড়ো হয়ে উঠছে। শব্দ। ঝমঝম্ করে বেজে উঠছে বুঝি চারপাশ। ভেতরটা আন্দোলিত হয়ে ওঠে। রঞ্জনের মনে হয় এ ট্রেনে করেই ও বাঁচার জন্য পালিয়ে এসেছে। কোনোদিন কি এ ট্রেনে করেই ওকে আবার ফিরে যেতে হবে মৃত্যুর দিকে? শিউরে ওঠে শরীর। ও দ্রুত পিছু হটে। দু'মিনিট দাঁড়িয়ে ট্রেন আবার চলে যায়। কাজেম সবুজ ফ্ল্যাগ দেখায়। দু'জন যাত্রী নেমেছে। ওরা রেললাইন পার হয়ে অপর দিকে চলে যাচ্ছে। এখন কি করবে? পিছু হটে কতোদূর যাবে? কারো না কারো সঙ্গে দেখা হবে। কারো না কারো গায়ে ধাক্কা লাগবেই। চলাটা তো রেললাইনের মতো সমান্তরাল নয়। ও ধীর পায়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে এসে ঢোকে। জাকারিয়া ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, বোস । টেবিলের এক কোণে কতকগুলো পুরনো খবরের কাগজ। জাকারিয়া হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। রঞ্জন পুরনো কাগজ থেকে প্রথম কাগজটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে রেখে দেয়। তৃতীয় কাগজটা ওঠাতেই হঠাৎ করে চোখে পড়ে, 'শ্রাবণী হত্যার আসামী আসহাব নাসিরুদ্দীন পলাতক'। ও প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাগজটা উল্টো ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখে। জাকারিয়া খেয়াল করে না। সে একসময় চোখ তুলে বলে, গ্রামটা দেখেছো? কেমন লাগছে?

— গ্রামে তো কখনো থাকিনি। সেজন্য যা কিছু দেখছি সবকিছুর ভেতর আনাড়ির মুগ্ধতা আছে।

— অকপট কথা বলেছো।

— আমি এখানে অনেকদিন থাকতে চাই। বলছিলাম কি এখানকার স্কুলে যদি আমাকে ড্রইং-এর মাস্টার করে দেবার ব্যবস্থা করতেন।

— চাকরি চাচ্ছো?

— হ্যাঁ, গ্রামটা খুব পছন্দ হয়েছে। কাজ পেলে থাকতে ভালোলাগবে। নইলে নিজেকে খুব আউটসাইডার মনে হবে।

— আমার বাসায় থাকতে কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে?

— অসুবিধার কথা নয়। মানে, ইয়ে, নিজের কাছে খারাপ লাগছে।

— কেন? জাকারিয়া বিস্মিত হয়।

— আমিতো আপনার ঘাড়ে চেপে বসতে পারিনা। আমি আপনার পেইং গেস্ট হতে পারি।

জাকারিয়া ভুরু কুঁচকে তাকায়। তারপর হেসে বলে, ঠিকই বলেছো। তোমার মতো ছেলের এমন কথা বলাই স্বাভাবিক। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হাজী আকবর আলীর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা যথেষ্ট। আমি চেষ্টা করবো। তবে পয়সাকড়ি বেশি দিতে পারবে না।

— তা আমি জানি। গ্রামের স্কুলে আর কটাকাই বা বেতন দিতে পারবে। যা দেবে তাতে আমার চলে যাবে।

জাকারিয়া অন্যমনস্ক হয়ে কিছু একটা ভাবে। মনে হয় তার ভাবনার রশিতে গিট পড়েছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সেটা সে খুলতে গিয়েও পারছে না। আনমনা হয়ে বলে, তুমি থাকলে আমার রিঙ্কু ভালো থাকবে। ওর মনে বাবা না থাকার দুঃখ আছে। তুমি ওকে ভালোবাসা দিও।

— ও একটি চমৎকার শিশু।

— হতভাগা।

— ঠিক বলেন নি। মানুষের সৌভাগ্যের কথা কেউ কিছু বলতে পারে না।

— সৌভাগ্য! শব্দটি মৃদুভাবে উচ্চারণ করে চুপ করে যায়। রঞ্জন উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে। জাকারিয়া বেশ কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলে, জানো যখন ট্রেনের শব্দ অনেক দূর থেকে শুনি আমার বুকের ভেতর আনন্দধ্বনি বাজতে থাকে। আমি বুঝি না কি সেটা। যখন কাছে আসে অলীক মনে হয় সব কিছু। মনে হয় আমি বুঝি কোনোদিন কোনো আনন্দধ্বনি শুনিনি। ওই ট্রেনটা আমাকে থেঁতলে দিয়ে ছুটে চলে গেছে। ওই ট্রেনটা কোনো স্টেশন ছোঁয় না। সেদিন তুমি যখন আমার কাছে ভালোবাসা চাইলে সেদিন মনে হয়েছিলো আমি অন্যরকম আনন্দধ্বনি শুনতে পেলাম। কিন্তু আমি তো জানি আমার ট্রেনটা কোনো স্টেশন ছোঁয় না।

জাকারিয়া ওর দিকে গভীর চোখে তাকালে রঞ্জনের গলা শুকিয়ে যায়। ওর ভয় করে। ও নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। দ্রুত স্খলিত কণ্ঠে বলে, আমি যাই। জাকারিয়া মাথা নাড়ে। বেরুতে গেলে দরজার কাছে কাজেমের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। হাত থেকে পড়ে যায় সেই কাগজটি। ও কাঁপা হাতে উঠিয়ে নিয়ে সার্টের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়।

কাজেম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনের কি হইছে ভাইজান? রঞ্জন ওর দিকে না তাকিয়ে বলে, তুমি কেমন আছ প্লাটফরমের রাজা?

— কুউ - ঝিকঝিক রাজা ঝিকঝিক, নাই।

— কি নাই?

— মুকুট। মাথা খালি।

এতোক্ষণে ভেতরের চেপে রাখা উৎকণ্ঠা ফুস করে উড়িয়ে দিয়ে ও হো-হো করে হাসে। হাসতে হাসতে প্লাটফরম পেরিয়ে নেমে যায়। কাজেম পেছনে হাঁটতে থাকে। পত্রিকাটা বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে ও পেছনে কাজেমের পায়ের শব্দ শোনে। ও একবার মুখ ফিরিয়ে বলতে চায়, কাজেম তুমি আমার পেছনে এসো না। কিন্তু বলা হয় না। ও যেন শুনতে পায় দীপ্তির কণ্ঠ। রিঙ্কুকে গল্প বলছে, তারপর রাজপুত্র ছুটছে তো ছুটছে। পঙ্খিরাজ ঘোড়া নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। কোনো দিকে তাকাচ্ছে না, কোথাও দাঁড়াচ্ছে না রাজপুত্র।

তখন কাজেম দু'পা এগিয়ে রঞ্জনের পাশে পাশে হাঁটে। বলে, আমার কথা শুইনা আপনে হাসলেন ক্যান ভাইজান? সত্যি যদি রাজা অইতে পারতাম। ভত্তা আর ডাইল দিয়া ভাত খাওয়া লাগতো না। পারবেন আমারে রাজা কইরা দিতে?

রঞ্জনের স্খলিত কণ্ঠ, রাজা হওয়া কি সহজ?

দীপ্তির কণ্ঠ উড়ে যায় মাঠের ওপর দিয়ে, রাজপুত্র যাচ্ছে মানস সরোবর থেকে নীলপদ্ম তুলে আনতে। সেখানে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। সেটা যে দৈত্য-দানোর এলাকা। সেখানে যে যায় দৈত্যরা তাকে বন্দী করে ফেলে।

কাজেমের আবদারে কণ্ঠস্বর, রাজা না বানাইলে একডা সিগা —

— হ্যাঁ তা দিতে পারি, নাও। দিয়াশলাই বের করে সেটা জ্বালিয়ে দিতে দিতে বলে, তুমি তো আমাকে তোমার বাড়িতে যেতে বললে না কাজেম?

— চলেন আইজকে যাই। দেখতে পাইবেন কেমন রাজপুরী।

রিঙ্কু মুগ্ধ হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। গল্পটা ও যেন শুনছেনা, গিলছে। জিজ্ঞেস করে, রাজপুত্র বুঝি বাবাকে ভীষণ ভালোবাসে মা?

— হ্যাঁ ভীষণ ভালোবাসে। বাবা না থাকার কথা ভাবলে রাজপুত্রের ভীষণ কান্না পায়।

রঞ্জন নিজের উদ্বেগকে কাজেমের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। জিজ্ঞেস করে, তোমার অনেক স্বপ্ন না কাজেম?

— হ, মেলা হপন। ঘুম থাইকা উইঠা দেহি বেবাক কেবল হপনই। একডাও সত্যি অয় না।

— যেটুকু আছে এটুকু নিয়ে খুশি থাকলে অনেক কিছুই সত্যি হয়।

রিঙ্কু মার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, রাজপুত্রর মতো আমার তো বাবা নেই। আমি কাকে ভালোবাসবো?

দীপ্তি মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আহ্ গল্প শোনোই না। এদিকে রাজ-কবিরাজতো রাজাকে নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছে। ওই মানস সরোবরের নীলপদ্ম বেটে রস না খাওয়ালে রাজা যে ভালো হবে না।

কাজেম চেঁচিয়ে উঠে বলে, অল্পে কেন খুশি হমু? মেলা কিছু চাই। বিয়ার সময় বৌয়ের বাপে কইছিলো দশ হাজার টেকা দিবো। দ্যায় নাই।

— গরীব মানুষ এতো টাকা কোথায় পাবে?

— তার আমি কি জানি। মাইয়া বিয়া দিতে অইলে টাকা দেঅন লাগবো।

রিঙ্কুর পক্ষে আর শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলে, রাজাকে তো রাজহাঁস কাকু ভালো করে দিতে পারে মা।

দীপ্তি জোরে হাসতে থাকে। ও ভীষণ মজা পায়।

— হেসো না মা হেসোনা। আমি সত্যিকথা বলছি।

— তুমি একটা বোকা ছেলে।

— তুমি তো জানো না মা, রাজহাঁস একটা যাদুকর।

— যাদুকর? দীপ্তির ভুরু কুঁচকে যায়। রঞ্জন যাদুকর? কেমন যাদুকর? ও কতোটুকু বশ করতে পারে মানুষকে?

রঞ্জন কাজেমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে ধমক দেয়, কে বলেছে তোমাকে যে টাকা দিতে

হয়? তুমি কি যৌতুক চাও?

— চাই-ই তো। কেডা না চায়। গরীব মানষের এইডাতো একডা রোজগার।

— ছিঃ কাজেম।

— ছিঃ কন ক্যান?

— এইভাবে ভাবতে হয় না।

— ইস, এক্কেবারে দয়ার সাগর। একডা সিগারেট দিয়া ক্যাবল উপদেশ। ও গান ধরে, কুউ ঝিকঝিক — রাজা হও ঝিকঝিক — বউর বাপে টেকা না দিলে বউ পিটাও ঝিকঝিক।

রঞ্জন ওর দিকে তাকিয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করে।

রিঙ্কু মাকে বলছে, কাকু বাড়ি এলে তুমি কিন্তু কাকুকে একটা যাদু দেখাতে বলবে মা। বলবে তো?

— ঠিক আছে বলবো। তুমি ঘুমোও।

রিঙ্কু চোখ বোঁজে। দীপ্তি গুনগুন করে গাইতে থাকে — ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি/ মোদের বাড়ি এসো /খাট নাই পালং নাই /চোখ পেতে বোসো।

সুরেলা কণ্ঠ উড়ে বেড়ায় ঘরময়। ঘর ছাড়িয়ে প্রাঙ্গণে আছড়ে পড়ে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রঞ্জন সে কণ্ঠ শোনে। এতক্ষণ যে কণ্ঠটা ও অবচেতনে শুনতে পাচ্ছিলো, সেটা এখন চেতন এবং বাস্তব। ও গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে। ও বুঝতে পারে দীপ্তির কণ্ঠস্বর ওকে ভয়শূন্য করে দিচ্ছে। উঠোন থেকে বারান্দায় উঠলে গান থেমে যায়। ও নিজের ঘরে ঢোকার আগে দু'হাতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে পড়ে। কণ্ঠস্বর থেমে গেলে ওর বুকের ভেতর নিজের গুড়গুড় শব্দটা প্রবল হয়ে ওঠে। যেটা ওর বিবেক। অপরাধবোধের গ্লানি সারাক্ষণ ওকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ঝট করে সার্টের ভেতর থেকে কাগজটা বের করে তোষকের নীচে ঢুকিয়ে রাখে। জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। সামনে খোলা মাঠ। জানালার শিকে মাথা রাখলে মনে হয় ওর হাত দু'টো উঠে যাচ্ছে শ্রাবণীর গলায়। আস্তে আস্তে সে হাত গলার ওপর চেপে বসছে। ও অস্ফুট আর্তনাদ করে, আমি শ্রাবণীকে মারতে চাই নি। এ্যাকসিডেন্ট, নেহাৎই উত্তেজনার এ্যাকসিডেন্ট।

।। ১০ ।।

নাসিরুদ্দীনের বাড়ি। শোবার ঘর। সায়রা বাণু অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে। কঙ্কন পাশে বসে আছে। নাসিরুদ্দীন ইজি চেয়ারে গা এলিয়েছে। চোখ বোঁজা। সায়রা বাণু কঙ্কনের হাত ধরে বলে, মনে হচ্ছে রঞ্জন বুঝি কোথাও বসে বাঁশি বাজাচ্ছে রে।

খ্যাক করে ওঠে নাসিরুদ্দীন, বাজাতেই পারে। ওতো বাঁশি বাজায়, ছবি আঁকে, ভেল্কি দেখায়। হাজার রকম শখ।

সায়রা বাণু চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি এভাবে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।

— মা, ডাক্তার তোমাকে উত্তেজিত হতে বারণ করেছে।

— না, উত্তেজিত হবে না। কতো যে শান্তি আমার। একদিকে ছেলেটার এই অবস্থা, অন্যদিকে উনি হয়েছেন দার্শনিক, নৈয়ায়িক।

— তোর মা তো খুব ভালো বাংলা শিখেছে রে কঙ্কন!

— আহ বাবা তোমরা কি শুরু করলে।

— আমি আর কি শুরু করবো মা। আমিও তো খুব শান্তিতে আছি। একজন খুনের

আসামীর পিতা। আনন্দে আমায় নাচতে ইচ্ছে করে।

উত্তেজনায় উঠে বসে সায়রা বাণু। বলে, খবরদার তুমি যদি আবার খুনের আসামী বলবে তো —

— যাও, যাও বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

— তুমি চাইলে তো যাবোই। বলেই বালিশে মাথা এলিয়ে দেয় সায়রা বাণু। তখন অঞ্জন এসে ঢোকে।

— ডাক্তার যে তোমাকে কি ছাই ওষুধ দিয়েছে মা। পাড়ার দোকানে পাইনি। শাহাবাগেও না। ভাবছি বিকেলে মিটফোর্ড যাবো।

— ওই ওষুধ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

— কেন বাবা?

— ডাক্তারতো মিছেমিছি ওষুধ দিয়েছে।

অঞ্জন আর কঙ্কন একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, মানে?

— তোদের মায়ের তো কোনো অসুখ নেই। সব অসুখ তো মনগড়া। মনের অসুখ।

— অঞ্জন তোর বাবাকে বল আমার পেছনে না লাগতে।

অঞ্জন আর কঙ্কন বুঝে যায় ব্যাপারটি কি। দু'ভাইবোন মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে। নাসিরুদ্দীন কৃত্রিম চোখ গরম করে বলে, এই তোরা হাসছিস কেন?

— তোমরা এমন ছেলেমানুষ হয়ে থাকো। তাতেই আমাদের আনন্দ।

নাসিরুদ্দীন আর সায়রা বাণু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ মজা পায়। বুঝতে পারে বাবা-মার মান-অভিমান ওরা বেশ অনায়াসে বুঝতে শিখেছে।

সেই তখন দীপ্তি বাবার মুখোমুখি। জাকারিয়া বিকেলের চা খাচ্ছে। দীপ্তি কোনো রকম ভণিতা না করে বলে, আচ্ছা বাবা তুমি যে হুট করে এই লোকটিকে বাড়িতে নিয়ে এলে তুমি কি জানো লোকটি কে?

জাকারিয়া স্বচ্ছন্দে মাথা নাড়ে। বলে, জানার দরকার নেই।

— নিশ্চয়ই আছে।

— কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোনো অঘটন তো ঘটেনি।

— একটা কিছু যদি ঘটেই যায় তখন জেনে কি হবে?

— জানবো না।

দীপ্তি বিস্মিত হয়ে বলে, খুব সহজে বলে দিলে যে জানবে না।

— রাগ করছিস? জানিসতো আমি এমন মানুষ।

— বাবা তুমি একবার ঠকেছো।

— হ্যাঁ, ঠকেছি। তোর জীবনটা নষ্ট হয়েছে।

— আমার জীবনের কথা আমি বলিনি বাবা।

— তোকে বলতে হবে কেন? আমারই তো বোঝা উচিত। রাস্কেলটা —

জাকারিয়া আকস্মিকভাবে থেমে থেকে ঠক্ করে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে আর মুখ তোলে না। দীপ্তি চামচ দিয়ে কাপের গায়ে টুং টুং শব্দ করছিলো। ওর হাতও থেমে যায়। ও নিজেও মুখ নিচু করে রাখে। যেন টেবিলটা একটা বিশাল স্ক্রিন হয়ে গেছে। সে স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে একটি দৃশ্য। দৃশ্যটি এমন : একটি ঘর। সাত্তার চিৎকার করে টাকা চাইছে।

জাকারিয়া চুপ করে বসে আছে। বিবর্ণ অপমানিত চেহারা। দীপ্তি এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। ও গর্ভবতী। সান্তারের কণ্ঠ সপ্তগ্রামে, তাহলে আপনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন না? জাকারিয়া ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমি কতো টাকা বেতনের চাকরি করি তা তুমি জানো। কিড়মিড় করে সান্তারের দাঁত, এসব কথা আমি জানতে চাই না। আমি টাকা চাই। জাকারিয়ার অনড় ভঙ্গি, এতো টাকা আমার নেই। সান্তারের চিৎকার, নেই। কদিন ধরে একটা কথাইতো বলছেন। দীপ্তি মুখ খোলে, বাবা মিথ্যে আশ্বাস দেয় না। সান্তার ওর দিকে তেড়ে যায়, তুমি চুপ করো। তুমি কথা বলবে না। তারপর ডানে ঘুরে জাকারিয়ার মুখের ওপর আঙুল নাড়ায়, আজকে আমাকে শেষ কথা বলতে হবে। জাকারিয়া রাগে না। রাগতে পারে না। অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি তো তোমাকে ভালো ছেলে মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি নেশাখোর নও। সান্তার হা-হা করে হেসে ওঠে, এখন দেখছেন আমি একটা নেশাখোর। আমার নেশা টাকার। আমি বিদেশ যাবো। অনেক টাকা বানাবো। ধুঁকে ধুঁকে জীবন চালাতে পারবো না। আপনি টাকা না দিলে আমার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। দীপ্তি পাশ থেকে মিনতিভরা কণ্ঠে বলে, এসব কি বলছো তুমি? আমার শরীর ভালো নেই। জাকারিয়াও একই ভঙ্গিতে বলে, দীপ্তি মা হবে। ওকে তোমার স্বস্তিতে রাখা উচিত। সান্তার তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, স্বস্তি? ফুঃ। মা হবে তো কি হয়েছে। সব মেয়েই মা হয়। এটা কোনো ঘটনা নয়। দীপ্তি ভীষণ আহত হয়ে বলে, তুমি এভাবে কথা বলছো? ওকে শাসায় সান্তার, হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি। মুখ সামলে চুপ করে থাকো। তারপর জাকারিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, তাহলে আমি কি চলে যাবো? জাকারিয়া চুপ করে থাকে। দীপ্তি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সান্তার দীপ্তির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে, শোনো আমি যাচ্ছি। আর কখনো আমার মুখ দেখবে না। জাকারিয়া ও দীপ্তির বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে সান্তার চলে যায়।

বাবা-মেয়ে দুজনেই স্মৃতির স্ক্রিন থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তি অস্ফুট আর্তনাদ করে, ওহ্ বাবা।

জাকারিয়া মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বলে, আমি জানি ওই রাস্কেলটার কথা উঠলে তোর কষ্ট হয়। আমি তোর জীবনটা নষ্ট করেছি।

— আবার তুমি একই কথা বলছো। এবার কিন্তু আমি রাগ করবো।

জাকারিয়া নিজেকেই বলে, এই ছেলেটি যদি ভালো হয়। যদি তোর জীবনটা অন্যরকম হয়।

দীপ্তি আর্তনাদ করে, বাবা তুমি স্বপ্ন দেখছো। না - বাবা, না।

— কেন না? কেন স্বপ্ন দেখবো না? স্বপ্ন না দেখলে মানুষ ফুরিয়ে যায় মা। আমার চোখের সামনে তুই ফুরিয়ে যাবি কেন?

— ওহ্ বাবা, চুপ করো।

— তোর মা মারা যাবার পর থেকে আমি তো চুপ করেই গিয়েছিলাম। আমার তো কথা বলতে হয় তোর জন্য। চোখের সামনে চারজন ছেলেমেয়ে মরে গেছে। বেঁচে রয়েছিস তুই একা। এটা কি বেঁচে থাকা মা? তোর জন্য আমি চেঁচিয়ে কথা বলতে চাই।

দীপ্তি বাবার দিকে তাকাতে পারে না। টপটপ করে চোখের পানি পড়ে। জাকারিয়ার মনে হয় ওর বেশি কষ্ট হলে ওর চেহারায় কতোগুলো ভাঁজ পড়ে। সেই ভাঁজগুলো আয়নার মতো হয়ে যায়, যেখানে একটা পুরো জীবনের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। ও জানে কেউ কেউ এক

লহমায় প্রতিবিম্ব পড়ে ফেলতে পারে। সেই মুহূর্তে রঞ্জনকে টানতে টানতে রিঙ্কু ঘরে ঢুকলে চমকে ওঠে জাকারিয়া।

— এসো, এসো বলছি।

দীপ্তি মেয়েকে ধমক দেয়, কি হচ্ছে রিঙ্কু?

— না, কিছু হয়নি। আমরা লুকোচুরি খেলছি।

— শোনো মা কাকু বলে, একদিন কাকু হারিয়ে যাবে, তখন আর কিছুতেই খুঁজে পাবো না।

জাকারিয়া ওকে কোলে নিতে নিতে বলে, সেটা তো সত্যি নানুভাই। তোমার কাকু কি সবসময় আমাদের এখানে থাকবে।

— হ্যাঁ থাকবে। কিছুতেই কাকুকে যেতে দেবো না।

জাকারিয়া আবার চমকে ওঠে। এ কোন বিধিলিপি! রিঙ্কুর সাধ্য কি যে রঞ্জনকে ধরে রাখে। দীপ্তির দিকে চোখ পড়লে বুঝতে পারে দীপ্তি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। দুজনেই অনুভব করে দুজনের চোখের ছায়ায় অদ্ভুত শঙ্কা।

দুজনের কাছে বাতাসে ভেসে আসে রিঙ্কুর কণ্ঠস্বর, আমি আর কাজলা দিদি কবিতাটা শুনতে চাইবো না মা। আমি চাই না রাজহাঁস কাকুও হারিয়ে যাক।

— না, না আমি হারাবো না। আমি তোমার কাছে থাকবো সোনা।

দীপ্তি নিঃশব্দে উঠে যায়। মনে হয়, এ কেমন কণ্ঠস্বর! কেমন করে ধরে রাখে এতো মায়া। কে এই মানুষ? বেড়া ভেঙে ঢুকতে চায় জীবনের শস্য ক্ষেতে?

দীপ্তির চলে যাওয়ায় ভেতর দিয়ে একটি পুরো গ্রাম উঠে আসে রঞ্জনের দৃষ্টির সামনে। প্রকৃতি এবং মানুষ অভিন্ন হয়ে যায়। ও বুঝি কোনো এক গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। বাঁশির শব্দে চমকে তাকায় কাজল। ও গরু চরাচ্ছিলো। গরুগুলোকে খুঁটিতে বেঁধে ছুটে আসে। বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসছে অনেকে। কতো ছেলেমেয়ে আছে এ গাঁয়ে? রঞ্জনের চারপাশে ভিড় জমে ওঠে। নিজের শূন্য থালাটা কোলের ওপর রেখে বসে পড়ে বুড়ি। বাঁশি বাজানো শেষ হলে কাজল বলে, থামলেন ক্যান? অন্যরাও সায় দেয়, আরো বাজান। আমরা শুনুম।

— তোমাদের ভালোলেগেছে? রঞ্জন অভিভূত হয়।

— হ, খুব ভালা লাগছে।

— বাঁশি শুনে কি মনে হলো তোমাদের?

— মনে অয় কনু দুখ নাই।

— বাহ্, সুন্দর কথাতো।

— আপনের লগে ছবি আঁকতেও ভালা লাগে।

— ঠিক আছে তোমাদের আমি বাঁশি বাজানো শেখাবো। এখন যাও সবাই।

ছেলেমেয়েরা দৌড়ে চলে গেলে গাছের গুঁড়িতে হেলান দেয় রঞ্জন। চোখ বুজলে দীপ্তির পিঠে ছড়িয়ে থাকা ঘন কালো চুল গাঁয়ের নদীটির মতো কলকল করে। যে কথা বলে রঞ্জনের হৃদয়, প্রকৃতির এমন অপরূপ সৌন্দর্য আমার গ্লানি ভুলিয়ে দেয়। আমি মুক্ত মানুষ হয়ে যাই। এখানে থেকে আমি হয়তো নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারি। ছবি এঁকে, বাঁশি বাজিয়ে মানুষকে আনন্দ দিয়ে, শিশুদের ভালোবেসে আমি কি আমার অপরাধের দায়ভার থেকে মুক্ত

হতে পারবো? পারবো কি নিজের বিচার নিজে করতে?

।। ১১ ।।

মৌফুলি কলসিতে পানি নিয়ে বাড়িতে ঢোকে। আতরজান নিশিকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসেছিলো। মৌফুলিকে ঢুকতে দেখে ঠোঁট বাঁকায়। মৌফুলি বারান্দায় কলসি রেখে রান্নাঘর থেকে এক সানকি পান্তা ভাত নিয়ে আসে।

— আম্মা ভাত খান। নিশিরে আমার কাছে দ্যান।

আতরজান মুখ ঝামটা দেয়, অহন বেলা কতো?

— আমি কি করমু। একডার পর একডা কাম করতাছি। কলের ধারে যা ভিড় —

— ক্যাবল মুখে মুখে কতা —। আতরজান বাক্য শেষ করার আগেই মুখে ভাত পোরে। মৌফুলি তাকিয়ে থাকে। আতরজান মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, অমন কইরা চাইয়া রইছ ক্যান?

— হাঁড়িতে আর ভাত নাই।

— ভাত নাইতো কি অইছে? ভাত না থাকলে ঘাস খাইবা। বাপের বাড়ির হাঁড়িওতো ঠনঠন। অহন অতো ভাত ভাত করো ক্যান?

মৌফুলি এক মুহূর্ত বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নিশিকে বুকে জড়িয়ে রান্নাঘরে যায়। হাঁড়ি থেকে গম বের করে মাটির খোলায় ভাজে। তারপর বারান্দায় এক কোণে বসে নিশিকে দোলায় আর গম ভাজা খায়। কাজেম পথ দেখাতে দেখাতে রঞ্জনকে নিয়ে ঢোকে। বাড়ি দেখে অবাক হয় রঞ্জন, তোমার বাড়ি তো ভারি সুন্দর কাজেম। কেমন ঝকমকে-তকতকে। বাহ্ ফুলগাছও লাগিয়েছো দেখছি। কে এসব করে? তুমি?

কাজেম লজ্জা পেয়ে মাথা চুলকায়, ইয়ে, না মানে আমার বৌ। ঐ মৌফুলি, মৌফুলি — আতরজান ও মৌফুলি এগিয়ে আসে।

— এই আমার মা। আমার বউ। আর মাইয়া নিশি।

— আপনার এই সুন্দর বাড়ি দেখে আমার খুব ভালোলাগছে ভাবী।

মৌফুলির হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে জ্বলে ওঠে আতরজান, এই বাড়ির পিছনে খাটতে খাটতে আমার জান শ্যাষ।

আতরজানের কণ্ঠ খট্ করে রঞ্জনের কানে বাধে। মনে হয় কণ্ঠস্বর কৃত্রিম, কোথাও একটু ফাঁক আছে। তবু ও হেসে মাথা নাড়ে। গল্প করে। মৌফুলির অমায়িক ব্যবহার ভালো লাগে। ফেরার সময় প্রশংসা করলে কাজেম আপত্তি করে, আপনে যতো ভালা কইতাছেন ও অতো ভালা না। অর বাপের কাছ থাইকা যৌতুকের টেকা আইনতে কইলে কয়, পারুম না। আমার বাপ মুক্তিযোদ্ধা। টেকা নাই।

— ঠিকই তো বলে কাজেম। যুদ্ধ করা মানুষরা গরীব হলে কি হবে মাথা উঁচু করে রাখে।

— মুক্তিযোদ্ধা ধুইয়া কি আমি পানি খামু। আমার পাওনা টেকা দেয় না।

— ছিঃ কাজেম এভাবে বলতে হয় না। যৌতুক আবার পাওনা কি?

— আপনে একডা পাগল, বলেই দ্রুত হেঁটে যায় কাজেম। রঞ্জনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। লোকটা মুহূর্তে কেমন বদলে যেতে পারে। আশ্চর্য, ওর বাড়ি ফেরার ইচ্ছা হয় না। কুড - ঝিক - ঝিক করতে করতে কাজেম চলে গেলে ওর মনে শহরে ওদের বাড়িতে টেলিফোনটা বেজে চলেছে। ওর বাবা এসে ফোন ধরে। ফোনের অপর প্রান্তে থানার ওসি। হ্যালো নাসিরুদ্দীন বলছি। কি বললেন, আমার ছেলের খোঁজ পাওয়া গেছে? ও আচ্ছা। ফোন রেখে দেয়

নাসিরুদ্দীন। ছুটে আসে সায়রা বাণু, কি ব্যাপার কে ফোন করেছিলো? আমার বন্ধু, বলে নাসিরুদ্দীন চলে যেতে থাকে। বন্ধুতো তোমার কতোই আছে। কোন বন্ধু?

— আহ্, এতো কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? মান্নান ফোন করেছিলো।

— কিন্তু তোমাকে কেমন নার্ভাস মনে হচ্ছে?

চেঁচিয়ে ওঠে নাসিরুদ্দীন, ফর গড সেক, তুমি এতো কিছু জানতে চেও না।

রঞ্জন বুঝতে পারে ফ্রিজ হয়ে গেছে সায়রা বাণুর কণ্ঠ। ফ্রিজ হয়ে গেছে নাসিরুদ্দীনের দৃষ্টি। ফ্রিজ হয়ে গেছে থানা থেকে বেরিয়ে আসা পুলিশের গাড়ি। আর ওর করোটিতে ঘুরতে থাকে সেই ক্যামেরাটি। যেটি একটি স্বপ্ন চিত্রায়িত করতে থাকে। শিশুটির হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে ড্রইং খাতার প্রজাপতিটি। ওটি কোনোদিন ফ্রিজ হবে না এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে ও নদীর দিকে হাঁটতে থাকে। ঠিক এভাবেই তো শহরের ফুটপাথে হেঁটে যায় নাসিরুদ্দীন। হাঁটে আর দাঁড়ায়। চারদিকে তাকায়। আনমনা। শহরের জনবহুল রাস্তায় মানুষের ভিড়ে মিশে হাঁটতে থাকে অঞ্জন। বৈঠকখানায় বসে গোয়েন্দা গল্পের বই পড়তে চায় কঙ্কন। পারে না। উঠে পায়চারি করে। জানালায় দাঁড়ায়। সায়রা বাণু রান্নাঘরে। এক সময় খেয়াল করে যে তরকারি পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নামায়। কপালের ঘাম মোছে। রান্নাঘর থেকে বেরুতে গিয়ে হোঁচট খায়। দূর থেকেই অঞ্জন দেখতে পায় নাসিরুদ্দীন চুপচাপ পার্কে বসে আছে।

— বাবা? কি হয়েছে এখানে বসে আছো? নাসিরুদ্দীন অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। বাড়ি চলো বাবা। মা ভাববে। আমি তো জানি এই অসময়ে তুমি কেন পার্কে বসে আছো। তুমি রঞ্জনের কথা ভাবছো। চলো, বাড়ি যাই।

নাসিরুদ্দীন অঞ্জনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়। যেন ওকে নির্ভর না করলে পড়ে যাবে। দুজনে হাঁটতে থাকে।

।। ১২ ।।

বড় মাঠটা পেরিয়ে স্কুলের হেড মাস্টারের ঘরে এসে দাঁড়ায় রঞ্জন। ড্রইং মাস্টারের চাকরিটা ওর হয়েছে। হেডমাস্টার ওর দিকে তাকিয়ে বলে, বসুন।

— আপনাদের স্কুলটা চমৎকার জায়গায়। কি সুন্দর চারদিক।

হেডমাস্টার রঞ্জনের উচ্ছ্বাসে খুশি হয় না। খানিকটা ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলে, অজ পাড়া-গাঁয়ে প্রকৃতি ছাড়া আর কি থাকে বলুন? শহর থেকে এলে প্রথম প্রথম এমন সুন্দর লাগে। তারপর গা সওয়া হয়ে যায়। এরপর ভুলেই যায় যে জায়গাটা সুন্দর। এ গাঁয়ের একটি লোকও কিন্তু আপনার মতো মুগ্ধ হয়ে বলে না যে কি সুন্দর!

রঞ্জন হাসতে থাকে, মানুষের দোষ কি? আমরা তো কাউকে তেমন করে গড়তে পারি না। আমি তো মনে করি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সৃজনশীল মন আছে তাকে জাগিয়ে দিতে পারলে আর কিছু না হোক মানুষ সুন্দর করে বাঁচতে শিখবে।

হেডমাস্টার বাঁকাচোখে তাকিয়ে বলে, অভাব —

— অভাব তো আমাদের আছেই হেডমাস্টার সাহেব। কিন্তু তাই বলে কি নিজের চারপাশ সুন্দর রাখা যায় না? পেটে না হয় ভাত নেই, কিন্তু আমাদের মনের খোরাকের তো অভাব নেই। তাকে আমরা কাজে লাগাই না কেন?

— দেখুন না আপনি কি উদ্ধার করতে পারেন।

— হেডমাস্টার সাহেব আমি কি কোনো খারাপ কথা বলেছি?

হেডমাস্টার স্কুলের রেজিস্টার দেখছিলো সেদিকে তাকিয়ে থাকে। হাতের কাগজটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, পরের ক্লাসটা আপনার।

ঘণ্টা পড়ে। সেই শব্দে নিজের ভেতর চাঞ্চল্য অনুভব করে রঞ্জন। বুঝতে পারে না হেডমাস্টার কেন ওর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। ও ক্লাসে আসে। ওকে দেখে সবাই চুপ। বলে, আমি তোমাদের নতুন টিচার। তোমাদেরকে ছবি আঁকা শেখাবো।

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, ছবি আঁকা? আমরা মানুষ, ঘর, নদী, গাছ, ফুল, পাখি সব আঁকতে পারি।

— ঠিক আছে। আজকে তোমরা সবাই তোমাদের মাকে আঁকো। যার ছবি সবচেয়ে সুন্দর হবে বুঝবো সে তার মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

ছেলেমেয়েরা পেন্সিল দিয়ে খাতায় ছবি আঁকতে শুরু করে। নিচু করে মাথাগুলোর উপর দিয়ে তাকালে ওর সামনে হেডমাস্টারের মুখটা ভেসে ওঠে। কেন তিনি ওর প্রতিপক্ষের মতো আচরণ করলেন? ও নিজেকেই বলে, আমি বিশ্বাস করি মানুষের ভেতরের সৃজনশীলতা জাগিয়ে দিতে পারলে তার অনেক বদ্ধ দরজা খুলে যায় ও ভালোমন্দের বিচার করতে শেখে। পরক্ষণে নিজের বুকে হাত রেখে বলে, আমি নিজেইতো বাঁচতে শেখা শুরু করেছি। আমি চাই কিছু করতে। বড় কোনো প্রত্যাশা নয়। কিছু সুন্দর ছবি এঁকে এইসব শিশুদের ভেতর যদি বেঁচে থাকতে পারি?

— স্যার? রঞ্জন চমকে ফিরে তাকায়। হয়ে গেছে তোমার? দেখি? বাহ্ সুন্দর হয়েছে। চমৎকার এঁকেছো।

রিঙ্কু উঠে দাঁড়ায়, আমারও শেষ হয়েছে। এই যে। আমার মায়ের মতো হয়েছে তো স্যার?

— স্যার! রঞ্জন হেসে ফেলে।

— স্কুলে তো তুমি আমার কাকু না।

— তাইতো আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম। ওকি ঋতু তুমি তোমার ছবির মায়ের চোখদু'টো ফুটো করে দিয়েছো কেন? ও চুপচাপ বসে থাকে। কথা বলে না। অন্য ছেলেমেয়েরা নিজেদের ছবি স্যারকে দেখানোর জন্য ব্যস্ত। সবার ছবি দেখে রঞ্জন ঋতুর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই মুহূর্তে ঘণ্টা পড়ে। ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ করে বেরিয়ে যায়। রঞ্জন ঋতুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসে। বলে, জানি তোমার মনে অনেক দুঃখ।

— ঐটা আমার সৎমার ছবি। আমারে যে মারে।

— ঠিক আছে আমি একদিন তোমাদের বাড়িতে যাবো। কিন্তু মনে রেখো তুমি একজন মা পেয়েছো। তুমি যদি তাকে ভালোবাসো সেও তোমাকে ভালোবাসবে। যাও, বাড়ি যাও।

ঋতু দু'হাতে চোখের পানি মুছে মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড় দেয়। রঞ্জনের মনে পড়ে একদিন ও মাকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকছিলো। সায়রা বাণু একটু পর পর আপত্তি করছিলো, আর কতোক্ষণ ওভাবে বসে থাকতে হবে রে?

— আহ্ মা এসব ব্যাপারে একটু ধৈর্য ধরতে হয়।

কিছুক্ষণ ছবি আঁকা হলে সায়রা বাণু উঠতে উঠতে বলে, দেখবো তোর চোখে কে বেশি সুন্দর। ছবির মা না এই মা।

রঞ্জন মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো, তুমি আমার ছবি এবং বাস্তব। তুমি আলাদা নও।

— হলো না। ছবি আর বাস্তব একরকম হলে ছবি হয় না। ছবিটা আলাদা হতে হয়।

রঞ্জন প্রশ্ন করেছিলো, কেমন?

— যেমন ধর ছবিতে আমার চোখদু'টো ফুটো করে দিয়ে বলবি, এই হলো সবচেয়ে সুন্দর জননী।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করতে পারেনি, চোখ না থাকার সৌন্দর্য তোমার কাছে প্রবল কেন? জননীরা কি অন্ধ হবে? তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে যাবার কথা? ও এই মুহূর্তে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ তাই। মায়েরা এমন করেই ভালোবাসে।

রিঙ্কুকে বাড়িতে রেখে স্টেশনে আসে ও। এই একটি জায়গা যাদুর মতো টানে। এখানকার আসা-যাওয়ার খেলাটাই তো শেষ কথা। মাঝখানের এই প্লাটফরমটুকু সমস্ত জীবন। ও দূর থেকেই দেখতে পায় জাকারিয়া প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে ট্রেন ছেড়ে গেছে। ওর মনে হয় জাকারিয়া খানিকটা অন্যমনস্ক। রঞ্জন কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কিছু ভাবছেন?

জাকারিয়া চমকে ওঠে, না তো।

— কিন্তু আপনি ভাবছিলেন।

— তাতে তোমার কি? আমি যা খুশি তা করবো। হ্যাঁ, আমি ভাবছি। আমার স্ত্রীর কথা খুব মনে পড়ছে। আমার কষ্ট হচ্ছে।

— কষ্টটা এজন্য যে আপনি ভাবছেন মানুষের একা হয়ে যাওয়া খুব দুঃখের। একা হয়ে গেলে মানুষ স্মৃতি আঁকড়ে ধরে। মানুষ সেই স্মৃতি থেকে সঙ্গ পেতে চায়।

জাকারিয়া ওর কথা শুনে মাথা নাড়ে, তুমি ঠিকই ধরেছো। তুমি আমাকে বুঝতে পারো। দীপ্তির মাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু কি জানো ওর স্মৃতি মনে করলে আমার বুক ভরে না। বুক আরো বেশি করে শূন্য হয়ে ওঠে।

— আমি আপনাকে ছবি আঁকা শেখাবো। আপনি তো কলেজে পড়ার সময় শিল্পী হতে চেয়েছিলেন।

— চেয়েছিলাম। কিন্তু চাওয়া আর পাওয়া তো এক হয়নি।

— এখন এক হবে। দেখবেন যতক্ষণ ছবি আঁকবেন ততক্ষণ আপনি অনেকটা সময় নিজের করে নিতে পারবেন। আপনার একাকীত্ব কাটবে, কষ্ট কমবে।

জাকারিয়া খুশি হয়ে মাথা নাড়তে থাকে, দারুণ বলেছো।

কাজেম কাছে দাঁড়িয়েছিলো। সেও উৎফুল্ল হয়ে বলে, ভাইজান আমারে ছবি আঁকা শিখাইবেন?

— না তোমাকে আমি জাল বোনা শেখাবো। একটা জাল বানাও তারপর আমরা দু'জনে নদীতে মাছ ধরবো।

কাজেম খুশি হয়। কুউ - ঝিক - ঝিক জাল বানামু - মাছ ধরমু।

।। ১৩।।

মেঠোপথে হেঁটে যায় রঞ্জন। এ গাঁয়ে এসে এটা ওর একটা প্রিয় অভ্যেস হয়েছে। পথ আবিষ্কার করে হেঁটে যেতে যেতে ওর মনে হয় আনন্দের অনেক অর্থ ও বুঝতে পারে। শহরের আড্ডা, সিনেমা দেখা, নাটক দেখা, ঘুরে বেড়ানোর মতো আনন্দ এ নয়। এ আনন্দ নিজের একটি আনন্দের সঙ্গে অন্য একটি আনন্দের ভাগাভাগি। হুট করে নতুন কোনো

মানুষের দেখা পাওয়া, যার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অন্য মানুষ, সরল — কৌতূহলী। আজও লম্বা পথ হেঁটে এলেও কারো সঙ্গে ওর কথা হয় নি। কেবলই মনে হয় জাকারিয়া প্রায়ই বলে মানুষ চিনতে পারে না। মানুষ চেনা সহজ নয়। চারদিকের খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটা বিন্দুর মতো মনে হয়, আমি নিজেও শ্রাবণীকে চিনতে পারিনি। আমিতো ওকে ভালোবাসতাম। তবু ভুল করলাম কেন? কেন মুহূর্তের উত্তেজনায় জীবনের সবটুকু ভালো অংশ থেঁতলে গেলো? আমিও কি শ্রাবণীকে চিনতে ভুল করেছিলাম?

ও জোরে হাঁটতে শুরু করে। হঠাৎ মনে হয় শ্রাবণীও ওর সঙ্গে হাঁটছে। বলছে, ইস কতোদিন পর এমন মেঠোপথে হাঁটছি। সেই ছোটবেলায় একবার বাবার সঙ্গে গ্রামে গিয়েছিলাম। না ঠিক গ্রাম নয়। মফস্বল শহর। বাবা গিয়েছিলেন অফিসের কাজে। ও রঞ্জনের হাত ধরে। হাতে চুমু দিয়ে আবার ছেড়ে দেয়। রঞ্জনের শরীর শিউরে ওঠে। কেমন করে শ্রাবণী এমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো? তারপর শোনো, বাবা তার অফিসের পিয়নকে দিয়েছিলেন আমাকে চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখাতে। আমি অমন খোলা পরিবেশে নিজেকে সামলাতে পারিনি। মনে হচ্ছিলো আমার পিঠে ডানা গজিয়েছে। আমি উড়তে পারি। আমি দৌড়ুতে শুরু করলাম। জানো, একটুপর শুনি সেই লোকটি পেছন থেকে আমাকে ডাকছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমার দাঁড়াবার সময় নেই। সামনে ছোট একটা নালা। ফকফকে পানি বয়ে যাচ্ছে। আমিতো ওই নালায় নামার জন্য পাগল হয়ে গেছি। আলি ভাই আমার কাছে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে আলি ভাই? বুড়ো মানুষটি চোখ নামিয়ে বললো, অমন করে দৌড়ালে মানুষ খারাপ বলবে। বিশ্বাস করো রঞ্জন সেদিন আমার ভালোলাগা এমন হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো যে আমি মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিলাম। বললাম, মানুষ খারাপ বললে আমার কি ক্ষতি হবে আলি ভাই?

আলি ভাই জবাব দেয় না। বললাম, আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। মানুষ খারাপ বলবে কেন? আলি ভাই বললো, আপনি তো ছোট নন। বড়ো হয়েছেন যে? আমার বয়স তখন চৌদ্দ। কিইবা বড়ো হয়েছি। জীবনের কিছুইতো তখন জানতাম না। অথচ মানুষ আমাকে জোর করে বড়ো বানাবে। আমি ইচ্ছে মাফিক খোলা মাঠে দৌড়ুতে পারবো না। বুকভরে নিশ্বাস নিতে পারবো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমাকে চার দেয়ালের ভেতর ঠেলে দেয়ার জন্য তোমরা ওৎ পেতে আছো? আলি ভাই বললো, মেয়েদের তো এভাবেই থাকতে হবে। ওহ্ আমার বুকটা সেদিন ফেটে যাচ্ছিলো।

রঞ্জন ভীষণ আবেগ নিয়ে বলে, শ্রাবণী চলো আমরা এখন দৌড়াই। ধরো, আমার হাত ধরো। শ্রাবণী দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, কেন তোমার হাত ধরে দৌড়ুবো? আমিতো একাই দৌড়াতে পারি। রঞ্জন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, আহ্ শ্রাবণী এমন সুন্দর বিকেলটা নষ্ট করতে নেই। শ্রাবণী আকাশ ফাটিয়ে হাসে, কেন আমাকে দৌড়াবার জন্য ডাকছো? আমি মরে গেছি বলে? তুমিও তো ওই আলি ভাইয়ের দলে রঞ্জন। কোথায় শ্রাবণী? ও কি এই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে শ্রাবণীকে ডাকবে? একা একা দৌড়নো যায় না শ্রাবণী। তুমি থাকলে আমি হয়তো দৌড়ে গিয়ে দিগন্তে পৌঁছতে পারতাম। এখন আমার বুকে হাঁফ ধরেছে। দৌড়তে পারছি না। আমাদের পাশাপাশি দৌড়নোরই কথা। আমি আলি ভাইদের দলে নই শ্রাবণী। তুমি পেছনে থাকবে কেন? আবার সেই আকাশ ফাটানো হাসি, তোমাদের কেউ কেউ আমাদের পেছনে ঠেলে দাও। শ্রাবণীর কণ্ঠস্বর যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বিষণ্ন

হয়ে যায় রঞ্জন। এমন সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভেতরে বিষাদের ছায়া নামলে ও শুনতে পায় শিশুদের কলধ্বনি। চারদিক থেকে দৌড়ে আসছে ওর দিকে। বলছে, দুঃখ পেয়ো না। আমরা আছি।

কাজল কাছে এসে ওর হাত ধরে, স্যার আপনের কি অইছে? বাসু করুণ কণ্ঠে বলে, আপনে এমুন কইরা খাড়ায়ে রইছেন ক্যান?

— কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?

— মনে অইতাছে আপনে য্যান এতিম। আপনের কেউ নাই।

— না, না আমি এতিম না। আমার বাবা, মা, ভাইবোন সব আছে।

— তারা কোনহানে?

— ঢাকায়।

— আপনে আমাগোরে ঢাকায় নিবেন?

— ঢাকায়? কোথায় নিয়ে যাবো? কোথায় থাকতে দেবো?

— ক্যান আপনের বাড়িতে।

— ওই বাড়িতে যে আমি যেতে পারি না।

— আপনের বাড়িতে আপনে যাইতে পারেন না?

ছেলেমেয়েরা হি-হি করে হাসতে থাকে। তারপর ওরা ওকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে ছড়া কাটে। রঞ্জনের মনে হয় দুঃখ নেই, বিষাদ নেই — ঝর্নার বেগে ছুটে আসছে আনন্দের কলধ্বনি। ও নিজেও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। ওদের যাদু দেখায়।

তখন ফোন বাজে নাসিরুদ্দীনের বাড়িতে। নাসিরুদ্দীন চোখের ওপর হাত রেখে ভাবে। শ্রাবণী ওসির ভাগ্নি। লোকটি পাগলা কুকুর হয়ে গেছে। কতোদূর নিয়ে যে ছাড়বে। ফোন উঠিয়ে নাসিরুদ্দীন হ্যালো শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে, আইন শুধু নিজের ভাগ্নির জন্য কঠিন না রেখে সবার বেলায়ই যেন একরকম করতে পারেন ওসি সাহেব। আপনার মতো দায়িত্ববান পুলিশ অফিসাররাই পারে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি টাইট করে ফেলতে।

ধাম করে ফোনটা রেখে রিসিভারটা আবার নামিয়ে রাখে। ততোক্ষণে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সবাই। নাসিরুদ্দীন ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, এই লোকটি আমাকে পাগল করে ফেলবে।

অঞ্জন বলে, এরপর থেকে তুমি টেলিফোন ধরো না বাবা।

সায়রা বাণু সায় দেয়, হ্যাঁ ঠিক। ফোন আমি ধরবো। দেখি ও কি করে।

— না, তুমিও ধরবে না। তোমাকে এসব কথা বললে তুমি অসুস্থ হয়ে যাবে।

কঙ্কন বলে, তাহলে শুধু আমি আর ভাইয়া ধরবো। আমাকে কিছু বলতে চাইলে আমি আচ্ছা করে কথা শুনিয়ে দেবো।

— আমার ইচ্ছে হয় একদিন গিয়ে লোকটাকে বানিয়ে রেখে আসি। সবাই অঞ্জনের দিকে তাকায়। ঘরে নীরবতা। নাসিরুদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ছেলেটা যে কোথায় আছে। সায়রা বাণু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, আমার মনে হয় একদিন ও হঠাৎ করে আমাদের কাছে চলে আসবে।

কঙ্কনের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস, মা আমারও তাই মনে হয়।

— কাল রাতে আমি ভাইয়াকে স্বপ্ন দেখেছি।

— আমিও দেখেছি রে অঞ্জন। দেখি রঞ্জন গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। চারপাশে ভিড় করে আছে মানুষ।

— আশ্চর্য, আমিও এমনই একটি স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি ও ম্যাজিক দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের মাতিয়ে তুলেছে। ছেলেমেয়েরা ওকে ভীষণ ভালোবাসে।

অঞ্জন ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে, বাবা আমরা কি স্বপ্নের ভেতর দিয়ে এভাবেই নিজেদের ইচ্ছেগুলো খুঁজে ফিরছি। ভাবছি, রঞ্জন সুখে থাকুক, ভালো থাকুক। বাবা, এভাবে কি ভাইয়া আমাদের স্মৃতিতে চলে যাচ্ছে — এভাবেই কি আমরা ভুলে থাকতে চাইছি যে আমাদের পরিবারের একজন মানুষ ফাঁসির আসামী।

তিনজন মানুষ স্তব্ধ হয়ে অঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা শেষ হলে সায়রা বাণু কান্না চাপে। নাসিরুদ্দীন স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। এভাবে উড়িয়ে দিয়ে যায় নিজের চারপাশকে। কঙ্কন অঞ্জনের পাশে এসে বসে। বলে, এমন করে স্বপ্নগুলো ভেঙে দিলি কেন ভাইয়া?

— আমাদের উচিত বাস্তবকে আরো কঠিন করে দেখা।

কঙ্কন আর্তনাদ করে, না। এভাবে নয়। আমাদের তো বাঁচতে হবে।

— তাহলে রঞ্জনকে আমরা আমাদের জীবন থেকে মুছে ফেলি না কেন?

অঞ্জনের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে সায়রা বাণু বলে, অসম্ভব। ও নিজেই আমাদের জীবনে একটি স্বপ্ন। ওগো তুমি তো জানো আমাদের বিয়ের পাঁচ বছর পর ও হলো। আমরা একটি বাচ্চার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

— আমরা ইচ্ছে করলেই রঞ্জনকে আমাদের জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারি না রে অঞ্জন।

— ভাইয়াকে ছাড়া আমার শৈশবের দিনগুলো একদম শূন্য হয়ে যায়। আমি আমার শৈশবকে হারাতে চাই না। আমার শৈশব আমার স্বপ্ন।

অঞ্জন হো-হো করে হেসে ওঠে, তাহলেতো ভালোই হলো। সবাই মিলে আমরা স্বপ্নের ভেতর আম আঁটির ভেঁপু বাজাই। আমাদের মাঝে জেগে থাকুক একজন অপু।

কথা শেষ হতে হতেই টেলিফোন বাজে। কেউ ধরে না। ওটা বেজে বেজে থেমে যায়। বড়ো একটা গাছের কাণ্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে রঞ্জন তখন চিৎকার করে বলে, টুকি। ছেলেমেয়েরা ওকে খুঁজতে শুরু করে। ও সবার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। ও কোথায় লুকোবে আর? ওর কি লুকোনোর জন্য জায়গা শেষ হয়ে গেছে? একসময় নিজেই বুঝতে পারে ও স্টেশনে এসেছে। জাকারিয়ার টেবিলের সামনে বসে ভাবছে, এই লোকটির কাছেই এখন ও সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। এই লোকটি কি পারবে ওকে সব বিপদ থেকে আড়াল করে রাখতে? একসময় জাকারিয়া ওর দিকে তাকালে ও বিব্রত হয়। মৃদু হেসে বলে, এমনি এলাম।

— মন ভালো নেই?

— না, ভাবলাম আপনি কি করছেন দেখে আসি।

— বুঝেছি তোমার সময় কাটছে না। তুমি সেদিন আমাকে ছবি আঁকার কথা বলেছিলে। জানো, আমিও অনেকদিন ভেবে দেখেছি যে এই স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকা — ট্রেনের আসা-যাওয়া দেখা — মানুষ, মানুষের বাঁচা, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি অনুভব করা তোমার ছবি আঁকা, বাঁশি বাজানোর মতোই আনন্দের। ভীষণ ভালোলাগে। তুমিও তাই

করবে। দেখবে এটা তোমাকে অন্যরকম ভালোলাগার স্বাদ দেবে। তোমার মনে হবে তুমি বেঁচে আছো। শুধু নিশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকা নয়, অনুভব করে বেঁচে থাকা।

রঞ্জন মুগ্ধ হয়ে শোনে। জাকারিয়া মৃদু হেসে বলে, বেঁচে থাকার জন্য অনেক অবলম্বন চাই। এই যেমন এখন তুমি আমার পরিবারে এক ভীষণ আনন্দ।

— কিন্তু আপনি তো জানেন না আমি কে? আমার পরিচয় কি?

— তোমার পরিচয় তুমি নিজে। কিন্তু আমার একটি দোষ আছে যে আমি মানুষ চিনতে পারি না।

— যখন চিনতে পারেন তখন কি আপনার দুঃখ হয়? নিজের ওপর রাগ হয়।

— না, একটুও না। আমি সেটা উপভোগ করি। তখন নিজের ওপর আমার মায়া বাড়ে।

রঞ্জন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না মানুষটি কতোটা গভীর। বাড়ি ফেরার সময় ওর খুব মন খারাপ হয়। ও সরাসরি বাড়ি না ফিরে বাজারে আসে। অন্যমনস্ক হয়ে গেলে মনে হয় ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। বাজারের মুচির সামনে স্যাণ্ডেলজোড়া খুলে দিয়ে বলে, দু'পাটিই ছিঁড়েছে।

মুচি স্যাণ্ডেলজোড়া উল্টেপাল্টে দেখে বলে, ছিঁড়ে নাই তো সাব।

— আমার মনে হলো কোথায় যেন ছিঁড়ে গেছে।

— না, ছিঁড়ে নাই। নেন।

রঞ্জন স্যাণ্ডেলে পা ঢোকাতে ঢোকাতে বলে আমার মনে হচ্ছিলো স্যাণ্ডেলটা ছিঁড়ে গেছে। হাঁটতে পারছি না। তাহলে কোথায় ছিঁড়লো? মুচি মৃদু হাসে। রঞ্জন চমকে উঠে বলে, হাসলে কেন?

— এমনে। মুচি নিজের সামগ্রী নিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

— তুমি বোধহয় জানো যে আমার স্যাণ্ডেলটা কোথায় ছিঁড়েছে?

— কইলাম তো স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে নাই।

— তাহলে কি ছিঁড়েছে?

— কইলজা। এইডা ছিঁড়লে মেলা কিছু ছিঁড়া ছিঁড়া লাগে। আমারডাও ছিঁড়া।

রঞ্জন মুচির কাঁধে হাত রাখে, বলবে কি তোমারটা কেমন করে ছিঁড়লো?

— যেইদিন তোলপাড় কইরা বিষ্টি অইবো। হেইদিন কমু।

ও চলে গেছে, রঞ্জনের মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে, তোলপাড় করা বৃষ্টি। বলে, আমারও ভীষণ দরকার তোলপাড় করা বৃষ্টি।

।। ১৪ ।।

পরদিন সকালে দীপ্তি রান্নাঘরে ব্যস্ত। জাকারিয়া অফিসে গেছে। রঞ্জন রান্নাঘরে এসে দাঁড়ায়, ভাবলাম চা-টা নিজেই করে নিয়ে যাই।

দীপ্তি ওর দিকে না তাকিয়ে বলে, ঠিক বললেন তো?

— কেন, মিথ্যে বলবো কেন?

দীপ্তি হাসতে হাসতে বলে, এমনি বললাম।

— আমি চা বানাতে পারি।

— আর কি পারেন?

— রাঁধতেও পারি। আগামী শুক্রবার হাটবার। নিজের পছন্দমতো বাজার করবো।

ফিরে এসে রাঁধবো। সবার দাওয়াড ।

দীপ্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ওহ্, খুব মজা হবে। আমারতো পিকনিকের মতো লাগবে। সেই কবে স্কুলে থাকতে পিকনিকে গিয়েছিলাম। তারপরতো ওসবের বালাই নেই।

— আপনাদের এ জায়গাটা এমন যে মনে হয় রোজই পিকনিক হচ্ছে।

— কিন্তু কতোদিন এ জায়গা আপনার ভালোলাগবে? কতোদিন থাকতে পারবেন?

— যতোদিন আমার ভালোলাগবে।

চা ছাঁকতে ছাঁকতে দীপ্তি বেশ নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে, আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো? রঞ্জন হেসে ওঠে, একটি কেন হাজারটি করুন। দীপ্তি চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় ওর দিকে। বলে, একটি প্রশ্নই হাজারটির সমান। রঞ্জন চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন দেখছি।

— আচ্ছা আপনি কি কোনো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেন? রঞ্জন চুপ।

— আপনার কি ঠিকমতো ঘুম হয় না? রঞ্জন চুপ।

— আপনার ভেতরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা আছে? রঞ্জন চুপ।

এতোক্ষণ ওকে চুপ করে থাকতে দেখে দীপ্তি আর প্রশ্ন বাড়ায় না। খানিকটা দ্বিধা নিয়ে বলে, আমি জানি আপনাকে এমন প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি। কিন্তু নিজের কৌতূহল চাপতে পারলাম না।

— কেন আপনার এমন ধারণা হলো?

— আপনি ঘুমের মধ্যে গোঙাতে থাকেন। আপনার দুঃস্বপ্নটা কি?

— ওহ্ না, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

— আমাকে বলতে পারেন। আমি আপনার বন্ধু হতে চাই।

— বন্ধু?

— হ্যাঁ, বন্ধু। সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়ার বন্ধুত্ব।

রঞ্জন মাথা নিচু করে। দীপ্তি তাকিয়ে থাকে। দুজনে জানতে পারে না একটু আগে যে ট্রেনটা স্টেশনে ঢুকলো সেই ট্রেন থেকে নামলো সাত্তার। সাত বছর পর ও দেশে ফিরেছে। হেড অফিসে ঘোরাঘুরি করে বের করেছে যে জাকারিয়া এই স্টেশনের দায়িত্বে আছে।

।। ১৫ ।।

রঞ্জন একদিনের জন্য শহরে আসে। ভীষণ মনে পড়ছে বাড়ির কথা। ফোন বুথ থেকে বাড়িতে ফোন করে। ফোন বাজে। নাসিরুদ্দীন কাছে বসে কাগজ পড়ছিলো। কিন্তু ফোন ধরে না। ছুটে আসে সায়রা বাণু। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে। অঞ্জন ছুটে এসে ফোনটা ওঠায়। কিন্তু ততক্ষণে রঞ্জন ফোন ছেড়ে দিয়েছে। ও একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ে। হুডটা তুলে দিয়ে গুটিসুটি বসে থাকে। রিকশাওয়ালা বেশ কিছুক্ষণ চালিয়ে বিরক্ত হয়ে বলে, কোনদিকে যামু? কিছু কন না দেহি? এই শওরে কি নতুন আইছেন? রাস্তাঘাট চিনেন না?

— অনেকদিন পর এলাম তো সেজন্য এখন কিছু চিনতে পারছি না। সবকিছু নতুন নতুন লাগছে।

— কতোদিন পর আইলেন?

— একশ বছর পর।

— কি কইলেন? একশ বছর? মিছা কথা কন ক্যান?

— মিছা কথা নয় রিকশাওয়ালা ভাই। এই শহরকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। কতোদিন

রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেলে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি। কতো গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বসন্ত এই শহরের রাস্তায় আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে। এখন আমি ইচ্ছে করলেই এই শহরের রাস্তায় ঘুরতে পারি না।

— অহন কৈ থাহেন?

— গ্রামে।

রিকশাওয়ালা ওকে আরো অনেক প্রশ্ন করেছিলো। ও কোনোটারই ঠিক ঠিক উত্তর দেয়নি। মনে হচ্ছিলো খেলাটা নিজের সঙ্গে। এই চেনা শহরটাকে অচেনা ভাবার খেলা। একসময় নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, ঠিক চিনেছিতো বাড়িটা? যেখানে আমার কৈশোর-যৌবন কেটেছে। যে বাড়ি থেকে আমি একদিন রাতের অন্ধকারে পালিয়েছিলাম।

রঞ্জন, আমার রঞ্জন — মায়ের আকুতি দিয়ে এ বাড়িকে ওর নতুন করে দেখা শুরু। বাবাকে সালাম করলে জড়িয়ে ধরে ঠিকই, কিন্তু মনে হয় খানিকটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। অঞ্জন আর কঙ্কন আগের মতো প্রাণবন্ত। মাঝখানের সময়টা ওরা দুজনে উড়িয়ে দিয়েছে। মা জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে যেখানে আছিস সেখানে তোর কষ্ট হচ্ছে না?

— হ্যাঁ, ভীষণ কষ্ট হয়।

— কষ্ট কেন? ঠিকমতো খেতে পাস তো?

— খাওয়ার কোনো কষ্ট নেই। ওটা বরং ভালোই হয়।

— তবে কষ্টের কথা বলছিস কেন?

— তোমাদের অভাবটা আমাকে বেশি কষ্ট দেয় মা।

— তোকে আমি আর যেতে দেবো না। তুই এ বাড়িতেই থাকবি। রঞ্জন বিবর্ণ মুখে মার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি একটু পরেই চলে যাবো মা।

নাসিরুদ্দীন শান্ত কণ্ঠে বলে, একটা দিন থেকে যা।

— ঠিক হবে না বাবা।

— রাতটুকুতো থাকবি।

রঞ্জন চুপ করে থাকে। অঞ্জন প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়, ভাইয়া তুমি এখন বাঁশি বাজাওতো?

— বাজাই। যেখানে থাকি সেটা বাঁশি বাজানোর মতো জায়গা। চারদিক খোলা প্রকৃতি, নির্জন। মেঠো পথে হেঁটে গেলে বাতাসের শনশন শুনে —

— তুমি ছবি আঁকোতো ভাইয়া?

— আঁকি। ওখানকার প্রাইমারি স্কুলে ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখাই।

সায়রা বাণু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, বাহ্ ভালো একটা কাজ পেয়েছিস তো। আমি তোর সঙ্গে যাবো সেই গ্রাম দেখতে, নিবি?

রঞ্জন মুখ নিচু করে। মুখটা অন্যদিকে ঘোরায়। নাসিরুদ্দীন সায়রা বাণুর হাত ধরে বলে, চলো আমরা রান্নাঘরে যাই। আমরা তো জানি ভুনা খিচুড়ি আর ইলিশ ভাজা রঞ্জনের খুব প্রিয়।

সায়রা বাণু যেতে যেতে নিশ্বাস ফেলে বলে, আমার মনে আছে। আমি ভুলিনি।

রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে পিঠ ঠেকিয়ে কাঁদতে থাকে সায়রা বাণু। নাসিরুদ্দীন মৃদু ধমকের সুরে বলে,আহ্ সায়রা বাণু, এমন করা ঠিক নয়। ছেলেটি কষ্ট পাবে। আমাদের উচিত ওকে আনন্দে রাখা।

— তাই তো। আর কদিনই বা —। আমি যে ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। কেন যে ও এতো বড় ভুলটা করলো? কেন ওর জীবনটা ওলোটপালোট হয়ে গেলো?

নাসিরুদ্দীনের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বয়, আসলে ওতো একটি চমৎকার ছেলে। আমরা ওর জন্য কিছুই করতে পারবো না। কিছুই না।

দূজন মানুষের নিঃসঙ্গ আর্তনাদ — অপরিসর রান্নাঘর — হাঁড়িকুড়ি — চালডাল — ইলিশ মাছ— নুন তেল মরিচ পেঁয়াজ ইত্যাদি কতো কিছুর ওপর দিয়ে ওদের কাছে পৌঁছায় না। ওরা তিন ভাইবোন একটি ঘটনা এবং ঘটনার কারণে উদ্ভূত জটিল সময়কে হাসিগানে উড়িয়ে দিয়েছে।

।। ১৬।।

রঞ্জন হাসতে হাসতে বলে, কতোদিন এমন প্রাণখুলে হাসি নি রে অঞ্জন।

— তোমাকে পেয়ে কি যে ভালোলাগছে। একটা নতুন শার্ট কিনেছি। সেটা আমি তোমাকে দিতে চাই ভাইয়া।

— নিশ্চয় দিবি। ওটা পরেই গাঁয়ে ফিরে যাবো।

কঙ্কন মুখ ম্লান করে বলে, আমি ভাইয়াকে কি দেবো?

— তুই একটা গান শোনা কঙ্ক। কতোদিন তোর গান শুনিনি।

কঙ্কনের কণ্ঠ যখন ওঠানামা করে — ও যখন কথাগুলো উচ্চারণ করে, ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি — খোকার চোখে ঘুম নেই ঘুম দিয়ে যেও — তখন রান্নাঘরের চুলোর সামনে দাঁড়িয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে সায়রা বাণুর। এ কেমন জীবন, কেমন সময় — এমন দম-আটকানো সময় কি কোনোদিন বুকের ভেতর থেকে তাড়াতে পারবে ও? ব্যাকুল চোখে নাসিরুদ্দীনের দিকে তাকায়, ওগো সত্যি আমার খোকার চোখে ঘুম নেই? তুমি কিছু বলছো না যে? নাসিরুদ্দীন চুপ করেই থাকে। জানে তার কিছুই বলার নেই।

।। ১৭।।

খেতে বসে বারবারই ছেলের পাতে ভাত-তরকারি তুলে দেয় সায়রা বাণু। রঞ্জনের আপত্তি শোনে না। ও একসময় হাত গুটিয়ে নিয়ে বলে, আরো দিলে পেট ফেটেই মরে যাবো।

— মরে যাবি? এমন একটু সত্য কথা শুনে কষ্টে-বেদনায় ওর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে সায়রা বাণু। টপটপ করে জল গড়িয়ে আসে গালের ওপর। নাসিরুদ্দীন হঠাৎ জোরে হেসে উঠে বলে, হ্যাঁরে যেখানে থাকিস সেখানে তুই মাছ খেতে পাস তো? তোর মা ভেবেছে পেট ফেটে মরে যাওয়াটা একটা দারুণ ব্যাপার।

অঞ্জন শোরগোল তুলে বলে, ঠিক বাবা।

কঙ্কনও একই ভঙ্গিতে বলে, বাবা তুমি না আমাদের ছোটবেলায় একটি পোটকা মাছের গল্প বলতে? ইয়া বড়ো পেট ছিলো।

সবশেষে রঞ্জন প্লাটফরমে এসে দাঁড়ায়। সবার মনে হয় ও অনেকদূর থেকে কথা বলছে, আমার এখনও মনে আছে আমাদের ছোটবেলায় আমরা একটা বাড়িতে ছিলাম যে বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি ছিলো না। মা সন্ধ্যেবেলায় তোদের দুজনকে গল্প বলতো আর ভাত খাইয়ে দিতো।

— গল্প না বললে আমি আর কঙ্ক ভাত খেতে চাইতাম না।

সায়রা বাণু চোখের জল মুছে বলে, অঞ্জন আর কঙ্কনকে যখন ভাত খাওয়াতাম তখন ছোট্ট একটা কুপি জ্বলতো টেবিলের ওপর। মিটিমিটি আলোয় চারদিক আলো-আঁধারী হয়ে থাকতো। রঞ্জন দুষ্টুমি করে দৌড়ে এসে একফুঁয়ে কুপিটা নিভিয়ে দিতো।

রঞ্জনের দূরাগত কণ্ঠ আবার ভেসে আসে, তখন চারদিকে ঘন-নিকষ কালো অন্ধকার নেমে আসতো মা। ভীষণ অন্ধকার, ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওহ্।

প্রত্যেকে স্তব্ধ হয়ে থাকে। যেন এই মুহূর্তে এ বাড়ির সব আলো নিভে গেছে। কোথাও কেউ নেই সেটা আবার জ্বালিয়ে দেবার জন্য।

।। ১৮।।

রিঙ্কুর রাজহাঁস কাকু বাড়িতে নেই বলে ওর জন্য হাট থেকে রাজহাঁস কিনে আনতে হয়েছে জাকারিয়ার। যেদিন রঞ্জন ঢাকা গেলো সেদিনই ও স্টেশন থেকে কিছুতেই বাড়ি আসবে না। সাফ কথা, যে বাড়িতে রাজহাঁস কাকু নেই সে বাড়িতে আমি যাবো না। শেষ পর্যন্ত রাজহাঁস কিনে দেয়ার কথা বলতে হলো, হাঁস নিয়ে স্টেশনে থাকলে যে হাঁসটাকে শেয়ালে খেয়ে ফেলবে, এই শর্তে বাড়ি ফিরলো ও। এখন ওটাকে নিয়ে খেলছে। মাটির পাত্রে ধান দিয়েছে। জাকারিয়া আর দীপ্তি বারান্দায় বসে মজা দেখে। একসময় ক্লান্ত হয়ে জাকারিয়ার কাছে এসে বলে, নানুভাই হাঁসটা কবে ডিম পাড়বে?

— কবে? ঠিকতো বলতে পারছি না।

পাছে একটা ডিমের বায়না করে এই ভয়ে দীপ্তি তাড়াতাড়ি বলে, ডিম দিয়ে কি হবে সোনা। ওতো তোমার বন্ধু। যখন খুশি তখন ডিম পাড়লেই হলো।

— আচ্ছা, ও কি সোনার ডিম পাড়বে?

— সোনার ডিম? দুজনে অবাক হয়।

— ঐ যে এক কৃষকের একটি হাঁস ছিলো। রোজ রোজ সোনার ডিম পাড়তো।

— ও তাই বলো।

রিঙ্কু আবার দৌড়ে হাঁসের পেছনে চলে যায়। জাকারিয়া মেয়ের দিকে তাকায়, হ্যাঁ রে রঞ্জন কবে ফিরবে বলেছে?

— কাল বিকেলে।

— ছেলেটা নেই কেমন খালি খালি লাগছে।

— বাবা আমাদের কি উচিত নয় ওর কে কে আছে খোঁজ করা?

— হয়তো উচিত ছিলো। কিন্তু শুরুতেই যখন করিনি এখন আর পারবো না।

— তুমি কি সবসময় একইরকম থাকবে?

জাকারিয়া মৃদু হেসে বলে, বলতে চাস যে আমার কোনো শিক্ষা হয় না?

— আহ, বাবা আমি তা বোঝাতে চাইনি।

জাকারিয়া অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে, তুই বোঝাতে না চাইলে কি হবে মা কথাটা তো সত্যি! এই জীবনে আমি বুঝতেও পারবো না।

।। ১৯।।

স্বামী-শাশুড়ির নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মৌফুলি ট্রেনের নীচে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো। ওর বন্ধু নয়ন দূর থেকে ওকে লাইনের কাছে দেখে একটা কিছু আঁচ করে ছুটে যায়। কারণ আগের রাতে মৌফুলি ওর ঘরে শুয়ে কান্নাকাটি করেছিলো। বলেছিলো, আমার মতন একডা

মানুষ না থাইকলে কি অয় নয়ন? নয়ন জানে না জীবনের কাছ থেকে কখন নিষ্কৃতি চায় একজন মানুষ! ট্রেন আসার আগে নয়ন ওকে হেঁচকা টানে সরিয়ে আনতে আনতে বলেছিলো, মরবি ক্যান? তোর মাইয়া আছে না? মাকে সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দেবার জন্য একটি শিশুই কি যথেষ্ট? না, চিৎকার করে ওঠে মৌফুলি। শুধু শিশু সব দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে না। জীবনের পূর্ণতা চাই। ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসে, ব্যক্তিত্বে, মমতায় আরো কতো কি, কতো কি!

ঘটনাটা গাঁয়ে বেশ আলোড়ন তোলে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে মৌফুলি আর নয়নকে দেখে সান্তার। ওরা বাড়ির দিকে ফিরে যাওয়ার সময় পিছু নেয় গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা। কাজেম হন্তদন্ত হয়ে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, মরতে গেছিলা? কেন মরতে গেছিলা?

নয়ন মুখ ভেংচি দেয়, জানেন না কেন মরতে গেছিলো? আবার যদি ওর গায়ে হাত দিবেন তো আমি আপনেরে পুলিশে দিমু?

— মার চাইতে মাসীর দরদ বেশি। বৌ আমার না আর একজনের?

— বৌ? কেমুন বৌ? এইডারে কি সংসার কয়?

— কয়, কয়।

— না। মৌফুলি চিৎকার করে ওঠে। বিস্ময়ে ওর দিকে তাকায় উপস্থিত সবাই। যেন একজন মৌফুলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নতুন মৌফুলি। ওই না চিৎকার শোনে সান্তারও। অবাক হয়। দৃশ্যটা ওর পরিচিত। তফাৎ এই যে সেদিন দীপ্তি অমন করে চিৎকার দেয় নি। শুধু কেঁদেছিলো। এখন কি ইচ্ছে করলে ফেরত পাবে যা কিছু রেখে গিয়েছিলো তার সব?

উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে আতরজানের মুখোমুখি হয় জাকারিয়া। ধমকের সুরে বলে, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলোনা কাজেমের মা। দুর্ঘটনাটা যদি ঘটেই যেতো তাহলে কি অবস্থা হতো ভেবে দেখো।

— কারো মরার সাদ অইলে আমি কি করমু।

— তোমরা মেয়েটার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পারো।

— ভালো ব্যবহারই তো করি। ওরে তো ভাত আমিই খাওয়াই? না অন্য কেউ খাওয়ায়?

— ভাতের কথা বলিনি। বলেছি ভালোবাসার কথা।

আতরজান মুখ বাঁকায়, ভালোবাসা? আপনেতো বেগানা পুরুষের ভালোবাসা দিয়া গাঁও-গেরাম ভাসায়ে দিলেন। পরেরে কোনো উপদেশ দিয়েন না। নিজের ঘরের দিকে দেহেন।

— নিজের ঘর? আমারে ঘরে কিছু হয়নি কাজেমের মা।

— চোখ থাকতে আন্ধা অইলে কে আর কি করবে।

আতরজান মুখ ঝামটিয়ে চলে যায়। জাকারিয়া বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঠ-ঘাট-প্রান্তরের কাছে নতজানু হয়ে বলে, আমি অন্ধ নই। বত্রিশটি বছর ধরে কেবল স্টেশনে স্টেশনে কাটিয়েছি। কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে দেইনি। আমি চাইনা আমার প্রিয় রেলগাড়ির নিচে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ুক। লাইনের গায়ে লেগে থাকুক মাংসের কুচি।

।। ২০ ।।

সে মুহূর্তে রঞ্জনের ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে সেই কাগজটি বিছানার নীচ থেকে বের করে দীপ্তি। রঞ্জনের ছবিসহ খবরটি ছাপা রয়েছে। ও তাকিয়ে থাকে। পড়া হয়ে গেলেও নড়তে পারে না। বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে ওর ভেতরে। একটা রেলগাড়ি হাজার হাজার

মানুষ থেঁতলাতে থেঁতলাতে চলে যাচ্ছে। কখনো কখনো একটি হৃদয় অমন হাজার হাজার হয়। ও স্তব্ধতার ঘোরের ভেতর কাগজটা আবার যেখানে ছিলো সেখানে রেখে দেয়।

।। ২১ ।।

সকালে রঞ্জন নাস্তার টেবিলে বসে বলে, কাল রাতে একটা দারুণ স্বপ্ন দেখেছি মা।

— স্বপ্ন? সবাই উৎসুক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়।

— দেখলাম একটি ফুটফুটে মেয়ে। একটি চমৎকার রাজহাঁস নিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি ওর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কেমন অদ্ভুত আলোয় ভরে গেলো। মনে হলো এটাই বুঝি পৃথিবীর প্রথম আলো।

নাসিরুদ্দীন হেসে বলে, মানুষ যা ভাবে স্বপ্নে তার প্রতিফলন হয়। আমার মনে হয় তুই কোনো সুন্দর জীবনের কথা ভাবছিস।

— আসলে কি জানো তোমাদের সঙ্গে কতোদিন পর দেখা। এটাই আমার কাছে স্বপ্নের মতো। আমার বেঁচে থাকাই এখন স্বপ্ন বাবা। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার দরকার নেই। আজ আমাকে যেতে হবে।

সায়রা বাণু আঁতকে উঠে বলে, যাবি? কোথায়? রঞ্জন চুপ করে থাকে। কেঁদে ফেলে, আমাকেও বলবি না?

রঞ্জন চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে টেবিল থেকে উঠে যায়। ওর পিছু পিছু অঞ্জন-কঙ্কনও যায়। সায়রা বাণু চোখ মুছে বলে, ছেলেটা আমাদেরও বিশ্বাস করে না গো। আমরা ওর পর হয়ে গেলাম।

নাসিরুদ্দীন যেন ফ্রিজ হয়ে যায়, ওর নিজের কাছেই জিজ্ঞাসা বেঁচে থাকা কি এমন? এমন তীব্র, এমন জটিল, এমন নির্মম!

সেদিনই রাতের অন্ধকারে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় রঞ্জন। ফিরে আসে গ্রামে।

।। ২২ ।।

স্টেশনে ওর জন্য অপেক্ষা করছিলো রিঙ্কু ও অন্য ছেলেমেয়েরা। ওকে কোলে তুলে নিলে ও গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি না থাকলে আমার কিছুই ভালোলাগে না কাকু।

রঞ্জন অভিভূত হয়। আশঙ্কিত হয়। শিউরে ওঠে। এক অদ্ভুত মায়ায় জড়িয়ে যাচ্ছে ও। কোথায় এর পরিণতি?

রান্নাঘরে বসে চা খাবে বলে মোড়া টেনে বসতেই দীপ্তি বলে, কেমন কাটলো ঢাকায়?

— ভালোই। অনেকদিন পর বাবা-মা ভাইবোনের সঙ্গে দেখা হলো।

দীপ্তি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, অনেকদিন পর কেন? আপনি ঘন ঘন বাড়িতে যান না?

রঞ্জন আকস্মিক এই আক্রমণে প্রথমে বিমূঢ় হয়, তারপর বুঝতে পারে দীপ্তি ওকে অন্য রকম দৃষ্টিতে দেখছে। ও মরীয়া হয়ে বলে, না, মানে ঠিক যাওয়া হয় না।

— কেন যান না? আপনি একা মানুষ। আপনার আর পিছুটান কি?

— পিছুটান? দীপ্তি সরাসরি তাকিয়ে থাকে। রঞ্জন ঢোক গেলে, বড় ধরনের পিছুটান একটা আছে।

— আমি কি জানতে পারি?

— জীবনের হিসেবে একটা বড় রকমের গরমিল হয়ে গেছে। এই পিছুটান আমাকে

তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দীপ্তির চোখে চোখ পড়তে বলে, আপনি ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? আমার ভয় করছে।

— তাকিয়ে থাকলেই ভয় পান। তাহলে আপনি বোধহয় অনেককিছুতেই ভয় পান।

— হ্যাঁ তা পাই। অন্ধকার রাত, দিনের আলো দু'টোতেই আমার ভয়।

— আশ্চর্য। আপনিতো তাহলে শুধু ভীতু নন, ভীতুর ডিম।

— হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

— কবে থেকে আপনি ভীতু? ছোটবেলা থেকেই?

— তা ঠিক বলতে পারবো না। ছোটবেলায় আমি কিসে কিসে ভয় পেতাম তা মনে নেই।

— তা হলে আপনি বড় হয়েই ভীতু হয়েছেন।

— হয়তো তাই।

— যাকগে, ঢাকায় কেমন ছিলেন?

— একটা প্রশ্ন দুবার করলেন।

— কারণ জবাবটা ঠিকমতো পাইনি।

— ঐ যে বললাম ভালো ছিলাম, কিন্তু মন পড়েছিলো এখানে।

— আপনার মাকে বলেছেন এই গাঁয়ের কথা?

দীপ্তির কণ্ঠস্বর একদম অন্যরকম হয়ে কানে বাজে। ও অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, না।

— বাবাকে?

— না।

— ভাইবোনকে?

— না।

দীপ্তি হেসে ফেলে, এই গ্রাম এতো ভালোবাসেন অথচ ওদের বলতে পারলেন না। লুকোলেন কেন?

রঞ্জন অসহায়ের মতো ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আর এক কাপ চা দেবেন?

দীপ্তি হাসতে হাসতে বলে, কাপটা দিন। সেই হাসি দু'কান ভরে শুনতে শুনতে রঞ্জন বুঝে যায় যে দীপ্তি ওর ব্যাপারটা জেনে গেছে। হয়তো বিছানার নিচ থেকে কাগজটা পেয়ে গেছে। ওর ভেতরে সাহস ফিরে আসে। মনে হয় একজনকে নির্ভর করলে ও হয়তো যন্ত্রণার দায়ভার থেকে মুক্ত হতে পারবে। ওকে আর ঘুমের মধ্যে গোঙাতে হবে না। চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে দীপ্তি বলে, আপনার কাছে আমার কতোগুলো প্রশ্ন ছিলো?

— সে প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো।

— কখন?

— এখন। এই মুহূর্তে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম। তাকে আমি সচেতনভাবে খুন করতে চাইনি। আমি সেটাকে এ্যাকসিডেন্ট বলি। আইন বলে না। পুলিশ আমাকে খুঁজছে।

— পুলিশের হাতে ধরা দেননি কেন?

— আমি যে বাঁচতে চাই। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

— কিভাবে?

— মানুষের জন্য কিছু করার মধ্য দিয়ে।

— এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে কি করবেন? আপনার তো কিছু করার মতো টাকাও নাই।

— আমি মানুষের মধ্যে প্রেরণা দিতে চাই। আমি কতোটা পারবো আমি জানি না।

— কারণ পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।

রঞ্জন বিহ্বল দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে তাকায়। প্রবল বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ওর দু চোখে।

।। ২৩ ।।

স্কুলের হেডমাস্টারের রুমে বসে সাত্তার সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করে, কে এই আসহাব নাসিরুদ্দীন?

হেডমাস্টার খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে বলে, জানি না।

— জানেন না, অথচ একটি লোককে হুট করে স্কুলের মাস্টার করে নিলেন।

— আমি কি করবো? যার স্কুল সেই হাজী সাহেবই তো চাইলেন।

— চাইলেই তো হয় না। ভালোমন্দ দেখতে হয়।

— আমি জানি দেখতে হয়। তবে ছেলেটি ভালো। এমন কিছু করেনি যেটা নিয়ে ওর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারি।

— আমার বিশ্বাস ও একটা মুখোশপরা লোক।

— গাঁয়ের লোকেরা ওকে পছন্দ করে।

— অভিনয়। ছদ্মবেশী। আপনি গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার। গাঁয়ের মাথা। ও যদি একটা খুনের আসামী হয় তাহলে পুলিশ আপনাকেই ধরতে আসবে।

— না, না এসব কি বলছেন।

— এমনি বললাম। কথার কথা।

হেডমাস্টারের আত্মকথন প্রবল হয়, সত্যি তো, কে এই ছেলেটি? আমারও তো দায়িত্ব এটা খুঁজে দেখা।

সাত্তার চলে গেলেও হেডমাস্টার গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে শুনতে পায় না। স্কুল ছুটি হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেলে রিঙ্কু রঞ্জনের হাত ধরে টানে, কাকু বাড়ি চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে। মা ঠিক আমার জন্য ভাবছে। রঞ্জন ওর হাত ধরে স্কুলের বারান্দায় দাঁড়ায়, আমিও তো একদিন রিঙ্কুর মতো ছিলাম। আমার বাড়ি ফেরার তাড়া ছিলো। আমার জন্য মায়ের অপেক্ষা ছিলো। তারপর আমার জীবনে ভালোবাসার ঈর্ষা এলো।

এই ঈর্ষা নিয়ে সাত্তার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলো রঞ্জনের বুকের ভেতর রিঙ্কুকে। তখন নিজের ঘরে বসে ছবি আঁকছিলো জাকারিয়া। দীপ্তি পেছনে দাঁড়িয়ে দেখে বললো, দারুণ এঁকেছো বাবা।

জাকারিয়া লাজুক হেসে মেয়ের দিকে তাকায়, রঞ্জন বলছিলো ছবি আঁকলে আমার একা থাকার সময়গুলো ভরে যাবে মা।

— ঠিকই বলেছে বাবা। এখন থেকে তুমি রোজ ছবি আঁকবে।

— এই ছেলেটের একটি গুণ যে মানুষকে জাগিয়ে দিতে পারে।

দীপ্তি অস্ফুট স্বরে বলে, জাগিয়ে দিতে পারে?

জাকারিয়া নিজেকেই বলে, ও যদি আমার ছেলে হতো! ইস আমার চারটে ছেলে মরে গেলো!

— ছেলে নেই বলে তোমার কি খুব দুঃখ বাবা?

— না ছেলের জন্য দুঃখ নয়। মৃত সন্তানের জন্য কষ্ট মা। ওরা বেঁচে থাকলে আমাকে স্মৃতি থাওয়ার যন্ত্রণা সইতে হতো না। ওরা আমাকে অন্যভাবে বাঁচিয়ে দিতো।

— তুমি তো এখন আমার জন্যও কষ্ট পাচ্ছো বাবা। পাচ্ছো না?

জাকারিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নাড়ে, পাচ্ছি।

— বেঁচে থেকেও আমি যদি তোমার কষ্টের কারণ হই তাহলে আর দুঃখ কেন?

জাকারিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়। দেখতে পায় নিজের যৌবন। ঘাড়ে পাঁচ বছরের একটি ছেলে। ছড়া বলছে ওকে। খোকা গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে / ছিপ নিয়ে গেলো কোলা ব্যাঙ মাছ নিয়ে গেলো চিলে। জাকারিয়া গুনগুন করে ছড়াটি বললে দীপ্তির চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। ওর জীবনওতো এমন ঃ ছিপ নিয়ে গেলো কোলা ব্যাঙ মাছ নিয়ে গেলো চিলে। ভাবতে ভাবতে ফিরে আসে নিজের ঘরে। দু'হাতে বালিশ আঁকড়ে ধরলে শরীরটা বিছানার ওপর কুঁকড়ে থাকে। ভেতরের কেউ যেন বলছে, বিয়ের পর ভালোবাসতে চেয়েছিলাম একজন মানুষকে। ভালোবাসা কি বোঝার আগেই দেখলাম বুকের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ভালোবাসার সোনালি স্বপ্ন। আবার ভালোবাসার কুঁড়ি ফুটে উঠতে চায়। আবার —। শুনতে পায় রঞ্জনের কণ্ঠ, পুলিশ আমাকে খুঁজছে।

ওহ্, না বলে দীপ্তি বালিশে মুখ গোঁজে।

রাতে খেতে বসে জাকারিয়া মেয়ের রান্নার প্রশংসা করে বলে, চমৎকার রান্না হয়েছে। মায়ের আমার রান্নার হাত ভালো। বুঝলে রঞ্জন দীপ্তির মাও কিন্তু চমৎকার রাঁধতো। আমাকে অবাক করে দেবার জন্য প্রায়ই নিজে নিজে নতুন খাবার রাঁধতে চাইতো। তারপর হাসতে হাসতে বলে, মাঝে মাঝে এমন খারাপ হতো যে মুখেই দেয়া যেতো না। কিন্তু ছেলে দু'টো মারা যাবার পর সব উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেলো।

দীপ্তি কথাগুলো যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে বলে, বাবা তোমাকে এই মাছটা দেই? তুমিতো মাছের পেটি খেতে ভালোবাসো।

রঞ্জন উদাস কণ্ঠে বলে, আমার বাবাও মাছের পেটি খেতে ভালোবাসে। মাও চেষ্টা করে অনেক কিছু রান্না করতে।

জাকারিয়া আগ্রহ নিয়ে বলে, তোমার কথা বলো রঞ্জন। আমি ফ্যামিলির গল্প শুনতে ভালোবাসি।

— আমার বাবা-মার সুখের দাম্পত্য জীবন। এখনো তারা বেশ সুখে আছে। আমার ছোট ভাইটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বোনটি গান শেখে। চমৎকার ছড়া গান গায়।

— আমাকে নেবে তোমাদের বাড়িতে?

— আমাদের বাড়িতে? রঞ্জন দীপ্তির দিকে তাকায়।

— কেন ক্ষতি কি? তোমার সঙ্গে চলে যাবো। মাত্র একদিন থেকে চলে আসবো। শুধু তোমার বাবা-মাকে দেখতে যাবো।

রঞ্জন আমতা আমতা করে, আমি তো নিজেই জানি না যে আমি কবে ঢাকা যেতে পারবো।

দীপ্তি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য উৎসাহ দেখায়, তার চেয়ে চলো বাবা আমরা একটা নৌকা নিয়ে নদীতে সারাদিন ঘুরে বেড়াই।

রিঙ্কু হাততালি দিয়ে ওঠে, কি মজা আমিও যাবো।

জাকারিয়া যেন বুকের তলদেশ থেকে শব্দ ওঠায়, নদী নয়, গাছ নয়, ঘাস নয়। আমি যে

মানুষের কাছে যেতে চাই মা। রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে, নৌকায় যেতে যেতে আমরা কোনো গ্রামের হাটে নেমে যাবো। কতো মানুষ। ওদের সঙ্গে কথা বলবো। জাকারিয়ার গম্ভীর কণ্ঠ, আমি তেমন মানুষের কাছে যেতে চাই রঞ্জন যাদের জীবনটা সুখে কেটেছে। ভাত শেষ না করে থালাটা ঠেলে দিয়ে উঠে যায়। দীপ্তি রঞ্জনের দিকে তাকায়। বলে, বাবার প্রায়ই এমন হয়। দিন না আপনার যাদু দিয়ে বাবার ছেলেদের বাঁচিয়ে, আমার মাকে বাঁচিয়ে — আপনাদের ফ্যামিলির মতো আমরাও একটা হ্যাপি ফ্যামিলি হয়ে যাই।

।। ২৪ ।।

স্টেশনে জাকারিয়ার সামনে এসে দাঁড়ায় সাত্তার। ওর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ভূত দেখার মতো চমকে উঠেও নিজেকে সামলে নেয়, তুমি?

— আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছি।

— দেখতেই তো পাচ্ছি। এখানে এসেছো কেন? আমি চাই না তুমি দীপ্তির সামনে যাও।

— আমার মেয়ে —

— ওরা তোমার কেউ না। ওদের কথা তুমি উচ্চারণও করবে না।

সাত্তার হো-হো করে হেসে ওঠে, কেউ না? মুখে বললেই তো হবে না। আইনের কাছে ওরা আমার সব।

— আইন? যেদিন ওদের ফেলে রেখে গিয়েছিলে সেদিন আইন কোথায় ছিলো? জন্ম দিলেই যে বাবা হওয়া যায় না এটা আইনের উর্ধ্বের সত্য। তুমি তার প্রমাণ।

— আমি দীপ্তি ও রিঙ্কুকে চাই।

— খবরদার তুমি আমার দীপ্তিকে ডিসটার্ব করবে না।

— আপনি গায়ের জোরে আমাকে বাধা দিচ্ছেন।

— গায়ের জোরে নয়, আমি আইনের জোরে তোমাকে বাধা দেবো।

সাত্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, আমিও দেখবো।

সেদিন বিকেলে রঞ্জন দীপ্তির হাত ধরে গেটের বাইরে আনে। বলে, হ্যাপি ফ্যামিলি করে দিতে না পারলেও আমি একটি মেয়েকে তো হ্যাপি করতে পারি। এসো দেখো কতো সুন্দর এই গ্রাম। কতো ভালো এখানকার মানুষ। সবচেয়ে চমৎকার শিশুরা। দীপ্তি, শুধু এই উঠোন আর রান্নাঘরই পৃথিবী নয়। পৃথিবী অনেক বড়ো। চলো তোমাকে সেই পৃথিবী দেখাবো। যেখানে পথের ধারে সাতভাই চম্পা ফুল হয়ে ফুটে আছে। নদীতে ভেসে যাচ্ছে চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর। খনার বচন শিখে ফসল বুনছে কৃষক। রূপোলি মাছে ভরে যাচ্ছে জেলের জাল।

— আহ্ এমন করে আমাকে ভয় দেখিও না।

— ভয় নয় সুমনা। আমি তোমাকে ভালোবাসার রঙ দেখাবো। এসো এই ফুলটি তোমার খোঁপায় পরিয়ে দেই। দেখবে ফুলের গন্ধ তোমার চারপাশ স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে। তুমি এখন থেকে ভুলে যাবে তোমার ফেলে আসা দুঃখ।

— আহ্ সবকিছু কিএতো সুন্দর!

— হ্যাঁ সুন্দর। শুধু নিজের মতো করে গড়ে নেয়া শিখতে হয়।

।। ২৫ ।।

মৌফুলি বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। বুকের মধ্যে নিশিকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গ্রামের

পথে। ওর চারপাশে বাতাসের শনশন শব্দে মুক্তির আনন্দ। বুকের ভেতর থেকে নতুন মৌফুলি কথা বলে, আহ্ কি সুন্দর গ্রাম। এমন করে আগে তো দেখিনি। ভেবেছি ঘরে থাকলেই বুঝি শান্তি। নিশি আমি একটা স্বাধীন মানুষ। তোকেও আমি স্বাধীন মানুষ বানাবো।

ওকে যেতে দেখে কাজলসহ ছেলেমেয়েরা দৌড়ে আসে ওর কাছে।

— কৈ যান মৌফুলি বু'?

— কাম খুঁজতে।

— গরু চরাইবেন?

— চরামু।

— আমি আপনেরে গরু চরানোর কাম দিমু।

বাসু বলে, আমি আপনেরে ধানক্ষেতের আগাছা বাছার কাম দিমু।

— করমু।

— দোকানদারি করবেন?

— করমু।

— জাইলা গো লগে মাছ টোকাইবেন?

— টোকামু।

হা-হা করে প্রাণখুলে হাসে মৌফুলি। নিজেকে পান্তাবুড়ি মনে হয়। পথে কতো যে সঙ্গী জুটে যায়। সবাই উপকারী। রঞ্জন রিঙ্কুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলো। ওরা ওকে দেখে এগিয়ে আসে। রঞ্জন কাজলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, কি ব্যাপার এমন হইচই করে সবাই মিলে কোথায় যাচ্ছো তোমরা?

মৌফুলি বলে, বাপের বাড়ি।

— বেশ তো এটা একটা চমৎকার যাওয়া।

মৌফুলি বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, আমি আর এই বাড়িতে ফিরুম না। আমার বাপে যুদ্ধ করছিলো, দ্যাশ স্বাদীন করছিলো। আমার বাপে গরীব, কিন্তু সাহসী মানুষ। আমিতো হেরই মাইয়া। আমি পইড়া পইড়া মাইর খামু ক্যান?

— আমাকে আপনের আব্বার কাছে নিয়ে যাবেন?

— আমার বাপে মানুষজন বেশি পছন্দ করে না। একা একা থাকতে চায়। বাপে যে যুদ্ধ করছে এই কথাও কাউরে কইতে চায় না।

— তবু আমি তার কাছে যাবো। এদেরকে নিয়ে যাবো। তাঁর যুদ্ধের গল্প শোনাবো এইসব ছেলেমেয়েদের।

ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে, হ আমরা বেবাক যামু।

মৌফুলি ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে, কুনদিন যাইবেন?

— আপনি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। আমরা যে কোনোদিন যাবো।

মৌফুলি মাথা নেড়ে চলে যায়।

।। ২৬।।

ক্লাসে রঞ্জন ছেলেমেয়েদের বাবার ছবি আঁকতে দেয়। সবাই আঁকা শুরু করে। রিঙ্কু হিজিবিজি এঁকে খাতা ভরিয়ে ফেলে। ওর ভীষণ কান্না পায়। ভাবতে থাকে, বাবা কেমন? আমার তো বাবা নাই। তাহলে আমি কাকে আঁকবো?

রঞ্জন হঠাৎ ওর দিকে খেয়াল করে অবাক হয়, কি হয়েছে রিঙ্কু? কাঁদছো কেন? আঁকতে ভালো লাগছে না?

— আমি কাকে আঁকবো? আমার কি বাবা আছে?

— তুমি আমাকে আঁকো রিঙ্কু সোনা।

— না, আমি তোমাকে আঁকবো না।

রঞ্জন নিঃশব্দে সরে আসে। এই প্রথম ও অনুভব করে শিশুর মুখে রূঢ় সত্য শোনা এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। কুঁকড়ে যাওয়া বুকের ভেতরটা ভীষণ মোচড়াতে থাকে। ছেলেমেয়েরা আঁকা শেষ করে ওর কাছে নিয়ে আসে। ও ওদের হাত থেকে কাগজগুলো নেয়। ওদের সঙ্গে কথা বলে। প্রশংসা করে, ওদের খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা চেহারা দেখে। ঢং পড়লে ওরা চলে যায়। তখন রিঙ্কু ওর সাদা কাগজটা নিয়ে টেবিলের কাছে আসে। রঞ্জনের দিকে কাগজটা এগিয়ে দেয়। ও নেয় না। রিঙ্কু সেটা টেবিলের ওপর রাখে। রঞ্জন ওকে কোলে টেনে নিলে ও কেঁদে ফেলে, তুমি আমাকে তোমার ছবি আঁকতে বললে কেন? তুমিতো আমার বাবা নও?

রঞ্জন ওকে গভীর মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরলে ও ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, তুমি আমার বাবা হবে?

— বাবা?

— হ্যাঁ, বাবা, বাবা। আমি বাবা চাই। রঞ্জন বুঝতে পারে ওর শরীরের ভেতর পাথর হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ও নড়তে পারছে না। রিঙ্কু দু'হাতে ওকে ঝাঁকাতে থাকে, কথা বলছো না কেন? তুমি কথা বলছো না কেন? তুমিতো জানো আমার বাবা নাই, তবু কেন আমাকে বাবার ছবি আঁকতে বলছো? বলো? তুমি যদি আমার বাবা না হও তাহলে আমি ওই পুকুরে ডুবে যাবো। আর কোনোদিন খুঁজে পাবে না। খুব ভালো হবে যে মা কাঁদবে। তোমাকে বকবে।

রঞ্জন বুঝতে পারে এইটুকু মেয়ের এতো কথা ওকে পুরোপুরি পাথর করে চলেছে। সে পাথরের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে ওর অতীত। ওকে আবার বেঁচে উঠতে হবে ভিন্ন রঞ্জন হয়ে। বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ায় এ যে একটা অদ্ভুত সত্য। ও বিহ্বল হয়ে বলে, আহ্ রিঙ্কু এমন করে বোলো না।

তখন বজ্র-নির্ঘোষের মতো এক ব্যাকুল আবেদন। চৌচির করে দেয় ওর পাথর-শরীর। রিঙ্কু অলৌকিক শিশু হয়ে উচ্চারণ করে, তুমি আমার বাবা হবে না?

এক মুহূর্ত দ্বিধা করার অবকাশ নেই — এক মুহূর্ত দ্বিধা করলে উল্টে যাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, খসে যাবে তারকারাশি। রঞ্জন অমোঘ কণ্ঠে তরঙ্গ ওঠায়, হ্যাঁ, আমি তোমার বাবা হবো। নক্ষত্রের আলো দিয়ে তৈরি করা তুমি আমার ছোট্ট খুকী।

— ওহ্ বাবা, আমার বাবা। কচি দুহাত গলা জড়িয়ে ধরলে রঞ্জনের মনে হয় ওর কণ্ঠ পবিত্র হয়ে গেছে। ওই জায়গা ফাঁসির রজ্জু স্পর্শ করতে পারবে না।

।। ২৭।।

তখন সায়রা বাণু আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। ছেলেটার চলে যাওয়াটা তেমন কষ্টের নয়। কষ্ট হচ্ছে না বলে যাওয়াটা। অবিশ্বাসের কালো রশির ফাঁস থেকে সায়রা বাণু নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। নাসিরুদ্দীনকে বলে, ছেলেটা পালিয়েছে, ভালো হয়েছে। যে কটা দিন বাঁচতে পারে বাঁচুক। আমি ওর কথা ভেবে অসুস্থ হবো না। নাসিরুদ্দীন এই কথার রেশ ধরে

নিজেকে প্রকাশ করে, মনে করবো আমাদের রঞ্জন সুখে আছে। ওর ঘর হয়েছে, বউ আছে — কদিন পর ও বাবা হবে। সায়রা বাণু দু'চোখ উজ্জ্বল করে বলে, বাবা হবে? আমাদের ঘর আলো করে ফুটে ওঠা রঞ্জন বাবা হবে? ওগো আমরা কি এমন দিন দেখে যেতে পারবো? নাসিরুদ্দীন অন্যমনস্ক হয় না। ভেতরের এক অযৌক্তিক বিশ্বাস সম্বল করে বলে, নিশ্চয়ই পারবো।

।। ২৮ ।।

সন্ধ্যার পর রিঙ্কুকে ভাত খাইয়ে ঘুম পাড়াতে চায় দীপ্তি। জাকারিয়া ফেরেনি। খবর পাঠিয়েছে দেরি হবে। রঞ্জনও নেই। রিঙ্কুর চোখে ঘুম নেই। মাকে এটা-ওটা প্রশ্ন করে। একসময় দীপ্তি ধমক দেয়, কি ব্যাপার ঘুমুচ্ছো না কেন?

— তুমি তো ছড়া বলছো না। ঘুম পাড়ানি গানও গাইছোনা।

দীপ্তি ওর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে গুনগুন করে, খোকা যাবে শ্বশুড়বাড়ি সঙ্গে যাবে কে। বাড়িতে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।

— ধুত ছাই খোকা খোকা করছো কেন? আমি কি খোকা?

— তুমি খোকা হবে কেন? তুমি তো হুলো বেড়াল।

— আমাকে রাগিয়ো না বলছি। আমাকে রাগালে আমি বাবার কাছে চলে যাবো।

দীপ্তি আতঙ্কে, বিস্ফারিত চোখে তাকায়, বাবা?

রিঙ্কু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মায়ের কোলে মুখ গোঁজে, আমি কাকুকে বাবা ডেকেছি।

— কাকু কি বলেছে?

— বলেছে লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকবে। তুমি রাগ করেছো মা?

দীপ্তি ওকে কাছে টেনে নিলে ও মায়ের বুকে মুখ লুকায়। দীপ্তির দু'হাত ভরা কাঁচের চুড়ি টুংটাং করে বেজে ওঠে। মাত্র দু'দিন আগে রঞ্জন চুড়িগুলো এনে দিয়েছে। বলেছে, চুড়িগুলো তোমার হাতে খুব মানিয়েছে।

— কিশোরী বয়সে লাল চুড়ি আমার খুব ভালোলাগতো।

রঞ্জন হাসতে হাসতে বলে, কিশোরী বয়স?

— হাসলে কেন? কিশোরী বয়সে কি হাসির কারণ থাকে?

— তোমার এখনো কিশোরী বয়স ফুরোয়নি দীপ্তি। তোমার দু'চোখে এক আশ্চর্য কৈশোর ধরা আছে।

— আমি কারো কাছ থেকে এমন কথা শুনিনি। কৈশোরে এক সময়ে নিজে নিজে অনুভব করলাম, আমি বড় হয়েছি। আমার বয়স চৌদ্দ ছুঁয়েছে।

— বাহ্ এতো একটা দারুণ অভিজ্ঞতা।

— তুমিতো জানো, বাবার সঙ্গে অনেক স্টেশনে কাটিয়েছি। ছোটবেলা থেকেই রেলগাড়ি দেখতে আমার খুব ভালোলাগতো। আমার চৌদ্দ বছর বয়সে বাবা শায়েস্তাগঞ্জ বদলি হলেন। জংশন স্টেশন। সারাদিন কতো ট্রেন আসে যায়। ট্রেন এলে আমি দৌড়ে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াই। শায়েস্তাগঞ্জ যাবার পর টের পেলাম ট্রেনের জানালা দিয়ে কোনো কোনো যুবক দু'চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই দৃষ্টি দেখে আমি লজ্জা পেতে শিখলাম।

— শুধু লজ্জা? ভালোলাগেনি?

— হ্যাঁ, ভালোও লেগেছে।

— সেই দিনগুলো তোমার জীবনে আবার ফিরে আসছে দীপ্তি। সেজন্য তোমার দু'চোখে কৈশোরের ছায়া।

— তাহলে তুমি কি সেই যুবক যে রেলগাড়ির জানালায় মুখ রেখে আমার দিকে তাকিয়েছিলে?

— হয়তো তাই।

— না, তুমি সে যুবক নও। তাহলে রেলগাড়ি তোমাকে আমার থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। আমি আর কোনোদিন তোমাকে খুঁজে পাবো না।

অদ্ভুত বিষণ্ন ছায়া সেদিন নেমে এসেছিলো দুজনের চোখে।

।। ২৯ ।।

তখন দু'হাত মাথার চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে অফিসের টেবিলের উপর কনুই রেখে বসেছিলো জাকারিয়া। সাত্তারকে দেখার পর থেকে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই মুহূর্তে মন ভালো নেই। কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়েছে যে ঘড়িয়াতে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ির ধাক্কা লেগেছে। লাইন ক্লিয়ার হতে সময় লাগবে। গাড়ি না আসা পর্যন্ত স্টেশনে অপেক্ষা করতে হবে। কাজেমের কাছে এক কাপ চা চেয়েছে। এখনো দেয়নি। রঞ্জন ঘরে ঢুকলে সাত্তারের পায়ের শব্দ ভেবে চমকে ওঠে, কে? কে তুমি? কেন এসেছো? আমি তোমাকে আসতে নিষেধ করেছি।

— আমি রঞ্জন।

— ও তুমি? রঞ্জন, যে আমার কাছে ভালোবাসা চেয়েছো।

— কি হয়েছে আপনার?

— কিছু হয়নি। আমি ভেবেছিলাম রেলগাড়ির সেই ড্রাইভারটি এসেছে, যে একটি এ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়েছে।

— এ্যাকসিডেন্ট?

— হ্যাঁ, এ্যাকসিডেন্ট। রেলের এ্যাকসিডেন্ট আর জীবনের এ্যাকসিডেন্ট দুটোই সমান। তবে আমি তাদেরকে খুব ভালোবাসি যারা আমার কাছে ভালোবাসা চায়। আমি তোমাকে বুকে আগলে রাখবো রঞ্জন। তোমার কোনো ভয় নেই।

রঞ্জন বুঝতে পারে জাকারিয়া ওর সঙ্গে কথা বলছে না। বলছে নিজের সঙ্গে কিংবা তার সামনে অদৃশ্য কেউ আছে। ওর মন খারাপ। কেমন করে যেন মানুষটা ভীষণ আপন হয়েছে, এমন আপন যে একে কোনো সম্পর্কের ব্যাখ্যায় ফেলা যায় না। এ সম্পর্কের উর্ধ্বে এক গভীর সম্পর্ক। কিন্তু উনি আমাকে কেমন করে বাঁচাবেন? ওনার কি সাধ্য? তখন সেই কণ্ঠ ওকে আদেশ করে, তুমি বাড়ি যাও রঞ্জন। আমার ফিরতে রাত হবে। বাড়িতে দীপ্তি একা।

রঞ্জন বাড়িতে ফেরার পথে ভাবে তিনি কি তাঁর মেয়ের একাকীত্ব ঘুচাবার দায়িত্ব ওকে দিলেন? নাকি পাহারাদার নিযুক্ত করলেন? কোনটা? রঞ্জনের বুক ভেঙে যায়। কোনোটার দায়িত্ব নেয়ার কি সুযোগ পাবে ও? ও আবার ফিরে আসে জাকারিয়ার অফিস ঘরে। জাকারিয়া ওকে দেখে অবাক হয় না। যেন ধরে নিয়েছিলো যে ও আবার ফিরে আসবে। রঞ্জন এবার একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে, বলে, আপনাকে যতোটুকু দেখেছি বুঝতে পারছি রেলের চাকরিটা আপনার ভালোলাগে।

— ঠিক বুঝেছো। আমার মনে হয় চাকরিটা শুধু চাকরি নয়, আমার জীবন। এখানে একটা প্রচণ্ড গতি আছে।। এই গতির মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজে পাই। ভেবে দেখো দুটো

লাইন, পাথরের নুড়ি, কাঠের স্লিপার, সিগনাল, ফ্ল্যাগ, হুইসেল এবং স্টেশন সবকিছুর ভেতর একটি অন্য অর্থ আছে। প্রতিটি অর্থই জীবনের সঙ্গে মিলে যায়।

— হ্যাঁ তাইতো। স্বল্প শিক্ষিত কাজেমও কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দটাকে কেমন নিজের করে নিয়েছে।

— তুমি ভাবতে পারবে না রঞ্জন মৌফুলি যেদিন মরতে গিয়েছিলো সেদিন আমার ভেতরটা চিৎকার করে উঠেছিলো। আমি চাই না আমার রেলের চাকায় মানুষের শরীর থেঁতলে যাক।

— কিন্তু রেল তো অন্যভাবেও মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে।

— কেমন?

— কেউ হয় তো বাঁচার জন্য রেলে করে অন্য কোথাও চলে এলো, দেখা গেলো সেই একই রেল আবার তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

— হতে পারে। যাওয়া-আসাইতো রেলের ধর্ম।

— আপনি যে রেল থেকে গতি পেয়েছেন সে গতিটা আমাকে দিন। আমি আপনার মতো হতে চাই।

রঞ্জনের কণ্ঠস্বর শুনে জাকারিয়া চোখ বোঁজে। ও দেখতে চায়না ওর মুখ। চেয়ারের পেছনে মাথা এলিয়ে দিলে রঞ্জন উঠে পড়ে।

।।৩০।।

গাঁয়ের ডাক্তারের চেম্বারে বসে আছে সাত্তার। বিকেলবেলাটা এখানেই সময় কাটায়। ডাক্তারও হেডমাস্টারের মতো একচোখা। রঞ্জনের দোষ দেখে না। কেন ও এখানে এসে জুটেছে এটাও ভেবে দেখতে চায় না। ও বেশ মর্ম যাতনায় আছে। ডাক্তারের এখানে একটাই লাভ যে পুরনো কাগজগুলো পড়া যায়। কেউ তো পড়ে না। ডাক্তার পড়ে বেশ যত্ন করে গুছিয়ে রাখে। সাত্তার আজও কাগজ বের করে বসে। দু'একটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে ও রঞ্জনের খবর ছাপানো কাগজটা টেনে বের করে। খবরটা পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, ডাক্তার।

এই ডাকে ওর দিকে চমকে তাকায় ঋতু ও ছোট ভাইয়ের জন্য ওষুধ নিতে এসেছে। ও বেঞ্চে বসে তেঁতুল খেতে খেতে পা দোলাচ্ছিলো। সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তার নাকের ওপর চশমা নামিয়ে চোখ বড় করে বলে, কি হয়েছে।

সাত্তার কাগজটা এগিয়ে দেয়, পড়েন।

ডাক্তার কাগজটা পড়ে একপাশে রাখতে রাখতে বলে, এ আর এমন কি? এমন খবর তো হরহামেশা ছাপা হয়।

সাত্তার বাঁকা করে তাকায়। কণ্ঠে ঝাঁঝ, নামটা চেনা লাগছে না? আপনি যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সারাক্ষণ বলেন, এমন অসাধারণ মানুষ হয় না।

— আপনার যতো উদ্ভট চিন্তা সাত্তার সাহেব।

সাত্তার ঋতুর দিকে ঘুরে তাকায়, এ্যাই খুকি তোমাদের স্কুলের ড্রইং টিচারের নাম কি?

— ক্যান নাম জিজ্ঞাস করেন ক্যান? কি অইছে আমাগো সারের?

সাত্তার রেগে যায়, বল না নামটা? ডেঁপো মেয়ে।

— আমি কমু না। আপনে য্যান কেমুন কইরা চিল্লায়ে কথা কইতাছেন।

ডাক্তার বিরক্ত হয়, মানুষের পেছনে লাগা আপনার অভ্যেস দেখছি। এসব ছাড়ুন।

— একে দেখে নেয়ার পর ছাড়বো। ও আমার রিঙ্কুর ইঞ্জিন হয়েছে। যাই হেডমাস্টারকে কাগজটা দেখাই।

সাত্তার গ্রামের পথে হেঁটে গেলে কেঁপে ওঠে দীপ্তির বুক। অজানা আশঙ্কা ওকে তাড়িত করে। কদিন ধরে জাকারিয়ার জ্বর। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছে। ওর মায়ের নাম ধরে ডেকেছে। দীপ্তি খুব অসহায় বোধ করে। বাবার কপালে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, বাবা এখন কেমন লাগছে?

জাকারিয়ার ক্লান্ত কণ্ঠ, আমাকে নিয়ে ভাবিস না মা। এখন তো বয়সটাই অসুখ।

— উঁহু এভাবে বলবে না। তোমার কোনো বয়স হয়নি। তুমি আমার রিঙ্কু।

রিঙ্কু লাফিয়ে ওঠে, কি মজা। এখন থেকে নানুভাইকে আমিও রিঙ্কু ডাকবো।

— তাই ডেকো নানুভাই। তুমি আমাকে রিঙ্কু ডাকলে আমার মনে হবে আমার নতুন জন্ম হয়েছে। এতোদিন আমি বুঝি অন্য একটা জীবনে লুকিয়েছিলাম।

— লুকিয়েছিলে? আশ্চর্য।

— আশ্চর্য কিছু নয় রে। মানুষের মনের ভেতরে মন থাকে, মানুষ নিজেকে খুঁড়ে খুঁড়ে সে মন খুঁজে বের করে।

— বাবা, আমাদের জীবনে তোমার এ কথাটি বেশি সত্য। আমরা ধাক্কা খাই আর নিজেদের অন্যভাবে দেখতে শিখি।

— আমাদের পরিবারে রঞ্জন আসার পর থেকে এমন একটা ওলোটপালট হয়েছে। আমাদের ভেতরের অনেক স্তর সরে গিয়ে অনেক কিছু বেরিয়ে এসেছে। ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে খুব আরাম পাই।

তখন সাত্তার হেডমাস্টারের সামনে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলে, এই কাগজটা দেখুন তো মাস্টার সাহেব।

কাগজটা হাতে নিতে নিতে বলে, কি আছে কাগজে? পুরনো কাগজ মনে হচ্ছে? খবরটায় চোখ পড়তে চমকে ওঠে, এ্যাঁ, আসহাব নাসিরুদ্দীন? সাত্তারের দিকে তাকালে দেখতে পায় সাত্তার বিজয়ীর হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তারপর পুরো খবরটা পড়ে। তার মনে দ্বিধা। কারণ এতোদিন ধরে দেখা ছেলেটির আচরণ, ভাবনা, মানুষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাকে বেশ মুগ্ধ করেছে। যদিও কখনও মুখ ফুটে সেটা বলা হয়নি।

সাত্তার সেই একই ভঙ্গিতে বলে, কি বুঝলেন? এ গাঁয়ে আপনিই তাঁকে নিয়ে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন মাস্টার সাহেব। দেখলেন তো?

— মানুষ অনেক সময় খুন করতে না চাইলেও দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এমন একটি ঘটনা আমি আগে দেখেছি।

— আপনার সন্দেহ হচ্ছে?

— কাগজে যখন বেরিয়েছে একটা ঘটনা তো নিশ্চয়ই ঘটেছে। এই ছেলেটি কোথা থেকে এ গাঁয়ে এলো — সেটাও ভাবার বিষয় —

— সাত্তার রেগে ওঠে, মাস্টার সাহেব আপনার মনেও দ্বিধা? হেডমাস্টারকে চুপ করে থাকতে দেখে ও গলা আর এক ধাপ উঁচু করে বলে, আমি ভেবেছিলাম আপনি ন্যায়ের পক্ষে —

— আমি এখনো ন্যায়ের পক্ষে। আমি অন্যায় কিছু বলিনি।

— আপনার কণ্ঠে সেই জোর নেই।

— চিৎকার করে বললেই কি শুধু ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা হয়? বড় সত্য নিঃশব্দেই থাকে সাত্তার সাহেব। তবে মানুষের ভেতরের ভালোটুকুকে তো আমরা উড়িয়ে দিতে পারিনা।

— প্রতারকরা অনেকরকম ছদ্মবেশই নিতে জানে। আসি।

সাত্তার চলে গেলে হেডমাস্টার অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে থাকে। কিছুই ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

।। ৩১ ।।

দুদিন পর জাকারিয়া অফিস গেলে পিছু নেয় সাত্তার। জাকারিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ও রেগে যায়, আবার কেন এসেছো তুমি?

— আপনি ওই লোকটাকে কতোদিন বাড়িতে রাখবেন?

— সে কৈফিয়ত তো আমি তোমাকে দেবো না।

— একদিন দিতে হবে। আমি আপনাকে একটি খবরের কাগজ দেখাতে এসেছি।

— স্টুপিড। বের হও আমার এখান থেকে।

— আপনি এই কাগজটা দেখবেন না?

— না, না।

— আমার স্ত্রী ও আমার মেয়েকে আমি ফেরত চাই।

— আমার মেয়ে তোমার ঘর করবে না। গেট আউট।

— আচ্ছা।

সাত্তার বেরিয়ে যায়। কিন্তু জাকারিয়া কাজে মন বসাতে পারে না। সাত্তারের যাওয়াটা বুকের মধ্যে বাজছে। যেন এক একটা পা ফেলা বুকের ওপর এসে পড়ছে। কেবলই মনে হয় রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। যতো সময় ব্যয় হবে জটিল হয়ে উঠবে — । কি? কি জটিল হবে? জানিনা, জাকারিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকে।

সেদিন দুপুরে সব ছেলেমেয়েরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলে রিঙ্কু আস্তে করে বলে, সবাই চলে গেছে। এখন আমি তোমাকে বাবা ডাকি?

— ডাকো।

— বাবা, বাবা। তুমি আমার সোনার বাবা।

হেডমাস্টার ক্লাসের দরজায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে। দেখে খুশি হয়। রঞ্জন হঠাৎ হেডমাস্টারকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি রিঙ্কুকে কোল থেকে নামিয়ে দেয়।

হেডমাস্টার এগিয়ে আসে, স্টেশন মাস্টারের নাতনিটা আপনাকে খুব ভালোবাসে না?

রিঙ্কু সোৎসাহে বলে, হ্যাঁ খুব ভালোবাসি। নুনের মতো ভালোবাসি।

— নুনের মতো? হেডমাস্টার হো-হো করে হেসে ওঠে। ও বুঝেছি সেই রাজার গল্প। জানেন গতকাল ছেলেমেয়েরা আমার কাছে এসেছিলো। বলেছে ওদের অঙ্ক ক্লাসটা যেন আপনি নেন।

— না, না তা কি করে হয়। দু'একদিনের মধ্যে তো অঙ্কের টিচারের ছুটি শেষ হয়ে যাবে।

— তা হয় না আমি জানি আসহাব সাহেব। শুধু ছেলেমেয়েদের ইচ্ছের কথা আপনাকে বললাম। আমি জানি মানুষের সব ইচ্ছা পূরণ হয় না।

— আমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। আমি এমনই একটি গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম —

হেডমাস্টার ওর চোখে চোখ রেখে বলে, আপনি কেন এ গাঁয়ে এসেছেন?

রঞ্জন দৃষ্টি নামিয়ে বলে, আর একদিন বলবো।

হেডমাস্টারের চোখের সামনে রঞ্জন ও রিঙ্কু আর দু'জন থাকে না। এক অদৃশ্য রেশমি সুতোয় বাঁধা একজন হয়ে যায়। হেডমাস্টার বুঝতে পারে শিশুটি রঞ্জনকে দু' হাতে আঁকড়ে ধরেছে — এ আঁকড়ে ধরা হাত দিয়ে নয় — এ ভালোবাসার হাত। যদি খবরের কাগজের সেই খবরটি সত্যি হয় তাহলে কি হবে? শুনতে পায় রঞ্জন ওর কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছে। ও কোথায় যাবে। শিশুটির গৃহে? পারবে কি শিশুটি ওকে বাঁচিয়ে দিতে?

— স্যার আমি যাই।

হেডমাস্টার অন্যমনস্কভাবেই মাথা নাড়ে। সাত্তারের ক্রুর হাসি ওকে স্তব্ধ করে দেয়। রঞ্জন রিঙ্কুর হাত ধরে ঘর পেরিয়ে বারান্দা এবং বারান্দা থেকে মাঠে নেমেছে।

।। ৩২ ।।

রাতে বারান্দায় বসে বাঁশি বাজায় রঞ্জন। ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্না চারদিকে। দীপ্তি ওর পাশে এসে বসে। কতোক্ষণ ধরে বাজে বাঁশি দু'জনে জানে না। দুজনের চারপাশ থেকে টাইম ফ্রেম লোপাট হয়ে যায়। একসময় দীপ্তির কণ্ঠে বিষাদ জমাট হয়ে ওঠে, তোমার বাঁশি শুনলে মনে হয় আমার পঁচিশটা বছর মিথ্যে হয়ে গেছে।

— দুঃখের কথা থাক। এসো তোমাকে বাঁশি বাজানো শেখাই।

— তুমি তো জানো না রঞ্জন, এক নতুন অনুভব সারাক্ষণ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

— আমি জানি, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তোমাকে বোঝে দীপ্তি। গতকাল তোমাকে আমি নদীর বুকে সুষুপ্তি দেখিয়েছি। আগামীকাল তোমাকে একজন অসাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাবো।

— মানুষ?

— শুধু প্রকৃতি দেখবে? মানুষ দেখবে না?

— দেখবো, মানুষ দেখবো। আমার কতোকিছু যে দেখা হয় নি। কার কাছে নিয়ে যাবে? কে তিনি?

— একজন যোদ্ধা মানুষ। আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন।

এরপর কবে যেন দু'জনে হেঁটে সেই মানুষটির কাছে গেলো। রঞ্জন বললো, আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি। মনে করেছি আপনাকে দেখলে পুণ্য হয়। পুণ্য হলে পাপ ক্ষয় হয়।

লোকটি নিজের উঠে যাওয়া হাতটা ধরার জন্য অন্য হাতটি বাড়ালো। পরক্ষণে সেই বাড়ানো হাতটি আবার গুটিয়ে নিলো। দীপ্তি বললো, আমার সামনে একটা যুদ্ধ। আমি সেই যুদ্ধে হারতে চাই না। আপনি কি আশীর্বাদ করবেন? লোকটি মৃদু হাসলো। ফেরার পথে রঞ্জন ওর বাঁশিটি তাকে দিয়ে বললো, আপনাকে দেয়ার মতো আমার তেমন কিছু নেই। এই বাঁশিটি আমার খুব প্রিয়। আপনি এই বাঁশিটিই নিন। বাঁশি? লোকটি খুশি হয়ে বাঁশিটা নেয়, কতোদিন ভাবছি গাঁয়ের পথে হাঁটমু আর বাঁশি বাজামু। আজ আমার কি যে আনন্দ লাগতাছে। ওরা আবার হেঁটে হেঁটে ফিরে এলো বাড়িতে। দূর থেকে ওদের দেখলো সাত্তার। তারপর সেই কাগজটা নিয়ে ট্রেনে উঠলো। ছুটে যাওয়া ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দুজনে।

রঞ্জনের মনে হয় ওই ট্রেনের সঙ্গে ও নিজেও দৌড়াচ্ছে। একসময় ট্রেন আর নেই। ওটার গতি অনেক বেশি। মুহূর্তে উধাও হয়ে গেছে। রঞ্জন বুঝতে পারে ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। ও আর পা ফেলতে পারছে না। দীপ্তি ওর দিকে তাকায়, কি হলো? রঞ্জন কিছু না বলে হাঁটতে শুরু করে। ট্রেনটা কি ওর বুকের ওপর দিয়ে গেলো?

।।৩৩।।

সাত্তার রমনা থানার ওসির হাতে কাগজটা দিলে ওসি একরকম ছোঁ মেরে কাগজটা নেয়। তারপর খবরটি পড়ে উত্তেজিত হয়। ফোর্স রেডি করার অর্ডার দেয়।

স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেডমাস্টার রঞ্জনকে আসতে দেখে। ভাবে, সাত্তার শহরে গেছে। সত্যি যদি প্রমাণিত হয় এই ছেলেটিই আসহাব নাসিরুদ্দীন? না, না আমি ভাবতে পারছি না। আমি চাই না এমন কোনো দুর্ঘটনা এ গাঁয়ে ঘটুক।

রঞ্জন কাছে এসে হেডমাস্টারের ফ্যাকাসে চেহারা দেখে বলে, স্যার আপনার কি শরীর খারাপ? স্যার চলুন আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনার বিশ্রাম দরকার। আপনি আমার হাতটা ধরুন। চলুন, বাড়ি নিয়ে যাই।

আশ্চর্য হেডমাস্টার এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে রঞ্জনের হাত ধরে। তার মনে হয় ছেলেটিকে নির্ভর করা যায়।

।।৩৪।।

বাবার জন্য পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, সরষের তেল দিয়ে মুড়ি মাখিয়ে এনে দীপ্তি দেখতে পায় জাকারিয়া ছবি আঁকছে। বেশ মনোযোগ। মুড়ি দেখে একমুঠ মুখে পোরে। দীপ্তিও বসে যায় পাশে। রঙের ভেতর থেকে যে কোনো আকৃতি ফুটে উঠতে দেখলে ওর দারুণ লাগে। এমন সময় গাল ফুলিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে রিঙ্কু, মা এই বিকেলবেলা বাবা ঘুমিয়ে আছে কেন? বাবাকে ডেকে তুলি ?

জাকারিয়ার হাত থেকে তুলিটা পড়ে যায়। তার মনে হয় এতোবড় বিস্ময় তার জীবনে কোনোদিন ঘটেনি। ও লজ্জায় ভীষণ বিব্রত বোধ করে। রিঙ্কু চেঁচিয়ে ওঠে, মা কথা বলছো না যে?

— আহ্ রিঙ্কু খেলো গে যাও।

— না, আমি বাবাকে —

— কি বললে?

ও দ্রুত কণ্ঠে বলে, কাকু, কাকু। তারপর একছুটে বেরিয়ে যায়। জাকারিয়া দীপ্তির দিকে তাকায়। ও বিব্রত কণ্ঠে বলে, আমি কিছু জানি না বাবা। ও কেন এমন করে ডাকে।

দীপ্তি চলে গেলে জাকারিয়া খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে থাকে। একটি শিশুর বুকের ভেতর প্রবল তৃষ্ণা। ওর একজন বাবা চাই। শিশু দ্রুত বুঝে যায় যে বাবা-মা না থাকলে তার শৈশব স্মরণযোগ্য হয় না, কৈশোর অর্থবহ হয় না। তাই বাবা কিংবা মা, যার অভাব তার জীবনে তীব্র হয়, সে তাকে খুঁজে বেড়ায়। রিঙ্কু তেমন একটা জটিল সময়ের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করছে। জাকারিয়া তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। বুঝে যায় ওকে কি করতে হবে।

রিঙ্কু তখন নিঃশব্দে রঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখের পাপড়ি টেনে ধরে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। রঞ্জন ওকে বুকের ওপর টেনে নেয়।

— বাবা ওঠো। বিকেলবেলা তুমি ঘুমিয়ে থাকলে আমার মন খারাপ হয়।

— তাই বুঝি? তাহলে তো খুব খারাপ কথা। আর ঘুমুবো না।

— চলো বেড়াতে যাবো। কতোদিন রাজহাঁসটা নিয়ে বাইরে যাই না।

— আচ্ছা চলো। রঞ্জন উঠে জানালার সামনে দাঁড়ায়। শার্ট গায়ে দিতে দিতে বলে, বাহ্ রোদ পড়ে গেছে। বাইরে কি সুন্দর আলো!

— রাজহাঁসটা কবে সোনার ডিম পাড়বে বাবা?

— সোনার ডিম? ভাবতেই রঞ্জনের চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। রিঙ্কু সোনার ডিমের কথা বলছে। কি অসম্ভব স্বপ্ন ওর বুকের ভেতর। আমি কি ওর জীবনে এমনি সোনার ডিম? না, না। অস্ফুট আর্তনাদ রঞ্জনের কণ্ঠে।

— কি হলো বাবা?

— কিছু হয়নি সোনা।

— তুমি তো বললে না যে কবে রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়বে?

— রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়বে না রিঙ্কু সোনা।

ও উৎসাহের সঙ্গে বলে, পাড়বে। তুমি দেখো পাড়বে। চলো বেড়াতে চাই।

রঞ্জন আর রিঙ্কু রাজহাঁস নিয়ে বেরিয়ে গেলে জাকারিয়া আর দীপ্তি সে দৃশ্য দেখে। দুজনের বুকের ভেতর পরম পাওয়ার তৃপ্তি জেগে ওঠে। যেন কতোকালের অপেক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে, এখন সামাজিক স্বীকৃতি হলেই হয়ে যায়।

রাতে রিঙ্কু গলগল করে নানুভাইর সঙ্গে কথা বলে, জানো নানুভাই আজ রাজহাঁস নিয়ে ভীষণ মজা হয়েছে। আমরা গান করতে করতে নদীর ধারে গিয়েছি। নদীতে সূর্য ডুবতে দেখেছি। রাজহাঁসের সাদা পালকে সূর্যের আলো ঝলমল করছিলো।

— ইস, ভুল হয়ে গেছে। তোমাদের সঙ্গে গেলে আমিও মজা করতে পারতাম।

— এরপর তোমাকে নিয়ে যাবো। কাজল বলে, স্যার এই গাঁয়ে না আইলে আমরা এতোকিছু বুঝতেই পারতাম না।

— ঠিকই তো বলে।

— জানো নানুভাই রাজহাঁসটা না সোনার ডিম পাড়বে।

— রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়ে না নানুভাই।

— ঠিক ঠিক পাড়বে। তুমি দেখে নিও।

— আচ্ছা তুমি চুপিচুপি আমাকে একটা কথা বলতো নানুভাই। তুমি তোমার রাজহাঁস কাকুকে বাবা ডাকো কেন?

— আমার ডাকতে ভালোলাগে। সবার বাবা আছে আমার নেই কেন? বলো আমার বাবা নেই কেন? আমাকে বাবা এনে দাও।

জাকারিয়া ওকে জড়িয়ে ধরে। রিঙ্কু কেঁদে ফেলে, জানো রাজহাঁস কাকু আমাকে বাবার মতো ভালোবাসে।

সকালে জাকারিয়া দীপ্তিকে বলে, রিঙ্কুর সঙ্গে কাল রাতে আমার কথা হয়েছে মা। তুই নিজে বিষয়টি ভেবেছিস? দীপ্তি মুখ নিচু করে থাকে। জাকারিয়া বলতেই থাকে, যখন আমাদের মাঝে রঞ্জন ছিলো না, তখন ওর মধ্যে বাবা সম্পর্কে এমন তীব্র কৌতূহল ছিলো না। রঞ্জনকে পেয়ে ও অন্যরকম হয়ে গেছে। আমারও স্বপ্ন তোকে সুখী দেখা। আমিও চাই তোর জীবনে—

— কিন্তু বাবা, তুমিতো রঞ্জন সম্পর্কে কিছু জানো না।

জাকারিয়া সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়, জানার কোনো দরকার নেই মা। ও খুব ভালো ছেলে।

— কিন্তু তুমিতো বল তোমার মানুষ চিনতে ভুল হয়।

— ওকে আমি বুঝেছি। এবার আর ভুল হবে না। ওকে নিয়ে আমার কোনো দ্বিধা নেই। তাছাড়া জানিস মা যে মানুষ বাচ্চাদের মন জয় করে তাদের মধ্যে কোনো কলুষতা থাকতে পারে না।

— কিন্তু বাবা, মানুষ তো ভুল করতে পারে।

— তা পারে। কেন পারবে না। তবে রঞ্জন এমন কোনো ভুল নিশ্চয়ই করেনি যা কোনো বড় রকমের অন্যায়।

— তবু বাবা তোমার খোঁজ করা উচিত। ও কেন এই পাড়াগাঁয়ে এসে রয়ে গেলো।

— এই গাঁ ওর ভালোলাগছে মা। এমন সুন্দর প্রকৃতি, নদী খোলামেলা চারদিক, এখানে এসে ও অন্যরকম হয়ে গেছে। দেখছিস না কেমন পাগল ছেলে। সারাক্ষণ ছবি আঁকা, বাঁশি, যাদু কতোকিছু নিয়ে মেতে থাকে। ওর সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার কোনো দরকার নেই। তুই কিছু ভাবিস না।

বলতে বলতে জাকারিয়া উঠে যায়। বাবার জন্য দুঃখ হয় ওর। বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। নিরুপায় মানুষের যন্ত্রণা ওকে ক্ষতবিক্ষত করে।

সেদিন বিকেলে স্টেশনের অফিস ঘরে বসে রঞ্জন প্রশ্ন করে, আমাকে এখানে আসতে বলেছেন কেন?

জাকারিয়া মৃদু হেসে বলে, এটা আমার খুব প্রিয় জায়গা যে! এখানে বসে আমি জীবনের অনেকরকম অর্থ খুঁজে পেয়েছি। এই ফাঁকা স্টেশনটি আমার একাকীত্বকে প্রবল করে, একাকীত্ব ভরিয়েও দেয়।

— আপনাকে দেখে আমি তা বুঝতে পেরেছি।

— জানো আমার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমি এই স্টেশনে বসে নিয়েছি।

— বেশ মজা। পেশার সঙ্গে নিজেকে এতো গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলতে আপনার মতো আমি কাউকে দেখিনি।

— রঞ্জন আজ আমি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তোমাকে ডেকেছি।

রঞ্জন উদগ্রীব হয়ে ওঠে না। ও বুঝতে পারে জাকারিয়া ওকে কি বলবে। শুধু অপেক্ষা করে কিভাবে বলবে সেটা শোনার জন্য।

— আমি জানি রিঙ্কু তোমাকে বাবা ডাকে। আমি খুব খুশি হবো তুমি যদি সামাজিকভাবে রিঙ্কুর বাবা হও। দীপ্তিও তোমাকে পছন্দ করে। আর আমার বুক জুড়ে আছো তুমি।

— যেদিন আমি এই স্টেশনে আসি সেদিন আপনি বলেছিলেন আপনার মানুষ চিনতে ভুল হয়।

— না, না এবার আর কোনো ভুল হয়নি। আমি তোমাকে ঠিকই চিনেছি বাবা। আমি ঠিক করেছি সাত্তারের সঙ্গে দীপ্তির ডিভোর্সের ব্যবস্থা করতে দু'একদিনের মধ্যে ঢাকা যাবো।

।। ৩৫ ।।

পরদিন দুপুরের আগে গাঁয়ের স্টেশনে পুলিশ এসে নামে। সঙ্গে সাত্তার। পুলিশ দেখে কাজেম পালাতে চায়। ওসি ওর হাত চেপে ধরে, কোথায় যাচ্ছো? তুমি এ গাঁয়ের লোক?

কাজেম মাথা নাড়ে।

— আসহাব নাসিরুদ্দীনকে চেনো?

— না, চিনিনা।

সাত্তার রেগে ওঠে, চিনিস না? ভাইজান, ভাইজান করতে করতে মুখে ফেনা উঠে যায়। ও রাগে চেঁচিয়ে ওঠে, তারে পুলিশে খুঁজবে ক্যান?

সাত্তার আঙুল তোলে, দেখবি পুলিশে খোঁজে কেন? ওসি সাহেব স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে চলেন। ওখানেই ওকে পাবেন।

পুলিশ দেখে গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা জড়ো হয়েছে চারদিকে। সবার চোখে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা। ছেলেমেয়েরা পুলিশের খবর তাদের প্রিয় স্যারকে দেয়ার জন্য দৌড়াতে থাকে।

জাকারিয়া তখন ঢাকা যাবার জন্য ছোট একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছে। কাছে রিঙ্কু বসে আছে।

— নানুভাই আমিও তোমার সঙ্গে ঢাকা যাবো।

— এবার না নানুভাই। পরের বার নেবো। এবার আমার অনেক কাজ।

রিঙ্কু অভিমান করে, থাক, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। বাবাই আমাকে ঢাকা নিয়ে যাবে। আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।

দীপ্তি তখন মায়ের দেয়া গয়নাগুলো বের করে বিছানার ওপর ছড়িয়ে রেখেছে। ছোট্ট একটা কানের দুল পরতে চায়। কোনটা পরবে বুঝতে পারে না। রঞ্জনের দিকে তাকায়, বলো না কোনটা তোমার পছন্দ?

— দেখি।

মা একটু একটু করে সঞ্চয় করে আমার জন্য গয়না গড়িয়েছে। সব গয়না আমার পরাই হয়নি।

— ঠিক আছে যেটা তোমার পরা হয়নি সেটাই পরো।

দীপ্তির পরা হলে রঞ্জন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, বাহ্ সুন্দর!

ছুটে আসে রিঙ্কু, বাবা নানুভাই আমাকে ঢাকা নিয়ে যাবে না। তুমি আমাকে ঢাকা নিয়ে যাবে তো?

রঞ্জন ওকে কোলে তুলে নেয়, হ্যাঁ বাবা আমি তোমাকে ঢাকা নিয়ে যাবো। দীপ্তি আমরা হানিমুন করতে ঢাকায় যাবো।

— হানিমুন কি বাবা?

দুজনে হাসতে থাকে। সেই হাসির মধ্যে ঝমঝম শব্দ তুলে উঠোনে ঢোকে ছেলেমেয়েরা। শব্দটা একদম অন্যরকম। এ রকম শব্দ, এ গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা আগে কখনো করেনি। সে শব্দে চমকে ওঠে জাকারিয়া। বুকের ভেতর কট করে ওঠে, তাহলে কি এবারেও মানুষ চিনতে ভুল হয়ে গেলো? ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে বলছে, স্যার, স্যার, পুলিশ। জাকারিয়ার কণ্ঠ থেকে স্খলিত উচ্চারণ, আমার বাড়িতে পুলিশ! রিঙ্কু দৌড়ে বাইরে আসে, পুলিশ কি কাজল? রঞ্জন দীপ্তির হাত ধরে, যদি আমার জীবনে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়, যদি অপরাধের দণ্ড কম হয়, তাহলে মনে রেখো তোমার কাছেই ফিরে আসবো দীপেশ্বরী। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

ততোক্ষণে সাত্তার পুলিশ নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে। জাকারিয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে রঞ্জনকে

ডাকে। ও কাছে এগিয়ে এলে ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে, বাবা আমার বাড়িতে পুলিশ কেন?

— আমারই জন্য। আমাকে যেতে হবে।

জাকারিয়া ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলো, পারে না। পুলিশ এসে হাতকড়া লাগায়। রিঙ্কু ওকে জড়িয়ে ধরে, বাবা তোমার কি হয়েছে? তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

সাত্তার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নিজ কন্যার দিকে তাকায়, ওই লোকটা রিঙ্কুর বাবা হতে পেরেছে! ওর বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়।

গাঁয়ের পথে এগিয়ে যায় পুলিশ। পেছনে ছেলেমেয়েরা হাঁটতে থাকে। স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টার দৃশ্যটি দেখে। তারপর ওদের সঙ্গে হাঁটতে থাকে। আতরজান, কাজেম, মৌফুলি, নয়ন, ডাক্তার, মেজান আরো কতো অসংখ্য মানুষ। ভেঙে পড়েছে গ্রাম। মৌফুলি চেঁচাচ্ছে, আমারে নিয়া পুলিশ ভাইজানরে ছাইড়া দিতে পারে না।

কোলাহলহীন পুরো গ্রাম। স্তব্ধ হয়ে গেছে গাঁয়ের মানুষ। শুধু বাতাসে ভেসে বেড়ায় রিঙ্কুর আর্ত চিৎকার, বাবা।

ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়ায় রঞ্জন। বুঝতে পারে একটি শিশুর বুকের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বয়ে যায় মহাকাল। ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দীপ্তি মায়ের দেয়া বালাজোড়া হাতে পরে। মনে হয় আজ বড় আনন্দের দিন। ও তো বুক ভরা আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করবে। নিশ্চয়ই ফিরবে সে।

ওর জলভরা চোখের ওপর পুরো গ্রাম ফেড-আউট হতে থাকে। শুধু তার কণ্ঠস্বর নিসর্গ হয়। তার কণ্ঠস্বর পাখির কূজনের মতো বলতে থাকে, আমার জন্য অপেক্ষা কোরো দীপেশ্বরী।

1.	Poetry & Truth (1970) – Abu Sayeed Ayyub	Rs. 10.00
2.	W.B. Yeats : An Indian Approach (1968) – Dr. Naresh Guha	Rs. 15.00
3.	Shakespeare : A Book of Homage (1965) – Edited Prof. S. C. Sengupta	Rs. 10.00
4.	The Idea of Revenge in Shakespeare (1969) – Dr. Jagannath Chakraborty	Rs. 20.00
5.	Essays and Studies Vol. VI (1987) – Edited Debabrata Mukherjee	Rs. 25.00
6.	Essays and Studies Vol. VI (1987) – Edited Jasodhara Bagchi	Rs. 50.00
7.	রবীন্দ্রকাব্যে অলংকার (১৯৭১) — ডঃ জটাধারী মালাকার	Rs. 20.00
8.	ভার্জিল : ঈনীড (১৯৭২) — সম্পাঃ হৃষীকেশ বসু ও রবের আতোয়ান	Rs. 20.00
9.	তারাপদ মুখোপাধ্যায় কৃত বাংলা ছন্দ (১৯৮০) — সম্পাঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য	Rs. 40.00

Books Are Available at the Jadavpur University Press and Granthalok, National Council of Education, Calcutta - 700 032

Terms & Conditions

1. All correspondences should be addressed to The Registrar, Jadavpur University, Calcutta -700 032, India.
2. Prices in Rupees do not include cost of postage, freight, packing etc. which are to be borne by the customer. Books are sent to countries outside India by sea mail, postage free.
3. All cheques, drafts and money orders are payable to Jadavpur University, Calcutta.
4. Discount of 20% is allowed to booksellers only. Discounts of 40% on the price (excluding V.P. and other charges) of each book are allowed provided the booksellers, agreeable to act as Agents, but not less than 10 copies of any publication at a time. Over-riding discount of 5% over and above 40% may be given to the Selling Agents / Distributors willing to sell more than 500 copies of any publication within a limited period of time.
5. All prices are subject to change without notice due to reasons beyond our control.

JADAVPUR UNIVERSITY
CALCUTTA - 700 032 • INDIA

Price : Rs. 30 **BIVAV** Reg No : 30017/76

Vol. 20 No. 2 Special Autumn Issue 73rd issue
July-Sept. '98

PUBLISHED IN OCTOBER '98
INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO. 0970-1885

VICTORIA MEMORIAL HALL

(An Institution of National Importance)
1 Queens way, Calcutta 700 071
Te : 223-1889-91/5142; Fax : 223-5142

A : Forthcoming Programmes under National Calender of Events.

1. Journey towards freedom: New forms of exposition for the modern conciousness in Bengal—An Exhibition in association with Vivan Sundaram. (September'98 to November '98)

2. Life & times of Tipu Sultan- An Exhibition (during 1998-99)

B : Sound and Light Shows at Victoria Memorial Ground on Pride and Glory - The Story of Calcutta
(from October '98 through June '99).

C: Recent Publications:

1.	Charles Doyly's Calcutta Album I and II	Rs. 40.00 Each
2.	Calcutta Gallery - *India's first City Gallery*	Rs. 50.00
3.	The First Spark : *Story of the Revolt 1857*	Rs. 75.00
4.	*Contemporary Art of Bengal*	Rs. 375.00
5.	Ganguly. K.K. *Modern Masters*	Rs. 35.00
6.	*A Comprehensive Catalogue of Water colours Pencil sketches and Pen & ink drawings in the collection of Victoria Memorial.*	Rs. 15.00
7.	Greig Charles, *Landscape paintings in the Victoria Memorial collection chiefly by European Artists..*	Rs. 150.00
8.	Chakrabarti, Hiren, *Urban History : Calcutta Tercentenary.*	Rs. 35.00
9.	*Calcutta in the eyes of Daniell (Album)*	Rs. 35.00